পশ্চিমবংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক
বিদ্যালয়সমূহের সাহিত্য-কলা ধারার ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা পরিচয়

(সাহিত্য-কলা ধারার জন্য)

সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ
অরুণকুমার সেন, এম. এ. (স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত),
এম্. এস্-সি. (ইকন্, লণ্ডন), ব্যারিষ্টার এ্যাট্-ল
প্রণীত

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট • কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

পৌরবিজ্ঞান

নবম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

দশম শ্রেণী

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

একাদশ শ্রেণী

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

অর্থবিদ্যা

নবম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম শ্রেণী

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

একাদশ শ্রেণী

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

SYLLABUS FOR
ELEMENTS OF ECONOMICS & CIVICS
CIVICS : Second Paper

Class IX

1. The evolution of human society. The Family. The patriarchal and matriarchal families. The Indian joint-family.

2. The State : its origin and characteristics.

3. The Government. Forms of Government. Democracy and Dictatorship. Merits and defects of Democracy. Unitary and Federal Government. Parliamentary and Presidential Government.

4. Organs of Government. Separation of powers. Departments of Government. 5. Functions of Government.

6. The Individual and Society. Socialism.

7. The Nation. Right of Self-determination. United Nations.

Class X

8. The Citizen ; how citizenship is acquired and lost ; qualities of a good citizen ; hindrances to good citizenship.

9. The Citizen's Rights. The Right to Vote ; its importance and implications.

10. The Citizen's Duties—to the family, to the community, to the State. 11. Rights and Duties. 12. Law and Liberty. 13. Public Services. 14. Public Opinion. Organs of Public Opinion. 15. Political Parties.

Class XI

16. A brief outline of the Constitution of India with special reference to—The Preamble. Fundamental Rights ; Directive Principles. The Indian Citizen. Franchise. The Federation of India. The Distribution of Powers. The President—how he is elected. Powers of the President. The Union Parliament. Control of the Executive by the Legislature. The States. The Governor. The State Legislature. Relation between the Centre and the States. Heads of Revenues and Expenditures for Union and State Governments. The Judiciary. The Supreme Court. The Indian Political Parties.

17. Local Government.

18. Civic Problems. Village Improvement. Community Development Projects. Towns and Cities. Food. Housing. Sanitation. Health.

[illegible] Defence of India. The Army, the Navy and the Air Force. Voluntary Defence Organisations. The National Cadet Corps.

ECONOMICS : First Paper

The subject is to be treated with special reference to INDIAN CONDITIONS

Class IX

1. National Income and its distribution—per capita income—standard of living.
2. Broad factors determining national income—factors of production.
3. Population—population and food supply—population and national income—labour supply—unemployment.
4. Natural resources—land and its productivity.
5. Capital—factors governing the accumulation of capital.
6. Technical skill—its importance—factors governing its formation.
7. Economic structure—main structural features of an under-developed economy—requirements for economic development.

Class X

8. Forms of business organisation—single-owner firm—Partnership— Joint-Stock Companies. Co-operation—principles—different types of co-operative societies and their main features. Small and Large-scale industries.

9. Role of the Government—economic functions of the Government—Government and development planning—Indian 5-Year Plans.

10. Government finances—taxation, expenditure and borrowing—financing of development.

11. Money—functions of money—monetary standards—creation of money—Banks—Commercial Banks—Central Bank—Functions of Banks—Bank money.

12. The general price level—measurement of changes in the general price level—simple index numbers—Inflation.

Class XI

13. International Trade—territorial division of labour—Balance of Trade and Balance of Payments—Protection and Free Trade.

14. Markets—forms of markets : Competition and Monopoly.

15. Price determination under different market conditions—factors governing demand : price changes and income variations, elasticity of demand—factors governing supply and supply price—increasing and diminishing returns.

16. Different types of factor incomes—wages, interest, rent and profits—Collective bargaining and trade unions.

The objects that have been kept in view in preparing the syllabus are :

(a) to help the students understand and take an intelligent interest in the everyday problems of our economic life ;

(b) to prepare them as future citizens to appreciate and to take an intelligent part in the affairs of the country ; and

(c) to provide those amongst them who intend to take up the 3-Year Degree Course in Economics with the necessary theoretical background.

উপরি-উক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই স্মরণ রাখিয়া গ্রন্থখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুর দুরূহ অংশের আলোচনা পরিহার করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। বিষয়বস্তু অনুসারেই ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই পুস্তকের প্রশ্নোত্তরে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রসমূহে যে-সকল সংকেত-অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদের ব্যাখ্যা হইল নিম্নলিখিত রূপ :

H. S. (H)	Higher Secondary Humanities Group
H. S. (C)	,, ,, Commerce Group
H. S. (C) Comp.	,, ,, Commerce Group (Compartmental)
H. S. (H) Comp.	,, ,, Humanities Group (Compartmental)
C. U.	Calcutta University (Intermediate)
B. U.	Burdwan University (Intermediate)
S. F.	School Final Examination (Elective & Optional)
P. U.	Pre-University (Calcutta)
En.	University Entrance (Burdwan)

পৌরবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি

(Subject Matter and Scope of Civics)

ভূমিকা : বর্তমানে আমরা সভ্য সমাজে বাস করিয়া সুশৃংখল জীবন যাপন করি। আহারের জন্য আমাদের প্রত্যেককে খাদ্য উৎপাদন করিতে হয় না, পরিধানের জন্য পোশাক তৈয়ারি করিতে হয় না। চালডাল, তরিতরকারি, মাছমাংস, জামাকাপড় বাজার হইতে কিনিয়া লইলেই হইল। বর্তমানে দেশের এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য অঞ্চল হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হয় ; সারা দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করা হয়। ইহাতেও না কুলাইলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের (food control and rationing) ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের যাতায়াতের জন্য মোটরবাস রেলগাড়ি ট্রামগাড়ি প্রভৃতি যান-বাহন নিয়মিত চলিতেছে ; আমাদের শিক্ষার জন্য স্কুলকলেজ খোলা আছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। আবার চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুষ্কৃতিকারীর হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিবার জন্য পুলিস আদালত জেল প্রভৃতি আছে ; দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য-বাহিনী আছে ; ইত্যাদি।

এই সকলের ফলে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিয়া থাকি। কিন্তু চিরকালই এই অবস্থা ছিল না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া, অতি ধীরে ধীরে। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা সংগৃহীত হইত প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য হইলেও দলের সকলে মিলিয়া তাহা সমভাবে ভোগ করিত। মানুষের যে-কোন সংঘবদ্ধ অবস্থাকেই সমাজ বলিয়া অভিহিত করা যায় বলিয়া এই অবস্থাতেও মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল বলা যায় ; এবং সকলে সমান ভোগ করিত বলিয়া এই সমাজ ছিল সমভোগী সমাজ।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য ও উৎপাদনের অন্যান্য কলাকৌশল শিখিল। ইহার ফলে আদিম সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। লোকে কৃষিকার্যের জন্য একস্থানে বসবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল এবং কৃষি-জমি, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি নিজের বলিয়া মনে করিতে সুরু করায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির (private property) উদ্ভব হইল। সমভোগী সমাজ আর রহিল না। তখন এক জন-গোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর পশু, শস্য ও অন্যান্য সম্পদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা

করায় দেখা দিল যুদ্ধবিগ্রহ। গ্রামীণ সমাজের মধ্যেও জমিজমা ইত্যাদি লইয়া বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল যুদ্ধ-পরিচালনা ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কর্তৃত্বের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধনায়কগণ এই কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া কায়েম হইয়া বসিলেন; এবং ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাদের অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে; সমাজ ও রাষ্ট্র বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক; আবার সে শ্রমিক-সংঘ, সাহিত্য সভা, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেরও সদস্য। তাহার সুখদুঃখ, আশাআকাংক্ষা, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে মানুষের আচরণই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যে শাস্ত্র এই আলোচনা করে ইংরাজীতে তাহাকে 'সিভিকস' (Civics) এবং বাংলায় 'পৌরবিজ্ঞান' বলা হয়।

পৌরবিজ্ঞান

অর্থ ও বিষয়বস্তু (Meaning and Subject Matter): ইংরাজী 'সিভিক্স' (Civics) শব্দটি দুইটি ল্যাটিন শব্দ হইতে আসিয়াছে—যথা, সিভিটাস্ (civitas) এবং সিভিস (civis)। সিভিটাস্ শব্দের অর্থ 'নগর-রাষ্ট্র' এবং সিভিস শব্দের অর্থ 'নাগরিক'। সুতরাং ইংরাজী শব্দগত অর্থে সিভিক্স বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা।

নাগরিককে বাংলায় 'পুরবাসী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং বাংলা শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান হইল পুরবাসীর আচরণের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান।

শাস্ত্র হিসাবে পৌরবিজ্ঞান অতি পুরাতন। প্রাচীন ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য দেশ এই শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল; তবে সুসম্বদ্ধভাবে ইহার আলোচনা করে প্রথমে প্রাচীন গ্রীস এবং পরে প্রাচীন রোম। এই গ্রীক ও রোমকদের শাস্ত্রই উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিলেও বর্তমান দিনে পৌর-বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহার কারণ, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের নাগরিক-জীবন এবং বর্তমান দিনের নাগরিক-জীবনের মধ্যে হইল আকাশপাতাল তফাত।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে

গ্রীক ও রোমক যুগে পুরবাসী বা নাগরিকের জীবনের একটিমাত্র দিক ছিল। নাগরিক তখন ছিল মাত্র রাষ্ট্রেরই সভ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্র একটিমাত্র নগর লইয়াই গঠিত হইত এবং রাষ্ট্র (State) ও সমাজ (society) আজিকার দিনের মত পরস্পর হইতে পৃথক ছিল না, সম্পূর্ণ একই ছিল। ঐরূপ

পূর্বে ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখা হইত

রাষ্ট্রকে 'নগর-রাষ্ট্র' (city state) বলা হয়। নগর-রাষ্ট্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সকল কিছুরই ব্যবস্থা করিত—নাগরিকগণকে নিজেদের কিছু করিতে হইত না। সুতরাং তখন ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

কিন্তু আজিকার দিনের রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স বা স্পার্টার ন্যায় ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র নয়, ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ 'জাতীয় রাষ্ট্র' (Nation States)। এইরূপ জাতীয় রাষ্ট্র নাগরিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা কখনই করিতে পারে না। তাই নাগরিকগণকেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আত্মবিকাশের জন্য পৌরসভা ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক-সংঘ ও বণিক সমিতির ন্যায় অর্থনৈতিক সংস্থা, সাহিত্য সভা ও কলা পরিষদের ন্যায় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হয়। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় পৌরবিজ্ঞান এই সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। উপরন্তু, বর্তমান যুগের নাগরিক বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও বিব্রত। ফলে ইহাদের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে নাগরিককে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সভ্য হিসাবে দেখা হয়।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of the Study of Civics) : উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, বর্তমানে পৌর-বিজ্ঞান চারিটি দিক হইতে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করে—যথা, (১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে, (৩) বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে, এবং (৪) বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে। এখন এইগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিলেই পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (scope) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাইবে।

আবশ্যিকভাবে নাগরিক কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য—ইহাতে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নাই। যেমন, আমরা সকলেই ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য, মার্কিনীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য, ইত্যাদি। রাষ্ট্রই সুশৃংখল সমাজ-জীবন সম্ভব করিয়া নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া তাহাকে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্যা হইল নাগরিকের প্রাথমিক সমস্যা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য তাহার পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। দেশ সুশাসিত হইলে তবেই নাগরিক ভালভাবে বাঁচিতে পারে—সে তাহার জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক,

১। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিক

মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহের বিকাশের সুযোগ পাইতে পারে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানে প্রথমেই রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করা হয়।

নাগরিক-জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবও কম নহে। দেশ-ব্যাপী রেল-ধর্মঘট, ডাক-ধর্মঘট আমাদের বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলে। পৌর-কর্মচারিগণের ধর্মঘটও আমাদের কম বিব্রত করে না। উপরন্তু, বর্তমান যুগে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নাগরিকতার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য করে। এই সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান করিয়া নাগরিক এই শিক্ষালাভ করে যে, কিভাবে পরস্পরের সমবায়ে সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে হয়—সাধারণের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এইভাবে গড়িয়া উঠে দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা। তখন নাগরিক বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্বপালনের উপযোগী হইয়া উঠে। এই কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

২। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে নাগরিক

তৃতীয়ত, নাগরিক-জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গমনাগমনের সুযোগসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। ফলে পৃথিবীর কোন স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ সুরু হইলে অন্যান্য দেশের লোকও চিন্তিত হইয়া পড়ে। তাহাদের ভয় হয়, এ যুদ্ধ হয়ত' ছড়াইয়া পড়িবে, এ-যুদ্ধ হইতেই হয়ত' তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে হয়ত' সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার শুধু যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বংসের কথাও নয়। বর্তমানে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি নানা দেশ হইতে সাহায্য পাইতেছি। যদি কোন কারণে এই সকল সাহায্য বন্ধ হয় তবে আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ত' ব্যর্থ হইয়া যাইবে; ফলে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইবে উন্নততর জীবনযাত্রার চিত্র। তাই আমরা মার্কিন সাহায্যদান লইয়া জল্পনাকল্পনা করি, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে সংঘর্ষের সংবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের গতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করি। অনেক সময় আবার শুধু জল্পনাকল্পনা, আলাপ-আলোচনা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না; যাহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন না হইয়া উঠে—সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার প্রচেষ্টাও করিতে হয়। এইজন্য দেখা যায় কংগোতে বেলজিয়ান ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে

৩। বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে নাগরিক

কলিকাতার পথে শোভাযাত্রা, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রতিবাদ হিসাবে লণ্ডনস্থ সোবিয়েত দূতাবাসের সম্মুখে জনতার বিক্ষোভ।

অতএব, নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা শুধু রাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। নাগরিককে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় বলিয়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সফলতার প্রচেষ্টা করিতে হয় বলিয়া পৌরবিজ্ঞান নাগরিক-জীবনের এই আন্তর্জাতিক দিকটির আলোচনাও করে।

পরিশেষে, সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে পৌরবিজ্ঞানকে আর একপ্রকার আলোচনাও করিতে হয়। ইহা হইল বিভিন্ন সংঘের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণ লইয়া আলোচনা। মানুষ তাহার আত্মবিকাশের জন্য সমাজ গঠন করিয়াছে। রাষ্ট্র ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল সমাজ-সংগঠনের দুইটি রূপ মাত্র। কিন্তু মাত্র এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে না, জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না। তাই সে সাহিত্য সভা, সংগীত একাডেমী, সেবা সমিতি, বণিক সমিতি, শ্রমিক-সংঘ, ধর্ম সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়; আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (ILO), সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির ন্যায় অনেক সময় আবার ইহারা সমগ্র বিশ্বেও কর্মক্ষেত্র বিস্তার করে। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়। মার্কিন শ্রমিক ভারতীয় শ্রমিককে মিত্র বলিয়া মনে করে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতীয় কর্মী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। কি করিয়া এই বন্ধনসূত্রকে দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে একই গোষ্ঠীভূত করা যায়—যুগ যুগ ধরিয়া দার্শনিকগণ এই স্বপ্নই দেখিয়া আসিতেছেন। কল্যাণকৃৎ শাস্ত্র হিসাবে এই 'এক পৃথিবী'র (one world) স্বপ্ন সফল করাও পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ।

৪। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে নাগরিক

পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ

পূর্বে অবশ্য পৌরবিজ্ঞানের এই আদর্শ ছিল না; ফলে উহার পরিধিও এত ব্যাপক ছিল না। তখন নগর-রাষ্ট্রের সভ্যের জন্য মাত্র 'সুন্দর নগরে'র (city beautiful) পথনির্দেশ করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু আজ নাগরিকের পক্ষে নগর বা স্থানীয় জীবনকে সুন্দর করিতে হইবে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিতে হইবে, সংঘজীবনকে সার্থক করিতে হইবে এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের প্রচার ও প্রয়াস করিয়া এক নূতন পৃথিবী গঠন করিতে হইবে বলিয়া পৌরবিজ্ঞানকেও সকল দিকেই পথনির্দেশ করিতে হইবে।

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ (Indian Civic Ideals and the Present Age) : বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতও পৌরবিজ্ঞান বা পুরবাসীর শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল। ফলে প্রাচীন ভারতেও পৌর আদর্শ পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমকদের পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল নগরকে সুন্দর করিয়া তোলা, প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলা। ইহার কারণ, এই গ্রামই ছিল প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি।

ভারতীয় পৌর আদর্শ : গ্রামকে সুন্দর করিয়া গঠন ও অরাজকতা পরিহার করা

পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত গ্রামসমূহ বহু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। এক রাজার রাজ্য অন্য এক রাজা কাড়িয়া লইলেও গ্রাম-ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিত না। গ্রামগুলি পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজাকে কর প্রদান করিয়া পূর্বের মত জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মৎস্যন্যায় বা অরাজকতা ঘটিলে গ্রামের জীবনযাত্রাতেও বিশৃংখলা দেখা দিত। সেইজন্য অরাজকতা পরিহার করাও ছিল প্রাচীন ভারতের নাগরিক-জীবনের আদর্শ।

স্বাভাবিকভাবে ইহার তুলনাতেও বর্তমান দিনের নাগরিক-আদর্শ ব্যাপকতর

এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনাতেও যে বর্তমান দিনের পৌর আদর্শ বহু পরিমাণ ব্যাপকতর হইয়াছে তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যাইবে। এখন আর গ্রামকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা এবং অরাজকতা পরিহার করাই নাগরিক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ইহার উপর লক্ষ্য লইয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিয়া গঠন করা, সংঘজীবনকে সার্থক করা এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের পথে এক নূতন পৃথিবী গঠন করা।

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা : প্রথম অবস্থায় মানুষ পশুর মতই বন-বনান্তরে ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। কিন্তু পশুর মত কখনও সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করে নাই ; আদিমতম যুগ হইতেই সে সংঘবদ্ধ। এই সংঘবদ্ধতার ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হইয়াছে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার।

যে-শাস্ত্র রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচনা করে তাহাকে পৌরবিজ্ঞান বলে।

অর্থ ও বিষয়বস্তু : শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা। পূর্বে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই ছিল যথেষ্ট—কারণ, রাষ্ট্র তখন ছিল নগররাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না—তাহাকে অন্যান্য সকলপ্রকার সংগঠনের সদস্য হিসাবেও দেখিতে হইবে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বর্তমানে ব্যাপকতর হইয়াছে।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি: বর্তমান দিনের ব্যাপকতর পৌরবিজ্ঞান নাগরিককে চারিটি দিক হইতে দেখে—(১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে, (৩) বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে, এবং (৪) বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে।

পৌরবিজ্ঞান কল্যাণকৃৎ শাস্ত্র। সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা, সার্থক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এবং শান্তি ও মৈত্রীর পথে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তোলা ইহার আদর্শ।

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ: প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শ ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া গঠন করা ও অরাজকতা পরিহার করা। গ্রীক ও রোমক পৌর আদর্শের মত এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনায়ও বর্তমান নাগরিক-জীবনের লক্ষ্য বহু পরিমাণ ব্যাপকতর।

প্রশ্নোত্তর

1. What is Civics? Discuss the subject matter and scope of Civics.
পৌরবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়? পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর। [২-৫ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ

(Nature and Stages of Society)

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, এই শাস্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংঘ প্রভৃতি সমাজ-সংগঠনেরই বিভিন্ন রূপ। সুতরাং এককথায় বলা যায়, পৌরবিজ্ঞান সমাজের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচনা করে। এখন প্রশ্ন উঠে সমাজ কি? সমাজ-সংগঠনের কারণ বা উদ্দেশ্য কি? কিভাবেই বা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে?

সমাজ (Society): সমাজবিজ্ঞানীদের (Sociologists) মতে, মানুষ যখন স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে বা বজায় রাখে তখনই সমাজ গঠিত হয়। এই স্বেচ্ছামূলক সম্পর্কের মূলে থাকে বিশেষ উদ্দেশ্য। অতএব সমাজের দুইটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়: (ক) স্বেচ্ছামূলক সম্পর্ক, এবং (খ) বিশেষ উদ্দেশ্য। এই অর্থে আদিমতম যুগেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়াছিল; বন্য জীবজন্তু ও অন্য বন্য মানুষের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এবং ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকারের উদ্দেশ্যে তাহারা দলবদ্ধভাবে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

বর্তমানেও কিছুসংখ্যক লোক যখন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হয়, শ্রমিকরা যখন তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য সংঘ (trade unions) গঠন করে এবং পল্লীবাসীরা যখন নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিবার জন্য কতকগুলি রীতিনীতি মানিয়া চলে তখন উহাদিগকে যথাক্রমে ধর্মীয় সমাজ, শ্রমিক সমাজ ও পল্লীসমাজ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ঐ একই অর্থে খেলাধূলার জন্য স্থাপিত ক্লাব-এসোসিয়েশন প্রভৃতিকে ক্রীড়া-সমাজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে সকল সময়ই যে স্বেচ্ছামূলক সম্পর্ক থাকিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। অনেক সময় ঐরূপ সম্পর্কের কল্পনাও করিয়া লওয়া হয়। যেমন, পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের মধ্যে সম্পর্কের কল্পনা করিয়া বলা হয় পাশ্চাত্য সমাজ।

মানবসমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের মত বৃহত্তর পরিধির সমাজের কল্পনা যখন করা হয় তখন ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন সংঘের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যেমন, মানবসমাজের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকে, অসংখ্য প্রতিষ্ঠান থাকে।

বর্তমানে অবশ্য মানবসমাজ, পাশ্চাত্য সমাজ ইত্যাদির ন্যায় অতি বৃহৎ পরিধির সমাজের কল্পনা না করিয়া অধিকাংশ সময়ে জাতির (Nation) গণ্ডির মধ্যেই সমাজের ধারণা করা হয়—যেমন বলা হয়, ভারতীয় সমাজ, চৈনিক সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। এই সকল সমাজ 'জাতীয় সমাজ' (National Society) নামে অভিহিত। বৃহত্তর পরিধির বলিয়া এইরূপ প্রত্যেকটি জাতীয় সমাজের মধ্যেও নানারূপ সংঘ—যথা, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সংগঠন প্রভৃতি থাকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দেশ বা জাতির অন্তর্গত সকল সংগঠন মিলিয়াই হইল জাতীয় সমাজ।

জাতীয় সমাজ

জাতীয় সমাজের অন্তর্গত সংগঠনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে আবশ্যিক সংগঠন; অন্যান্য সংঘ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, জাতীয় সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র থাকিবেই, কিন্তু অন্যান্য সংঘ নাও থাকিতে পারে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আইনের মাধ্যমে সামগ্রিক সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করা; অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশে সহায়তা করা। সামগ্রিকভাবে সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া রাষ্ট্র জাতীয় সমাজের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে এবং অন্যান্য সংঘ ইহার চারিদিকে আবর্তিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অন্যান্য সংঘ থাকিবে কি না-থাকিবে, যদি থাকে তবে তাহারা কি কি কার্য সম্পাদন করিবে ইত্যাদি বিষয় নির্ভর করে রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর। রাষ্ট্রের নীতির সহিত অন্য যে-কোন সংঘের নীতির সংঘর্ষ বাধিলে ঐ সংঘকে হয় নীতি-পরিবর্তন করিতে হইবে, না-হয় উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্র জাতীয় সমাজের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে

অপরদিকে আবার রাষ্ট্রও যথাসম্ভব সংঘের নীতিসমূহকে মান্য করিয়া চলে। অবশ্য রাষ্ট্র দেখে যে এই নীতিগুলির সহিত সমাজের আদর্শের মিল আছে কি না। যদি মিল না থাকে তবে রাষ্ট্র উহাদের মান্য করার পরিবর্তে পরিবর্তনসাধনের দ্বারাই সমাজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা করে। জাতীয় সমাজের কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে এইভাবে সমাজের আদর্শের প্রতিষ্ঠাই হইল রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য।*

রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য (Purpose of Social Organisation): গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে স্বভাবগত কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। অর্থাৎ, মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি মানুষকে সমাজাভিমুখী করিয়াছে। মানুষের এই স্বভাব বা প্রকৃতির দুইটি দিক আছে—সংঘবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা। আদিমকাল হইতেই ইহারা মানুষকে সমাজ-সংগঠনে প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে। সংঘবদ্ধতার কারণে মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। এইজন্য সে আদিম যুগেই দল ও পরিবার গঠন করিয়াছিল। আবার বিচ্ছিন্ন হইবার প্রেরণার জন্য এক দল অপর দলের সহিত মিলিতে পারে নাই।

সমাজ-সংগঠনের কারণ মানুষের প্রকৃতিগত সংঘবদ্ধতা

বস্তুত, মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, নিঃসংগ অবস্থায় যে-ব্যক্তি বাস করে, হয় সে পশু, না-হয় দেবতা। অপরের সহিত কথা বলা, অপরের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করা, অপরের সুখদুঃখের ভাগী হওয়া, অপরকে সুখদুঃখের ভাগী করা মানুষের সহজাত ইচ্ছা। সুতরাং সে পরিবারের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়।

মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না

শুধু যে মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না তাহা নহে, সে একাকী বাঁচিতেও পারে না। শৈশবে পিতামাতার স্নেহযত্ন না পাইলে শিশুর জীবন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটে। কিন্তু পার্থক্য হইল যে পশুপক্ষী-শাবককে মানব-শিশুর ন্যায় অত দীর্ঘদিন লালনপালন করিতে হয় না। শিশুর লালনপালন কালে মানব-মাতার পক্ষে আর কোন কার্য করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাতাকে আহার্য যোগাইবার জন্য প্রয়োজন হয় অপরের সহযোগিতার। সুতরাং শিশুর জীবনরক্ষার জন্যও আদিম মানুষকে সংঘবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

সে একাকী বাঁচিতেও পারে না

---

* সমাজের আদর্শ বিভিন্ন রকমের হয়—যেমন, আমাদের সমাজের আদর্শ অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বিলোপ; চীন ও সোবিয়েত সমাজের আদর্শ সাম্যবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠা; ইত্যাদি। সুতরাং ভারতে যদি অস্পৃশ্যতার সমর্থনে কোন সংঘ গড়িয়া উঠে তবে ভারত-রাষ্ট্র ঐরূপ সংঘকে দমন করিবে। অনুরূপভাবে, সোবিয়েত ইউনিয়নে কোন সাম্যবাদ-বিরোধী সংঘ গড়িয়া উঠিলে সোবিয়েত-রাষ্ট্র উহার বিলোপসাধন করিবে।

দ্বিতীয়ত, শৈশবাবস্থা হইতেই মানবজাতিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে। এই সংগ্রামকে বলা হয় জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence)। পরস্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে জীবন-সংগ্রামে মানুষ জীবনের সূত্রপাতেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। আদিম যুগে আহার সংগ্রহে অসুবিধা, বন্য জীবজন্তু এবং অন্য বন্য মানুষের কবল হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির জন্য মানুষ বুঝিয়াছিল যে একতাই বল—জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। ঐক্যবদ্ধ হইয়াই সে জয়ী হইল, অন্যান্য জীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল।

রবিনসন ক্রুসোর গল্পে দেখিতে পাওয়া যায় যে জাহাজ দুর্ঘটনায় ক্রুসো এক নির্জন দ্বীপে একাকী পতিত হইয়াও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রুসোর জাহাজটি দ্বীপের নিকটই বালির চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার পক্ষে ঐ জাহাজ হইতে নানারূপ শস্যবীজ যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসা সম্ভব হইয়াছিল। ক্রুসো দ্বীপে আসিবার পর জাহাজটি যদি সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইত তাহা হইলে ক্রুসোর জীবন-সংগ্রামের গল্প আর লেখা হইত না। হয়ত' কোন জন্তু তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত; না-হয় অনাহারে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হইত। সুতরাং ক্রুসো পরোক্ষভাবে সমাজের সহায়তালাভ করিয়াই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। জাহাজ হইতে তিনি যে শস্যবীজ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই উৎপাদন করিয়াছিল।

মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া বাঁচিতে চাহে সত্য, কিন্তু সে সকলের সহিত মিলিতে পারে না। সে মাত্র তাহাদের সংগই কামনা করে যাহাদের সহিত তাহার স্বার্থের মিল আছে। এই কারণে আদিম যুগে মানুষ বিভিন্ন দল গঠন করিয়াছিল।

পশুর মত শুধু জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়; সে সুখী হইয়া বাঁচিতে চায়—জীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে চায়। মানুষের বাক্‌শক্তি আছে, পশুর নাই। এ্যারিষ্টটলের মতে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রকৃতির ইচ্ছা সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই সুখী হউক। সুখের এই অন্বেষণে বা সুন্দর জীবনের সন্ধানে মানুষ শুধু দল বা পরিবার গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সে ধীরে ধীরে গড়িয়াছে রাষ্ট্র, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান।

মানুষ সুখী হইয়া বাঁচিতে চায়

সুতরাং বলা যায়, মানুষ সমাজ-সংগঠন করিয়াছিল জীবনরক্ষার প্রয়োজনে এবং বিচ্ছিন্ন হইবার প্রেরণায়। কিন্তু সমাজকে ক্রমবিকশিত করিয়া চলিয়াছে উন্নততর জীবন লাভের করিবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন উদ্ভূত হইয়াছে

সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution of Social Life): কবে এবং কিভাবে সমাজজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না; তবে আদিমতম যুগ হইতেই যে সংঘবদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়া আসিতেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষের এই সংঘবদ্ধতা প্রথমে কি রূপ গ্রহণ করে—পরিবার না দল—সে-বিষয়েও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। প্রাচীন লেখকগণের মতে, প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল পরিবার (family); এবং পরে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া ও বিভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিল দল বা গোষ্ঠীর।

মানুষ কিভাবে প্রথমে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল

আধুনিকগণ কিন্তু বলেন যে, মানুষ আদিমতম যুগ হইতেই দল বা গোষ্ঠীতে (clan) সংঘবদ্ধ ছিল; এবং পরে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের সংগে সৃষ্টি হইয়াছিল পারিবারিক সংগঠনের। আধুনিকদের এই মত মানিয়া লইয়াই নিম্নে সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হইতেছে।

আধুনিকগণ বলেন, দল বা গোষ্ঠীর ভিত্তিতে

গোষ্ঠী হইতে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের বর্ণনা:

স্বাভাবিক সংঘপ্রিয়তা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ আদিমতম যুগ হইতেই দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়া আসিতেছে। মানুষ তখন খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখে নাই; খাদ্য আহরণ করিয়াই তাহাকে জীবনধারণ করিতে হইত। বনজংগল হইতেই প্রধানত তাহারা ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া খাদ্য-সংগ্রহ করিত বলিয়া আদিম জনগোষ্ঠীকে বনজংগলের নিকটবর্তী অঞ্চলেই বসবাস করিতে দেখা যাইত।

১। খাদ্যাহরণের যুগ

এই অবস্থায় জীবন-সংগ্রাম ছিল অতি কঠোর; ফলমূল ও শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট হইত না। কোন এক বিশেষ দিনে কতটা খাদ্য সংগৃহীত হইবে সে-বিষয়েও নিশ্চয়তা ছিল না। তখন তাহারা সঞ্চয়ও করিতে শিখে নাই, সঞ্চয় করিবার অবকাশও ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা কিছু সংগৃহীত হইত তাহা দল বা গোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত। কেহ নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিত না। ফলে যেদিন ভাল শিকার হইত সেদিন বসিত ভোজ, আর কিছু পাওয়া না গেলে চলিত অনাহার।

আদিম মনুষ্যসম্প্রদায় শুধু যে আহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত তাহাই নয়, সকল দ্রব্যই ছিল গোষ্ঠীর সামগ্রিক সম্পত্তি (collective wealth)। কোন ব্যক্তি একটি হাতিয়ার তৈয়ারি করিলে তাহা দলের সকলে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিত। কেহই বলিতে পারিত না, 'এ-জিনিসটি আমি তৈয়ারি করিয়াছি, সুতরাং তুমি ব্যবহার করিতে পারিবে না।'

এই অবস্থায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই

আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয় নাই, তেমনি পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই। ফলে শিশুর প্রতিপালন ছিল গোষ্ঠীভুক্ত সকলের দায়িত্ব; এবং শিশুদের নিকট সকল বয়ঃপ্রাপ্তই ছিল তাহাদের পিতামাতার মত।

পারিবারিক জীবনও গঠিত হয় নাই

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি ছিল গোষ্ঠীর অংগীভূত; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) বা গোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া থাকিবার অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল পূর্ণ সাম্য এবং প্রকৃত গণতন্ত্র। সকলে সমান ভোগ করিত এবং গোষ্ঠীজীবন পরিচালনায় সকলেরই মত গ্রহণ করা হইত।

কালক্রমে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। যতদিন পর্যন্ত আদিম জনগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণভাবে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া বেড়াইত ততদিন কোন নায়ক বা নেতার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু যখন এক গোষ্ঠী অপর এক গোষ্ঠীর মৃগয়াভূমি বা মৎস্য-শিকারক্ষেত্র কাড়িয়া লইতে চাহিত তখনই প্রয়োজন হইত যুদ্ধনায়কের। প্রথম প্রথম যুদ্ধের সংগে সংগেই যুদ্ধনায়কের প্রয়োজন ফুরাইত; কিন্তু ক্রমে তাঁহারা শান্তির সময়েও সম্প্রদায়ের নায়কত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অধীনে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, পূজাপার্বণ প্রভৃতি কার্য পরিচালিত হইতে লাগিল। এইভাবে সমাজে 'রাজকর্তৃত্বে'র উদ্ভব হইল। এই কর্তৃত্বই পরে সরকারে রূপান্তরিত হইয়া সমাজকে রাষ্ট্রে পরিণত করিল। এ-ঘটনা অবশ্য ঘটিয়াছিল বহুদিন পরে।

অন্যতম পূর্ববর্তী ঘটনা হইল গোষ্ঠীজীবনে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিবর্তন—যাহাকে অর্থনৈতিক বিপ্লব (economic revolution) বলিয়াও অভিহিত করা যায়। এই অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয় প্রধানত দুইটি আবিষ্কারের ফলে: (ক) পশুপালন, এবং (খ) উদ্ভিদপালন বা কৃষিকার্য।

২। গোষ্ঠীজীবনে অর্থনৈতিক পরিবর্তন: পশুপালন ও কৃষিকার্য

পশুপালন আবিষ্কৃত হইলে গোষ্ঠীজীবন নূতন রূপ গ্রহণ করিল। এইবার খাদ্যসরবরাহ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। খাদ্যের জন্য মানুষকে আর সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল না। গৃহপালিত পশুর নিকট হইতে মাংস ছাড়া দুগ্ধও পাওয়া যাইত; আবার উহাদের পশম হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চর্ম হইতে তাঁবু ইত্যাদি নির্মিত হইত। পালিত পশু ভারও বহন করিতে লাগিল। এইভাবে গড়িয়া উঠিল পশুপালক সমাজ।

পশুপালনের ফলে পরিবর্তন

পশুপালক সমাজও ছিল ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠী, শিকারী-জীবনের ন্যায় এ-জীবনেও তাহারা একস্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারে নাই। একস্থানের জীবজন্তু মৎস্য প্রভৃতি ফুরাইয়া আসিলে শিকারী-জীবনে মানুষকে যেমন খাদ্যান্বেষণে স্থানান্তরে গমন করিতে হইত, [illegible] সমাজকেও পশুখাদ্যের সন্ধানে এক তৃণাঞ্চল হইতে অন্য

ব্যক্তিগত ধনসম্পদের উদ্ভব

তৃণাঞ্চলে প্রায়ই সরিয়া যাইতে হইত। অনেক বলেন, এই পশুপালক সমাজের মধ্যেই প্রথমে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয়; পালিত পশুর সম্পর্কেই মানুষ প্রথম বলিতে শিখে, "এগুলি আমার, বাকিগুলি অপরের।"

এই আমার এবং অপরের মধ্যে পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে উদ্ভিদপালন বা কৃষিকার্য সুরু হইলে। কিভাবে কৃষিকার্য আবিষ্কৃত হয় তাহা অবশ্য জানা যায় না। তবে অনেকে ইহাকে স্ত্রীলোকের আবিষ্কার বলিয়াই মনে করেন। গোষ্ঠীজীবনে পুরুষেরা যখন শিকারে বাহির হইত স্ত্রীলোকগণ তখন গৃহে থাকিয়া তাহাদের অস্থায়ী আবাসের নিকটবর্তী স্থানে বীজ মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করিত। এই সংগ্রহকার্যে লিপ্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন বা কয়েকজন একদিন আবিষ্কার করিল যে "একটি বীজ হইতে আরও অনেক বীজ, একটি মূল হইতে আরও অনেক মূল পাওয়া যায়।" এই আবিষ্কারের ফলেই হইল কৃষিকার্যের সুরু। মানুষ তখন নিজের ইচ্ছায় ফসল ফলাইতে শিখিয়া খাদ্যের জন্য অদৃষ্ট-নির্ভরশীলতা হইতে নিজেকে অনেকাংশে মুক্ত করিল। তাহার খাদ্যাহরণ জীবন (food-gathering life) খাদ্যোৎপাদন জীবনে (food-producing life) রূপান্তরিত হইল।

কৃষিকার্যের ফলে আরও পরিবর্তন :

কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ ভ্রাম্যমাণ জীবনও পরিত্যাগ করিল—কারণ, একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস না করিলে কৃষিকার্য সম্ভব হয় না। স্থায়ী বসবাসের ফলে তাহারা গৃহনির্মাণ করিতেও শিখিল; এবং ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল গ্রাম-ব্যবস্থা।

ক। মানুষ ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করিল

খাদ্যাহরণ জীবনের খাদ্যোৎপাদন জীবনে রূপান্তরের ফলে পূর্বতন সামাজিক জীবনের স্থলে গড়িয়া উঠিল নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, নূতন নূতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'পরিবার'ই হইল প্রথম।

খ। পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিল

পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয় অতি সাধারণভাবে। বলা হইয়াছে, প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল বলিয়া শিশুদের নিকট সকল বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ছিল পিতামাতার স্বরূপ। অবশ্য মাতার পক্ষে প্রত্যেক শিশুকে কয়েক বৎসর ধরিয়া পালন করিতে হইত বলিয়া শিশু মাতাকেই আপনজন বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিত। এইভাবে কতিপয় সন্তানসন্ততির মাতা ক্রমশ হইয়া দাঁড়ান তাহাদের কর্ত্রী, এবং যে পারিবারিক সংগঠনের উদ্ভব হয় তাহাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (matriarchal family)।

প্রথমে উদ্ভূত হয় মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে বংশ উত্তরাধিকার প্রভৃতি সকলই মাতার দিক হইতে নির্ণীত হইত। পরিবারের প্রাচীনতম স্ত্রীলোক ছিলেন পরিবারের মধ্যে প্রধানা। সকলকেই তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বা ভগিনীর নিকট এই কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হইত। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এইরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে আজও তাহাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া কেরলে, এখনও মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশরে পারিবারিক জীবন প্রধানত এই মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পরে আসে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পর আসে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। শিকার ও ফলমূল আহরণের পরিবর্তে আদিম জনগোষ্ঠী যখন প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারাই জীবনধারণ করিতে শিখে, তখন স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষের কর্তৃত্ব। কৃষিকার্য সম্পাদনের ফলে মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে শিখে, এবং এই সঞ্চয়ের বিনিময়ে সে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আলাদাভাবে ঘরসংসার পাতিতে সুরু করে। ঘরসংসার পুরুষের বলিয়া স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন হইয়া পড়ে।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আমাদের হিন্দু যৌথ পরিবারের মত

এইভাবে পুরুষের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে যে-প্রকার পারিবারিক সংগঠনের সৃষ্টি হয় তাহাকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আমাদের হিন্দু যৌথ পরিবারেরই (joint family) মত। ইহা দ্বারা বুঝায় যে, একই পূর্বপুরুষের বংশধরেরা একান্নবর্তী হইয়া, একই গৃহস্বামী বা কর্তার অধীনে বসবাস করিতেছে। যৌথ ধনসম্পত্তি, যৌথ ঘরকন্না এবং যৌথ ধর্মাচরণ—এই তিনটিই হইল যৌথ পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য। যৌথ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের নিজ নিজ উপার্জন গৃহস্বামী বা কর্তার নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকে। বিনিময়ে যৌথ পরিবার তাহাদের ভরণপোষণ, পুত্রকন্যার বিবাহাদি প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, যৌথ পরিবার পরিচালনার সকল ব্যাপারে গৃহস্বামীর ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমানে বহু পরিমাণে ভাঙিয়া পড়িলেও সেদিন পর্যন্ত যৌথ পরিবার প্রথা ছিল ভারতের সামাজিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারের প্রাধান্যের কারণ

প্রাচীনকালে যে পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবার বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহার মূলে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ইহা কতকগুলি উচ্চ আদর্শকে সমর্থন করে। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরস্পরের সহযোগিতা করা, প্রবীণতম ব্যক্তির ও নিয়মকানুনের অনুগত হইয়া চলা, প্রভৃতি যৌথ পরিবার প্রথার ভিত্তি। ইহাতে লোকে নিজের সামর্থ্যমত কার্য করে এবং প্রয়োজনমত ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ফলে পরিবারের মধ্যে

সংহতি বজায় থাকে। দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবারে লোকে ভবিষ্যতের ভয়ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কেহ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে যৌথ পরিবার যে তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবে তাহা সে জানে। তৃতীয়ত, যৌথ পরিবারে মাথাপিছু ব্যয় কম হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক দিয়া যৌথ পরিবার সমর্থনযোগ্য। পরিশেষে, যৌথ পরিবারের জন্য সম্পত্তি বন্টিত হয় না; ফলে কৃষি-জমিও খণ্ড খণ্ড হয় না। সুতরাং বৃহদায়তনে চাষ করিবার সুবিধা মিলে।

তবুও যৌথ পরিবার প্রথা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। কারণ, ইহা নিরুদ্যম ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেয়, মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দেয় না, ঝুঁকি লইয়া ব্যবসাবাণিজ্য করিতে দেয় না, রক্ষণশীল করিয়া তুলে, ইত্যাদি। ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব, সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের সংগে সংগে, পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতির সংগে সংগে যৌথ পরিবারও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এ-ঘটনা অনেক পরের। ইহার পূর্বে সমাজজীবনের বিকাশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যৌথ পরিবারের অবনতির কারণ

ভূমির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যে গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইল তাহা এক নূতন ধরনের সমাজ। এই সমাজ পূর্বের ন্যায় সাম্যবাদী না থাকিলেও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছিল। গ্রামীণ জীবন পরিচালিত হইত পঞ্চায়েতের নির্দেশে। প্রত্যেক গৃহস্বামী এই পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন।

গ। গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইল

গ্রামীণ সমাজে ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র কৃষিকর্মেই নিযুক্ত রহিল; আবার কতক লোক অন্যান্য পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। তারপর সুরু হইল দ্রব্য-বিনিময়। যাহার বেশী ধান ছিল সে ধানের পরিবর্তে কাপড় লইতে লাগিল, ইত্যাদি। ক্রমে বিনিময় বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইত বিভিন্ন গ্রামের মধ্যবর্তী এক স্থানে। এই মধ্যবর্তী স্থান পরে বাজারে (market place) পরিণত হইল, এবং অনেক ক্ষেত্রে বাজারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল নগর (city)।

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি: বলা হইয়াছে, পশুচারণ জীবনে মানুষ প্রথম আপন ও পর ভেদ করিতে শিখে এবং ভেদজ্ঞান আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে কৃষিকার্য সুরু হইলে। তারপর শ্রমবিভাগ ও পণ্য-বিনিময়ের উদ্ভবের ফলে ধনবৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। তখন সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হয় চুরিজুয়াচুরির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার। এই উদ্দেশ্যে সমিতি বা গ্রাম-পঞ্চায়েত কর্তৃক নিয়মকানুন প্রণীত হইতে থাকে। পরবর্তী যুগে এই নিয়মকানুনই 'আইনে' (Law) পরিণত হয়।

ঘ। ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির ভিত্তিতে ক্রমে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইল

ঙ। ফলে প্রয়োজন হইল আইনকানুন প্রণয়নের এবং

শিশুর জীবনরক্ষা
আত্মরক্ষা
এবং আহার্য সংগ্রহের জন্য আদিম যুগেই সংঘবদ্ধ ও সাম্যবাদী ছিল
তারপর পশুপালন ও কৃষিকার্যের ফলে
একজনের
অপর একজনের
একজনের
অপর একজনের
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির হইল উদ্ভব
তারপর আসিল পরিবার ও গ্রাম-ব্যবস্থা
শেষে যুদ্ধের ফলে জন্ম হইল রাষ্ট্রের

এইভাবে শ্রমবিভাগ, বিনিময়, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সমাজ কতকটা সুসংগঠিত হইলে যে স্তর বা পর্যায়ের সৃষ্টি হয়, তাহাকে উপজাতি (tribe) আখ্যা দেওয়া হয়। উপজাতিকে পশুপালক যাযাবর জাতির আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে উপজাতি আক্রমণ করিতেও শিক্ষা করিল; এবং ফলে যুদ্ধবিগ্রহও হইয়া দাঁড়াইল উপজাতীয় জীবনের অন্যতম স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

চ। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহের

সুতরাং যুদ্ধনায়কদের প্রয়োজনও ফুরাইল না। ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজপদ অধিকার করিয়া বসিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই কারণে একটি সুপ্রচলিত উক্তি আছে যে, রাজার জন্ম হইল যুদ্ধের ফলে (war begot the king)।

ছ। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাজার জন্ম হইল

যুদ্ধের ফলে রাজার জন্ম হইলেও রাজশক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক সময় ধর্মের সাহায্যও লওয়া হইয়াছিল। রাজার আদেশ ঈশ্বরেরই আদেশ, এই ধারণা প্রচার করিয়া সমাজে সংহতি আনয়ন করা হইয়াছিল। এইভাবে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

তখন হইতে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথমে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রাষ্ট্রে পৃথক সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না, পৃথক সংঘেরও অস্তিত্ব ছিল না। তারপর আসিল বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation States) দিন।* জাতীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংঘ লইয়া যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহাকে বলে জাতীয় সমাজ (National Society)। এই জাতীয় সমাজই ছিল এতদিন পৌর-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমানে বৃহত্তর মানব-সমাজের কল্পনাও করা হইতেছে—সকল জাতির সমবায়ে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তোলার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। সুতরাং বর্তমানে পৌরবিজ্ঞানে এ-সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাহা করা হইবে।

সমাজ-বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়

সংক্ষিপ্তসার

সমাজ : যখন কিছুসংখ্যক লোক পরস্পরের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক স্থাপন করে তখনই সমাজ গঠিত হয়। অতএব, বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ সংঘবদ্ধ হইলেই সমাজ গঠন করিয়াছে বলা যায়। মানুষ আদিমকালেই আত্মরক্ষা ও জীবিকার্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমানে নানা উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়া মানুষ বিভিন্ন প্রকার সমাজ গঠন করে। তবে এখন আমরা জাতির পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজের ধারণা

* ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়া থাকি। যেমন বলিয়া থাকি ভারতীয় সমাজ, মার্কিন সমাজ, ইত্যাদি। জাতির অন্তর্গত সকল সংগঠন মিলিয়াই হইল 'জাতীয় সমাজ'। এই সংগঠনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; (ক) রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ। রাষ্ট্র সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আবশ্যিক সংগঠন; আর অন্যান্য সংঘ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত।

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য: মানুষ একাকী বাস করিতে বা বাঁচিতে পারে না বলিয়া তাহারা আদিম-কাল হইতেই সংঘবদ্ধ। কিন্তু জীবনরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ সমাজ গঠন করিলেও সমাজকে ক্রমবিকশিত করিয়া চলিয়াছে উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে।

সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ: এই সংঘবদ্ধতার প্রথম রূপ সম্পর্কে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। আধুনিকগণ বলেন যে আদিমতম যুগে মানুষ দল বা গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ ছিল। এই আদিম জনগোষ্ঠী ছিল সাম্যবাদী। কারণ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির তখন উদ্ভব হয় নাই। ফলমূল আহরণ ও পশুপক্ষী শিকারের দ্বারা যাহাই সংগৃহীত হইত তাহা সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত। কালক্রমে কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। মানুষ পশুপালন ও কৃষিকার্য শিখিল। খাদ্যাহরণ জীবন রূপান্তরিত হইল খাদ্যোৎপাদন জীবনে। মানুষ ভ্রাম্যমাণ জীবন ত্যাগ করিল এবং পারিবারিক জীবন ও গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। পারিবারিক জীবনের প্রথমে মাতার কর্তৃত্ব বর্তমান ছিল। এইজন্য এইরূপ সমাজকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক। কৃষিকার্য শিখিবার পর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সৃষ্ট হয়। নানা কারণে সমাজে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব হয়, এবং ধনবৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য নিয়মকানুনের প্রয়োজন হয়। পরবর্তী যুগে এই নিয়মকানুনই 'আইনে' পরিণত হয়। আবার আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ করারও প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধনায়কগণ ইহার সুযোগ লইয়া রাজপদ অধিকার করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন। রাজশক্তিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের সাহায্যও লওয়া হইয়াছিল। এইভাবে সমাজ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল।

তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমানের জাতীয় সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় সমাজ ও কল্পিত বৃহত্তর মানবসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the term 'Society'? Discuss the purpose of social organisation.

'সমাজ' বলিতে কি বুঝায়? সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর। [৭-৯, ৯-১০ পৃষ্ঠা]

2. Trace briefly by the evolution of Society.

কিভাবে সমাজ বিবর্তিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১১-১৭ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of the State) : বর্তমানে নাগরিক জীবনের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে রাষ্ট্র। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা বহুলাংশে রাষ্ট্র সম্বন্ধেই আলোচনা।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও বলা যায়, কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাষ্ট্রকে এক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাকে বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা (sovereignty)।

আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ও রাষ্ট্র

সার্বভৌমিকতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' ('united power of the community'—MacIver) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের নাই। সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে আইন মান্য করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক ; কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী পালন করা সভ্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। আইন অমান্য করিলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে ; অন্য যে-কোন সংঘের নিয়মাবলী ভংগ করিলে সেই সংঘ অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন্ (President Wilson) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"* উইলসনের প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়াই ব্লুণ্টস্লি (Bluntschli) বলিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। এ-ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রনৈতিকভাবে' শব্দটির অর্থ হইল 'আইনানুসারে'। আইনই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল।

উইলসন্ এবং ব্লুণ্টস্লি প্রদত্ত সংজ্ঞা দুইটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও রাষ্ট্রের

---

* "A State is a people organised for law within a definite territory."

অন্যান্য অসংখ্য সংজ্ঞার মতই কিছুটা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং ইহাদের হইতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে। গার্ণারের সংজ্ঞা অবশ্য মৌলিক নয়; ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র। গার্ণারের মতে, 'রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে।'*

গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State) : এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে—যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, এবং (৫) বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে এই পাঁচটি উপাদানই অপরিহার্য। রাষ্ট্র বলিতে শুধু জনসমাজ বা ভূখণ্ড বা শাসন-ব্যবস্থা বা স্থায়িত্ব বা সাবভৌম শক্তি বুঝায় না। এই পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত যে প্রতিষ্ঠান তাহাকেই 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের এই উপাদান বা লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য : ১। জনসমষ্টি, ২। ভূখণ্ড, ৩। সরকার, ৪। স্থায়িত্ব, ৫। সার্বভৌমিকতা

জনসমষ্টি (Population) : আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র-গঠনের জন্য প্রথম অপরিহার্য উপাদান হইল জনসমষ্টি।

জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত নিয়ম নাই। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে স্বল্প সংখ্যাই সুশাসনের পক্ষে অত্যাবশ্যক; কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রভৃতির ফলে বৃহৎ জনসংখ্যা সুশাসনের অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয় না। পূর্বে দিল্লী হইতে বাংলাদেশ শাসন করাই কঠিন ছিল; আধুনিক যুগে ইংরাজদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশও শাসন করা কঠিন হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকরা দশ হাজার জনসংখ্যাকেই সুশাসনের দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন;

জনসমষ্টির আয়তন

* "A State is a community of persons, *more or less numerous*, permanently occupying a definite portion of a territory, independent of external control,...... and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

বর্তমানে ঐ একই দিক দিয়া ভারত তাহার ৪৪ কোটির অধিক লোককে এবং চীনদেশ তাহার প্রায় ৭০ কোটি লোককে অকাম্য বিবেচনা করে না।* তবে কাম্য জনসংখ্যা নির্বাচনে একমাত্র সুশাসনকে মাপকাঠি করিলে চলিবে না; দেশের আর্থিক সম্পদ কি পরিমাণ জনসংখ্যার উপযোগী তাহাও দেখিতে হইবে।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory): সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। জনসমাজের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা নিজস্ব বাসভূমি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ইতিহাসে যাযাবর জাতির মধ্যে সংগঠনের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সকল যাযাবর জনসমাজ নিয়ন্ত্রণ ও আইনের অধীন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে মানবসমাজের এইরূপ অবস্থাকে 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয় না। যাযাবর জনসমাজ যখনই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কোন কিছুর কল্পনাও করা যায় না।

সার্বভৌম শক্তির এলাকা রাষ্ট্রের সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত তাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না থাকিলে নির্ধারণ করা যায় না। রাষ্ট্রের সীমা যতদূর বিস্তৃত, সার্বভৌম শক্তির এলাকাও ততদূর ব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের সীমা বলিতে স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডল বুঝায়। এইজন্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের, ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের এবং ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রের কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ধরা হয়।

ভূখণ্ডের আয়তন

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির ন্যায় ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। প্রাচীন গ্রীকদের নিকট একটিমাত্র নগর ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত; আবার রোমকদের নিকট সমগ্র পৃথিবীও যথেষ্ট ছিল না। রোমকদের মতই প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে চাহিতেন। বর্তমান যুগে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ ভূখণ্ড কোনটিও কাম্য বিবেচিত হয় না। ভূখণ্ড অতি ক্ষুদ্র হইলে স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে; আবার অতি বৃহৎ হইলে সুশাসন ব্যাহত হয়। সুতরাং যে-পরিমাণ ভূখণ্ড সুশাসনের সহায়ক সেই পরিমাণ ভূখণ্ডই কাম্য।

শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার (Government): জনসমাজ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরবর্তী যে-উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহা হইল সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার। রাষ্ট্র একটি সংগঠন। যে-কোন সংগঠনের পরিচালনার ভার একদল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার যাহাদের উপর থাকে, সমষ্টিগতভাবে তাহারা সরকার বলিয়া পরিচিত। সরকার রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অন্তর্বর্তী সংগঠন। রাষ্ট্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

* ১৯৬৩ সালে যথাক্রমে ভারত ও চীনদেশের আনুমানিক জনসংখ্যা।

একটি ধারণা মাত্র ; ইহা মূর্ত হইয়া উঠে সরকারের মধ্যে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সরকার না থাকিলে জনসমষ্টি বিশৃংখল জনতায় পরিণত হইয়া সুন্দর সুশৃংখল সমাজ সৃষ্টির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত ; ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইত না।

সরকারের স্বরূপ

স্থায়িত্ব (Permanence) : স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসমাজ স্থায়ীভাবে সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিলে, তবেই রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে, যতদিন ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকে। অপর রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত হইলে বা অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা হারায়। ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

রাষ্ট্র স্থায়ী ; কিন্তু চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে

সার্বভৌমিকতা (Sovereignty) : পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে সার্বভৌমিকতা বা চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ; এবং তত্ত্বগত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে।* ইহাও বলা হইয়াছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া একমাত্র রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে পারে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই ইচ্ছা ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা স্বাধীনতা। সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইবে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক—ক। আভ্যন্তরীণ, খ। বাহ্যিক

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ তারিখের পূর্বে ভারতবর্ষে জনসমাজ ছিল, সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল, সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল ; কিন্তু সার্বভৌম শক্তির অধিকারী না হওয়ায় ভারতবর্ষ পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। উক্ত তারিখে ভারতবাসীর হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পর্যায়ভুক্ত হয়।

ভারত-রাষ্ট্রের জন্ম

---

* সার্বভৌমিকতাকে তত্ত্বগত বলা হইয়াছে, কারণ সার্বভৌমিকতা বলিতে যে বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা [illegible] তাহা বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই নাই। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর [illegible]
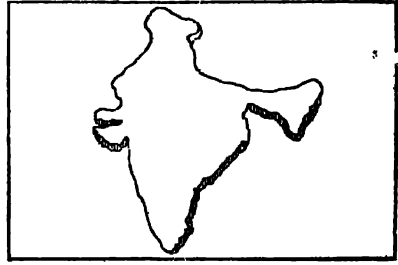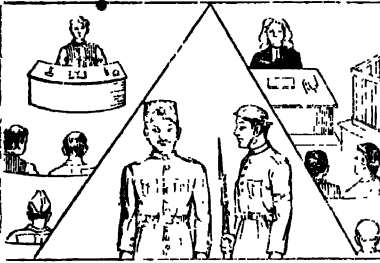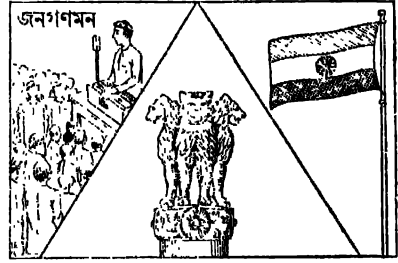
অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, স্থায়িত্ব এবং সার্বভৌমিকতা—এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে সংগঠনকে 'রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারত একটি রাষ্ট্র, কারণ ইহার উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যই আছে; পশ্চিমবংগ আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহাদের সার্বভৌমিকতা নাই। ইহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘ বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি অংশ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি (Units) কখনই রাষ্ট্র নহে। বাংলায় ইহাদের 'রাজ্য' বা 'প্রদেশ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।*

পশ্চিমবংগ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে (Units) 'রাজ্য' (States) বলা হয়; কানাডায় ইহারা 'প্রদেশ' (Provinces) বলিয়া অভিহিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইহাদের 'প্রদেশ' আখ্যাই দেওয়া হইয়াছিল।

কোন দেশ রাষ্ট্র কিনা, তাহা বিচারের মাপকাঠি কি? আধুনিক লেখকগণের মতে, এই মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য অন্তত কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাইতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নয়া চীন একটি রাষ্ট্র, কারণ উহা সকলের না হইলেও অনেক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government) ঃ রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিতে সরকারকেই জানে; তাহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। প্রাচীনকালেও অনেক সময় 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইত না। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র"। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদেরও দুই-একজন অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এইভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্র ও সরকার এক নহে

রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সুসংগঠিত জনসমাজ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের এই কার্য সম্পাদিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধন করিবার যন্ত্র মাত্র, সরকারই রাষ্ট্র নহে।

অধ্যাপক গার্ণার কয়েকটি উপমার সাহায্যে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এই পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি উপমায় তিনি রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রাণীর মস্তিষ্কটাই যেমন প্রাণী নহে, তেমনি সরকারও রাষ্ট্র নহে। তবুও মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রাণীটি যেমন চলাফেরা করে, তেমনি সরকারের নির্দেশেই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদান লইয়া গঠিত হয়। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হয় না সত্য, কিন্তু সরকার রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র উপাদান নহে—অন্যতম উপাদান মাত্র। রাষ্ট্র-গঠনের জন্য সরকার ছাড়া আরও চারিটি উপাদান—যথা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ, সার্বভৌমিকতা ও স্থায়িত্ব প্রয়োজন। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশকে সমগ্র বলিয়া মনে করিলে যেরূপ ভুল হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে সেইরূপই ভুল হইবে।

সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র

[illegible] রাষ্ট্রের সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। [illegible] সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া, কিন্তু সরকার গঠিত হয় মাত্র

শাসনকার্য পরিচালকগণকে লইয়া। 'শাসনকার্য পরিচালকগণ' বলিতে যাঁহারা আইন প্রণয়ন, শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন মাত্র তাঁহাদিগকে বুঝায়। তাঁহাদের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসাধারণের শতাংশের একাংশও নয়।

চতুর্থত, স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; সরকার কিন্তু চিরপরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনের অর্থ শাসকগণের পরিবর্তন। শাসকগণের পরিবর্তনে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। রাশিয়ার জারের, জার্মেনীর কাইজারের পতন হইয়াছিল; কিন্তু রাশিয়া বা জার্মান রাষ্ট্রের পতন হয় নাই। মিশরের রাজা ফারুকের হাত হইতে শাসনভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে মিশরীয় রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় সরকার থাকায় আজ এই দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর দল সরকার গঠন করিতেছে। সরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র কিন্তু ভাঙিতেছে না, বা নূতন করিয়া গড়িতেছে না। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে রাষ্ট্র সাধারণত অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে।

রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল

পঞ্চমত, সকল রাষ্ট্র একই ধরনের। অর্থাৎ, সকল রাষ্ট্রই জনসমাজ ভূখণ্ড প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। সরকার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়। অর্থাৎ, সকল সরকারে একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে থাকিতে পারে, কয়েকজনের হস্তে থাকিতে পারে, আবার সমগ্র জনসাধারণের হস্তে থাকিতে পারে। আর একদিক দিয়া দেখিলে শাসনক্ষমতা ইংলণ্ডের ন্যায় একই সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে, আবার ভারতের ন্যায় সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশসমূহের সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিতও হইতে পারে। ইহার ফলে আমরা একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), গণতন্ত্র (Democracy), যুক্তরাষ্ট্র (Federal State), এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সরকারের সাক্ষাৎ পাই।

রাষ্ট্র একই ধরনের, কিন্তু সরকার বিভিন্ন ধরনের হয়

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and other Associations): সমাজের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে সমাজের ধারণা জাতির (Nation) পরিপ্রেক্ষিতে করিয়া বলা হয় জাতীয় সমাজ—যেমন, ভারতীয় সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। ইহাও বলা হইয়াছে, এই সকল জাতীয় সমাজের অভ্যন্তরে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে: (ক) রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ—যথা, ধর্ম সংঘ, [illegible]

বণিক সমিতি, সাহিত্য সভা, কলা পরিষদ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের ন্যায় এই সকল সংঘও মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল। বর্তমান যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের সকল দিক পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না বলিয়াই এই সংঘের উদ্ভব হয়। বস্তুত, আধুনিক জীবনের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে মানুষ এই সকল সংঘের সহিত নিজেকে বিশেষ জড়াইয়া ফেলে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল

এইভাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ—উভয়ই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সভ্যপদ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রের সভ্যপদ সাধারণত মানুষের জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়; অপরদিকে সংঘের সভ্যপদ নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর। আবশ্যিকভাবে আমি ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু ফুটবল ক্লাব, সাহিত্য সভা প্রভৃতির সভ্য না হইলেও আমার চলে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি একসংগে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না; কিন্তু সে একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য: ১। রাষ্ট্রের সভ্যপদ আবশ্যিক; অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ স্বেচ্ছাধীন

২। রাষ্ট্র ও সংঘের উদ্ভব-পদ্ধতি এক নহে

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে, কিন্তু অন্যান্য সংঘ মানুষ স্বেচ্ছায় গঠন করিয়াছে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংঘের মধ্যে সংগঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে। এই ভূখণ্ডের বাহিরে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না; ইহার বাহির হইতে উহা সভ্য সংগ্রহও করিতে পারে না। অন্যান্য সংঘের কার্যক্ষেত্র কিন্তু এইরূপ সীমানির্দিষ্ট নহে অথবা তাহাদের সভ্যগ্রহণের বেলাতেও এরূপ কোন বাধা নাই। ভারত-রাষ্ট্র পাকিস্তানে গিয়া রেলপথ পাতিতে পারে না বা ঐ দেশ হইতে সভ্য সংগ্রহও করিতে পারে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান, ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যে-কোন দেশেই শাখা খুলিতে বা যে-কোন দেশ হইতেই সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। সংগঠনও পৃথক

চতুর্থত, উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য সংঘের সাধারণত দুই-একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে। ফলে ইহাদের কার্যাবলীও সংখ্যায় পরিমিত। যেমন, ক্রীড়াসংঘের উদ্দেশ্য হইল ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার করা, ইত্যাদি। সুতরাং ক্রীড়াসংঘের কার্য ক্রীড়া-ব্যবস্থায় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য ধর্মপ্রচারেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রীড়াসংঘ ধর্মের ব্যাপারে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খেলাধুলার ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামায় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু আইন [illegible] ও [illegible]মের মাধ্যমে সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করা। এই কারণে

৪। উদ্দেশ্যও বিভিন্ন

রাষ্ট্র মাত্র দুই-একটি কার্য সম্পাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই উহাকে করিতে হয়। ফলে আধুনিক যুগে রাষ্ট্র কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে; পূর্বে যে-সকল কার্য ব্যক্তি স্বয়ং সম্পাদন করিত বর্তমানে তাহার অধিকাংশই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রভুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র বর্তমানে মোটরবাস চালায়, খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করে, কলকারখানা স্থাপন করে, জলসেচ বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য বিশেষ বলিয়া উহাদের কার্যক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধারণ বলিয়া উহার কার্যক্ষেত্রও সীমাহীন।

পঞ্চমত, রাষ্ট্র সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী; কিন্তু অন্যান্য সংঘ দীর্ঘস্থায়ী নাও হইতে পারে। অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও উহাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক জাতীয় সমাজে কত সংঘই না লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, নূতন নূতন কত সংঘেরই না উদ্ভব ঘটিতেছে। সামাজিক সংগঠনের এই চিরপরিবর্তনের মধ্যে অধিকাংশ সময় রাষ্ট্র নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

৫। স্থায়িত্বও একপ্রকার নহে

পরিশেষে, রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল ক্ষমতাগত। একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই কারণে রাষ্ট্র উহার নিয়মাবলী বা আইন মান্য করাইতে বাধ্য করিতে পারে, বলপ্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সংঘের বলপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বাধ্য করিতে পারে না বা নিয়মভংগকারীকে শারীরিক শাস্তিপ্রদানও করিতে পারে না।

৬। কিন্তু প্রধান পার্থক্য ক্ষমতাগত

এই সার্বভৌম বা সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতার জন্যই আবার প্রত্যেক সংঘকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়। না মানিলে রাষ্ট্র ঐ সংঘের বিলোপসাধন করিতে পারে। উহার স্থলে নূতন সংঘের সৃষ্টিও করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ামক ও বিলুপ্তকারী হিসাবে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুশৃংখল সমাজজীবন গঠন করা। এই কারণে ইহাকে সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা প্রদান করা হইয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও বলবৎকরণের ক্ষমতা মাত্র।

রাষ্ট্রের বহু সংজ্ঞা আছে। ইহাদের মধ্যে গার্নার-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, এবং (৫) সার্বভৌমিকতা। এই পাঁচটি উপাদানের সমবায়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়; ইহাদের কোন একটির অভাব থাকিলে সংগঠন রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয় না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে সার্বভৌমিকতা না থাকার জন্য ভারতবর্ষ রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইত না। ঐ তারিখে সার্বভৌমিকতা ভারতবাসীর নিকট হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র-পদবাচ্য হয়।

কোন দেশ রাষ্ট্র কিনা তাহা বিচারের মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। কিছুসংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না পাইলে কোন দেশই রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হয় না।

পশ্চিমবংগ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে ; ইহারা 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে'র এক একটি অংশ মাত্র।

রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের অংশমাত্র ; সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। তবে অন্যান্য সংঘের সহিত ইহার সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাগত পার্থক্য রহিয়াছে। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টি ও বিলোপসাধন করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is a State ? What are its chief characteristics ? (S. F. 1959)

রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ? [১৯-২৪ পৃষ্ঠা]

2. Define State. Explain its characteristics and distinguish it from Government. (H.S. (H) 1962 ; P.U. 1962)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [১৯-২০, ২০-২২ এবং ২৪-২৫ পৃষ্ঠা]

3. What is meant by the term 'State' ? Is West Bengal a State ? (S. F. 1953 ; C. U. 1958 ; H. S. (H) 1960)

'রাষ্ট্র' শব্দটি দ্বারা কি বুঝায় ? পশ্চিমবংগ কি একটি রাষ্ট্র ? [১৯-২৩ পৃষ্ঠা]

4. What do you understand by 'Sovereignty' ? Why is it regarded as the most essential characteristic of the State ?

'সার্বভৌমিকতা' বলিতে কি বুঝ ? উহাকে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয় কেন ? [১৯, ২২ পৃষ্ঠা]

5. What do you mean by the term 'State' ? How does the State differ from other associations ? (C. U. 1961)

রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝ ? অন্যান্য সংঘের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য কোথায় ? [১৯-২০, ২৫-২০ পৃষ্ঠা]

6. Define the term 'State' and distinguish it from other associations. (H. S. (H) 1961 ; H. S. (H) Comp. 1961 ; H. S. (C) 1962)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [১৯-২০ এবং ২৫-২৭ পৃষ্ঠা]

7. Are the following States ?—

(a) The State of West Bengal or Assam, (b) A Football Club, (c) The United Nations. Give reasons for your answer. (En. 1962)

নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র ?—(ক) পশ্চিমবংগ বা আসাম রাজ্য, (খ) কোন ফুটবল ক্লাব, (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত : ফুটবল ক্লাব অন্যতম সংঘ, রাষ্ট্র নহে ; এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি রাষ্ট্র-সমবায়। ইহার সার্বভৌমিকতা নাই। সুতরাং ইহাও রাষ্ট্র নহে।......(২০, ২২, ২৩ এবং ২৬-২৭ পৃষ্ঠা)]

8. "A State is a people organised for law within a definite territory." Explain the statement. (S. F. Comp. 1961)

"রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। [১৯-২২ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(Origin of the State)

আমরা দেখিয়াছি যে মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাবের দুইটি দিক আছে—যথা, সংঘবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা। এই সংঘবদ্ধতাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। উদ্ভবের পর বহুদিন পর্যন্ত এই দুই সংগঠন মানুষের কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই ক্রমবিকশিত হইতেছিল। তারপর এমন এক অবস্থা আসিল যখন মানুষ ইহাদের উপযোগিতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল এবং ইহাদিগকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইল। এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) বৈজ্ঞানিক মতবাদ, এবং (খ) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ

মানুষের সংঘবদ্ধতার ফলেই যে সমাজ ক্রমবিকশিত হইয়া একদিন রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করিয়াছে, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক মতবাদ। আধুনিক কালে নানা বিদ্যার চর্চার ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘন তমসাবৃত ছিল। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে বলিয়া ইহাদের আলোচনা প্রয়োজন। উপরন্তু, কোন মতবাদকে যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার বিপরীত মতবাদগুলিকে খণ্ডন করা প্রয়োজন। এই দিক দিয়াও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির পর্যালোচনার সার্থকতা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of the Origin of State) : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রধান। অপরদিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এখন প্রথমে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির আলোচনা করিয়া পরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইতেছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin) : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মতবাদের মূল বিষয়ের বর্ণনা এইভাবে করা যায় : রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজা হইলেন ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি। সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করার [illegible]

এই মতবাদের মূল বক্তব্য

অমান্য করা। অর্থাৎ, রাজদ্রোহিতার অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়িত্বশীল; প্রজাদের নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। তিনি প্রজাদের মতামত ও প্রচলিত আইনকানুনের উর্ধ্বে।

অনেক সময় নৃপতিবিহীন রাষ্ট্রেও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ রাষ্ট্র ধর্মশাস্ত্রের নীতি অনুসারে শাসিত হয়; এবং রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইলেও তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic States) নামে অভিহিত। এইরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা যে ঈশ্বর-প্রেরিত শাসক ইহাতে প্রাচীন ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন।

ধর্মীয় রাষ্ট্র

মহাভারতে ভীষ্মদেব রাজপদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, পূর্বে রাষ্ট্র কিংবা রাজা ছিল না। ইহার ফলে ক্রমশ অরাজকতা দেখা দেয়। যেমন বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে তেমনি প্রবল ব্যক্তি দুর্বলকে উৎপীড়ন ও ধ্বংস করিতে থাকে। এই অরাজকতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকে সমবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিল, "হে ঈশ্বর, আমরা ধ্বংসের পথে চলিয়াছি। তুমি আমাদের নায়কত্ব করিবার জন্য এমন কাহাকেও দাও যাঁহাকে আমরা সকলে মিলিয়া পূজা করিব এবং যিনি আমাদের অরাজকতার অভিশাপ হইতে রক্ষা করিবেন।" ঈশ্বর এই প্রার্থনায় সাড়া দিলেন এবং শাসন করিবার জন্য নৃপতির সৃষ্টি করিলেন। জাপানীরা এই ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে এখনও বিশ্বাস করে; তাহারা তাহাদের রাজবংশকে সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ইউরোপে মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্দী অবধি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল সর্বপ্রধান মতবাদ। তাহার পর হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার, গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব প্রভৃতির ফলে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকে; এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা একরূপ ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হয়।

সমালোচনাঃ বর্তমানে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস শিক্ষিত লোক সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে বলা চলে। রাষ্ট্রকে ঈশ্বর-সৃষ্ট মনে করিলে রাজার আইনকে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখিতে হয়। ইহার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করা। বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি দিয়া বিচার করিলে স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

১। ইহা অযৌক্তিক

দ্বিতীয়ত, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে মন চায় না। ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি এত নির্দয় হইতে পারেন না যে, তিনি নির্মম অত্যাচারীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিবেন। [illegible] প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব।

২। ইহা অত্যাচার সমর্থন করে

বস্তুত, কোন যুগেই মানুষ অত্যাচারী নৃপতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লয় নাই। মহাভারতে আর এক স্থানে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন, "যিনি প্রজাপালনের পরিবর্তে প্রজাপীড়ন করেন, সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত।"

৩। ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ

তৃতীয়ত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় ঈশ্বরের প্রতিনিধির সন্ধান দিতে পারে না। ভারতের ন্যায় প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে? এ-প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ।

ঐতিহাসিক মূল্য

এই সকল কারণে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে। মানুষ যখন বর্বর ও বিশৃংখল জীবনযাপন করিত, যখন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই মানিত না তখন রাজা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এইরূপ প্রচার করিয়া আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার (allegiance and discipline) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি উপন্যাসের গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় রাজাও অনেক সময় বিশ্বাস করিতেন যে তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এবং সিংহাসন তাঁহার নিজের সুখের জন্য নহে। ফলে তিনি প্রকৃতই প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই দুই-এর ফলে সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force): এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা। মতবাদের সমর্থকগণের মতে, মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব তাহা নহে, কলহপ্রিয় জীবও বটে। ক্ষমতালিপ্সা মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি। কলহপ্রীতি ও ক্ষমতালিপ্সার জন্য সে আদিমকাল হইতেই বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রথমে বলবান ব্যক্তি বা বলশালী জনগোষ্ঠী (clan) কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি বা কোন দুর্বল গোষ্ঠীকে পরাভূত করিয়া তাহার বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল। এইরূপে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। তারপর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বাধিল সংঘর্ষ। সংঘর্ষের ফলে বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বিজয়ী উপজাতির দলপতি নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। এইভাবে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই বলপ্রয়োগ মতবাদ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ডাঃ লীকক (Dr. Stephen Leacock)। তিনি বলেন, "ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগকে অধীনতায় আনয়ন করার মধ্যে, স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্বলিপ্সার মধ্যে।"

সমালোচনা: রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে পাশবিক বলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। তরবারির দ্বারাই পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র

ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ-মত স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না যে, একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি শক্তি কার্য করিয়াছে। কোন দলপতি গোষ্ঠী বা উপজাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিত না, যদি-না গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ তাহার আনুগত্য স্বীকার করিত। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে। উক্তিটি হইল, "প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত!" কতকটা স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতার প্রেরণায়, কতকটা ধর্মভয়ে, কতকটা উপযোগিতার জন্য এবং কতকটা বলপ্রয়োগে বশীভূত হইয়াই মানুষ রাজনেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল—একমাত্র বলপ্রয়োগের কারণে করে নাই। সুতরাং বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইবে; ইহা অন্যতম কারণ মাত্র।

এই মতবাদে কিছুটা সত্য নিহিত আছে

কিন্তু বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ নয়

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories): পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই দুই মতবাদ কিন্তু অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিম সমাজে পিতাই ছিলেন গৃহস্বামী এবং পিতার দিক হইতে বংশ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হইত। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইত মাতার দিক হইতে, পিতার দিক হইতে নহে।

এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন, আদিম যুগের সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের উপর প্রাচীনতম পুরুষ সভ্য বা গৃহস্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এক পরিবার যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইল তখন এই সকল পরিবারের উপর আদি পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব বজায় রহিল। এইভাবে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। উপজাতির মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল; এবং ফলে একটির স্থলে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইল। আত্মীয়তা-বোধ এই উপজাতিগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল; তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া কার্য করিতে লাগিল এবং ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

দুই দিক দিয়া পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথম সমালোচনা অনুসারে সমাজ প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হইয়াছিল এবং পরে আসিয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। অর্থাৎ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ বলেন, সমাজ-সংগঠনের আদিমতম রূপ গোষ্ঠী (clan), পরিবার নহে। পারিবারিক জীবন সুরু হইয়াছিল বহু পরে—সামাজিক জীবন ক্রমবিকাশের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলে।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব বিশেষ জটিলতায় আবৃত; পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মত অত সরলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে প্রাচীনকালে পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ছিল মাতার, পিতার নহে। ক্রমে এই কর্তৃত্ব সমগ্র উপজাতির (tribe) উপর পরিব্যাপ্ত হইল। এইভাবে প্রবীণতমা গৃহকর্ত্রী জননেত্রী হইয়া বসিলেন এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল।

এই দুই মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতায় নারী পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং স্ত্রীলোক যে সর্বস্থানেই এবং বহুদিন ধরিয়া পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে—এইরূপ মতবাদ অযৌক্তিক। প্রথমে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক থাকিলেও কিছুদিন পরেই নারীর প্রভুত্বের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরুষের কর্তৃত্ব। উপরন্তু, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মতই মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ একমাত্র পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করে। সুতরাং প্রথমোক্ত মতবাদের মতই ইহা রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। আত্মীয়তাবোধ বা পরিবারের সম্প্রসারণ ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি নানা কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে এই মতবাদকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র (State of Nature) মধ্যে বাস করিত। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, এই অবস্থায় সমাজও সংগঠিত হয় নাই; আবার কয়েকজনের মতে তখন সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। 'প্রাকৃতিক অবস্থা'য় সমাজ সংগঠিত হউক আর না-হউক রাষ্ট্রের উদ্ভব না হওয়ায় তখন মানুষের দ্বারা প্রণীত কোন আইনকানুন ছিল না। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত। এই যথেচ্ছাচারিতার উপর কোন বাধা ছিল না। অনেকে কিন্তু বলেন যে একমাত্র বাধা ছিল কতকগুলি 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি' (Natural Laws)। এই সকল 'স্বাভাবিক নীতি'র ফলে মানুষের হিংসা, হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ

প্রবৃত্তিগুলি দমিত থাকিত। এই অবস্থায় বেশী দিন বাস করা সম্ভব না হওয়ায় আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে স্বাভাবিক নীতির স্থানাধিকার করিল মানুষের দ্বারা প্রণীত আইনকানুন।

আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে—এই মতবাদ অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যে এবং আমাদের দেশে মহাভারত, বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই মতবাদকে পরিস্ফুটিত করিয়া ইহার বর্তমান রূপদান করিয়াছেন তিনজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ইঁহারা হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ চিন্তাবীর হবস্ ও লক্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো।

ইহা অতি প্রাচীন মতবাদ

হবস্ (Hobbes): হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ সমাজ-জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কারণে এই অবস্থা ছিল অতি ভয়াবহ। আদিম মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহের কোন বিরাম ছিল না। কোনরূপ আইনকানুনের বাধা ছিল না বলিয়া মানুষ তখন অসৎ উপায়ে ও নির্মমভাবে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিত।* ফলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু এবং প্রত্যেকেই ছিল প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত। সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রতিবেশীকে এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল নিঃসংগ জীবন-যাপন করা। আদিম মানুষ তাহাই করিতে লাগিল। ফলে জীবন হইয়া উঠিল নিঃসংগ, অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং অনিশ্চিত (Life became solitary, poor, nasty, brutish and short)।

সমাজের উদ্ভবের পূর্বে মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ

তারপর মানুষ এই দুর্বিসহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজিতে লাগিল। মুক্তি আসিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। আদিম মনুষ্যগণ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের (assembly of men) হস্তে তুলিয়া দিল। এইভাবে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ হইলেন সার্বভৌম (sovereign)। সার্বভৌম শক্তির উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটিল, বিরোধ সংযত হইল এবং প্রতিষ্ঠিত হইল সুশৃংখল সমাজজীবন বা রাষ্ট্র।

দুঃসহ জীবন হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া

লক্ (Locke): লক্ যে প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত ভয়াবহ নহে। হবসের ধারণার বিরোধিতা করিয়া লক্ বলেন যে প্রাকৃতিক অবস্থায় একপ্রকার সমাজজীবন গঠিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা এবং পারস্পারিক

* হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থায় 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি'র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

সহযোগিতার রাজ্য। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি' দ্বারা।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে সমাজজীবন ছিল অসম্পূর্ণ

তবুও প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক ত্রুটি ছিল। প্রথমত, কোন্‌টি ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি এবং কোন্‌টি নয়—সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সকল নীতির ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তৃতীয়ত, আইন ভংগ করিলে যেরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়, এই সকল নীতি ভংগ করিলে সেরূপ কোন শাস্তিপ্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

এইজন্য মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল

এই সকল অসম্পূর্ণতার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবনযাপন নিরাপদ হইতে পারে নাই। এই নিরাপত্তার জন্যই মানুষ চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের। এই চুক্তি হইয়াছিল সম্প্রদায়ের সকলের সহিত প্রধান বা রাজা বলিয়া নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে।

রুশো (Rousseau): লক্ হইতে আরও এক স্তর ঊর্ধ্বে উঠিয়া রুশো বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একরূপ মর্ত্যের স্বর্গ। এই অবস্থায় সমাজ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ছিল এবং মানুষ সুন্দর সহজ সুখী ও সরল জীবনযাপন করিত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই আদিম সরলতা ও সুখ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে লাগিল; এবং মানুষ নিজের এবং অপরের দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে শিখিল। তখন প্রাকৃতিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রাকৃতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় মানুষ ইহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানেও মুক্তি আসিল চুক্তির মধ্য দিয়া, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া।

প্রথমে গোষ্ঠীজীবন ছিল সুন্দর

কিন্তু পরে ইহা ভয়াবহ হওয়ায় মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল

রুশোর মতবাদে রাজার স্থান নাই

হবস্ ও লকের মত রুশোর কল্পিত চুক্তিতে কিন্তু রাজার স্থান নাই। আদিম মনুষ্যগণ চুক্তি দ্বারা ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সমর্পণ করে নাই, ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সমাজকে যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সমালোচনা: সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই বিভিন্ন দিকে সমালোচিত হইয়া ইহার প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে।

এই মতবাদের প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে ইহা অনৈতিহাসিক। আদিম যুগে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাশূন্য মনুষ্যগণ হঠাৎ একদিন পরস্পরের সহিত

মিলিত হইয়া চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র-গঠন করিল এইরূপ উদাহরণ কোন দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ সত্য নহে।

১। ইহা অনৈতিহাসিক

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় আইনানুমোদিত বুঝাপড়া। অর্থাৎ, আইনসংগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে অংগীকার করা হয় তাহাকেই চুক্তি বলে। সুতরাং চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল আইন প্রণয়নের। সামাজিক চুক্তি মতবাদে কল্পনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই, আইন প্রণয়নের পূর্বেই মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এইরূপ ধারণা যুক্তির দ্বারা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

২। ইহা ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া যে-কল্পনা করা হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। লোকে রাষ্ট্রের উপযোগিতা বুঝিতে পারে, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার (political consciousness) উন্মেষ হইলে। আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র কাহাকে বলে তাহা জানিত না; সংগঠন সম্বন্ধেও তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। এই অবস্থায় তাহারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল কিরূপে? কি করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে রাষ্ট্র গঠিত হইলেই তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থার দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটিবে? এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক চুক্তি মতবাদে পাওয়া যায় না।

৩। আরও একটি কারণে ইহা অযৌক্তিক

চতুর্থত, অনেকের মতে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক—ইহা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার ঘোরতর পরিপন্থী। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এই ধারণা প্রচার করা হয় বলিয়া জনসাধারণ সকল সময়ই সরকারের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ফলে দেখা দেয় গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রধান বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল সামাজিক চুক্তি মতবাদ হইতে।

৪। ইহা বিপজ্জনক মতবাদ

উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে এই মতবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মূল্য

সামাজিক চুক্তি মতবাদের পূর্বে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল প্রচলিত মতবাদ। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ অনুসারে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত;

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে ক্ষমতা কিন্তু জনসাধারণ বা শাসিতের নিকট হইতে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এইভাবে শাসিতকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করা হইয়াছে—ঈশ্বরের আদেশের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে জনমতের প্রাধান্য।

এই মতবাদ গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ

বলপ্রয়োগ মতবাদ

সামাজিক চুক্তি মতবাদ

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory): দেখা গেল যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ—কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কোনটিই যথেষ্ট নহে। এ-সম্বন্ধে গার্ণার সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে...

পাশবিক শক্তিরও ফল নহে, প্রস্তাব বা চুক্তির দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই। শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়াও ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।" তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যাইবে কিভাবে? রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ মানুষের অলস কল্পনামাত্র নহে; ইহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রূপ গ্রহণ করিয়াছে—হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বার্জেসের (Burgess) উক্তি হইল, "রাষ্ট্র মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল।"*

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মতবাদে পাওয়া যায়

কবে এবং কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি আদিমকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; এবং ধীরে ধীরে এই সামাজিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাও বলা যায় যে অন্তত কয়েকটি শক্তি এই রূপান্তরকার্যে—অর্থাৎ রাষ্ট্র-গঠনে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শক্তিগুলি হইল রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। এখন ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাদের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করা হইলেও ইহারা পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত থাকিয়া ইহারা সকলেই একসংগে কার্য করিয়াছে। তবে কোন্‌টি কোন্ সময় কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে কার্যকর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

রাষ্ট্রের সূত্রপাত তমসাচ্ছন্ন

কি কি শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে

১। রক্তের সম্বন্ধ (Kinship): রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় সমাজে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাতের পর হইতে। পারিবারিক জীবনের পূর্বে মানুষ যখন সাম্যবাদী সমাজজীবন যাপন করিত তখন তাহারা 'আনুগত্যের শিক্ষা' লাভ করে নাই। অথচ আনুগত্যই প্রকৃত সংঘবদ্ধ জীবনের মূলসূত্র। মানুষের আনুগত্য প্রথম প্রকাশ পায় পারিবারিক জীবনে। পরিবারের প্রতি স্নেহমমতা প্রদর্শনের সংগে সংগে তাহারা গৃহকর্তার আদেশও পালন করিতে শিখে। এইভাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে নূতন সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়।

মানুষ পরিবারের মধ্যেই প্রথম আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে

পরিবারের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন একই পরিবার বহু পরিবারে বিভক্ত

* "The State is the product of continuous development of human society."

হইয়া গেল, তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইল না। এই অবস্থাতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল আত্মীয়তাবোধ। বিভিন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ একই পূর্বপুরুষের বংশধর হইয়া নিজেদের পরিচয় দিত বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রহিল। এইভাবে এক নূতন গোষ্ঠীজীবনের* (a new clan life) উদ্ভব হইল। এইরূপ গোষ্ঠীর উপর সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীপ্রধান। সকলে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিত।

গোষ্ঠীজীবনের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল আত্মীয়তাবোধ

২। ধর্ম (Religion): রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধের সমসাময়িক আর একটি শক্তি যাহা প্রাচীন সমাজের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আত্মীয়তাবোধ যখন ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন ধর্ম না থাকিলে গোষ্ঠীজীবন যে ধ্বংস হইত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ধর্ম সমাজকে ভাঙন হইতে বাঁচাইয়াছিল

ধর্ম বলিতে তখনকার দিনের লোক বুঝিত প্রকৃতি-পূজা এবং পূর্বপুরুষদের পূজা। আদিম মানুষ ঝড়ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু-পরিবর্তন, জীব ও উদ্ভিদের মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনাকে দেবতার কোপ বলিয়া মনে করিত; এবং ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বজ্রের দেবতা, ঋতুর দেবতা, সংহারের দেবতা প্রভৃতির পূজা করিত। অপরদিকে তাহারা আবার বিশ্বাস করিত যে যত রোগশোক, দুঃখদুর্দশা তাহা পূর্বপুরুষদেরই অভিশাপের ফল। সুতরাং পূর্ব-পুরুষদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যও তাহারা তাঁহাদের পূজা করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল পূজাপার্বণ সম্পাদিত হইত গোষ্ঠীপতির অধীনে। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রবীণদের মাধ্যমেই পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে, এবং বজ্র ঋতু সংহার প্রভৃতির দেবতাগণকে কিভাবে সন্তুষ্ট করিতে হয় তাহা একমাত্র প্রবীণরাই জানেন। গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রবীণতম ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে অমান্য করার অর্থ পূর্বপুরুষদের আত্মা ও অসংখ্য দেবদেবীর অভিশাপ কুড়ানো। এইভাবে গোষ্ঠীপতি সমাজের প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃত হইয়া ধর্মাচরণ পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সংগে সংগে আবার সমাজকে শাসনও করিতে লাগিলেন। সকল সময়ই যে গোষ্ঠীপতি সমাজ শাসন করিতেন তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে লোকে গোষ্ঠীপতি অপেক্ষা যাদুকরদেরই বশ্যতা স্বীকার করিত, কারণ যাদুকররা নানারূপ যাদু-শক্তির সাহায্যে লোককে ভীত করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, ক্রমে সমাজের উপর গোষ্ঠীপতি বা যাদুকরদের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

৩। যুদ্ধবিগ্রহ (War): যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

* নূতন গোষ্ঠীজীবন বলা হইতেছে, কারণ আদিমতম যুগে যখন পরিবারের উদ্ভব হয় নাই তখনও মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিত। এই অবস্থাকে 'পুরাতন গোষ্ঠীজীবন' বলা হয়।

গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ণ খাদ্যাহরণের যুগ হইতে মানুষ যখন পশুচারণ যুগে গিয়া পড়িল তখন হইতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। পরবর্তী —অর্থাৎ, কৃষিকর্মের যুগে এই সংঘর্ষের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। সুবিধা পাইলেই এক দল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া উহার কৃষি-জমি, ফসল, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিত। অনেক সময় আবার যাহারা পরাজিত হইত তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসেও পরিণত করিত। ফলে জনগোষ্ঠীকে সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা একদিন আক্রমণ করিতেও শিখিল; এবং ফলে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইল সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধবিগ্রহ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় যুদ্ধনায়কের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব করা ছাড়াও তিনি শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের কার্যও করিতেন। এইরূপে যুদ্ধনায়ক সমাজের সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়া একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাষ্ট্র-গঠনে যুদ্ধবিগ্রহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

৪। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property): ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে আইনকানুনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী। আহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত; শিশু ছিল জনগোষ্ঠীর সকলের শিশু। তারপর মানুষ যখন পশুচারণ জীবনে গিয়া উপনীত হইল তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের জন্য চুরি-জুয়াচুরির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকারের সম্পর্কে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে এই সম্পর্কে প্রণীত হইল বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রথা।* পশুচারণ জীবনের পর মানুষ যখন কৃষি-জীবন সুরু করিল তখন ভূমি ও ক্রীতদাসকেই প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হইতে লাগিল। কৃষি-জীবনে অধিকতর ধন-বৈষম্যের ফলে ধনসম্পত্তি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য আরও অধিকসংখ্যক নিয়মকানুন প্রণীত হইল। তারপর পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিল; এবং ইহার ফলে উদ্ভব হইল বণিকশ্রেণীর। বণিকশ্রেণীর স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে এক জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সহিত বিরোধ সংযত করিতে হইত, অনেক সময় আবার বিরোধে লিপ্ত হইতে হইত।

এইভাবে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে। সরকার সৃষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল।

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে

* ১২ [illegible] ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

৫। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political Consciousness): রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। আদিমকাল হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিলেও তাহারা সংঘবদ্ধতার আদর্শ সম্বন্ধে সুরু হইতেই সচেতন ছিল না। প্রথমে আত্মীয়তাবোধ ও ধর্মের বন্ধন গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন লোকে ভয়ে বা অপরের অনুকরণে গোষ্ঠীপতিদের আনুগত্য স্বীকার করিত। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে 'রাষ্ট্রনৈতিক অবচেতনা'র যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। গোষ্ঠী ক্রমশ সম্প্রসারিত

প্রথমে ছিল অন্ধ আনুগত্য

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা

হইতে থাকিলে এই অবচেতনা ঘুচিয়া গেল। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাতের ফলে মানুষ দলীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল—বুঝিল ঐক্য ব্যতীত সংঘর্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে 'রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ' (dawn of political consciousness) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে লোকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে যুদ্ধ-নায়কদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল; এবং ইহার ফলে যুদ্ধনায়কদের প্রভাবপ্রতিপত্তি স্বীকৃত হইল।

পরে আনুগত্য সচেতন হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব করিল

শান্তির সময়েও লোকে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ এবং বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য সচেতনভাবে ঐ যুদ্ধনায়কদের অনুগত হইয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজার আসনে বসিলেন এবং প্রজার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজার অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের সার্থকতা : ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু-না-কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, রক্তের সম্বন্ধ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের নির্দেশ করে; দ্বিতীয়ত, ধর্ম ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ইংগিত দেয়; তৃতীয়ত, যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্র-গঠনে বলপ্রয়োগের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে; এবং চতুর্থত, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সামাজিক চুক্তিবাদের আভাস দেয়। এই কারণগুলির কোনটিই এককভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে না, অথচ ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছে। ঐতিহাসিক মতবাদের সার্থকতা এইখানে যে অন্য কোন মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল কারণের ব্যাখ্যা সমভাবে করে নাই; তাহারা একটিমাত্র শক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভুল করিয়াছে।

একমাত্র এই মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের সকল কারণকে সমভাবে ব্যাখ্যা করে

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ, (২) বৈজ্ঞানিক মতবাদ। একমাত্র ঐতিহাসিক মতবাদই বৈজ্ঞানিক মতবাদ; অন্য সকল মতবাদই কল্পনাপ্রসূত।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ : এই মতবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি; এই কারণে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী।

এই মতবাদ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া এবং অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবুও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ : একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাই এই মতবাদের

এই মতবাদ আংশিকভাবে সত্য। বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যতম কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নয়।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদঃ এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদঃ রাষ্ট্রের কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের মধ্যে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনজন দার্শনিক—হবস, লক ও রুশো ইহাকে পরিস্ফুট করেন।

এই তিনজন দার্শনিকের মতেই রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র মধ্যে বাস করিত; কিন্তু এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনজন দার্শনিক পরস্পরের সহিত একমত নহেন। প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল—(১) হবসের মতে বর্বরসুলভ অবস্থা; (২) লকের মতে, শান্তি ও শুভেচ্ছার রাজ্য কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থা; এবং (৩) রুশোর মতে, মর্ত্যের স্বর্গ।

ফলে (১) হবসের মতে, মানুষ দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল; (২) লকের মতে, অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল; (৩) রুশোর মতে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাহার কল্পিত মর্ত্যের স্বর্গে সুখশান্তি বিনষ্ট হওয়ায় মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে। রুশোর মতবাদে রাজার স্থান নাই।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক মতবাদ বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইহা গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদঃ ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমানের জটিল রাষ্ট্র-রূপ ধারণ করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশে প্রধানত পাঁচটি শক্তি—যথা, রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি কোন্ পর্যায়ে কি পরিমাণে কার্য করিয়াছে তাহা অবশ্য নির্ণয় করা কঠিন।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss critically the Social Contract Theory of the origin of the State.
(C. U. 1961 ; H. S. (II) Comp. 1960)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের আলোচনা কর। [৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা]

2. Give a brief account of the Theory of Social Contract as an explanation of the origin of the State. (C. U. 1957)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[ইংগিতঃ ১নং প্রশ্ন হইতে এই প্রশ্নটির পার্থক্য আছে। ১নং প্রশ্নের উত্তরে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে; কিন্তু এই ২নং প্রশ্নের উত্তরে মতবাদের শুধু ব্যাখ্যা করিতে হইবে—সমালোচনা করিতে হইবে না।......৩৩-৩৫ পৃষ্ঠা]

3. "The State is the result of brute force." Discuss the validity of this theory of the origin of the State. (C. U. 1941)

"পাশবিক বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই মতবাদ কতদূর সত্য আলোচনা কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"The State is the result of the subjugation of the weaker by the stronger."

Do you accept this theory of the origin of the State? Give reasons for your answer. (C. U. 1945)

"বলবান কর্তৃক দুর্বলকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করার ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য কিনা? যুক্তিসহ উত্তর দাও। [৩১-৩২ পৃষ্ঠা]

4. Briefly describe the Historical Theory of the origin of the State. (C. U. 1956)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance; it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss this statement and indicate the process through which the State has come into existence. (C. U. 1944)

"রাষ্ট্র ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে, মানুষের কলাকৌশলের ফলও নহে; ইহা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর এবং যেভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। [৩৭-৪২ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Government)

এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া ইহার বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক বলিয়া—সকল রাষ্ট্র জনসমষ্টি, ভূখণ্ড প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া—এই শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক হয় নাই। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সরকারেরই বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়া থাকেন।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ: একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র

সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার* শ্রেণীবিভাগে প্রথমে দেখা হয় যে শাসনক্ষমতা একজন না বহুজনের হস্তে ন্যস্ত। ক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে সরকারকে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), এবং বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র (Democracy) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

একনায়কতন্ত্র সাধারণত একই ধরনের হয়; কিন্তু গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকারের এই সকল রূপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল চারিটি—(১) এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government), (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government), (৩) পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকার (Parliamentary or Responsible Government), এবং (৪) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Government)।

* ইংরেজী শব্দ Government-এর বাংলা 'সরকার' ও 'শাসন-ব্যবস্থা' দুইই করা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারে কেন্দ্রীভূত থাকিলে উহাকে এককেন্দ্রিক সরকার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বণ্টিত হইলে উহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, ইংলণ্ড ও ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অপরদিকে ভারতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্র বা ইউনিয়ন সরকার (Union Government) এবং পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসামের ন্যায় রাজ্য সরকারগুলির (State Governments) মধ্যে বণ্টিত। সুতরাং ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়।

গণতান্ত্রিক সরকারের দুইটি রূপ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশেই পার্লামেণ্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত। এই প্রকার সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে শাসন ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে; এবং যাঁহারা প্রকৃত শাসন পরিচালনা করেন তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। ইংলণ্ড ও ভারতে প্রকৃত শাসন পরিচালনা করে মন্ত্রি-পরিষদ (Cabinet)। উভয় দেশেই মন্ত্রি-পরিষদ পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল। মন্ত্রি-পরিষদই প্রকৃত শাসক বলিয়া এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থাকে 'মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার' (Cabinet Government) নামেও অভিহিত করা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে বলা হয় 'রাষ্ট্রপতি-শাসিত' (Presidential)। এই ধরনের সরকারে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া কার্য করে এবং আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের কোন দায়িত্বশীলতা থাকে না।

গণতান্ত্রিক সরকারের আর দুইটি রূপ : পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

সরকারের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যাইতে পারে :
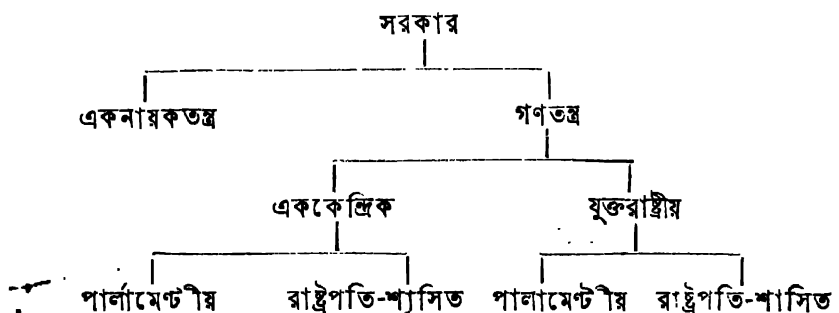
এখন সরকারের বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

গণতন্ত্র (Democracy) : 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায় যাহা পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ সমাজ জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে কোনরূপ মর্যাদা দেয় না, বলপ্রয়োগ বা শোষণকে কোনরূপ সমর্থন করে না। এইরূপ সমাজে সকলেরই দায়িত্ব রহিয়াছে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার; এবং সমাজের উন্নতিকল্পে সকলের প্রচেষ্টাকেই সমান মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবে একমাত্র সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় 'গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা'। ইহা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বা সকলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান নাও মিলিতে পারে।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজ

সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সরকার

সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ, গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার। এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government) : শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের শাসন (rule of the people)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতন্ত্র ইহার উপর জনগণের দ্বারা (by the people) এবং জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য (for the people) শাসন। এই তিনটিকে মিলাইয়া রাষ্ট্রপতি লিংকন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সুপ্রচলিত হইয়াছে। লিংকনের ভাষায়, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হইল "জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।"

লিংকন-প্রদত্ত সুপ্রচলিত সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন উঠে যে জনগণ বলিতে কি বুঝায়? জনগণ বলিতে 'কখনই দেশের সকল লোককে বুঝায় না, অধিকাংশকেই বুঝায় মাত্র।' এমন শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই যাহাতে দেশের সমগ্র জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। নাবালক উন্মাদ সমাজদ্রোহী প্রভৃতিকে কখনই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। এই কারণে অধ্যাপক ডাইসি (Prof. A. V. Dicey) গণতন্ত্রের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয় বিবেচিত হয়। ডাইসির মতে, জনসাধারণের অধিকাংশই যদি শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে তাহাই গণতন্ত্র। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি :

১। ইহা 'জনগণের শাসন'

জনগণ বা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। কারণ, সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সম্প্রদায়ের সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনভার প্রাপ্ত হয়।

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত বলিয়া শাসনক্ষমতা নাগরিক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু সকল নাগরিক একমতাবলম্বী নয়। এই কারণে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলই শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

২। কার্যক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মাত্র

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণ' বলিতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; এবং স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক শাসন হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, সর্বসাধারণের নহে।

এইভাবে শাসনকার্যের পরিচালনার ভার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর ন্যস্ত থাকিলেও শাসনকার্য কিন্তু পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থেই নহে। গণতান্ত্রিক সরকার কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘিষ্ঠের মংগলকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ফলে এই শাসন-ব্যবস্থা সকলেরই প্রিয়; এই কারণে ইহাকে 'জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা'ও (Popular Form of Government) বলা হয়।

৩। শাসনকার্য কিন্তু পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে

গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের শাসনক্ষমতায় আস্থাবান। 'রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য' বলিতে বুঝায় সকলেরই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সমান সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা প্রদান করাই গণতান্ত্রিক আদর্শ। কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণী একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশবিক বলের উপর নয়। এই কারণে শাসনকার্য সর্বদাই জনমতের অনুকূলে পরিচালিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' (Government based on Public Opinion) বলিয়াও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

৪। এই শাসন-ব্যবস্থা সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Direct and Indirect or Representative Democracy) : বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক সরকারের সাক্ষাৎ আমরা পাই—যে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহা হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)। ইহা ছাড়া গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধও (Direct or Pure) হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হইতে পারে

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাতে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও করিত। এইভাবে শাসনকার্য নাগরিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইত। নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রাচীনকালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতেও নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি সিন্ধু নদের দুই তীরে বহুসংখ্যক নগর-রাষ্ট্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেখানে তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের নগর-রাষ্ট্রে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যা স্বল্প হইলে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ক্ষুদ্র নহে, জনসংখ্যাও স্বল্প নহে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। ফলে মাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি 'ক্যাণ্টন' ও 'অর্ধ-ক্যাণ্টনে'* এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্যে (States) এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে না—পরোক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় এই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যেখানে "জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে।" নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভায় জনমতের অনুকূলে আইন পাস করেন এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের অঙ্কবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করেন।

আধুনিককালের পরোক্ষ গণতন্ত্র

শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণও হয় নাগরিকগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন, না-হয় আইনসভার প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। প্রতিনিধি যদি জনমতের বিরুদ্ধে কার্য করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহার নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তিনি জনমতের সপক্ষে কার্য করিতে সচেষ্ট থাকেন।

অবশ্য প্রতিনিধি যে সকল সময় জনমতের অনুকূলেই কার্য করিবেন, এমন

* সুইজারল্যাণ্ডে প্রদেশগুলি 'ক্যাণ্টন' (Cantons) এবং ক্ষুদ্রাকার প্রদেশগুলি 'অর্ধ-ক্যাণ্টন' (Half-Cantons) নামে অভিহিত। ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ১৯ ও ৬।

কোন নিশ্চয়তা নাই। নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার জন্য নির্বাচকগণকে পুনর্নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করিতে হয়। এই কারণে অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহাতে প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ সর্বদা বজায় থাকে। প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পন্থা প্রধানত তিনটি—গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall)। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের ত্রুটি

ত্রুটির প্রতিবিধান—প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ:

গণভোট পদ্ধতির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহকে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের দ্বারা পাস করানো বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। নির্বাচক-মণ্ডলীর অধিকাংশ ইহা অনুমোদন করিলে তবে ইহা আইনে পরিণত হইবে। এককথায় বলা যায়, গণভোটের ব্যবস্থা থাকিলে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হস্তেই থাকে, প্রতিনিধিগণের নিকট হস্তান্তরিত হয় না।

১। গণভোট

গণ-উদ্যোগ বলা হয় সেই ব্যবস্থাকে যেখানে নির্বাচকগণ উদ্যোগী হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে তবে আইনসভা সেই আইন পাস করিতে বাধ্য হইবে।

২। গণ-উদ্যোগ

পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকিলে নির্বাচকগণ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে যে প্রতিনিধি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতেছেন, তবে প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হয়। এইভাবে পদ্ধতিগুলি দ্বারা আজিকার দিনের বৃহৎ রাষ্ট্রে বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করা হয়।

৩। পদচ্যুতি

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Defects of Democratic Government): সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইলে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কারণ, একমাত্র গণতন্ত্রেই শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া শাসনযন্ত্র সকলের কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা সাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং সাধারণের পক্ষে যাহা মংগলজনক সেইরূপ কার্যই গণতন্ত্রে সম্পাদিত হয়; সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর আইনই গণতন্ত্রে প্রণীত

গুণ:

১। একমাত্র গণতন্ত্রই সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে

হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; করিলে তাঁহাদের পক্ষে পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশা থাকে না।

এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, একমাত্র গণতন্ত্রেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। এই কারণে প্রকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। একনায়ক-তন্ত্রে আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ নাই, ভাব-বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র নাই। সেখানে একনায়কের মতকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

২। একমাত্র এই শাসন-ব্যবস্থাতেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

গণতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই অধিকার রহিয়াছে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার, অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার। এইজন্য একমাত্র গণতন্ত্রেই সুন্দর ও সার্থক জীবন সম্ভবপর হয়।

৩। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত

গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে। গণতন্ত্রে ধনী ও দরিদ্রে, অভিজাত ও অভাজনে, উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণে কোন ভেদ নাই। এখানে সকলেই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। ধনীরও একটি ভোট, দরিদ্রেরও একটি ভোট; ধনীর নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে, পথচারী দরিদ্রেরও নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে।

৪। ইহা সাম্যকেও সমর্থন করে

গণতন্ত্র সকলকে সমান মর্যাদা দিয়া সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সকলে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয় এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। কেহ যখন কাহারও অপেক্ষা কম নহে তখন দেশরক্ষা সকলেরই দায়িত্ব, রাষ্ট্রের উন্নয়ন সকলেরই কর্তব্য—এইরূপ ধারণা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া জাতীয় জীবনকে মংগলের পথে লইয়া যায়। জনসাধারণও শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ফলে উত্তরোত্তর রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠে। মিলের মতে, সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা-প্রদান করাও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সাধন করে।

৫। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে

পরিশেষে, গণতন্ত্রে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের আশংকা বিশেষ থাকে না। গণতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ ইহা বুঝে যে রাষ্ট্র তাহাদেরই রাষ্ট্র, সরকার তাহাদেরই সরকার। বর্তমানে যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা তাহাদের প্রতিনিধি; সুতরাং আজ্ঞাবাহী। সৈন্যসামন্ত, পুলিস, [illegible]কিদার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি তাহাদেরই ভৃত্য। এই কারণে জনসাধারণ

৬। ইহা বিপ্লবের আশংকা হইতে অনেকাংশে মুক্ত

আইনকানুন স্বেচ্ছায় পালন করে। আর যদি তাহারা দেখে সরকার অন্যায় করিতেছে, অযৌক্তিক আইনকানুন পাস করিতেছে তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাহারা সরকার গঠনকারী ঐ দলকে সরাইয়া দিয়া অন্য দলের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ যদি কংগ্রেস দলের শাসন পছন্দ না করে, তবে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে সরাইয়া অন্য এক দলকে গদিতে বসাইতে পারে। সহজে শাসক-পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে না।

ত্রুটি :

উপরি-উক্ত গুণাবলী সত্ত্বেও গণতন্ত্র বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারে নাই। একশ্রেণীর সমালোচকের মতে, গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন। ইঁহারা বলেন, শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবিবেচনার উপর। কিন্তু গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। ইহা সকলকেই সমান জ্ঞান করে বলিয়া অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই সাধারণত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে দেখা যায়। সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে, গণতন্ত্র "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্যের শাসন—কারণ, এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় অধিক।"

১। গণতন্ত্র অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন বলিয়া অভিযোগ

ইহাও বলা হইয়াছে, অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে রক্ষণশীল। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন ধ্যানধারণা অশিক্ষিত শাসকবর্গ এবং জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না। ফলে শাসনযন্ত্র পুরাতন পদ্ধতিতেই চলে।

২। ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা

গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও সমালোচকগণের মতে ভুল। বলা হয় যে জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটাই সাধারণ লোকের থাকে না। সুতরাং তাহারা গতানুগতিক পথে চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে সকলপ্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে গণতন্ত্রে দেখা দেয় নিয়ন্ত্রণের আধিক্য। এই নিয়ন্ত্রণাধিক্যের জন্য সাধারণের স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হয়।

৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক

দলপ্রথা গণতন্ত্রের অংগ। এই কারণে গণতন্ত্রে অপচয় দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। প্রথমত, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বিরাট ব্যয় হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মিতব্যয়িতার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। শাসকবর্গ সাধারণের অর্থ অপব্যয় করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আবার শাসকবর্গ এবং

৪। দলপ্রথার জন্য ত্রুটি

সাধারণ লোক সকলেই রাষ্ট্রের মংগল অপেক্ষা নিজ দলের স্বার্থের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখে। এই সকলের ফলে জাতীয় কল্যাণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

৫। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বে সন্দেহ

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। গণতন্ত্রে পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার বিশেষ সুবিধা হয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলা হয়

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইল যে এই শাসন-ব্যবস্থা চারুকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের উন্নতির পরিপন্থী। যে জনসাধারণ গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের নিকট এই সকল বিষয়ে প্রগতির কোন মূল্যই নাই। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া তাহারা নিম্নস্তরের সাহিত্য, নিম্নস্তরের শিল্পকলারই পৃষ্ঠপোষকতা করে। ফলে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির সৃজনীশক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক সভ্যতা 'বন্ধ্য, সাধারণ ও স্থূল' (banal, mediocre and dull) হইয়া দাঁড়ায়।

৭। ইহা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে

আরও বলা হয় যে বিপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে গণতন্ত্র বিশেষ কার্যকর নহে। গণতন্ত্রে শাসক সংখ্যায় বহু বলিয়া প্রতি পদে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। ইহাতে শাসনযন্ত্র মন্থরগতি হইয়া পড়ে, এবং বিপদের সময় জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

৮। ইহা পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়

পরিশেষে, গণতন্ত্র পুঁজিবাদের (Capitalism) প্রশ্রয় দেয় বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। সংজ্ঞা অনুসারে এবং তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র সর্বসাধারণের শাসন-ব্যবস্থা ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা ধনী ও মূলধন-মালিকদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য থাকিলেও অর্থনৈতিক সাম্য থাকে না। ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে (Conditions for Success of Democracy) ঃ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যে বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গণতন্ত্র যে ত্রুটিবিহীন শাসন-ব্যবস্থা সে-কথাও বলা চলে না। আদর্শের দিক দিয়া গণতন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু এই সকল আদর্শ উপলব্ধির দ্বারা গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তোলা বিশেষ কঠিন।

গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন হইল 'গণতান্ত্রিক জনগণে'র (democratic men)। 'গণতান্ত্রিক জনগণ' বলিতে মিল এরূপ জনসাধারণকে বুঝিয়াছিলেন (১) যাহাদের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে ;

(২) যাহারা কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহে; (৩) যাহারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে সর্বদা প্রস্তুত। সুতরাং গণতন্ত্র প্রবর্তন করিলেই উহা সাফল্যলাভ করে না। জনসাধারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপযোগী হইলে তবেই উহা সফল হইয়া উঠিতে পারে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে বুঝাপড়াও দাবি করে। কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে। অপরদিকে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।

গণতন্ত্র বুঝাপড়াও দাবি করে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনগণই প্রকৃত শাসক বলিয়া জনমত প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে জনগণের পক্ষে শাসকবর্গকে কোনরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া 'জনগণের শাসন' মিথ্যায় পরিণত হইতে পারে।

পরিশেষে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হইল জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারের। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, উপযুক্ত মজুরি পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অধিকার, ইত্যাদি। এগুলি না থাকিলে লোক ভোটাধিকার লইয়া কি করিবে? নাগরিক যদি দৈনন্দিন অভাব মিটাইতেই সকল সময় ব্যস্ত থাকে তবে সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া কখন চিন্তা করিবে?

এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ অপরিহার্য

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নাগরিককে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা যায় না। শ্রমিককে যথাযোগ্য মজুরি প্রদান করিতে হইলে নিয়োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিতে হয়। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ইহাই করিতে হইবে; বহুর কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। এরূপ করিলে তবেই সাধারণ নাগরিক গণতন্ত্রে আগ্রহান্বিত হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে; এবং তখনই গণতন্ত্র হইয়া উঠিবে প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা (Popular Form of Government)

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship): একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে, একনায়কতন্ত্রে ন্যস্ত থাকে মাত্র একজনের হস্তে। একনায়কতন্ত্রে একনায়কই (Dictator) একমাত্র শাসক; অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা একনায়কের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র।

একনায়কতন্ত্রের অর্থ

প্রাচীনকালে রাজার হস্তেই শাসনের চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিত। এইরূপ রাজতন্ত্রকে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) বলা হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই চরম রাজতন্ত্রও একনায়কতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন কোন রাষ্ট্র-নৈতিক দলের নায়ক—উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনপ্রাপ্ত রাজা নহেন। এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক দলের নায়ক প্রথমে বিপ্লবের সাহায্যে বা নির্বাচনের ফলে ক্ষমতা অধিকার করেন। তারপর সকল বিরোধী দলের বিলোপসাধন করিয়া নিজ দলের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দলের মধ্যেও তিনি আর কোন নেতাকে মাথা তুলিতে দেন না। এইভাবে ক্রমে তিনি হইয়া দাঁড়ান দল ও দেশের একমাত্র নায়ক বা একনায়ক। একনায়কগণের প্রত্যেকের নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে বলিয়া গণতান্ত্রিকতার কিছুটা আভাস একনায়কতন্ত্রে পাওয়া যায়।

তবুও বলা যায়, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতন্ত্রে জনগণ শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসকই জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। মানুষে মানুষে সাম্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা,

গণতন্ত্র
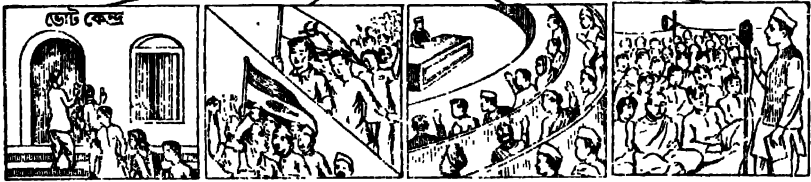
স্বাধীন নির্বাচন | বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল | মতপ্রকাশের স্বাধীনতা | জনমতের প্রাধান্য

একনায়কতন্ত্র

মূল্যহীন ভোটাধিকার | একদলীয় শাসন | নায়কের একাধিপত্য | রক্তাক্ত নীতি

জনমতের প্রাধান্য প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান একনায়কতন্ত্রে পাওয়া যায় না। ইহাদের পরিবর্তে দেখা যায় একদলীয় শাসন, দলের উপর একনায়কের একাধিপত্য, মূল্যহীন ভোটাধিকার, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত ও তরবারির নীতি অনুসরণ।

একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় এবং অনেক সময় তাহাদিগকে দমনও করা হয়। অপরদিকে আবার মত-প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতার সম্ভাবনা লুপ্ত করা হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের দমনের জন্য, জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হইলে গুলিগোলা জেল নির্বাসন প্রভৃতি সবকিছু ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।

গুণাগুণ ঃ একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের যাহা ত্রুটি একনায়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ একনায়কতন্ত্রের তাহা দোষ। প্রথমে গুণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে বহুজনের কুশাসনের পরিবর্তে একজনের সুশাসনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। নানা মুনির নানা মতের ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে-বিশৃংখলার সম্ভাবনা থাকে, একনায়ক সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং কর্মক্ষম হইলে সে-আশংকা দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ না থাকায় অপব্যয়, দলীয় স্বার্থসাধন প্রভৃতি রহিত হইয়া দেশের সর্বাংগীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তৃতীয়ত, বিপদের সময় এবং জরুরী অবস্থায় একনায়ক দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, বহুজন-শাসিত গণতন্ত্রে যাহা সম্ভব হয় না। পরিশেষে, জনমতের জোয়ারভাঁটার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মত একনায়কতন্ত্রে সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটে না। সরকারের এই স্থায়িত্বের ফলে একনায়কতন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষ নীতি অনুসৃত হইতে পারে।

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন ব্যবস্থা বলিয়া উভয়ের গুণাগুণ বিপরীত

একনায়কতন্ত্রের গুণ

অপরদিকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়। শাসন-ব্যবস্থায় কোথায় গলদ তাহা তাহারা জানিতে পারে না ; জানিতে পারিলেও সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। একনায়কতন্ত্রে শুধু এই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই নহে, অন্যান্য স্বাধীনতা ও মানুষে মানুষে সাম্যও অস্বীকৃত হয়। সকলেরই যে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহা মোটেই মানিয়া লওয়া হয় না। ফলে নাগরিকের আত্মবিকাশ ব্যাহত হয় ; রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাহার আকর্ষণ গভীর হইতে পারে না। একনায়ক-তান্ত্রিক সরকারকে সে বিদেশী সরকারের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিখে। এই সরকারের পরিবর্তন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলিয়া পরিবর্তন প্রয়োজনীয় মনে করিলে লোকে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে

ত্রুটি

একনায়ককে সর্বদা সচেতন হইয়া থাকিতে হয়, বিপ্লবের কানাঘুষা চলিতেছে কিনা তাহা জানিবার জন্য বহু গুপ্তচর পোষণ করিতে হয়। এই বাবদ অর্থের অপচয় ছাড়াও গুপ্তচরদের কার্যকলাপের ফলে সাধারণ লোকের জীবন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে ত্রুটি সত্ত্বেও একনায়কতন্ত্রে মোটামুটি সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। কারণ, লোকে মাত্র সুশাসনই চায় না, নিজস্ব শাসন বা স্বায়ত্তশাসনও চায়।*

একনায়কতন্ত্রের দুই সাম্প্রতিক রূপ (Two Modern Forms of Dictatorship): সাম্প্রতিক একনায়কতন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালীর ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Fascist Dictatorship) এবং জার্মেনীর নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Nazi Dictatorship) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্যাসীবাদ প্রচারের সাহায্যে মুসোলিনী এবং নাৎসীবাদের সাহায্যে হিটলার যথাক্রমে ইতালী ও জার্মেনীর সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়ান।

ক। ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র, খ। নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র

হিটলার মুসোলিনী

মুসোলিনী গণতন্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই যে সুশাসন হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন যিনি শাসন পরিচালনার কার্যে যোগ্যতম। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তাঁহার হস্তেই শাসন পরিচালনার ভার দিতে হইবে। নির্বাচনের প্রয়োজন নাই, আইনসভার বিতর্কও নিরর্থক; শাসনের ভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে পূজা করাই জনসাধারণের কর্তব্য।

* "Good government is no substitute for self-government." H. C. Bannerman

হিটলারও গণতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া নেতৃপূজার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। হিটলারই সমগ্র জার্মান জাতির নেতা হইয়া দাঁড়ান; এবং তাঁহার অধীনে নাৎসী দল (Nazi Party) জার্মেনীকে পরিচালিত করিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইতালী ও জার্মেনী উভয় দেশেই একনায়কতন্ত্র ধ্বংস হইয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে একনায়কতন্ত্র পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; অন্তত ফ্রাংকোর অধীনে স্পেনে ইহা আবার মাথা তুলিয়াছে।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Unitary and Federal Governments): বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ (Nation States) অতি বৃহদায়তন বলিয়া অনেক সময় একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশ শাসন করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে এই সকল রাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার গঠন করা হয়—(১) একটি কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকার, এবং (২) কতকগুলি আঞ্চলিক বা দেশের বিভিন্ন অংশের সরকার। দেশের শাসনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র শাসনক্ষমতা যদি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেই ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই যদি নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে তবে ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে 'এককেন্দ্রিক' (Unitary) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হয় তবে ঐরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' (Federal) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখন প্রথমে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government): এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য বর্তমান থাকে। নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি ও উহাদের ক্ষমতা প্রদান করা ছাড়াও অন্যভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা আঞ্চলিক সরকারসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, ইহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, এমনকি উহাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ সর্বতোমুখী প্রাধান্যের জন্য অন্যতম আধুনিক লেখক ষ্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন, "এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের অস্তিত্ব নাই।"

কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বতোমুখী প্রাধান্যই এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত। ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থাও প্রথমে এককেন্দ্রিক ছিল; পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

গুণাগুণ : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য বর্তমান থাকে বলিয়া সমগ্র দেশব্যাপী একই শাসননীতি ও শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। ইহার ফলে বিভিন্ন সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা লুপ্ত হয় এবং শাসন-ব্যবস্থার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষে এবং সংকটজনক সময়ে এই দৃঢ়তা বিশেষ উপযোগী। ঐ একই কারণে আবার শাসনযন্ত্র বিরাট ও জটিল হইয়া উঠে না; ফলে ব্যয়াধিক্যও ঘটে না।

গুণ : অখণ্ড শাসন-নীতি কিন্তু সুপরিবর্তনীয় অথচ দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থা

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হইল যে ইহা বিশেষ সুপরিবর্তনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের ইচ্ছামত আঞ্চলিক সরকারের সৃষ্টি ও বিলোপ এবং তাহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া শাসনকার্যের উন্নতিসাধন করিতে পারে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না।

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। আঞ্চলিক সরকারসমূহকে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের শাসনকার্যে বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র-বিরোধী। উপরন্তু, বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এত জটিল জাতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে যে উহার পক্ষে অঞ্চলগুলির প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে আঞ্চলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। আঞ্চলিক বা অংশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে জাতীয় স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়—কারণ, অংশ-গুলি লইয়াই ত' সমগ্র জাতীয় জীবন।

ত্রুটি : কিন্তু ইহা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government) : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। এই লিখিত সংবিধানই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত করিয়া দেয়। ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টিত হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের কেহ কাহারও অধীন থাকে না। উভয়ে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ন্যায় আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও মৌলিক (original) ক্ষমতা; ইহার কোনরূপ পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে প্রথমে সংবিধানের পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Federal Government) : যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় :

(১) **শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন :** শাসনতন্ত্র বা সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা

বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষমতা বণ্টন নানাভাবে হইতে পারে। তবে সাধারণত যে-বিষয়গুলি জাতির স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়—যেমন, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রেলপথ, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি—সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হয়; এবং যে-বিষয়গুলির সহিত আঞ্চলিক স্বার্থই অধিক জড়িত—যেমন, শিক্ষা, স্থানীয় শান্তিরক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি—সেগুলি রাজ্য বা অংশগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের হস্তে সমর্পণ করা যায় না। করিলে বিষয়গুলি ঠিকমত পরিচালিত হয় না। সুতরাং এইরূপ বিষয়গুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সরকারের যুক্ত কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়।

১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন

ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হয়

(২) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা লিখিত হয় এবং সুপরিবর্তনীয় হয় না। সুপরিবর্তনীয় বলিতে বুঝায় সহজ পরিবর্তন-যোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রকে সহজে পরিবর্তিত করা যায় না। যাইলে ক্ষমতার ভাগাভাগি লইয়া কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারগুলি পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিত। ফলে শাসনকার্যও ব্যাহত হইত।

২। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 'সাধারণত' একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে।* এই আদালতের কার্য হইল শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা। কেন্দ্র বা কোন রাজ্য সরকার যদি এমন কোন আইন প্রণয়ন করে যাহা তাহার সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যাহাতে কোন সরকার নিজস্ব সীমা লংঘন না করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষা করে।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত।

গুণাগুণ: যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। স্বায়ত্তশাসনই গণতন্ত্রের মূলকথা। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপোষক।

গুণ: ১। ইহা গণতন্ত্রের পরিপোষক

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র

---

* যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের উপর শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভার নাই।

গঠন করিতে পারে। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূতপূর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি লইয়া গঠিত। এই উপনিবেশগুলির প্রত্যেকটি যদি একটি করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিত তবে বর্তমানের শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না।

২। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়। একই জাতির বিভিন্ন অংশ যদি পাশাপাশি রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করে তবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে। ভারতবাসী এক জাতি। কিন্তু ধরা যাউক যে, তাহারা পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করিতেছে। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্যসাধন করা যাইতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও থাকিবে, অথচ ভারতবাসী একই শাসনাধীনে বাস করিবে।

৩। ইহা জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কর্মবিভাগ (division of functions) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রমবিভাগ (division of labour) বা কর্মবিভাগ দক্ষতার মূলসূত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় বলিয়া কর্মও বিভক্ত হয়। ফলে উভয় প্রকার সরকারই দক্ষতার সহিত আপনাপন কার্য সম্পাদন করিতে পারে।

৪। ইহা কর্মবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

লর্ড ব্রাইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণের নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইল, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা লইয়া পরীক্ষা চালানো যায়; কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র দেশব্যাপী এইরূপ করা বিশেষ বিপজ্জনক।

৫। ইহাতে শাসন ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো যায়

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য (regional autonomy) বর্তমান থাকে বলিয়া আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করা যাইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনমতেই সম্ভবপর নহে। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমবংগ সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে যেরূপ যত্নবান হইতে পারে, ভারত সরকারের পক্ষে তাহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

৬। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হয়

ত্রুটি: ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কয়েকটি সুস্পষ্ট ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকায় শাসনকার্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে

না ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক সন্ধি ও সর্তাদি পালন ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন নির্ভর করে সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপর। কিন্তু আঞ্চলিক সরকারগুলি সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করিয়া সন্ধি ইত্যাদি পালনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। ইহাতে জাতির আন্তর্জাতিক মর্যাদার লাঘব ঘটে।

২। ইহাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বর্তমান থাকে

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। অনেক সময় এই বিরোধের ফলে জাতির শক্তিরও হানি ঘটে।

৩। ইহা ব্যয়বহুল ও জটিল

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও জটিল। একটির পরিবর্তে অনেকগুলি সরকার থাকায় এবং ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় শাসনকার্যে ব্যয়বাহুল্য ও জটিলতা দেখা দেয়।

৪। দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে

চতুর্থত, শাসন-ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগের আশংকা থাকে। এই অশান্তি ও গোলযোগ ক্রমে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এই কারণে একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

উপসংহার : এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন শাসন-ব্যবস্থাই সকল অবস্থার উপযোগী নহে, তবুও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Parliamentary and Presidential Governments) : শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের

সরকারের এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে

মধ্যে সম্বন্ধ অনুসারে—অর্থাৎ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে (ক) পার্লামেণ্টীয় (Parliamentary) এবং (খ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত (Presidential)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পার্লামেণ্টীয় সরকারে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে ; এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এই দুই বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে।

পার্লামেণ্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্টীয়

সরকার মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত সরকার (Cabinet Government) নামেও অভিহিত।* এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head) এবং প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য। নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন নামসর্বস্ব শাসক (nominal executive)। শাসনকার্য তাঁহার নামে পরিচালিত হয়, কিন্তু প্রকৃত শাসনভার থাকে প্রকৃত শাসক (real executive) বা মন্ত্রিবর্গের উপর। নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন; তাঁহার কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকে না বলিলেই চলে। ইংলণ্ডের রাণী ও ভারতের রাষ্ট্রপতি এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা দুইজনেই রাষ্ট্রপ্রধান (Heads of States), কিন্তু সরকারের মধ্যে প্রধান নহেন। "ইঁহারা জাতির প্রতীক, কিন্তু ইঁহারা জাতিকে শাসন করেন না। ইঁহাদের পদ মর্যাদাসম্পন্ন, কিন্তু কর্তৃত্বহীন; সুতরাং দায়িত্বশূন্য।"

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

১। নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য

দায়িত্বপূর্ণ পদ হইল প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণের। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্যাকার্যের জন্য ব্যবস্থা বিভাগের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বশীল। ব্যবস্থাপক সভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইজন্যই পার্লামেণ্টীয় সরকার দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা (Responsible Government) নামে পরিচিত।

২। মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতা

ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্ব যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility)। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে সরকারী নীতি ও কার্য পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।** এইভাবে শাসকবর্গের উপর আইনসভা বা পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বজায় থাকে বলিয়াই এই প্রকার সরকারকে 'পার্লামেণ্টীয় সরকার' বলা হয়।

৩। দায়িত্বশীলতার যৌথ প্রকৃতি

মন্ত্রিগণ আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। আইনসভায় তাঁহাদের দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সুতরাং তাঁহারা যে-প্রস্তাব উত্থাপন করেন আইনসভায় তাহা পাস হয়। এইভাবে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ভিত্তিতেই পার্লামেণ্টীয় সরকার পরিচালিত হয়।

৪। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ—উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য

---

* ৪৫ পৃষ্ঠা।

** আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে মন্ত্রিগণ একমাত্র নিম্নতর পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন।

করেন এবং যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন। প্রধান মন্ত্রী আবার আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বও করেন। এইজন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বকেও পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

৫। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব

পরিশেষে, অনেকের মতে, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সুসংগঠিত বিরোধী দল থাকিবে। বিখ্যাত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রবিদ অধ্যাপক জেনিংসের (Jennings) ভাষায়, "বিরোধী দল পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য অংগ।" এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত থাকে না বলিয়া বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারিতার প্রতিবন্ধকতা করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ভারত, ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত।

৬। বিরোধী দলের অস্তিত্ব

গুণাগুণ ঃ পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে ইহা ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। সরকারের এই দুই বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে তবেই সুশাসন সম্ভবপর হয়।

গুণ ঃ ১। সুশাসন সম্ভবপর হয়

দ্বিতীয়ত, শাসকবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন বলিয়া গণতন্ত্র বা সাধারণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে। আইনসভায় প্রতিনিধিগণ জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করেন; ফলে শাসকবর্গকেও জনপ্রতিনিধিদের মতামত অনুসারে চলিতে হয়। এইভাবে শাসন-ব্যবস্থা জনমত দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে।

২। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে

পার্লামেন্টীয় সরকারে সহজেই শাসক পরিবর্তন করা যাইতে পারে। যে মন্ত্রিগণ আজ শাসন পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা যদি অদক্ষতার পরিচয় দেন বা অন্যায় করেন, তবে আইনসভায় জনপ্রতিনিধিবর্গ কাল তাঁহাদের সরাইয়া তাঁহাদের স্থলে অন্য একদল মন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি একবার পদে অধিষ্ঠিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না।*

৩। যে-কোন সময় শাসক পরিবর্তন সম্ভব

পার্লামেন্টীয় সরকার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে আইনসভায় শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এই প্রশ্নোত্তর সংবাদপত্রে ছাপা হয় বলিয়া ইহা হইতে জনসাধারণ অনেক শিক্ষালাভ করে। আবার নির্বাচন যে-কোন সময় অনুষ্ঠিত

৪। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার হয়

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট সময় হইল চারি বৎসর।

হইতে পারে বলিয়া সর্বদাই দলীয় প্রচারকার্য চলিতে থাকে। ইহা হইতেও জনসাধারণ শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত হয়।

পার্লামেন্টীয় সরকারের সমালোচকেরা বলেন যে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ না থাকায় সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই সমালোচনা বর্তমানে একরূপ মূল্যহীন—কারণ, বর্তমানে সুশাসনের জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাই কাম্য বিবেচিত হয়।

ত্রুটি : ১। বলা হয়, ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিগণের পক্ষে আইনসভার সদস্যপদ শাসনকার্য পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। এই প্রসংগে একজন সমালোচক উক্তি করিয়াছেন যে অর্থমন্ত্রী যদি আইনসভায় প্রশ্নের উত্তর দিতেই ব্যস্ত থাকেন, তবে অর্থদপ্তর পরিচালনা করিবার সময় কখন পাইবেন ?

২। শাসন পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে

পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসক-পরিবর্তন সহজসাধ্য বলিয়া ইহা ঘন ঘন ঘটিতে দেখা যায়। ফলে দীর্ঘ দিন ধরিয়া অনুসৃত কোন সরকারী নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, আজ মন্ত্রি-পরিষদ যে-নীতি গ্রহণ করিল, কাল নূতন মন্ত্রি-পরিষদ আসিয়া তাহা বদলাইয়া দিল।

৩। সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে

ঘন ঘন শাসক-পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই আবার মন্ত্রিগণ শাসনকার্যে দক্ষতা-লাভ করিবার সময় পান না। পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহাদের পক্ষে দল এবং আইনসভার সদস্যদের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহারা শাসনকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন না।

৪। শাসকবর্গ দক্ষ হইতে পারেন না

বহু শাসক লইয়া গঠিত বলিয়া পার্লামেন্টীয় সরকার দ্রুত নীতি নির্ধারণ করিতে পারে না। ইহাতে যুদ্ধ ইত্যাদি সংকটের সময়ে বিশেষ ক্ষতি হয়।

৫। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়

পরিশেষে, ইহাও বলা হয় যে এই শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিবর্গ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। মন্ত্রিগণ হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সুতরাং তাঁহারা আইনসভার মাধ্যমে যে-কোন প্রস্তাব, যে-কোন আইন পাস করাইয়া এবং যে-কোন ব্যয় অনুমোদন করাইয়া লইতে সমর্থ। ফলে শাসনকার্য জনমত দ্বারা পরিচালিত না হইয়া মন্ত্রিবর্গের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারাই পরিচালিত হয়। মন্ত্রিবর্গের এই স্বেচ্ছাচারকে 'নয়া স্বৈরাচার' (New Despotism) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।*

৬। মন্ত্রিবর্গ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন

* পুরাতন স্বৈরাচার হইল একনায়ক বা রাজার স্বেচ্ছাচার।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Form of Government) : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাতে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকে।

বৈশিষ্ট্য :

এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে। "রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি এবং শাসন বিভাগেরও কর্তা।" নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক বলিয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে কিছু নাই। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কিন্তু ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তাঁহার সহকর্মী নহেন।" মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না ; আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়িত্বশীলও নহেন। তাঁহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট।

১। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক নাই

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতিও তাঁহার কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে সংবিধানভংগ (violation of the constitution) বা দুর্নীতিমূলক কর্ম ছাড়া অন্য কোন কারণে পদচ্যুত করা যায় না।

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের জন্য ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্ব নাই

অপরদিকে আইনসভাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয় না। মন্ত্রিবর্গের মত রাষ্ট্রপতিও আইনসভার কার্যে যোগদান করিতে পারেন না। দূর হইতে প্রস্তাব পাঠাইয়া, ব্যয়-বরাদ্দ দাবি করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত থাকিতে হয়। আইনসভা ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে, ব্যয়-বরাদ্দের দাবি না-মঞ্জুর করিতে পারে। তখন রাষ্ট্রপতি বাণী (message) পাঠাইতে পারেন। আইনসভা এই বাণীকেও উপেক্ষা করিতে পারে।

৩। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ নহে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা ছাড়াও কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

গুণাগুণ : রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার মত দ্রুত পরিবর্তনশীল নহে। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া নীতি অনুসরণ করা যায় এবং শাসকবর্গ শাসনকার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে পারেন। ফলে দেশের উন্নতি সাধিত হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

গুণ :

১। প্রধান গুণ স্থায়িত্ব

সমর্থকদের মতে, এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ শান্তিপূর্ণ—কারণ, ইহাতে শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিশেষ নাই। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে উভয়ই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে।

২। বলা হয়, এই ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ

শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া এই প্রকার শাসন-পদ্ধতি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ উপযোগী। রাষ্ট্রপতির কোন সহকর্মী নাই; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং তিনি যেরূপ তৎপরতার সহিত কার্য করিতে পারেন পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় না।

৩। জরুরী অবস্থার উপযোগী

সমর্থকগণ আরও বলেন, যে-দেশে বহু রাষ্ট্রনৈতিক দল আছে সে-দেশের পক্ষে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারই প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। বহুদল থাকিলে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে পার্লামেন্টীয় সরকারের মন্ত্রি-পরিষদও একদলীয় না হইয়া বহুদলীয় হয়। বহুদলীয় মন্ত্রি-পরিষদ দুর্বল হইতে বাধ্য। এইজন্য এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারই বাঞ্ছনীয়।

৪। বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত শাসন-ব্যবস্থা

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ত্রুটিগুলিও বিশেষ প্রকট। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে বলিয়া ইহারা পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এইরূপ সংঘর্ষের অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। সুতরাং সমর্থকগণ যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারকে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন, তাহা ভুল।

ত্রুটি :

শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনার দরুন সুশাসন ব্যাহত হইবার আশংকাও রহিয়াছে।

১। ইহাতে কুশাসনের আশংকা রহিয়াছে

দ্বিতীয়ত, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। সংবিধানভংগ ও দুর্নীতিমূলক কার্য না করিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। ফলে তিনি এই দুই বিষয় বাঁচাইয়া সম্পূর্ণ খুশিমত কার্য করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। এইজন্য পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের সমর্থকদের নিকট রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার স্বৈরাচারী বলিয়া মনে হয়।

২। রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হইতে পারেন

পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদ আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করে; কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের এই কার্য সম্পাদিত হয় আইনসভার বিভিন্ন কমিটির দ্বারা। এক একটি কমিটির উপর এক এক প্রকার আইন

প্রণয়নের ভার ন্যস্ত থাকে। ইহার ফলে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়ে। দায়িত্ব বিভক্ত হইলে দায়িত্ব বিলুপ্তও হয়—কারণ, শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ উভয়েই দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করে। বস্তুত, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার একরূপ দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা। ইহাতে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহে, এবং আইন প্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব কাহারও নাই।

৩। ইহা দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা

দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ বিপজ্জনক। ইহাতে জনগণ অত্যাচারিত হইতে পারে, অকাম্য আইন প্রণীত হইয়া সাধারণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এইরূপ আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

৪। এই কারণে ইহা বিপজ্জনকও বটে

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। বর্তমানে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারেরই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সরকারের একটি শ্রেণীবিভাগ হইল একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে। গণতন্ত্র আবার বিভিন্ন ধরনের হয়—যথা, (ক) এককেন্দ্রিক, (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়, (গ) পার্লামেন্টীয়, (ঘ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত।

গণতন্ত্র: ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সরকার। গণতান্ত্রিক সরকারই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র জনসাধারণের শাসন হইলেও, কার্যক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনকার্য পরিচালিত হয় সকলের জন্য, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য নহে। উপরন্তু, গণতন্ত্র সকলের সম্মতির উপরও প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ইহা জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত।

গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয়ই হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে অচল। তাই বর্তমানে সকল দেশেই গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। তবে অনেক সময় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ: গণতন্ত্রের নিম্নলিখিত গুণগুলির নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। একমাত্র গণতন্ত্রই সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে; ২। একমাত্র ইহাতেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব; ৩। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত; ৪। ইহা সাম্যকেও সমর্থন করে; ৫। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে; ৬। ইহাতে বিপ্লবের আশংকা কম থাকে।

ত্রুটি: কিন্তু অভিযোগ করা হইয়াছে যে—১। গণতন্ত্র অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন; ২। এই শাসন-ব্যবস্থা রক্ষণশীল; ৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক; ৪। গণতন্ত্র দলগত ত্রুটিসম্পন্ন; ৫। ইহা অস্থায়ী; ৬। গণতান্ত্রিক সভ্যতা নিম্নস্তরের; ৭। এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে; ৮। ইহা পুঁজিবাদ সমর্থন করে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে: গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ অতিরঞ্জিত হইলেও গণতন্ত্রকে সফল করা কঠিন। ইহার জন্য প্রয়োজন—১। গণতান্ত্রিক জনগণের, ২। নাগরিকগণের মধ্যে বুঝাপড়ার, এবং ৩। অর্থনৈতিক অধিকারের।

একনায়কতন্ত্র: একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। ইহাতে চূড়ান্ত শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহার গুণাগুণও গণতন্ত্রের বিপরীত। একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ হইল—(১) ফ্যাসীবাদ, (২) নাৎসীবাদ।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা: বর্তমানে বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও অনেকগুলি করিয়া আঞ্চলিক সরকার থাকে। এই কেন্দ্রীয় সরকার যদি আঞ্চলিক সরকারসমূহকে সৃষ্টি করে এবং উহাদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখে তবে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা হয়।

গুণাগুণ: অখণ্ড শাসন ও নীতি কিন্তু সুপরিবর্তনীয় অথচ দৃঢ় শাসন এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ। অপরদিকে ইহা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে বলিয়া এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী নহে বলিয়া কাম্য নহে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা: যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে সংবিধানের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল—১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, ২। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, এবং ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

গুণ: ইহা ১। গণতন্ত্রের পরিপোষক; ২। জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়; ৩। ইহাতে শাসন ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো যায়; ৪। আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া যায়।

ত্রুটি: কিন্তু ইহা ১। অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ২। সংঘর্ষের সম্ভাবনাপূর্ণ, ৩। ব্যয়বহুল, ৪। জটিলতা-সম্পন্ন।

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার: ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে সরকারের এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য: ১। নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য, ২। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ৩। ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের যৌথ দায়িত্বশীলতা, এবং ৪। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব।

গুণ: এই পার্লামেণ্টীয় সরকারে—১। সুশাসন সম্ভব হয়; ২। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে; ৩। সহজে শাসক পরিবর্তন করা যায়; ৪। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

ত্রুটি: ১। কিন্তু ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন কাম্য নাও হইতে পারে; ২। শাসকগণ দক্ষ হইতে পারেন না; ৩। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না; ৪। মন্ত্রিগণ স্বৈরাচারী হইতে পারেন; ৫। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার: ১। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক নাই; ২। ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের কোন দায়িত্ব নাই; ৩। এই দুই বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ নহে।

গুণ: ১। স্থায়িত্ব ইহার সবপ্রধান গুণ, ২। বলা হয়, এই ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ, ৩। জরুরী অবস্থার উপযোগী, এবং ৪। বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা।

ত্রুটি: ১। কিন্তু ইহাতে কুশাসনের আশংকাও রহিয়াছে; ২। রাষ্ট্রপতি একমাত্র শাসক বলিয়া স্বৈরাচারী হইতে পারেন; ৩। ইহা দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা; ৪। সুতরাং ইহা বিপজ্জনকও বটে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the defects of a Democratic form of Government? Distinguish between Direct and Indirect Democracy. (H. S. (H) 1961)

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি কি কি? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[৫১-৫২ এবং ৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা]

2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects? (H. S. (H) 1960)

গণতন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার গুণাগুণ কি কি? [৪৬-৪৭ এবং ৪৯-৫২ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the merits and defects of Democratic form of Government. (C. U. 1962; H. S. (H) 1960; H. S. (H) Comp. 1961; H. S. (C) 1962)

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। [৪৯-৫২ পৃষ্ঠা]

4. Define Democracy. How does it compare with Dictatorship ? (S. F. 1959)

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উহার সহিত একনায়কতন্ত্রের তুলনা করা যায় কিরূপে ?

[৪৬ ৪৭ এবং ৫৩ ৫৫ পৃষ্ঠা]

5. What are the essential conditions for the success of a Democracy ? Do they exist in India ? (H. S. (C) Comp. 1960 ; En. 1961)

গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য সর্ত কি কি ? ভারতে কি উহাদের সন্ধান পাওয়া যায় ?

[ইংগিত : ভারতে এখনও গণতান্ত্রিক জনগণের, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বুঝাপড়ার এবং অর্থনৈতিক অধিকারের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে শিক্ষাবিস্তার, সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে ইহাদের সকলকেই গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।...এবং ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা]

6. What do you understand by Dictatorship ? State its demerits. Has Dictatorship any merits ? If so, what are they ? (C. U. 1959)

একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বুঝ ? ইহার ত্রুটি কি কি ? একনায়কতন্ত্রের কোন গুণ আছে কি ? থাকিলে গুণগুলি বর্ণনা কর। [৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা]

7. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which do you prefer and why ? (H. S. (C) 1961 ; P. U. 1961 ; En. 1961)

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি পছন্দ কর ; এবং কেন কর ? [৪৬-৪৭ এবং ৫৩-৫৬ পৃষ্ঠা]

8. How will you distinguish Unitary Government from Federal Government ? Illustrate your answer.

(C. U. 1952, '58 ; H. S. (H) Comp. 1961 ; En. 1962)

কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করিবে ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত।......) এবং ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা]

9. Explain what is meant by a Federal Government. What are the merits and defects of such a form of Government ? (H. S. (H) 1962)

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাহাকে বলে ব্যাখ্যা কর। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ কি কি ?

[৫৮-৬১ পৃষ্ঠা]

10. Distinguish between Unitary and Federal Forms of Government. What are their respective merits and drawbacks ? (P. U. 1962)

যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। এই দুই প্রকার সরকারের প্রত্যেকটির গুণাগুণ কি কি ? [৫৭-৫৮ এবং ৫৯-৬১ পৃষ্ঠা]

11. Distinguish between Parliamentary Form of Government and Presidential Form of Government. Discuss their respective merits and demerits.

(C. U. 1957)

পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের গুণাগুণের তুলনা কর। [৬১-৬৭ পৃষ্ঠা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

(Ends and Functions of the State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (Ends of the State) : রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ একমত হইতে পারেন নাই। এ্যারিষ্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকগণের মতে, রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ; সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই ইহার অস্তিত্ব। রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুন্দর জীবন উপলব্ধি করা বা আত্মবিকাশ কোন মতেই সম্ভব নয়। অপরদিকে আবার কাহারও কাহারও ধারণায়, রাষ্ট্র অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য সংগঠন মাত্র। মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। মানুষের মধ্যে যদি হিংসা, দ্বেষ, পরদ্রব্য-লোভ, হত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত তবে ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন হইত না। বস্তুত, এগুলিকে দমিত রাখাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দুই বিপরীত চরম মতবাদের মধ্যপন্থাও অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে ইঁহাদের মতে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ : (ক) আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সুশৃংখল সমাজজীবন সম্ভব করা ; (খ) সাধারণের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের পথ সুগম করা ; এবং (গ) মানব-সভ্যতার উন্নয়নে সহায়তা করিয়া বিশ্বজনীন উদ্দেশ্যসাধন করা।

ল্যাস্কি প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণের মত হইল যে, উপরি-উক্তভাবে চিরকাল ও সর্বদেশের লোকের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় না। দেশ ও কাল ভেদে রাষ্ট্রেরও উদ্দেশ্যের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

তবুও সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুন্দর জীবন সম্ভব করা। এই সুন্দর জীবন সকলেরই সুন্দর জীবন—ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের নয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন—শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসাধন নয়। সাধারণের কল্যাণের পরিবর্তে রাষ্ট্র যদি কোন শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বার্থসাধনে নিয়োজিত থাকে তবে ঐ রাষ্ট্র উদ্দেশ্যচ্যুত হইয়াছে—আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এ্যারিষ্টটল এরূপ রাষ্ট্রকে 'বিকৃত রাষ্ট্র' (Perverted State) আখ্যা দিয়াছিলেন।

তবুও বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of State Functions) : সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিলে

প্রশ্ন উঠে যে, কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে? দুঃখের বিষয়, এ-সম্বন্ধেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মোটেই একমত নহেন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে—(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং (খ) সমাজতন্ত্রবাদ।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (**Individualism**): যে সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে তাহাই শ্রেষ্ঠ—ইহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণের মতে, ইহা রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। একমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ দ্বারাই রাষ্ট্র তাহার উদ্দেশ্যসাধন, অর্থাৎ সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে পারে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংরক্ষণ যখন রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য তখন উহার কার্যাবলী হইবে ন্যূনতম—সংখ্যায় মাত্র দুইটি: (১) দেশে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা, এবং (২) বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য হইল পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র। এইজন্য এই প্রকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) বলা হয়।

নানা দিক হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন করা হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই তাহার নিজের ভালমন্দ সম্যকভাবে বুঝিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন

জীববিজ্ঞানের দিক হইতে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার আছে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া দুর্বলকে রক্ষা করা অযৌক্তিক ও অন্যায়।

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে; এবং ইহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হয়। সুতরাং সমাজও বিশেষ লাভবান হয়।

অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শান্তিশৃংখলা রক্ষা ছাড়া সমাজজীবনের অন্যান্য অংশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে অনেক সময় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বলিতে বুঝায় সরকারী হস্তক্ষেপ; এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বলিতে বুঝায় দলীয় সরকার (Party Government) কর্তৃক পরিচালনা। দলীয় সরকারের নীতি প্রায়ই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আবার সরকার বিভিন্ন নীতি লইয়া পরীক্ষাও চালায়। ফলে সাধারণের জীবন হইয়া উঠে ব্যতিব্যস্ত; ইহাতে সময় এবং অর্থেরও অপচয় ঘটে।

কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি উপেক্ষণীয় নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তিনটি প্রধান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত—যথা, (ক) প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের ভালমন্দ বুঝিবার সমান ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি আছে; (খ) প্রত্যেকেরই নিজের মংগলসাধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে; এবং (গ) প্রত্যেকে নিজ নিজ অভাব-পূরণের চেষ্টা করিলে সমাজের কল্যাণ আপনাআপনিই সাধিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটি:

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচকগণ দেখাইয়াছেন যে এই তিনটি ধারণাই ভ্রান্ত। প্রথমত, প্রত্যেকেরই ভালমন্দ বুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। এই কারণে মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় অনেক সময় অন্ধভাবে অগ্রসর হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য-সংকটের সময় খাদ্য-মজুতের উল্লেখ করিতে পারা যায়। খাদ্য-সংকট দেখা দিলে লোকে অন্ধভাবে খাদ্য-মজুতে অগ্রসর হইয়া অবস্থাকে আরও সংগীন করিয়া তুলে। সুতরাং ব্যক্তির অন্ধ কর্মপ্রচেষ্টাকে হাত ধরিয়া ঠিক পথে লইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন হইল রাষ্ট্রের। আমাদের উদাহরণে রাষ্ট্র ব্যক্তির খাদ্য-মজুতের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া খাদ্য-সংকটকে দূর করিতে চেষ্টা করিবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যে-যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেরই নিজের মংগলসাধনের জন্য অপরের সমান ক্ষমতা থাকে না। কারখানার মালিকের সহিত দরাদরি করিয়া শ্রমিক কখনই শ্রমের উচিত মূল্য আদায় করিতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে শ্রমিকের 'দরাদরির অবাধ স্বাধীনতা'র অর্থ তাহার পক্ষে অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকিবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ স্বাধীনতাকে আদর্শ হিসাবে কখনই সমর্থন করিতে পারা যায় না। অতএব, রাষ্ট্রের কর্তব্য মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া তাহাকে ন্যায্য মজুরি প্রদান করিতে বাধ্য করা।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকেই তাহার ব্যক্তিগত অভাবপূরণের চেষ্টা করিলেই যে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইবে। সকলেই খাদ্য-মজুতের চেষ্টা করিলে দেশে খাদ্য-সংকট দূর না হইয়া বরং বিপরীত ফলই হইবে।

উপসংহার: রাষ্ট্র যে মাত্র পুলিস-সংগঠন নহে, একথা বর্তমানে সকলেই স্বীকার করেন। রক্ষাকার্য ছাড়াও এমন কতকগুলি কার্য আছে যাহা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নহে। উদাহরণস্বরূপ, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বা বেকার-সমস্যার সমাধানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবশ্য একটি বিশেষ গুণও আছে। ইহা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেয়, তাহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই আত্মনির্ভরশীলতা ও

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা রহিয়াছে

উদ্যোগ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমিকা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদস্বরূপ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র কখনই সমাজজীবনের সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে থাকে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা। ইহার ফলে ক্ষমতাবান ও ধনীরা বিশেষ সুবিধাভোগ করে এবং দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তি পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। মালিকের সহিত দরাদরির সমান ক্ষমতা থাকে না বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিক-শ্রেণীকে সর্বদা বেকারাবস্থা, অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। দ্বিতীয়ত, এই কারণে সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ লাগিয়াই থাকে। তৃতীয়ত, অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য কাম্য ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এবং স্বল্প দামে বিক্রীত হইবে—এরূপ ধারণা করা ভুল। পুঁজিপতি মাত্র সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদনে মনোযোগী হয় যাহাতে তাহার মুনাফার সম্ভাবনা অধিক থাকে। ঔষধের পরিবর্তে যদি মদ্য বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ হয় তবে সে ঔষধের কারখানা তুলিয়া দিয়া মদ্যের কারখানাই খুলিবে। ফলে ঔষধের উৎপাদন কমিবে কিন্তু সমাজে মদ্যপানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদে সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই সকল কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে কর্মমুখর রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করা হয়, সংক্ষেপে তাহাই সমাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু রক্ষাকার্য বা পুলিসের কার্য সম্পাদন করিলেই চলিবে না; রাষ্ট্রকে সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা নিজ মালিকানায় আনিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উহার পরিচালনার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট উৎপাদন হইবে, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পাইবে এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিবে। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইবে। অবশ্য ইহাতেও যদি সমাজজীবনে পূর্ণ মংগলের পদধ্বনি শুনা না যায়, তবে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-জীবনের অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। মোটকথা, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সীমা নির্দেশ করা যায় না। সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা নাই, শোষণ নাই, মানুষে মানুষে ভেদ নাই—যেখানে সকলেই সুখী, সকলেই তৃপ্ত। এইরূপ সমাজ-গঠনের জন্য প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিকের (friend, guide and philosopher) কাজ করিতে হইবে। এইরূপ সমাজে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা কিছু থাকিবে না; সে হইবে সমাজ

সমাজতন্ত্রবাদ কাহাকে বলে

সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংকুচিত করিয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে

সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য : নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন

বা রাষ্ট্রেরই একটি অংশ। সমাজের মংগলকেই সে নিজের মংগল বলিয়া গণ্য করিবে এবং ঐ মংগলসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইল সমাজতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Forms of Socialism): সমাজতন্ত্রের মূলনীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও ইহা উপলব্ধির পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার গঠন সম্পর্কে সমর্থকগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে—যথা, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ।

সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের কারণ

(ক) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism): রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ সমষ্টিবাদ (Collectivism) নামেও অভিহিত। ইহা ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিয়া সমাজে সাম্য ও সর্বাধিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। বলা হয়, ভারত এইরূপ সমাজতন্ত্রবাদের পথেই চলিয়াছে।

(খ) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism): সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রবাদের এই রূপ অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। রাষ্ট্র গঠিত হইবে শ্রমিক এবং যাহারা উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে—অর্থাৎ, সাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া। এইরূপ পুনর্গঠিত রাষ্ট্র দেশরক্ষা, করধার্য প্রভৃতি সাধারণ কার্য সম্পাদন করিবে মাত্র—উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইবে শ্রমিক-সংঘগুলির (Trade Unions or Trade Guilds) দ্বারা। তবে যাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে (consumers) তাহাদেরও সংঘ থাকিবে। শ্রমিক-সংঘগুলি ভোগপণ্য-ক্রেতাদের এই সকল সংঘের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিবে।

(গ) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism): যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক বিপ্লবের পক্ষপাতী। ধর্মঘট, ধ্বংসাত্মক কার্য (sabotage) প্রভৃতির দ্বারা অর্থনৈতিক বিপ্লব আনয়ন করিয়া রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইতে হইবে। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইলে পর শ্রমিক-সংঘগুলি মিলিয়া একটি শ্রমিক সমবায় (Confederation of Labour) গঠন করিবে। ইহা রেলপথ, ডাক-বিভাগ, মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কার্য সম্পাদন করিবে। বিশেষ বিশেষ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা থাকিবে বিশেষ বিশেষ শ্রমিক-সংঘের হস্তে—যথা, বয়ন-শিল্প পরিচালনা করিবে বয়ন শ্রমিক-সংঘ, ইত্যাদি।

(ঘ) সাম্যবাদ (Communism) ঃ সাম্যবাদও রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিতে চায়। সাম্যবাদিগণের মতে, শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের উদ্দেশ্যে ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিলে শোষণের অবসান ঘটিবে, এবং ফলে রাষ্ট্রেরও প্রয়োজনীয়তা ফুরাইবে। অবশ্য ধনতান্ত্রিক যুগের পরই রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয় না। ধনতন্ত্রের পর আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র কিন্তু আপনা হইতেই আসে না ; ইহা আনয়ন করে সর্বহারার বিপ্লব (Proletarian Revolution)। সমাজতান্ত্রিক যুগে পূর্বেকার পুঁজি-পতি এবং জমিদার, জোতদার, মহাজনগণ নানারূপ ছলে-বলে-কৌশলে আবার পূর্বতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চায়। ইহাদের বাধা দিবার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে থাকিলে একদিন এরূপ অবস্থা আসিবে যখন প্রত্যেকে সমাজের জন্য আনন্দ সহকারেই সাধ্যমত কার্য করিবে এবং প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্যাদি পাইবে। এই অবস্থায় শোষণ ও মুনাফা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ায় রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। সুতরাং রাষ্ট্রও বিলুপ্ত হইবে (The State will wither away) এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে সাম্যবাদী সমাজ (Communistic Society)।

রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই সাম্যবাদের উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা ঃ সমাজতন্ত্রবাদ অসাম্য ও অন্যায়ের জগতে সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ যে কোনমতেই সমর্থনীয় নয়, ধনী দরিদ্র ও শ্রমিক-মালিকের ব্যবধান যে কোন-মতেই সুন্দর সমাজজীবনের সহায়ক নহে—ইহাই সমাজ-তন্ত্রবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদ নির্দেশ দেয় যে প্রকৃতির সকল দানে (in all gifts of Nature) সাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হউক, মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপিত হউক, এবং সকল শোষণের অবসান ঘটিয়া মানুষ পরস্পরের সহিত সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হউক। অতএব, আদর্শের জগতে সমাজতন্ত্রবাদের স্থান অতি উচ্চে।

সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ অতি উচ্চ

কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, ইহা কি সম্ভব ? এই প্রশ্নের উত্তরে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন সমাজতন্ত্রবাদের অধীনে সামগ্রিক কাজকর্ম (collective activity) এত বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে যে তাহা কোন রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে মানুষের প্রকৃতি বিচারে সমাজতন্ত্র-বাদের সমর্থকগণ ভুল করিয়াছেন। মানুষ সমাজের জন্য আনন্দ সহকারে কার্য করিতে চায় না—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই চায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমাজতন্ত্রবাদ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

কিন্তু প্রশ্ন যে ইহা কি সম্ভব ?

আরও বলা হয় যে, সমাজতন্ত্রবাদ কাম্যও নহে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-

ব্যবস্থায় ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় বলিয়া জীবন হইয়া উঠে যান্ত্রিক ; পরিচালকগণের কোন মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া উৎকোচ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে ; পরিচালকগণ পদে পদে ভুল করিতে পারেন ; ইত্যাদি।

এবং ইহা কি কাম্য ?

উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রবাদের মূল ধারণা প্রায় সর্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই আজ অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক অভিযানের কবলে সকল রাষ্ট্রকেই আজ কিছু-না-কিছু আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে।

উপসংহার

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of Modern States) :

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হইত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা। তারপর হইতে নানা কারণের জন্য দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারই প্রধান।

পূর্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিত

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রসারিত হইলেও পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংখ্যায় এখনও নগণ্য। অধিকাংশ রাষ্ট্রই বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া তাহাদের কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে। ইহা অবশ্য সত্য যে গতি হইল কর্মক্ষেত্র প্রসার করার দিকে। এই সকল আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়ই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয় : (১) মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য, (২) গৌণ বা ইচ্ছামূলক কার্য বা কর্তব্য।

মুখ্য বা অপরিহার্য কার্য হইল সেইগুলি যেগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র সম্পাদন না করিয়া পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে পুলিসবাহিনী, স্থল-নৌ-বিমানবাহিনী প্রভৃতি রক্ষিবাহিনী পোষণ করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলার জন্য শুধু পুলিসবাহিনী পোষণই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে গঠিত জনসমাজ। সুতরাং আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন আছে। আইন না থাকিলে শুধু পুলিস-বাহিনী দ্বারা শান্তিরক্ষা অরাজকতারই নামান্তর। আইন প্রণয়নের সংগে সংগে বিচার-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজনীয়। সুতরাং রাষ্ট্রকে ইহাও করিতে হয়।

সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্য

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র রক্ষিবাহিনী পোষণ করিয়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় না। সুতরাং রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত

কূটনৈতিক সম্বন্ধ (diplomatic relations) স্থাপন করিতে হয়, পররাষ্ট্র-নীতি (foreign policy) নির্ধারণ করিতে হয়, ইত্যাদি।

গৌণ কার্য হইল সেগুলি যাহা রাষ্ট্র সম্পাদন করে নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া নয়—সমাজজীবনকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্যই।

সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত গৌণ কার্যাবলী

শুধু আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াই পূর্ণাংগ সমাজজীবন গঠন করা সম্ভব হয় না ; সুতরাং প্রয়োজন হয় অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের। এই কর্তব্যগুলি প্রধানত হইল : (১) শিক্ষার বিস্তার করা, (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করা, (৩) ডাক-বিভাগ, রেলপথ, বিমানপথ পরিচালনা করা, (৪) পরিবহণের অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, (৫) মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থা (currency and credit) পরিচালনা করা, (৬) ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজন হইলে সরকারী কর্তৃত্বে আনয়ন করা, (৭) শ্রমিকদের কল্যাণসাধন করা, (৮) বেকার-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া, (৯) কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা, (১০) কতকগুলি বিশেষ শিল্প-গঠন এবং ইহাদের পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা।
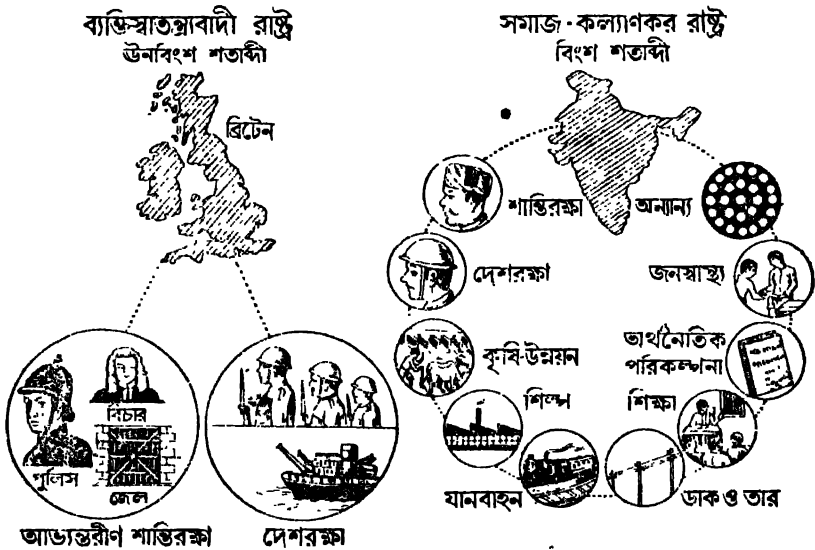
উন্নততর রাষ্ট্র আরও অগ্রসর হয়। ইহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার (planning) দ্বারা দেশের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করে এবং দেশের সম্পদ ও সুযোগ যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখে।

উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলির অধিকাংশই সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি দ্বারা নির্দিষ্ট। এইগুলি ব্যক্তির হস্তে রাখিলে সমাজের মংগল হইতে পারে না, কারণ ব্যক্তি হয় সঠিকভাবে ইহার পরিচালনা করিতে পারে না—না-হয় অধিক মুনাফার লোভে সমাজের ক্ষতি করে। যে-সকল রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদকে পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই অথচ উপরি-উক্ত গৌণ কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিতেছে, তাহাদিগকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare States) বলা হয়। সমাজের সেবার উদ্দেশ্যে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসার করিয়া চলিয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্র সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র

ভারতের উদাহরণ লইয়া সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান (Constitution) অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারত অন্যতম সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র

সংবিধানের এই নির্দেশের রূপদান করিবার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (economic planning) গ্রহণ করিয়াছে। সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণ, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, রাষ্ট্রের মালিকানায় নূতন নূতন শিল্পের পত্তন, পরিবহণের উন্নতি-বিধান, কৃষি ও কুটির শিল্পের পুনর্গঠন প্রভৃতি এই পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া ভারত-রাষ্ট্র অন্যান্য দিকেও হস্তক্ষেপ করিতেছে। যথা, বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে, বিদেশ হইতে খাদ্য আনাইয়া দেশের খাদ্যাভাব মিটাইতেছে, নানাভাবে শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা করিতেছে, শিক্ষার প্রসার ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিতেছে, ইত্যাদি।

বলা হয়, এইভাবে সমাজ-কল্যাণের পথ বাহিয়া ভারত সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ (The Individual in relation to Society): রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ যে মতবাদ দুইটির আলোচনা করা হইল, উহারা আবার ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ লইয়াও মতবাদ। বস্তুত, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং ব্যক্তির সহিত সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্বন্ধ—এই তিনটি বিষয়ই পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রই সমাজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য।* কিভাবে রাষ্ট্র এই লক্ষ্য সাধন করিবে—অর্থাৎ, কিভাবে রাষ্ট্র সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে—তাহাই হইল ব্যক্তির

* ১৯ পৃষ্ঠা।

সহিত সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্ন। রাষ্ট্র যদি সমাজজীবনকে অধিক নিয়ন্ত্রিত না করে, তবে উহা হইবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র; অপরদিকে যদি অধিক নিয়ন্ত্রণই উহার নীতি হয় তবে উহা হইবে সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র। যাহা হউক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধের মূল নীতিগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে:

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

সমাজ ব্যতীত মানুষ যখন বাঁচিতে পারে না, বাঁচিতে পারিলেও যখন বাঁচার মত বাঁচিতে পারে না—তখন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতে বাধ্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, মানুষ পশুর মত জীবন-যাপন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; সে চায় সুখী হইয়া বাঁচিতে, কাম্য জীবনযাপন করিতে। এই উদ্দেশ্যে সে আদিমতম কাল হইতেই সমাজকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং মানুষের উন্নততর জীবন সম্ভব করিবার জন্য সমাজ দীর্ঘ দিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে।

সামাজিক নিয়মকানুন ব্যক্তি-কল্যাণের প্রতিবন্ধক নহে

সমাজে বসবাস করিতে হইলে কতকগুলি সামাজিক নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। অনেকের মতে, এই সকল নিয়মকানুন ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ইহাদের জন্য ব্যক্তি অব্যাহতভাবে চলাফেরা ও কাজকর্ম করিতে পারে না বলিয়া সে সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। এই মত অবশ্য বর্তমানে মানিয়া লওয়া হয় না। ব্যক্তিকে লইয়া এবং ব্যক্তির জন্যই সমাজ। সুতরাং প্রকৃত সামাজিক কল্যাণ কখনই ব্যক্তি-কল্যাণের বিরোধী হইতে পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তির কল্যাণের সমন্বয়ই সামাজিক কল্যাণ; এবং এই সমন্বয়সাধনের জন্যই রাষ্ট্র সমাজে আইনকানুন চালু রাখে। ইহাতে হয়ত' কয়েকজনের যথেচ্ছাচারিতা ব্যাহত হয়; কিন্তু কাহারও প্রকৃত কল্যাণের হানি ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, আইনকানুনের ফলে দস্যুতস্কর ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের ক্ষতি হয়, কারণ তাহারা অপরের দ্রব্য জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারে না। অপরদিকে আইনকানুনের জন্য তাহাদের ভালও হয়, কারণ তাহাদের সম্পত্তিও কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। সুতরাং সামাজিক নিয়মকানুন সকলেরই কল্যাণসাধন করে, সকলেরই আত্মবিকাশে সহায়তা করে। নিয়মকানুন আছে বলিয়াই লোকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের গুণাবলী বিকশিত করিতে পারে। যেমন, ভাল ফুটবল খেলোয়াড় অপরের সহিত মিলিত হইয়া দল গঠন করিলে তবেই তাহার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে—অর্থাৎ, আত্মবিকাশ করিতে পারে।

আত্মবিকাশ ও প্রকৃত কল্যাণের জন্য প্রয়োজন অপরের সহযোগিতার। সহযোগিতা তখনই পাওয়া যায় যখন লোকে বুঝে যে সমাজ তাহারই জন্য এবং সমাজের কল্যাণে তাহারও কল্যাণ। লোকের মনে এইরূপ ধারণা

গাঁথিয়া দিবার জন্য প্রয়োজন সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার। অর্থাৎ, সকলকেই আত্মবিকাশের বা নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সমান সুযোগসুবিধা দিতে হইবে। ধনী-দরিদ্রে, অভিজাত-অভাজনে ভেদ করিলে চলিবে না।

সামাজিক নিয়মকানুন উন্নততর জীবনযাত্রা সম্ভব করে

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করাই সভ্য সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য; ইহার জন্যই আবার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বারট্রাণ্ড রাসেলের (Bertrand Russell) ভাষায় বলা যায়, সমাজ যাহাদের লইয়া গঠিত তাহাদের সুন্দর জীবন সম্ভব করাই উহার উদ্দেশ্য। কোন্ সমাজ এই উদ্দেশ্য কতটা সাধন করিতে পারিয়াছে তাহাই উহার উৎকর্ষের মাপকাঠি।

সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশে নিযুক্ত থাকে বলিয়া ব্যক্তিরও কর্তব্য রহিয়াছে সর্বদা সমাজের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবার। সমাজের কল্যাণ বলিতে সমষ্টিগত কল্যাণই বুঝায়। এই সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের দ্বারাই সমাজ-ব্যবস্থা সুন্দর ও সুগঠিত হইয়া ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ সুগম হইতে পারে। সুতরাং নিজ মংগলের জন্যই ব্যক্তিকে সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

সমাজের কল্যাণসাধন ব্যক্তির দায়িত্ব

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য লইয়া দার্শনিকগণের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ রহিয়াছে। তবুও বলা যায় সামগ্রিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিলে রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে, সে-সম্বন্ধে দুইটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে: (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, এবং (খ) সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্র অকল্যাণকর অথচ অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, মনুষ্যের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্যই ইহার অস্তিত্ব। সুতরাং এই ত্রুটি দূরিকরণের জন্য যাহা প্রয়োজন রাষ্ট্র মাত্র সেই কার্যই সম্পাদন করিবে—কোনমতে কোনভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতায় বা স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে এরূপ প্রয়োজনীয় কার্য হইবে সংখ্যায় দুইটি—(ক) আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা, এবং (খ) বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য পুলিসের ন্যায় রক্ষাকার্য মাত্র। এইরূপ রাষ্ট্রকে পুলিসী রাষ্ট্র বলা হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে (১) মনস্তত্ত্বের দিক হইতে, (২) জীববিজ্ঞানের দিক হইতে, (৩) অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে, এবং (৪) অভিজ্ঞতা হইতে সমর্থন করা হইয়াছে। ইহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিলেই সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের সকলে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন নয় বলিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা পুলিসী রাষ্ট্র সামগ্রিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। যাহা হউক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে যথেষ্ট বলিষ্ঠতা আছে—ইহা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল করার বিরুদ্ধে।

সমাজতন্ত্রবাদ: সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রে দেখা যায় ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা। ইহাতে কতিপয় লোক বিশেষ সুখভোগ করে এবং দরিদ্র জনসাধারণ পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম।

সমাজতন্ত্রবাদ অনুসারে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কতটা প্রসারিত করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে

নিশ্চয়ই করিয়া কিছু বলা যায় না। সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং দার্শনিকের কাজ করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে—যথা, (১) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, (২) যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ, (৩) সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, এবং (৪) সাম্যবাদ।

সমাজতন্ত্রবাদ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হইল—(১) ইহা কি সম্ভব, এবং (২) ইহা কি কাম্য? সমালোচকগণ বলেন ইহা সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। তবুও দেখা যায় যে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী: বর্তমান সময়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করিয়াছে। এই সকল রাষ্ট্র যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) অপরিহার্য কার্য, এবং (২) ইচ্ছাধীন কার্য। রাষ্ট্র অপরিহার্য কার্যাবলী সম্পাদন করে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হিসাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য; কিন্তু ইচ্ছাধীন কার্য সম্পাদন করে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে। এইজন্য এই সকল রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র বলা হয়। ভারত এই সকল সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ: রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নির্ধারণের প্রশ্ন আবার ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়েরও প্রশ্ন। কারণ, রাষ্ট্রই সমাজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রই সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সামাজিক নিয়মকানুন ব্যক্তিকল্যাণের সহায়ক, পরিপন্থী নহে। ব্যক্তির কল্যাণসাধন করা সমাজের এবং উহার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের আদর্শ। এই কারণে ব্যক্তির পক্ষেও সমাজের কল্যাণে নিযুক্ত থাকিবার দায়িত্ব রহিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What should, in your opinion, be the functions of a modern State ? (C. U. 1951)

তোমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি ?

[ইঙ্গিত: পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদ—কোনটাই কাম্য নহে। সুতরাং এই দুই মতবাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ, সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রগুলি যে যে কার্য সম্পাদন করে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে সেই সকল কার্য সম্পাদন করা উচিত মনে হয়।...... (৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা)]

2. State the functions of a modern State. Would you regard India as a modern State according to this concept ? (H. S. (H) 1960)

কোন আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বর্ণনা কর। এই বর্ণনা অনুসারে তুমি কি ভারতকে অন্যতম আধুনিক রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিবে ? [পূর্ববর্তী প্রশ্ন এবং ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

3. Enumerate the essential and non-essential activities of the State. (C. U. 1957)

রাষ্ট্রের অপরিহার্য ও ইচ্ছাধীন কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা]

4. Explain the Socialistic Theory of State functions. (C. U. 1959 ; H. S. (H) Comp. 1960)

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। [৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা]

5. What are the functions of Social Welfare States ? (S. F. 1959)

সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী কি কি ? [৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা]

6. What is meant by Socialism? Give your arguments for and against it. (H. S. (H) 1962)

সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝায়? ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে তোমার যুক্তিগুলি প্রদর্শন কর।

[৭৩-৭৪ এবং ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা]

7. Write notes on: (a) Individualism, (b) Socialism, (c) Social Welfare States.

টীকা লিখ: (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, (খ) সমাজতন্ত্রবাদ, (গ) সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র।

[৭১-৭৩, ৭৩-৭৪ এবং ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা]

8. Explain the relation between individual and society. (C. U. 1960)

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর। [৭৮-৮০ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Separation of Powers and Organs of Government)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers): সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলিতে বুঝায় সরকারেরই কার্যাবলী। সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—যথা, আইন প্রণয়ন করা, আইন বলবৎ বা শাসন পরিচালনা করা এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। এই তিন প্রকার কার্য পরিচালনার জন্য সরকারী ক্ষমতাকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (গ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা। সাধারণত এই তিন প্রকার কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ বা অংগ (organs) থাকে: (ক) আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature), (খ) শাসন বিভাগ (Executive) এবং (গ) বিচার বিভাগ (Judiciary)।

সরকারী ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ

সংক্ষেপে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি কাহাকে বলে

সংক্ষেপে, সরকারের তিন শ্রেণীর কার্য বা ক্ষমতা এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ, আইন বলবৎকরণের ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের নীতিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ইহা হইল কোন বিভাগের মধ্যে নিজস্ব গণ্ডি ছাড়াইয়া অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি।

এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে: (১) সরকারের এক বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না;

(২) একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না; এবং (৩) সরকারের কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। এখন দেখা যাউক, এই তিন অর্থের কোন্‌টিতে কতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা কতদূর প্রযুক্ত হওয়া কাম্য। তাহার পূর্বে অবশ্য আলোচনা করা প্রয়োজন ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য কি?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিনটি অর্থ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য: বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক আলোচিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়: ১। শাসনকার্যের ক্ষেত্রে কর্মবিভাগের সুবিধা (advantages of division of labour) লাভ করা; ২। সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সুশাসন সম্ভব করা; এবং ৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা।

তিনটি উদ্দেশ্য:
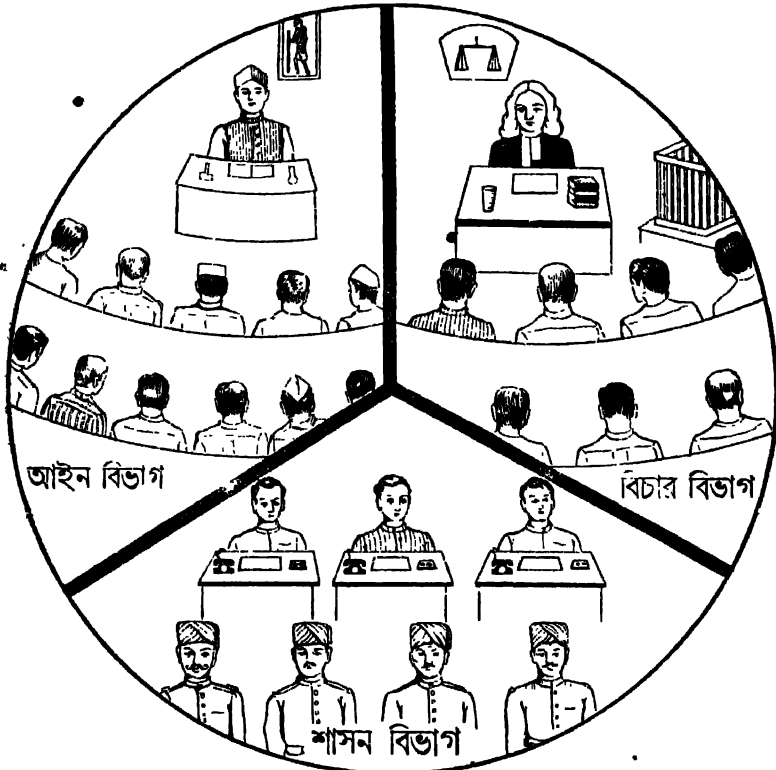
সরকারের তিনটি বিভাগ এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি

একরূপ এ্যারিষ্টটলই প্রথমে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারী কার্যাবলী তিন শ্রেণীর—যথা, নীতি-নির্ধারণ করা, ঐ নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারকার্য সম্পাদন করা। সরকারী কার্যাবলী এইভাবে বিভক্ত হইলে শাসনকার্য পরিচালনায় কর্মবিভাগ বা শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করা যায় বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

১। কর্মবিভাগের সুবিধা লাভ করা

পরবর্তীকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সরকারের তিনটি বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপযোগিতা নির্দেশ করেন। ইঁহাদের মতে, সরকারের তিনটি বিভাগ যদি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে—অর্থাৎ, পরস্পরের কার্যে হস্তক্ষেপ না করে তবেই সুশাসন সম্ভব হয়।

২। সুশাসন সম্ভব করা

ইহার পর ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ আলোচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মণ্টেস্কু (Montesquieu)। মণ্টেস্কুর হস্তে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। বলা যায়, মণ্টেস্কুই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির ধারণাকে (concept) মতবাদে (theory) পরিণত করিয়া উহার পূর্ণ রূপদান করেন।

৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা

মণ্টেস্কু চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সমসাময়িক ছিলেন। লুই-এর স্বৈরাচারের ফলে ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল বলা চলে। একবার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসিয়া মণ্টেস্কু ঐ দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপক-রূপ দেখিয়া একরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণই ইংলণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্বের হেতু। এই সিদ্ধান্ত হইতে পরে তিনি স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ (safeguard) হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদের সৃষ্টি করেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও মণ্টেস্কু

মণ্টেস্কুর বক্তব্য হইল, একই ব্যক্তির হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাজা যদি আইন প্রণয়ন, আইন বলবৎকরণ, বিচারকার্য সকলই সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তবে তিনি ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিয়া অযৌক্তিকভাবে উহাকে বলবৎ করিতে এবং অন্যায়ভাবে আইনভংগকারীর শাস্তিপ্রদান করিতে পারেন। এরূপ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব, এই তিন প্রকার কার্য পৃথক তিন শ্রেণীর ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

মণ্টেস্কুর মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ

মণ্টেস্কু ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে

ভুল কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা কোন কালেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় নাই। তবুও মন্টেস্কুর মতবাদ চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বহু লোকের নিকট ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৭৮৯ সালে ফরাসীরা ঘোষণা করে, যে-দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই সে-দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকার ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি মিলিয়া গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রণীত ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির শাসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃহীত হয়। ইউরোপে কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোন দেশ এই মতবাদের প্রভাবে পড়ে নাই।

মন্টেস্কুর মতবাদের প্রভাব ও এই নীতির প্রয়োগ

সমালোচনা ঃ বর্তমানে নানাদিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে, সরকারের কার্যাবলী ঠিক তিন শ্রেণীর নয়; সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নয়। ইঁহাদের কয়েকজন বিচারকার্যকে শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলেন যে সরকারী বিভাগ সংখ্যায় মাত্র দুইটি: (১) শাসন বিভাগ, এবং (২) ব্যবস্থা বিভাগ। সমালোচক দলের অপর অংশ সরকারী কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী—যথা, (১) নির্বাচন, (২) আইন প্রণয়ন, (৩) শাসননীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা, (৪) আইন ও নীতিকে কার্যকর করা, এবং (৫) বিচারকার্য। ফলে ইঁহাদের মতে, সরকারী বিভাগও সংখ্যায় পাঁচটি—যথা, (১) নির্বাচকমণ্ডলী, (২) ব্যবস্থা বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণের বিভাগ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণের বিভাগ, এবং (৫) বিচার বিভাগ।

১। সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে

সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নহে

প্রয়োগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। সরকারকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ—যথা, হস্ত পদ মস্তিষ্ক প্রভৃতি যেরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করা একেবারে অসম্ভব। ফলে প্রত্যেকটি বিভাগ এমন সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে যাহা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারে অপর বিভাগের কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, আইন প্রণয়নের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভাগের কার্য। কিন্তু অধিকাংশ

২। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পর্কচ্যুত হইতে পারে না:

ক। দেখা যায়, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে

ক্ষেত্রে আইন প্রণীত হয় শাসন বিভাগের নির্দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রধান নীতি হিসাবে গৃহীত সেখানেও আইনসভা অল্পবিস্তর শাসন বিভাগের নির্দেশানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। উপরন্তু, আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগকে জরুরী আইন (ordinance) পাস করিতে হয়। আবার শাসন বিভাগকে উপ-আইন (by-law) প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা প্রণীত আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিয়া লইতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভা আইন প্রণয়নের কিছু ভার শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অপরদিকে আবার আইন প্রণয়ন করা বিচার বিভাগেরও কার্য। বর্তমানে বিচারকগণ প্রণীত আইন (judge-made law) বিচার-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে। প্রচলিত আইন যখন অ-পর্যাপ্ত বা অযৌক্তিক বিবেচিত হয় তখন বিচারসভা এইরূপ আইন প্রণয়ন করে।

খ। একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িতও থাকে

এইভাবে এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন করে বলিয়া একই ব্যক্তিকে একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিতে হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থাতে প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা বিভাগেরই অংশ।

গ। এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তত্ত্বের দিক দিয়া সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কার্যক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর ব্যবস্থা বিভাগের প্রাধান্য প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। পার্লামেন্টীয় সরকারে শাসন বিভাগের কর্মকর্তা বা মন্ত্রিগণ সরাসরি ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন; আইনসভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের কতিপয় কার্য আইনসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ বলিয়া ঐ শাসন-ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অপরদিকে আবার আইনের বৈধতা-অবৈধতা ঘোষণার দ্বারা বিচার বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিন অর্থের কোনটিতেই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়

৩। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে

শুধু যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব তাহাই নহে, ইহার পূর্ণ প্রয়োগ কাম্যও নহে। বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব দেখা দিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রবর্তিত থাকিলে প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব ক্ষমতা সংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকিবে এবং কখনই

অপর বিভাগগুলিকে সাহায্য করিবে না। ইহার ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার যে-অভাব ঘটিবে তাহা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের সুফল কখনই পূরণ করিতে পারিবে না।

এই দিক দিয়া একজন আধুনিক লেখক ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে এক ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই ব্যায়াম-কৌশলে খেলোয়াড়দের মধ্যে সহযোগিতার একটু অভাবের ফলে সমস্ত খেলাটাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ
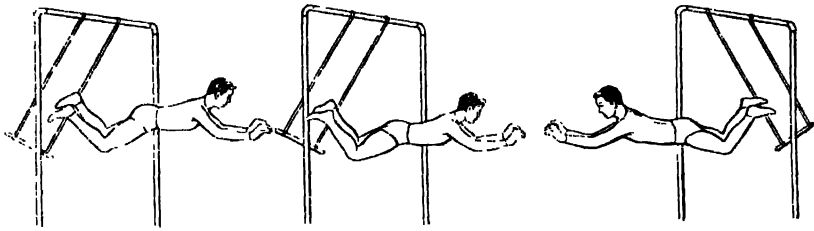
উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে দেখা ভুল। ইতিহাসের দিক দিয়া মন্টেস্কু ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে শাসন-ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ কোন দিনই ছিল না। তবুও ইংরাজরা কোনকালেই অন্য দেশের লোক অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের উপর। জনসাধারণ যদি স্বাধীনতাকাংক্ষী হয় তবে রাষ্ট্র উহা প্রদান না করিয়া পারে না। আবার জনসাধারণকেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে কিনা, তাহা জনগণকে চিরকালই সতর্ক দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে। ব্যাহত হইলে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনগণের স্বাধীনতাকাংক্ষা ও নির্ভীকতার উপর, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপর নহে।

৪। ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য বর্তমানে এই নীতির মাত্র আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আংশিক প্রয়োগ বলিতে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই বুঝায়।

বর্তমানে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই সমর্থন করা হয়

ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ (Separation of Powers in India): ব্রিটিশ আমলে ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি মোটেই অনুসৃত হয় নাই। তখন দেশের শাসক-প্রধান গভর্ণর জেনারেল এবং প্রদেশের শাসক-প্রধান গভর্ণরগণ আইন প্রণয়নও করিতে পারিতেন। শাসনকর্তাগণের আবার বিচারের ক্ষমতাও

ব্রিটিশ আমলে ভারত

ছিল। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন একাধারে জিলা-শাসক এবং জিলার অন্যতম বিচারক। শাসকগণ আবার যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটকও রাখিতে পারিতেন।

স্বাধীন ভারতের অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণের হস্তে অস্থায়ী জরুরী আইন (ordinance) ছাড়া অন্য কোনরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই; কিন্তু পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার দরুন কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এখনও কয়েক ক্ষেত্রে বিনা বিচারে আটক রাখিবার ক্ষমতা শাসন বিভাগের আছে। সংবিধানে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করিবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এখনও সকল রাজ্যে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য শাসকবর্গের হাত হইতে বিচারক্ষমতা অপসারিত হয় নাই। তবে স্বতন্ত্রিকরণের কার্য বেশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে, এবং আশা করা যায় যে দুই-এক বৎসরের মধ্যেই এই কার্য সমাপ্ত হইবে।* তখন যে-অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বর্তমানে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হয় তাহা—অর্থাৎ, বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য, ভারতে পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইবে।

স্বাধীন ভারত

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Organs of Government): ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদে ধরিয়া লওয়া হয় যে সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায় যে ব্যবস্থা বিভাগ সরকারের অপর দুই অংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। ইহার দুইটি কারণ আছে: প্রথমত, ব্যবস্থা বিভাগ জনপ্রতিনিধিবর্গকে লইয়া গঠিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থা বিভাগ আইন করিলে তবেই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যের সুযোগ ঘটে। রাষ্ট্র আইনানুসারে সংগঠিত জনসমষ্টি (a people organized for law) বলিয়া প্রথমেই প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। সেই আইন অনুসারে শাসন ও আইনভংগের বিচার হইল পরের কথা। অতএব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা সুরু করা উচিত ব্যবস্থা বিভাগ হইতে।

সরকারের সকল বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন নহে

ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature): ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইল ইহার কার্যাবলী ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা।

---

* ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরল, মাদ্রাজ, মহীশূর ও পশ্চিমবংগের সমগ্রে এবং মধ্যপ্রদেশ; পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইয়াছে। মাদ্রাজে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যখন বিচারকার্য সম্পাদন করেন তখন তাঁহারা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানাধীন থাকেন এবং মাত্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই বিচারক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। India—A Reference Annual, 1962

কার্যাবলী (Functions) : ব্যবস্থা বিভাগের কার্য আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলিই প্রধান :

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী পাঁচ প্রকার

(ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য : ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য। পূর্বে অধিকাংশ আইন ছিল প্রথাগত (customary laws)। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আজিকার দিনে ব্যবস্থাপক সভা প্রথাগত আইনের (customary laws) সংশোধন করে এবং প্রয়োজন হইলে ইহার বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করে।

(খ) অর্থসংক্রান্ত কার্য : গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি লইয়াই করধার্য বা ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। ইহার ফলে সকল গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ের প্রশ্ন রহিয়াছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণাও করা যায় না।

(গ) শাসনসংক্রান্ত কার্য : ব্যবস্থা বিভাগকে কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি অনুমোদন প্রভৃতি শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করাও শাসনসংক্রান্ত কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার এই কার্য প্রধানত পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার আইনসভারই বৈশিষ্ট্য, কারণ পার্লামেন্টীয় সরকারে মন্ত্রি-পরিষদকে আইনসভার নিকট (আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে নিম্নতর পরিষদের নিকট) দায়িত্বশীল থাকিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত থাকার দরুন শাসন বিভাগ আইনসভার অনুবর্তী হইয়া চলে না। পার্লামেন্টীয় সরকারে আইনসভা নিন্দা প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, বিল পাস করিতে অস্বীকার করা প্রভৃতির দ্বারা মন্ত্রি-পরিষদকে যে-কোন সময় পদচ্যুত করিতে পারে। এইজন্য মন্ত্রি-পরিষদ বা শাসন বিভাগকে সর্বদা সংযত হইয়া চলিতে হয়।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের কার্য—ইহা পার্লামেন্টীয় সরকারের আইনসভারই বৈশিষ্ট্য

(ঘ) বিচারসংক্রান্ত কার্য : ব্যবস্থা বিভাগের বিচারসংক্রান্ত কার্যও রহিয়াছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে ব্যবস্থাপক সভা। ইহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের আচরণের বিচার হয় ঐ ব্যবস্থাপক সভাতেই। ইংলণ্ডে আবার ব্যবস্থাপক সভার উর্ধ্বতন কক্ষ লর্ড সভা (House of Lords) ঐ দেশের আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত।

(ঙ) শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য : শাসনতন্ত্র বা সংবিধান সংক্রান্ত কার্য বলিতে সংবিধানের পরিবর্তন ও ব্যাখ্যার কার্য বুঝায়। ভারতের ন্যায় অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধানের ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ভার ঐ দেশের ব্যবস্থাপক সভার হস্তে ন্যস্ত।

গঠন (Organisation) : ব্যবস্থাপক সভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা (Unicameral Legislature) এবং দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা* (Bi-cameral Legislature) বলা হয়।

এক-পরিষদ ও দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার পরিষদ দুইটিকে যথাক্রমে প্রথম বা নিম্নতর (lower) এবং দ্বিতীয় বা উচ্চতর (upper) পরিষদ বা কক্ষ (chamber) বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নতর পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিনিধি-বর্গ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনপ্রিয় পরিষদ (popular chamber) নামেও পরিচিত।

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে যুক্তি :

আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন অথবা এক-পরিষদসম্পন্ন হইবে ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। দ্বি-পরিষদ ব্যবস্থার সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন :

(ক) দুইটি পরিষদ না থাকিলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। একটিমাত্র পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইতে পারে না। ফলে ইহাতে সর্বদাই অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের আশংকা রহিয়াছে। এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে এরূপ আকস্মিক আইনও পাস করিতে পারে, যাহাতে দেশের ক্ষতি হয়। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটা দুষ্কর। নিম্ন পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পরিষদ ধীর-ভাবে উহার বিচার করে। ইহাতে বিলটির দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং আকস্মিক আইনও প্রণীত হইতে পারে না। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

১। ইহাতে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভবপর

(খ) লর্ড ব্রাইসের মতে, দ্বিতীয় পরিষদ নাগরিকগণকে একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। তিনি বলেন, সকল আইন-সভারই স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি আছে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে এই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই আইনসভাকে সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি

২। ইহা একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার রোধ করে

* 'Legislature' এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ব্যবস্থাপক সভা' ও 'আইনসভা' দুইই করা হয়।

পরিষদে বিভক্ত করা উচিত যাহাতে একটি অপরটির স্বৈরাচারিতা রোধ করিতে পারে।*

বর্তমান যুগে ব্রাইসের এই যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় না। দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সমর্থকরাও উভয় পরিষদকে সমান ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী নহেন।

৩। বিশেষ প্রতি-নিধিত্বের ব্যবস্থা সম্ভব

(গ) উচ্চতর বা দ্বিতীয় পরিষদে মনোনয়ন ও পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির আইনসভার দ্বিতীয় পরিষদে শিল্পকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সমাজসেবা প্রভৃতিতে খ্যাতিসম্পন্ন বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে।

৪। দুইটি পরিষদ পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে

(ঘ) অধিকাংশ সময় উচ্চতর পরিষদে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংখ্যায় অধিক থাকেন বলিয়া ঐ পরিষদ নিম্নতর পরিষদের উৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ সভ্যগণকে সংযত রাখিতে পারেন। প্রথম পরিষদও উচ্চতর পরিষদের রক্ষণশীলতা কতকাংশে দূর করিতে পারে।

৫। বর্তমানে একটিমাত্র পরিষদ পর্যাপ্ত নহে

(ঙ) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুলভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় একটি পরিষদের পক্ষে আইনসভার সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সুতরাং প্রয়োজন হইল দুইটি পরিষদের।

৬। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে

(চ) দ্বিতীয় পরিষদেও প্রত্যেক বিল সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভ করে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে হয়ত' বিতর্ক ও আলোচনার ত্রুটি থাকিয়া যাইত; ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হইত।

৭। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য

(ছ) অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দুইটি পরিষদ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকার স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা হয়—যথা, জাতীয় স্বার্থ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ। এই দুই পৃথক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি পরিষদের প্রয়োজন। যেমন, ভারতবাসী হিসাবে আমাদিগকে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, আবার পশ্চিমবংগবাসীদের পশ্চিম-বংগের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার একটি পরিষদে থাকিবে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি-বর্গ, আর অপরটিতে থাকিবে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি সকল রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ।

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করিয়া ফরাসী লেখক আবে সিয়ে

* "The innate tendency of the assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of another house."

(Abbes Sieyes) বলিয়াছেন, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা অনাবশ্যক; আর যদি একমত না হয় তবে উহা অনিষ্টকর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, যদি নিম্নতর পরিষদকে সমর্থন করিতেই থাকে তবে দুইটি পরিষদ বজায় রাখিয়া অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি ও সময় নষ্ট করিবার কোন হেতু নাই। এ-ক্ষেত্রে উচ্চতর পরিষদের বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে যদি উচ্চতর পরিষদ নিম্নতর পরিষদের কার্যে বাধার সৃষ্টিই করিতে থাকে তবে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা অনিষ্টকর। সুতরাং আইনসভা একটিমাত্র পরিষদসম্পন্নই হইবে। বস্তুত, উচ্চতর পরিষদ সকল সময় বিবেচনার সহিত কার্য করে না। ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে নিম্নতর পরিষদের বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য। অর্থাৎ, উহার পক্ষে বিরোধিতা করা একপ্রকার স্বভাবে পরিণত হয়। ফলে অনেক সময় ইহা কাম্য আইন প্রণয়নেও বাধাপ্রদান করিয়া দেশের অনিষ্টসাধন করে।

বিপক্ষে যুক্তি: উচ্চতর পরিষদ

১। দ্বিতীয় পরিষদকে অনাবশ্যক মনে করা হয়

২। ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে

উপরন্তু, দুইটি পরিষদ থাকিলে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়। উচ্চতর পরিষদ যদি অনাবশ্যক এবং অকাম্যই হয় তবে এই অর্থব্যয়কে অপচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৩। ইহা অপচয়মূলক

উচ্চতর পরিষদ সাধারণত ধনী, রক্ষণশীল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। এইরূপ গঠন অগণতান্ত্রিক বলিয়াও দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই গঠিত হইবে, ইহাতে মনোনয়ন বা ইংলণ্ডের লর্ড সভার মত উত্তরাধিকার সূত্রে সভাপদপ্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই থাকিবে না।

৪। দ্বিতীয় পরিষদ অগণতান্ত্রিক

আর একটি কারণে দ্বিতীয় পরিষদকে অগণতান্ত্রিক মনে করা হয়। গণতন্ত্র হইল জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বিভাগ জনমতের অনুকূলে আইন পাস করিবে এবং শাসন বিভাগ তাহা বলবৎ করিবে—ইহাই এই শাসন-ব্যবস্থার মূলকথা। কিন্তু দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভায় কোনটি ঠিক জনমত তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, দেখা যায় দুইটি পরিষদ পরস্পরের বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বলা হয়, আইনসভা জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র বলিয়া ইহা ঐক্যবদ্ধই হইবে, দুইটি পরস্পরবিরোধী পরিষদে বিভক্ত হইবে না।

আরও বলা হয়, আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন হইলে ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং দুইটি পরিষদের প্রত্যেকটি পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে।

৫। ইহা ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত করে

অন্যতম আধুনিক লেখক ল্যাস্কি বলেন, এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভাই বর্তমান যুগের পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন আইন পাস করা হয় না। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতীয় পরিষদ এই আলোচনারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ফলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন পাসে অযথা বিলম্ব ঘটে।

৬। যুক্তরাষ্ট্রেও ইহার প্রয়োজন নাই

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন-সভায় দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয়। ল্যাস্কির মতে ইহাও ভুল। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই ঐ স্বার্থ সংরক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সংখ্যায় তিনটি: (ক) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, (খ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, এবং (গ) ক্ষমতা বণ্টন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।* আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এইগুলিই যথেষ্ট। ইহার উপর দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ণ অহেতুক।

উপসংহার

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। তবুও অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহার বিলোপ-সাধন অপেক্ষা সংস্কারেরই পক্ষপাতী। ইঁহারা মনে করেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইলেই দ্বিতীয় পরিষদের ত্রুটি-গুলি দূর হইবে এবং তখন ইহা সংশোধনকারী পরিষদ (revising chamber) হিসাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে।

শাসন বিভাগ (The Executive): সরকারের যে অংশ আইন বলবৎকরণের কাযে নিযুক্ত তাহাকে শাসন বিভাগ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive) হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ অর্থে মাত্র প্রধান কর্মকর্তা ও কর্মসচিবকে লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত এইরূপ মনে করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'শাসন বিভাগ' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ

প্রধান কর্মকর্তা ইংলণ্ডের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করিতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণের ন্যায় জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন, ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন অথবা কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গভর্ণর-জেনারেলের ন্যায় মনোনীত হইতে পারেন।

* ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive):

শাসন বিভাগ নানা প্রকার কার্য সম্পাদন করে

রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্যও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(ক) আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা: আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা বলিতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, নিম্নতন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন (ordinance) পাস প্রভৃতি কার্যাবলীকে বুঝায়। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের উপর আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বলা হয়।

(খ) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য: পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার বলিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, এই সকল রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ, ইহাদের প্রেরিত রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি বুঝায়। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য বর্তমান জগতে শাসন বিভাগের এই পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা: অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগের সম্মতি লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলেও যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করা হয় তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বলে।

(ঘ) অর্থসংক্রান্ত কার্য: সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য করধার্যের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা হয়। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত করধার্য ও অর্থব্যয় করা যায় না সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। যে-দপ্তরের মাধ্যমে এই কার্য করা হইয়া থাকে তাহাকে অর্থদপ্তর (Finance Department) বা রাজস্ব দপ্তর (Treasury) বলে। কর সংগ্রহ বা ব্যয় করা ছাড়াও এই দপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

(ঙ) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য: শাসন বিভাগের আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যও কিছু কিছু রহিয়াছে। শাসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে এবং উহার অধিবেশন স্থগিত রাখে। আবার প্রধান কর্মকর্তার সম্মতি না পাইলে কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে শাসন বিভাগ প্রয়োজনবোধে জরুরী অস্থায়ী আইনও পাস করিতে পারে।

বর্তমানে আইনসভা প্রণীত মূল আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য শাসন বিভাগ নিয়মিতভাবে উপ-আইন (by-law) প্রণয়ন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে আইনসভা আইন প্রণয়নের ভার শাসন বিভাগের উপর উত্তরোত্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

(চ) বিচারসংক্রান্ত কার্য: দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও শাসন বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে করধার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আপত্তির বিচার করে, কেহ অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইলে তাহার আবেদনের বিচার করে, ইত্যাদি।

(ছ) অন্যান্য কার্য: বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শাসন বিভাগকে অন্যান্য কর্তব্যও সম্পাদন করিতে হয়। আজিকার দিনে রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা, ডাক বিভাগ পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি মামুলী কর্তব্যপালন ছাড়াও নানাবিধ সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আজিকার দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ উত্তরোত্তর জনকল্যাণের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

বিচার বিভাগ (The Judiciary): সরকারের তৃতীয় অংগ বিচার বিভাগ। ইহার প্রধান কার্য ন্যায়বিচার করা। সমাজ-কল্যাণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বিশেষভাবে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মাপকাঠি আর নাই।

প্রাচীনকালে শাসনকার্য ও বিচারকার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় কার্যই সম্পাদন করিতেন স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী। এই ব্যবস্থাকে 'স্বৈরাচারের নামান্তর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই বর্তমান সময়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত না হইলেও বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে সকলেরই একমত। ফলে অধিকাংশ দেশে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary): বিচার বিভাগের প্রধান কার্য প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা এবং দণ্ডবিধান করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন (case law) হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিচারকগণও শুধু আইনের ব্যাখ্যা ও দণ্ডবিধানই করেন না, আইনের সৃষ্টিও করেন।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের

বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখে। আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর এই ভার ন্যস্ত।

বিচার বিভাগ শাসন বিভাগকে পরামর্শদানও করে। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে পরামর্শদানের ব্যবস্থা আছে।

বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহা ঠিক বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির বিচারাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা, লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার ইহা দুষ্কর্ম বা অন্যায় রহিত করিবার জন্য নির্দেশ বা লেখ (writs) জারি করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary): পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এই কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

(ক) বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি: বর্তমানে শাসন বিভাগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, সাধারণভাবে ঊর্ধ্বতন বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই নিয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ, বিচারকগণ শাসন বিভাগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

(খ) বিচারকগণের কার্যকাল ও পদচ্যুতি: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারকগণের কার্যকাল তাঁহাদের নিয়োগ-পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং অক্ষমতা বা দুষ্কর্ম প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না।

(গ) বিচারকগণের বেতন ও ভাতা: বিচারকগণকে উপযুক্ত বেতন ও ভাতা না দিলে তাঁহারা তাঁহাদের পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। দেখা গিয়াছে, স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিগণ উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কর্মের জন্য উন্মুখ থাকেন।

(ঘ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণ: পরিশেষে, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র না করিলে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যায় না।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি: সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—(ক) আইন প্রণয়ন, (খ) শাসন পরিচালনা, এবং (গ) বিচারের ব্যবস্থা। এই তিনপ্রকার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক

সরকারের তিনটি করিয়া বিভাগ থাকে—(ক) ব্যবস্থা বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ, এবং (গ) বিচার বিভাগ। যে-নীতি অনুসারে এই তিন শ্রেণীর কার্য এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা হয়: ১। সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; ২। একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না; ৩। এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য: ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে ধারণা এ্যারিষ্টটলের সময় হইতে চলিয়া আসিলেও ইহাকে মতবাদে পরিণত করেন মন্টেস্কু। মন্টেস্কুর মতে, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ অপরিহার্য। মন্টেস্কুর পূর্বে অবশ্য কর্মবিভাগের সুবিধা এবং বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্যের ফলে সুশাসন—এই দুই দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ধারণা প্রচার ও সমর্থন করা হইয়াছিল। অতএব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিনটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে: ১। সরকারী কর্মবিভাগের সুবিধা, ২। বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্যের ফলে সুশাসন, এবং ৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ।

সমালোচনা: নানা দিক হইতে স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে বলিয়া সরকারও তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত নয়।

দ্বিতীয়ত, দেখানো হইয়াছে যে উক্ত তিনটি অর্থের কোনটিতেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে।

চতুর্থত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে।

এই সকল কারণে বর্তমানে একমাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া আর কোন প্রকারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের দাবি করা হয় না।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ: সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগই অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী: ব্যবস্থা বিভাগ পাঁচ প্রকারের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে: ১। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য; ২। অর্থসংক্রান্ত কার্য; ৩। শাসনসংক্রান্ত কার্য; ৪। বিচার-সংক্রান্ত কার্য; ৫। শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য। শাসনসংক্রান্ত কার্যের মধ্যে আছে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার কার্য। ইহা অবশ্য পার্লামেন্টীয় সরকারের আইনসভারই বৈশিষ্ট্য।

ব্যবস্থা বিভাগের গঠন: ব্যবস্থা বিভাগ একটি না দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে সে-বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। দুইটি পরিষদের সপক্ষে বলা হয় যে—১। ইহাতে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়; ২। ইহা একমাত্র পরিষদের স্বৈরাচারিতা রোধ করে; ৩। ইহাতে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভব; ৪। বর্তমান কর্মমুখর রাষ্ট্রে একটিমাত্র পরিষদই যথেষ্ট নয়; ৫। দুইটি পরিষদ পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে; ৬। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে; ৭। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য।

অপরদিকে দুইটি পরিষদের বিপক্ষে বলা হয় যে—১। দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক; ২। ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে; ৩। দুইটি পরিষদ অপচয়মূলক; ৪। ইহা অগণতান্ত্রিক; ৫। ইহা ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত করে; ৬। যুক্তরাষ্ট্রেও ইহা অপ্রয়োজনীয়।

শাসন বিভাগ: শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে:

১। আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা; ২। পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য; ৩। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা; ৪। অর্থসংক্রান্ত কার্য; ৫। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য; ৬। বিচারসংক্রান্ত কার্য; ৭। অন্যান্য কার্য।

বিচার বিভাগ: বিচার বিভাগ বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে—১। আইনের ব্যাখ্যা; ২। আইনের সৃষ্টি; ৩। শাসন বিভাগকে পরামর্শদান; ৪। শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখা; ৫। কিছু কিছু শাসনসংক্রান্ত কার্য।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, ১। বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি; ২। বিচারকগণের কার্যকাল; ৩। বিচারকগণের বেতন ও ভাতা; ৪। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকিকরণ।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the Theory of Separation of Powers. (C. U. 1948, '51)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা কর।

[ইংগিত : সংক্ষেপে নীতির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে।......(৮২-৮৭ পৃষ্ঠা)]

2. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a Government? (H. S. (H) 1960)

আইন বিভাগীয়, শাসন বিভাগীয় এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় কেন? [৮২-৮৫ পৃষ্ঠা]

3. Explain the limits to the Theory of Separation of Powers. Give examples. (H. S. (H) 1961)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সীমা কি কি, তাহা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ চলিতে পারে না। বস্তুত, পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই প্রয়োজনীয়। ...৮২-৮৩ এবং ৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা]

4. Explain the Theory of Separation of Powers. How far is a strict separation of powers practicable and desirable? (P. U. 1962)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কতদূর সম্ভব বা কাম্য? [পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর এবং ৮২-৮৭ পৃষ্ঠা]

5. Argue for and against Bi-cameral Legislatures. (C. U. 1962; H. S. (C) Comp. 1960; B. U. 1961; En. 1962)

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [৯০-৯৩ পৃষ্ঠা]

6. Explain what is meant by a Bi-cameral form of Legislature. Do You favour such a form of Legislature? If so, why? (H. S. (H) Comp. 1961; P. U. 1961)

দ্বি-পরিষদসম্পন্ন আইনসভা বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। তুমি কি এই ধরনের আইনসভা সমর্থন কর? যুক্তিসহ উত্তর দাও। [৯০-৯৩ পৃষ্ঠা]

7. Describe the functions of the Executive in modern States.

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা]

8. What are the functions of the legislature in a Cabinet type of Government? (H. S. (C) 1962)

মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত সরকারে আইনসভার কার্য কি কি? [৬২-৬৩ এবং ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা]

9. Indicate the importance of the independence of the Judiciary. Describe the factors on which the independence of the Judiciary depends.

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব নির্দেশ কর। যে-যে বিষয়ের উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহা দেখাও। [৮৭ এবং ৯৬ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা

(Nation, Nationalism and Internationalism)

আধুনিক নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে পারে না, তাহাকে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও মাথা ঘামাইতে হয়। এই কারণে তাহার পক্ষে যে-সকল শক্তি বিশ্বশান্তির, বিশ্ব-সমবায়ের পরিপন্থী তাহাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ অন্যতম সক্রিয় শক্তি হইল জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। সুতরাং নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা একরূপ অপরিহার্য। কিন্তু জাতি (Nation) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না করিয়া জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং আলোচনা 'জাতি' হইতেই সুরু হওয়া উচিত। আমরা তাহাই করিব।

জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব

জাতি (Nation) : সংক্ষেপে জাতি বলিতে এমন এক 'জনসমাজ'কে (people) বুঝায় যাহা অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে এবং যাহারা স্বাধীন বা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে। এখন প্রশ্ন, এইরূপ জনসমাজ, যাহাকে জাতি বলা হয় তাহা কিভাবে গড়িয়া উঠে? জাতি গড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে, ক্রমবিকশিত হইয়া। কোন জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধের ফলে প্রথমে গড়িয়া উঠে 'জনসমাজ'। পরে এই জনসমাজের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইলে যখন উহা স্বাধীন হইতে চায় বা স্বাধীন হয় তখন উহাকে 'জাতি' আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতি কাহাকে বলে

জাতি কিভাবে মূর্ত হয়

জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে নানা কারণে—যথা, একই স্থানে বসবাস, একইভাবে উদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস, ভাষা ধর্ম সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতিতে সমতা, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে কোনটিই অবশ্য অপরিহার্য নয়। একস্থানে বসবাস না করা সত্ত্বেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহুদি জনসমাজ গঠিত হইয়াছিল। আবার এইভাবে উদ্ভূত না হইলেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। ইংরাজ বা মার্কিনদের জাতি বলিতে কেহই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু উভয়েই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অভিন্ন ভাষা ধর্ম সাহিত্য ও ইতিহাসকেও অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা চারিটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী হইয়াও এক জনসমাজ*;

* ভাষা চারিটি হইল জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং রোমান্স (Romansch); কিছুদিন পূর্বে প্রথম তিনটি ভাষাই স্বীকৃতি পাইয়াছিল।

বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীও এক জনসমাজ। ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও জন-সমাজ গড়িয়া উঠে। চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ধর্ম জনসমাজ গঠনের অন্তরায় হয় নাই।
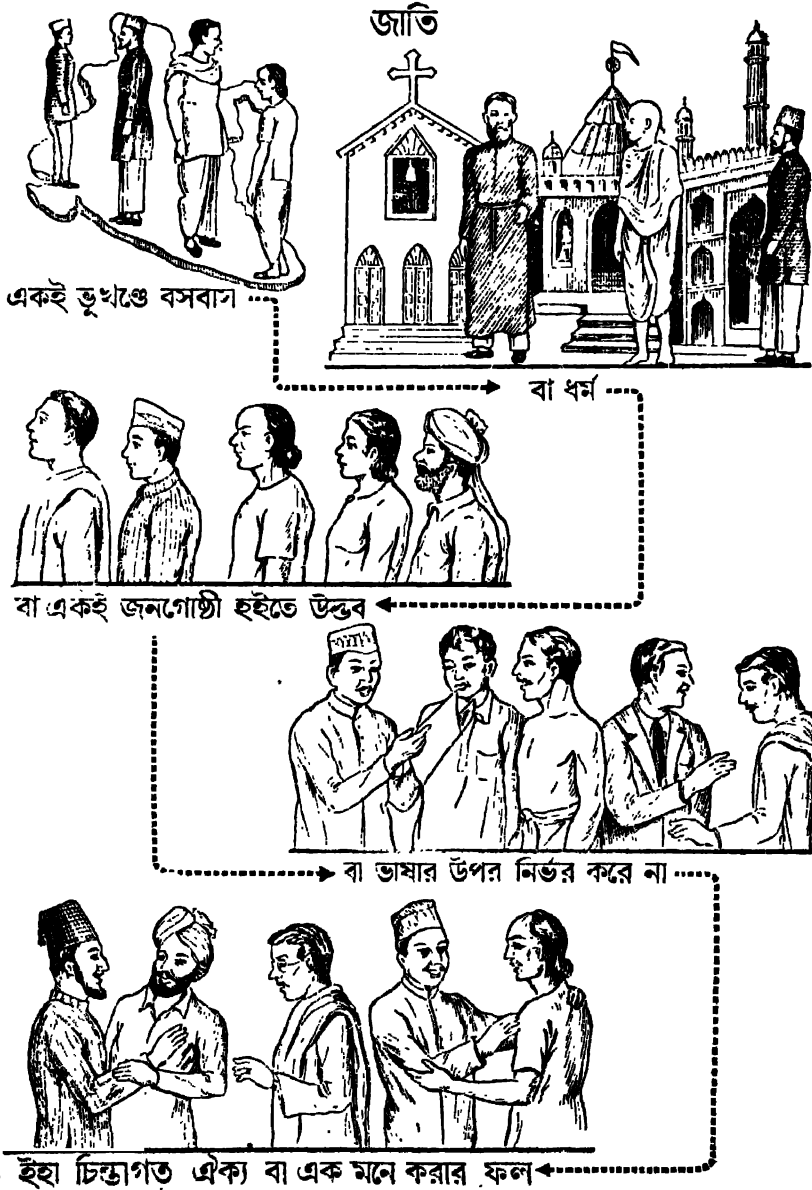
এইরূপে জনসমাজ গঠনের জন্য কোন উপাদান অপরিহার্য না হইলেও কয়েকটি বর্তমান থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে একমাত্র ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রথমে মুসলমান জনসমাজ এবং পরে মুসলমান জাতি গঠিত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আসল কথা হইল, জনসমাজের যে-ঐক্য তাহা প্রধানত চিন্তা বা ভাবগত। কোন জনসমষ্টি যদি ভাবে যে তাহারা একটি পৃথক জনসমাজ তবেই তাহারা জনসমাজে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যেদিন ভাবিতে শিখিল যে তাহারা অন্যান্য ভারতবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সেইদিনই তাহারা জনসমাজে পরিণত হইল। তাহার পূর্বে হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন খ্রীষ্টান—সকলেই ছিল ভারতীয় জনসমাজের অন্তর্গত।

জাতি বা জনসমাজের ঐক্য প্রধানত ভাবগত

এইভাবে জনসমাজ গঠিত হইলে ক্রমশই তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। সেই অবস্থায় জনসমাজকে 'জাতি' (Nation) আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) : জাতির মধ্যে যে ঐক্যবোধ (spirit) বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্র্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতি ভাবিতে শিখে, তাহারা যখন পৃথিবীর মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র তখন তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করিতে থাকে। ইহাকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি' বা অধিকার (right of self-determination) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের মুসলমানেরা যখন ভাবিল যে তাহারা এক স্বতন্ত্র জাতি তখন তাহারা পাকিস্তান গঠনের দাবি করিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বতন্ত্র জাতির রূপ আরও সুস্পষ্ট হইল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইলেও জাতি বিলুপ্ত হয় না বলিয়া জাতীয়তাবাদেরও অবসান ঘটে না। তখন জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথেও অগ্রসর হইতে পারে।

জাতির মধ্যে যে ভাব বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ বলে

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Nationalism and Right of Self-determination) : বলা হইয়াছে, নবগঠিত জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই দাবিকে মানিয়া লওয়া হয়, অনেক সময় ইহাকে অস্বীকার করা হয়। অস্বীকার করার ফল অবশ্য সকল সময় শুভ হয় না; সকল সময় আবার এই দাবিকে মানিয়া লওয়াও যায় না। এই কারণে দেখা প্রয়োজন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কতদূর স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন ধারণা। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, "জাতির সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত এক হওয়া প্রয়োজন"—অর্থাৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে মাত্র একটি করিয়া জাতি বাস করিবে। ইহাকে একজাতীয় রাষ্ট্রের (Mono-national State) আদর্শ বলা হয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন এই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান ও বিশ্বশান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সকল ক্ষেত্রে মানিয়া লইলে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, সকল জাতিরই দাবি পূর্ণ হইবে। ফলে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বাধিবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে অনেক নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া উইলসনের এই ধারণাকে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল, অনেক নূতন রাষ্ট্র গঠনের পরও যুদ্ধের আশংকা বিলুপ্ত হইল না। ইহার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতির সীমারেখার সহিত এক হইল না। অনেক পুরাতন ও নবগঠিত রাষ্ট্রে—যেমন, জার্মেনী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অন্যান্য জাতির অংশবিশেষ রহিয়া গেল। ফলে, আবার উঠিল আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি।

বিপক্ষে যুক্তি

বস্তুত, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান বা শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা—কোনটিই সম্ভব নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নাই; শান্তিভংগের সম্ভাবনাও দূরীভূত হয় নাই। বরং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

ভারতের উদাহরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই পর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লইয়া আলোচনাকালে লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, ইহা এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার। ইহার ফলে জনগোষ্ঠী যেমন নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তেমনি অপরাপর জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক হইবার প্রচেষ্টাও করে। এই পৃথক হইবার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি নাই। কার্জনের এই উক্তির সারবত্তা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। নবসৃষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে জার্মান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দল আবার পৃথক হইবার দাবি করিতে লাগিল। ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর ভারতে অনেক মুসলমান এবং পাকিস্তানে কিছু হিন্দু রহিয়া গিয়াছে। তাহারা যদি আবার পৃথক হইবার দাবি করে এবং এই দাবি যদি প্রবল হয়, তবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ বলিয়া কিছুই নাই।

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ নাই

প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্‌টন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে

'ইতিহাসের পশ্চাৎগতি'র লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার দাবি মাত্র। ইহা আদিম অসভ্য যুগের সহিত বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ। আদিম যুগে এক জনগোষ্ঠী যেমন অন্য জনগোষ্ঠীর সহিত মিলিতে চাহিত না, এই সভ্য যুগেও যদি মানুষ তাহাই করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহারা পিছনে হাঁটিতেছে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি পরিত্যাগ করা উচিত।

তবে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এই দাবিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইতে পারে

কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্তমানে শুধু মতবাদই নয়; ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। সুতরাং শুধু যুক্তি দ্বারা ইহাকে খণ্ডন করিলেই চলিবে না, কার্যক্ষেত্রে খণ্ডনের ফলাফলও বিচার করিতে হইবে। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি যদি প্রবল হয় তখন উহাকে মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, এই দাবিকে অস্বীকার করিলে গৃহযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism): জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। পরাধীন থাকাকালীন জাতি স্বাধীন হইবার আকাংক্ষা প্রকাশ করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানায়। তারপর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদ প্রথমে স্বাদেশিকতার (patriotism) রূপ ধারণ করে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির সৃষ্টি করে

স্বাদেশিকতা বলিতে বুঝায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অনুরাগের ফলে ঐ জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য জাতির সব কিছুকেই হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে। তাহারা বিশ্বাস করিতে থাকে যে তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, ভাষার মত ভাষা নাই, সাহিত্যের মত সাহিত্য নাই, সংস্কৃতির মত সংস্কৃতি নাই। এইরূপ স্বাদেশিকতাকে জাতি-পূজা (Nation-worship) আখ্যাও দেওয়া হয়। জাতি-পূজার ফলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ফলে তাহারা সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। হিটলারের অধীনে জার্মান জাতি এইরূপই করিয়াছিল।

প্রকৃত জাতীয়তাবাদ কিন্তু উদার নীতি পোষণ করে

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ধারণার আধুনিক স্রষ্টা ইতালীয় স্বদেশপ্রেমিক ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) কিন্তু জাতীয়তাবাদকে এই প্রকার বিকৃত রূপে দেখেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জাতিরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে। এই প্রতিভার বিকাশের জন্যই উহার পক্ষে স্বতন্ত্র থাকা

প্রয়োজন। স্বতন্ত্র থাকিলেও তাহারা পরস্পরের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইবে না; সাম্য স্বাধীনতা শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সমবায়ে মানবসমাজের উন্নতিবিধান করিয়া চলিবে।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করিলে দেখা দেয় সভ্যতার সংকট

সাধারণত ম্যাট্‌সিনির এই আদর্শ স্মরণ করিয়া জাতীয়তাবাদীরা পথ চলে না। মানবতার কথা ভুলিয়া গিয়া জাতীয় স্বার্থকেই ধ্রুবতারকা গণ্য করিয়া অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ"। ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে এবং দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'।

সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার জন্য শুধু ম্যাট্‌সিনি নন, যুগে যুগে দার্শনিকগণ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগি প্রসারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বারবার বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মানবতারই পূজা করিবেন। ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতেই যেমন ব্যক্তির সমৃদ্ধি—সেইরূপ জাতিও বিশ্ব জাতিসংঘের মধ্য দিয়াই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে; মানবসমাজের সমৃদ্ধিতেই জাতির সমৃদ্ধি। এই প্রসংগে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, ব্যক্তি যেমন পরিবারের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়, পরিবার যেমন গ্রামের জন্য, গ্রাম যেমন জিলার জন্য, জিলা যেমন প্রদেশ বা রাজ্যের জন্য এবং রাজ্য যেমন জাতির জন্য অনুরূপ করে—তেমনি জাতিকেও বিশ্বের জন্য, মানবসমাজের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শ

বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ও যাতায়াতের অকল্পিত সুবিধার ফলে পৃথিবী আজ অতি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। এ-পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিবার দিন আর নাই। সুতরাং মানবতার পথে, আন্তর্জাতিকতার পথেই চলিতে হইবে। বিপরীত মুখে চলিলে—অর্থাৎ, জাতিকেই দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে থাকিলে বাধিয়া উঠিবে সংঘর্ষ। এই পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের যুগে এইরূপ সংঘর্ষের ফলে সকলেরই ধ্বংস অনিবার্য।*

আন্তর্জাতিকতার আদর্শের গুরুত্ব

জাতিসংঘ (League of Nations) : আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে রূপ দিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠার দ্বারা। যাঁহারা জাতিসংঘ গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে সকল রাষ্ট্র মিলিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং যুদ্ধ বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবীতে অপার শান্তি ও অপূর্ব সমৃদ্ধি বিরাজ করিবে। আশাবাদী উদ্যোক্তাদের এই স্বপ্ন কিন্তু সফল হয় নাই —জাতিসংঘ রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

আন্তর্জাতিকতার আদর্শের রূপদানের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা: জাতিসংঘ

* "Unless we think internationally, we perish."

পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও জাতিসংঘ বিশ্বের বহু কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, পৃথিবীব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতিসংঘের উদ্ভব হইয়াছিল ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা মহত্তর যুদ্ধের ফলে ঐ একই উদ্দেশ্যে উদ্ভব হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যুদ্ধবিহীন করিবার উদ্দেশ্যে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকাকালীনই মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রসমূহ এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা আলাপ-আলোচনা, সভা ও সম্মেলনের পর ১৯৪৫ সালের জুন মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধান (U. N. Charter) গৃহীত হয়।

উদ্দেশ্য : সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ দৃঢ়সংকল্প। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ, শান্তি-ভংগকারী রাষ্ট্রকে সকলে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দিবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করিবে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা। সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা রক্ষার দ্বারা এই শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া ইহাকে 'সামগ্রিক নিরাপত্তা' (collective security) বলে। অতএব, বলিতে পারা যায় যে সামগ্রিক নিরাপত্তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক লক্ষ্য। চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা।

প্রাথমিক ও চূড়ান্ত লক্ষ্য

সংবিধানে আরও কয়েকটি গৌণ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে—যথা, রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা ; মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা ; জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা ; এবং পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা।

গৌণ উদ্দেশ্য

যে-সকল গৌণ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইল, আপাতদৃষ্টিতে তাহারা গৌণ হইলেও কার্যত তাহারা চরম লক্ষ্য বা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, পরাধীন জাতি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না পাইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের কল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া, মানুষের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া এবং সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়া এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। এই পৃথিবীতে জাতি থাকিলেও জাতি নাই, রাষ্ট্র থাকিলেও রাষ্ট্র নাই। সকল জাতি ও রাষ্ট্র সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ ; সমগ্র মানবজাতি যেন এক পরিবার। এ এক নূতন পৃথিবী !

গৌণ উদ্দেশ্যগুলি চরম লক্ষ্যের সহিত সম্পর্কিত

গঠন : জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে যে-সকল মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য। ভারতবর্ষও অন্যতম মূল সদস্য। স্বাধীনতার পর ভারত মূল সদস্যপদে আসীন রহিল। পাকিস্তান নূতন সদস্য হিসাবে জাতিপুঞ্জে গৃহীত হইল। মূল সদস্যগণ ব্যতিরেকে যে-কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালও ইহার সদস্য। বর্তমান (অক্টোবর, ১৯৬২) সদস্যসংখ্যা ১০৯ ।*

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহা নানা বিভাগে বিভক্ত। নিম্নলিখিত-গুলিই ইহার প্রধান বিভাগ।

সাধারণ সভা (General Assembly) : ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্র লইয়াই গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের মাত্র একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা আছে,যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রই পাঁচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে পারে। সভা সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। ইহা যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদকে সুপারিশও করিতে পারে। সভায় জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টের সমালোচনা করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council) : নিরাপত্তা পরিষদই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রকৃত ভার ইহার উপর ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক শান্তিভংগ হইল কি না, শান্তিভংগের আশংকা আছে কি না এবং শান্তিভংগ হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে প্রভৃতি সমস্তই নির্ধারণ করে এই পরিষদ। শান্তিভংগ হইলে পরিষদ নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। প্রথমত, ইহা সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে শান্তিবিপন্নকারী দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক

নিরাপত্তা পরিষদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

* ১০৭-তম ও ১০৮-তম সদস্য হইল বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার দেশ ভূতপূর্ব ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জ্যামাইকা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ; ১০৯-তম সদস্য হইল আলজেরিয়া। জ্যামাইকা এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং আলজেরিয়া অক্টোবর মাসে সদস্যপদ পায়।

সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট না হইলে পরিষদ বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাহায্য লইয়া বলপ্রয়োগ করিতে পারে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ এইরূপ বলপ্রয়োগই করিয়াছিল এবং কংগোতে এইরূপ বলপ্রয়োগই করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্বশান্তির রক্ষক বা অভিভাবক বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহা 'স্বস্তি পরিষদ' নামেও খ্যাত।

নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। ছয়জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কোন অস্থায়ী সদস্যকে পুনর্নির্বাচিত করা হয় না।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) : ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার বিভাগ। এই বিচারালয় ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন। জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) : ইহা সাধারণ পরিষদ দ্বারা মনোনীত ১৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। ঐ সকল উদ্দেশ্যে এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন মানবহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (ILO); খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (FAO); আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (UNESCO); আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF); বিশ্বব্যাংক (World Bank) * ; বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (WHO); আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (ITO) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়া ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবহিতের জন্য অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছে। এই কমিশনগুলির মধ্যে 'মানুষের অধিকারের উপর কমিশন'ই (Commission on Human Rights) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিশনের ফলে ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিশ্বজনীন-ভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করিয়াছে। অর্ধোন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ১৯৪৮ সালে একটি অর্থভাণ্ডারও (Development Fund) গঠন করা হইয়াছে।

এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি মানব-হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে

* ইহার পুরা নাম হইল International Bank for Reconstruction and Development. এইজন্য ইহাকে সংক্ষেপে IBRDও বলা হয়।

অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council)ঃ স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছে। এই তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করে অভিভাবক পরিষদ। এই পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণও আছেন।

উপরি-উক্ত বিভাগগুলি ছাড়া জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তর আছে। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক বা প্রধান কর্মসচিবই (Secretary-General) হইলেন প্রধান কর্মকর্তা। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্যকাল শেষ হইলে পুনর্নিযুক্তও হইতে পারেন।

যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। বিরাট আয়োজন ও সংগঠন সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ছায়া মোটেই দূরীভূত হয় নাই; মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইলেও তাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পরাধীন জাতিসমূহ এখনও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় নাই। এই সকল কারণে অনেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য সত্য যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ কিছু কিছু কার্য করিয়াছে; কিন্তু তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তুলনায় একরূপ নগণ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

এই অবস্থায় জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ইংগিত দেওয়া কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ বিফল হইলে মানবজাতির পক্ষে ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা আমাদিগকে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। দার্শনিকগণ বলেন, সাধারণ মানুষকেই এই কার্য সুরু করিতে হইবে। সাধারণ লোকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রনেতাগণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। সভ্যতার সংকট তখন দূর হইবে।

কিন্তু সাধারণ মানুষকেই ইহা সফল করিয়া তুলিতে হইবে

ভারত ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (India and United Nations): পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম মূল সদস্য। অবশ্য পরাধীন অবস্থাতেই ভারত এই সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতার পর ভারত তাহার সদস্যপদের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয় এবং আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ধারা সংবিধানে নিবদ্ধ করে। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা,

জাতিপুঞ্জে ভারতের ভূমিকা সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি দ্বারা নির্দিষ্ট

জাতিতে জাতিতে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধাবৃদ্ধি এবং সালিসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের জন্য ভারত-রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।* সংবিধানের এই নির্দেশমূলক নীতি অনুসারেই ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সার্থক করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

প্রথমত, ভারত সকল ক্ষেত্রেই জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের নির্দেশানুসারে কোরিয়া কংগো প্রভৃতিতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে, জাতিপুঞ্জের নিরস্ত্রিকরণের প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছে, আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছে। পরাধীন জাতিসমূহ যাহাতে সত্বর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাহাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয় তাহার জন্য ভারত সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। যাহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রকৃত বিশ্বজনীন রূপ গ্রহণ করে, তাহার জন্য ভারত নূতন নূতন রাষ্ট্রকে সদস্যপদ প্রদানের প্রস্তাব হয় আনয়ন করিয়াছে, না-হয় ঐরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। নয়া চীন যাহাতে সদস্যপদ পাইতে পারে তাহার জন্য ভারত বিশেষ প্রচেষ্টা করিয়াছে। অপরদিকে চৈনিক জাতির প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয়তাবাদী চীন যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য থাকিতে পারে না, তাহাও ভারত বারবার নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সার্থককরণে ভারতের এই যে প্রচেষ্টা তাহা অন্যান্য রাষ্ট্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। ভারতের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ভারত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য বা সভাপতির পদ অধিকার করিয়াছিল বা অধিকার করিয়া আছে।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ অন্যতম সক্রিয় আন্তর্জাতিক শক্তি। জাতির মধ্যে যে ভাব বর্তমান থাকে তাহাকেই জাতীয়তাবাদ বলে। জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনসমাজ। এইরূপ জনসমাজ নানা কারণে গড়িয়া উঠে। পরাধীন জাতির মধ্যে 'ঐক্যভাব' বা 'জাতীয়তাবাদ' জাগ্রত হইলে ঐ জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে। অনেকে বলেন, এই দাবি মানিয়া লওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন যে এই দাবির শেষ নাই—সুতরাং ইহাকে মানিয়া লইবার বেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে সকল সমস্যার যে সমাধান হয় না ভারতই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা: স্বাধীন জাতির জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা প্রথমে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া পরে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ এবং বর্তমানের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন এইভাবে আন্তর্জাতিক আদর্শকে রূপদানের প্রচেষ্টারই ফল।

---

* ভারতের শাসন-ব্যবস্থার পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হয়। সামগ্রিক নিরাপত্তাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা, মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা, জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদিও ইহার লক্ষ্য।

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহা নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত : ১। সাধারণ সভা ; ২। নিরাপত্তা পরিষদ ; ৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয় ; ৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ; ৫। অভিভাবক পরিষদ। ইহা ছাড়া একটি কর্মদপ্তরও আছে। প্রধান কর্মসচিব বা সাধারণ সম্পাদকের অধীনে দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলে মানবজাতির সম্মুখে ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং আমাদিগকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগি পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে' সফল করিয়া তুলিতেই হইবে।

ভারত ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম মূল সদস্য। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি অনুসারে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রসারে ভারত এই সদস্যপদ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ভারতের এই ভূমিকা অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by 'Nation' and 'Nationalism'? Illustrate your answer. (C. U. 1952)

'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ' বলিতে কি বুঝ ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [৯৯-১০১ পৃষ্ঠা]

2. Explain the theory : "One Nation, One State." Would you accept it? State your reasons fully. (C. U. 1962)

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—এই নীতির ব্যাখ্যা কর। ইহা কি গ্রহণযোগ্য ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত : জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—অর্থাৎ, একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের পর্যালোচনা করিতে হইবে।...১০১-১০৩ পৃষ্ঠা।]

3. Define the term 'Nation' and distinguish it from State. Is India a Nation? (H. S. (H) Comp. 1962)

জাতির সংজ্ঞা এবং জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভারত কি একটি জাতি ?

[ইংগিত : ভারত অবশ্যই জাতি বলিয়া গণ্য। ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষা ধর্ম আচার-ব্যবহারের পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যবোধ আছে ; ইহার উপর আছে রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা ভারত-রাষ্ট্র। অতএব, ভারত যে একটি জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই।......এবং ৯৯-১০১ পৃষ্ঠা।]

4. Discuss the case for and against the Right of Self-determination as a principle of organisation of States. (H. S. (H) 1962)

রাষ্ট্রসমূহের সংগঠনের নীতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা কর।

[২নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।]

5. State the principal aims and objectives of the United Nations. Give a brief outline of its organisation. (H. S. (H) Comp. 1962)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। উহার গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[১০৫-১০৮ পৃষ্ঠা]

6. Write a short note on the functions and importance of the United Nations. (C. U. 1961)

সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের কার্যাবলী ও গুরুত্বের উপর একটি টীকা রচনা কর। [১০৫-১০৬ এবং ১০৮ পৃষ্ঠা]

7. Briefly describe the role that India has been playing in the sphere of the United Nations.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষেত্রে ভারত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা]

দশম শ্রেণী

নবম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

পৌরবিজ্ঞানে সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করা হয়। এ-পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল; এখন ইহাদের সভ্য নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

নাগরিক (Citizen): নাগরিক সম্বন্ধে ধারণা প্রাচীন গ্রীস হইতে সুরু করিয়া অনেক স্তর পার হইয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। শব্দগত অর্থ ধরিলে নাগরিক হইল নগরবাসী। ইহার কারণ প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র (City States)। সুতরাং যাহারা নগর-রাষ্ট্রের সভ্য ছিল তাহাদেরই 'নাগরিক' বলা হইত। কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগের ধারণা এবং প্রাচীন গ্রীসের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে নগর ও রাষ্ট্র অভিন্ন থাকিলেও নগরের সকল অধিবাসীই নাগরিক-অধিকার ভোগ করিত না। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে নগর-রাষ্ট্রের শাসন-কার্য পরিচালনা করিত মাত্র তাহারাই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রত্যেক গ্রীক নাগরিকই একাধারে ছিল সৈন্য এবং বিচারকার্য ও শাসন-পরিচালনাকারী সংস্থার সদস্য। তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের মতে, যাহারা শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মাত্র তাহারাই নাগরিক। এই সকল নাগরিক মাত্র শাসন-পরিচালনার কার্যেই ব্যাপৃত থাকিত, আর তাহাদের জীবনধারণের দ্রব্যাদি যোগাইত অসংখ্য ক্রীতদাস। জনসংখ্যার অধিকাংশ হইলেও শাসনকার্যে ইহাদের কোন অংশ ছিল না; সুতরাং ইহারা নাগরিক-পর্যায়ভুক্ত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টপূর্ব ৪১৩ অব্দে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে ১ লক্ষ ১৫ হাজার পুরুষের মধ্যে ৫০ হাজার ছিল ক্রীতদাস এবং এথেনীয় নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার; আর বাকী ১৫ হাজার ছিল বিদেশীয়।

শব্দগত অর্থে নাগরিক নগরবাসী মাত্র

প্রাচীনকালে নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল

রোমক সভ্যতার যুগেও নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫১ অব্দে দেখা যায় যে প্যাট্রিসিয়ান (Patricians) বা অভিজাতশ্রেণীই মাত্র নাগরিক-অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ ছিল, অন্যান্যরা নাগরিকতা পাইত না। পরে অবশ্য নাগরিক-অধিকার কেবলমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথার যুগে (Feudal Age) অধিকাংশ লোক ছিল ভূমিদাস (serfs), এবং তাহাদের কোন প্রকার নাগরিক-অধিকার ছিল না।

জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের ফলে ইহা সম্প্রসারিত হয়

তারপর সমাজ-বিবর্তনের ফলে দাসত্বপ্রথা ও সামন্তযুগের অবসান ঘটে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র প্রবর্তিত হয়। ফলে নাগরিক-অধিকার সম্প্রসারিত হয়।

আধুনিক অর্থে নাগরিক

নাগরিকের আইনগত সংজ্ঞা

বর্তমানে সাধারণত 'নাগরিক' বলিতে বুঝায় সেই সকল ব্যক্তিদের যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ফলে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলারের (Mr. Justice Miller) ভাষায় বলা যায়ঃ "নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্য। তাহারা সেই জনসমষ্টি যাহার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।"

আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকের লক্ষণ

কে বা কাহারা নাগরিক হইবে এবং কোন্ কোন্ সর্তে নাগরিক-অধিকার অর্জিত হইবে, কোন্ কোন্ কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটিবে, ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেক রাষ্ট্র আইন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জনরূপে পরিগণিত হইবার ফলে তাহারা কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় যাহা বিদেশীয়রা পায় না। এগুলিকে সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (political rights) বলা হয়। অবশ্য সকল নাগরিকের সকল সময় পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার নির্বাচনে ভোটদানে সমর্থ হয় না; এবং ২৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা যে বেআইনী বা দুর্নীতিপরায়ণ কার্যে লিপ্ত হয় তাহাকে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়। যাহা হউক, বলা যাইতে পারে যে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ হইল নাগরিকের লক্ষণ।

অধিকার দায়িত্ব বা কর্তব্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে কতকগুলি সুবিধাসুযোগ বা অধিকার ভোগ করে তেমনি আবার তাহাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকের আইনগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা অধিকারের সহিত নাগরিকের কর্তব্যের উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইলেও আধুনিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে নাগরিককে অন্যান্য কর্তব্যপালনের দ্বারাও সমাজের মংগলসাধনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। নাগরিকের এই লক্ষণ বিচার করিয়া শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নাগরিকের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন: "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্য এবং রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া পূর্ণভাবে আত্মবিকাশের জন্য সচেষ্ট এবং সমাজের সর্বাধিক মংগল সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহাকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায়।" বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ল্যাস্কিও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নাগরিকতা হইল সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য নিজের জ্ঞানসম্পন্ন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ।" সমাজের মধ্যে ব্যক্তির প্রকাশ; সমাজকে অবলম্বন করিয়াই সে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, আত্মবিকাশ ত' দূরের কথা। সমাজের কল্যাণ ব্যক্তি-কল্যাণের সূচনা করে। তাই নাগরিককে সমাজের মংগলে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার বিচারবুদ্ধি যাহাতে জ্ঞানপ্রসূত হয় তাহাও দেখিতে হইবে—কারণ, অশিক্ষিত অজ্ঞের বিচারবুদ্ধি সমাজ-কল্যাণের সহায়ক হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি সমাজের জটিল সমস্যা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না।

আধুনিক বা পূর্ণ অর্থে নাগরিক

স্বজাতীয় ও প্রজা (Nationals and Subjects): নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'স্বজাতীয়' (Nationals) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত সমতা প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ একই জাতির (Nation) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অর্থে বিভিন্ন দেশে যে ভারতীয়গণ বসবাস করে তাহাদের আমরা আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে (International Law) 'স্বজাতীয়' শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদানকারী সমস্ত ব্যক্তিকেই ঐ রাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলা হয়। কিন্তু স্বজাতীয় হইলেই যে নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে পরও ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা দেওয়া হয় নাই, যদিও তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্তমানেও তাহাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়, নাগরিক বলিয়া নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে।

'স্বজাতীয়' শব্দের দুই অর্থ

সকল স্বজাতীয় নাগরিক-মর্যাদা নাও পাইতে পারে

'প্রজা' (Subjects) শব্দটির মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অনেক লেখক আছেন যাঁহারা ভোটাধিকারী নয় এমন সমস্ত স্বজাতীয়দিগকে 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী। এই অর্থ গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের সভ্যদের দুই ভাগ করিয়া যাহারা পূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহাদের নাগরিক আখ্যা দিতে হয়, আর যাহারা ঐ অধিকার আংশিকভাবে ভোগ করে তাহাদের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কিন্তু প্রজা শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া অনেকে ইহার ব্যবহারে আপত্তি করেন। তাই গণতান্ত্রিক দেশসমূহে রাষ্ট্র-সভ্যদের 'নাগরিক' আখ্যাই দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল ভারতীয়ই ভারতের নাগরিক—কেহই ভারত-রাষ্ট্রের 'প্রজা' নহে।

'প্রজা' শব্দের অর্থ

বর্তমানে শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি

নাগরিক ও বিদেশীয় (Citizens and Aliens): নাগরিক রাষ্ট্রের আপন জন। আপন জন হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে। রাষ্ট্রও তাহাকে নাগরিক হিসাবে কতকগুলি সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে। অপরদিকে বিদেশীয় (Aliens) হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা সেই রাষ্ট্রের আপন জন। সুতরাং তাহার স্থায়ী আনুগত্য হইল নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি অস্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়, সম্পূর্ণভাবে ঐ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হয় এবং সাধারণ আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে—অর্থাৎ, বিদেশী রাষ্ট্রের আইনকানুন ভংগ করিলে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকের মত তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আবার বিদেশীয়কে নাগরিকের মতই কর প্রদান করিতে হয়। তবে নাগরিকদের মত তাহাকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করানো যায় না।

স্থায়ী আনুগত্য ও পূর্ণ অধিকারের ভোগ নাগরিকের লক্ষণ

বিদেশীয়ের আনুগত্য কিন্তু অস্থায়ী

বিদেশীয় হইলেও কতকগুলি বিষয়ে নাগরিকের মত তাহাকে অধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এই অধিকারের পরিমাণ ক্রমশই সম্প্রসারিত হইতেছে। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিদেশীয়ের অন্যতম স্বীকৃত অধিকার। অপরাপর সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রেও নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় না। আমাদের দেশে নাগরিকের জন্য সংবিধানে যে-সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিদেশীয়রা সমভাবে ভোগ করিতে পারে। যেমন, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনের

ফলে অধিকারও আংশিক

তবে ইহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে

অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি ভারতে অবস্থানকারী বিদেশীয় ভারতীয় নাগরিকের মতই ভোগ করিয়া থাকে।

কিন্তু বিদেশীয়দের সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না। এই অধিকার একমাত্র নাগরিকরাই ভোগ করিতে পারে। ভারতে একমাত্র নাগরিকরাই আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিবার অথবা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার অধিকার ভোগ করে; ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেশীয়, যেমন রুশ বা চৈনিক বা মার্কিন নাগরিক, ঐ অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ নয়।

নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া

প্রত্যেক রাষ্ট্রই আবার জনস্বার্থের প্রয়োজনে বিদেশীয়দের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত অথবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিদেশীয়ের মর্যাদা ও অধিকার সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে এখনও পার্থক্য রহিয়াছে।

বিদেশীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যাহারা বিদেশী রাষ্ট্রে

বিদেশীয়দের শ্রেণী-বিভাগ : ১। বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়

বসবাসের অভিপ্রায়ে অবস্থান করে তাহাদের বসবাসকারী বিদেশীয় (resident or domiciled aliens) আখ্যা দেওয়া হয়; আর যাহারা সাময়িকভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাহাদিগকে অ-বসবাসকারী বিদেশীয় (non-resident aliens or temporary sojourners) বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর বিদেশীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রে স্থাবর সম্পত্তি ভোগদখল করিবার অধিকার একমাত্র বসবাসকারী বিদেশীয়দেরই থাকে।

অন্য আর একভাবেও বিদেশীয়দের ভাগ করা যায়। বিদেশীয়রা মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় (friendly aliens) অথবা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy

২। মিত্রভাবাপন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়

aliens) হইতে পারে। যুদ্ধ বাধিলে শত্রুপক্ষীয় বিদেশীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়, আর যে-সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সংগ্রাম থাকে না তাহাদের নাগরিকদের মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের সহিত অপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধিলে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। অপরপক্ষে, ভারতের সহিত সংগ্রাম নাই এমন সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় থাকিবে।

এই আলোচনা প্রসংগে ভারতে কে বা কাহারা বিদেশীয় তাহা জানা প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই মনে হইতে পারে যে, ভারত ব্যতীত অপরাপর সকল রাষ্ট্রের

নাগরিকই ভারতের নিকট বিদেশীয়। এই ধারণা কিন্তু ভুল। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে-কোন রাষ্ট্রকে 'বিদেশী রাষ্ট্র নয়' বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৫০ সালে এইরূপ একটি ঘোষণার দ্বারা যুক্তরাজ্য (U.K.), কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে ভারতের নিকট 'বিদেশী রাষ্ট্র নয়' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সুতরাং এই সকল দেশের নাগরিকগণও ভারতের নিকট বিদেশীয় নয়। ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইনে* এই সকল ব্যক্তিকে 'কমনওয়েলথ্ নাগরিকে'র মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে; এবং ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে সকল নাগরিক-অধিকার প্রদান করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কমনওয়েলথের বহির্ভূত দেশগুলির নাগরিকেরা ভারতের নিকট বিদেশীয়। অপরদিকে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নাগরিক ভারতের নিকট বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত নয়।

ভারতে বিদেশীয় কাহারা

নাগরিকতা অর্জন (Acquisition of Citizenship) : প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায় : (১) জন্ম দ্বারা (by birth or descent) এবং (২) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন দ্বারা (by formal grant or conferment by the State)। যাহারা প্রথম উপায়ে নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে জন্মসূত্রে নাগরিক (natural-born citizens) এবং যাহারা রাষ্ট্রের অনুমোদন দ্বারা নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয় তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalized citizens) বলা হয়।

নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Birth) : জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের আবার দুইটি মূলনীতি আছে—রক্তের সম্পর্ক-নীতি (*Jus Sanguinis*) এবং জন্মস্থান-নীতি (*Jus Soli or Jus Loci*)। রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে শিশু যে-স্থানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে পিতামাতার নাগরিকতা পাইবে। অর্থাৎ, পিতামাতা যে-রাষ্ট্রের নাগরিক সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়মানুসারে ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে ভারতীয় নাগরিকতা পাইবে। অপরদিকে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে শিশু যে-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে—তাঁহার পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি:

১। রক্তের সম্পর্ক-নীতি

২। জন্মস্থান-নীতি

*Citizenship Act, 1955

নাগরিক হউন না কেন। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়ম অনুসারে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতের অভ্যন্তরে যে-ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। কোন জাহাজে বা বিমানে জন্ম হইলে ঐ জাহাজ বা বিমান যে-রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে পর-রাষ্ট্রদূতের ক্ষেত্রে জন্মস্থান-নীতি প্রযুক্ত হয় না। যেমন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভারতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জন্মস্থান-নীতি তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

উপরি-উক্ত দুইটি নীতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই নীতি অনুসৃত হইত। পরে রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতার* ধারণা প্রসারের সংগে জন্মস্থান-নীতিও গৃহীত হয়। যাহা হউক, পৃথিবীর সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয় না; অনেক রাষ্ট্রই উভয় নীতিকে অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারত রক্তের সম্পর্ক-নীতি ও জন্মস্থান-নীতি উভয়কে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অনুরূপভাবে ইংলণ্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি নীতিই প্রচলিত। জন্মস্থান-নীতি অনুসরণের ফলে যাহারা ইংলণ্ড কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহারা স্বভাবতই ঐ দেশের নাগরিকতা পায়; আবার বিদেশে অবস্থানকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের কোন নাগরিকের সন্তানসন্ততি হইলে সে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের নাগরিকতা অর্জন করে।

অনেক রাষ্ট্র উভয় নীতিই অনুসরণ করে

এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করার ফলে অসংগতি ও বিরোধের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকের সন্তান যদি ইংলণ্ডের সীমানার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে সে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে ইংলণ্ডের, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এইভাবে দ্বৈত নাগরিকতার (double citizenship) সমস্যা দেখা দিবে—একই ব্যক্তি দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবার অধিকারী হইবে; এবং দুই রাষ্ট্রই তাহাকে আপন নাগরিক বলিয়া দাবি করিলে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

উভয় নীতি অনুসরণের ফলে দ্বৈত নাগরিকতার উদ্ভব হয়

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে মীমাংসার ব্যবস্থাও আছে। সাধারণত এরূপ নাগরিক রাষ্ট্রের সীমানার বাহিরে থাকিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া দাবি করে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার দ্বৈত নাগরিকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাছিয়া লওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়।

দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার মীমাংসা

---

* ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতীয় আইনের এক নিয়ম অনুযায়ী কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একই সময় ভারত এবং অপর কোন দেশের নাগরিক হইলে সে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তির সাহায্যেও দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার সমাধান করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, জন্মস্থান-নীতি ও রক্তের সম্পর্ক-নীতির মধ্যে কোন্‌টি যুক্তি-সংগত? গুণাগুণ বিচার করিয়া বলা যায় যে, দুইটি নীতির কোনটিই সম্পূর্ণ-ভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। জন্মস্থান-নীতির একমাত্র গুণ হইল যে জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য দিক হইতে দেখিলে জন্মস্থান-নীতি অযৌক্তিক ও অকাম্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা এবং উহার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা নির্ধারণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত নহে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন নাগরিকের তিনটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে জন্মস্থান-নীতি অনুযায়ী ঐ তিনটি সন্তান ভিন্ন ভিন্ন তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিবে। এইরূপ অদ্ভুত অবস্থাকে কোন প্রকারে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

এই দুই নীতির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে

রক্তের সম্পর্ক-নীতি এই দিক হইতে ত্রুটিবিহীন। কিন্তু জন্মস্থান যেমন সহজেই নির্ণয় করা যায়, পিতার নাগরিকতা অনেক ক্ষেত্রে অত সহজে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে রক্তের সম্পর্ক-নীতিকেই অপেক্ষাকৃত সমীচীন এবং স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

তবে রক্তের সম্পর্ক-নীতিই অপেক্ষাকৃত সমীচীন

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Naturalisation): অনুমোদন দ্বারা বিদেশীয় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। 'অনুমোদন' (naturalisation) শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, সরকারী চাকরিতে প্রবেশ, দীর্ঘকাল বসবাস প্রভৃতি উপায়ের যে-কোনটিকে অবলম্বন করিয়া পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। মোটকথা, যে-কোন ভাবেই বিদেশীয়কে নাগরিকতা প্রদান করা হইলে ব্যাপক অর্থে তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে অনুমোদন

ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে 'অনুমোদন' শব্দটি সাধারণত সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সংকীর্ণ অর্থে 'অনুমোদন' বলিতে বুঝায় কতকগুলি

নির্দিষ্ট সর্ত পূরণ করিয়া শাসন বিভাগ বা আদালতের মাধ্যমে পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। এইভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার জন্য বিদেশীয়কে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়—তাহাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতার জন্য আবেদন করিতে হয়, এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্ত পালন করিলে তবেই আবেদন করিতে পারা যায়। এই সকল সর্তের মধ্যে 'বসবাসের সর্ত' (condition of domicile) প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত। ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী অন্তত ৪ বৎসর কাল বসবাস করিয়াছে বা অন্তত ঐ সময়ের জন্য সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছে অথবা অংশত বসবাস ও অংশত সরকারী চাকরিতে তাহার ৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ তাহাকে দিতে হইবে। বসবাসের সর্ত ব্যতীত আবেদনকারীকে অন্যান্য সর্ত পূরণ করিতে হইতে পারে। যেমন, ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে, আবেদনকারী বিদেশীয়কে প্রমাণ করিতে হইবে—প্রথমত, সে সচ্চরিত্র; দ্বিতীয়ত, নাগরিকতা প্রদত্ত হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় তাহার আছে; এবং তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার যে-কোন একটিতে সে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন।

সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন

এইপ্রকার অনুমোদন বিভিন্ন সর্তাধীন

অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (grand) বা আংশিক (partial) হইতে পারে। যে-সকল রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদন-সিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ করা হয় না, সেই সকল রাষ্ট্রে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা পূর্ণ নাগরিকতা। ভারত ও ইংলণ্ডে অনুমোদন-পদ্ধতির সাহায্যে এইরূপ পূর্ণ নাগরিকতা অর্জিত হয়। অর্থাৎ, এই দুইটি দেশে জন্ম-সূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক একই মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়। যেমন, কোন অনুমোদন-সিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারে না; একমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিকরাই ঐ দুই পদ অলংকৃত করিতে পারে। এইভাবে যেখানে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিককে সকল প্রকার অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয় না সেখানে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন অপূর্ণাংগ বা আংশিক।

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন

বলা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদন ছাড়াও বিবাহ, সম্পত্তিক্রয়, সরকারী চাকরি প্রভৃতি দ্বারাও পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া যায়। ইহার উপর ভারত, ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়ম আছে যে, অন্য কোন দেশ ঐ সকল

সমষ্টিগত অনুমোদন

রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ দেশের অধিবাসীদের নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকতা অর্জনকে অনেক সময় 'সমষ্টিগত অনুমোদনকরণ' (group naturalisation) বলা হয়।

নাগরিকতার বিলোপ (Loss or Termination of Citizenship): নাগরিকতার আবার অবসানও ঘটিতে পারে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমত, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। যেমন, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বা স্বজাতীয় হয় তাহা হইলে সে ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের মত কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয়ত, অনেক সময় আবার অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাইতে পারে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিতি, অসদুপায়ে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন, দেশদ্রোহিতা, বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি বা সম্মান গ্রহণ প্রভৃতি কারণেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতার অবসান ঘটিয়া থাকে। এইভাবে নাগরিকতার অবসান ঘটিলে ব্যক্তি নাগরিকতাহীন বা রাষ্ট্রহীন (Stateless) হইয়া পড়ে।

ক। নাগরিকতা পরিত্যাগ করা যায়

খ। এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবসান ঘটে

গ। নানা কারণে ব্যক্তি নাগরিকতা-হীনও হইতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

শব্দগত অর্থে নাগরিক বলিতে বুঝায় নগরবাসী মাত্র। প্রাচীনকালে শাসনকার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, (২) রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার, এবং (৩) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারভোগকে নাগরিকের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়।

নাগরিক-অধিকার ভোগ করে বলিয়া তাহাকে কর্তব্যও পালন করিতে হয়—কারণ, কর্তব্য অধিকারের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কর্তব্যপালনের জন্য নাগরিককে উপযুক্ত হইতে হইবে।

স্বজাতীয় ও প্রজা: নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। স্বজাতীয় বলিতে রাষ্ট্রের সকল 'আপন জন'কে বুঝায়। সুতরাং সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক নাও হইতে পারে।

অনেক সময় যাহারা পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এরূপ স্বজাতীয়দের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'প্রজা' শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া বর্তমানে ইহার ব্যবহারে অনেকে আপত্তি করেন।

নাগরিক ও বিদেশীয়ঃ নাগরিক বিদেশীয় হইতে পৃথক। নাগরিকের আনুগত্য স্থায়ী এবং তাহার অধিকার পূর্ণ—অপরদিকে বিদেশীয়ের আনুগত্য অস্থায়ী এবং অধিকারও আংশিক; নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে, বিদেশীয়ের নাই।

বিদেশীয়রা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা, (ক) বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়, (খ) শত্রুভাবাপন্ন ও মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয়।

নাগরিকতা অর্জনঃ নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি প্রধানত দুইটি—(১) জন্ম, এবং (২) অনুমোদন।

জন্ম দ্বারা আবার দুইভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়—(ক) রক্তের সম্পর্কে, এবং (খ) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া। এই নীতি দুইটি যথাক্রমে রক্তের সম্পর্ক-নীতি এবং জন্মস্থান-নীতি নামে পরিচিত। নীতি দুইটির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে; তবে রক্তের সম্পর্ক-নীতিই অধিকতর সমীচীন।

অনুমোদন দ্বারা যাহারা নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়। 'অনুমোদন' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অনুমোদন আবার পূর্ণ বা আংশিক হয়।

নাগরিকতার বিলোপঃ নাগরিকতার বিলোপ বলিতে নাগরিকতার পরিবর্তন মাত্র বুঝাইতে পারে। (১) নাগরিক স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে; (২) এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবসান ঘটে; এবং (৩) নানা কারণে ব্যক্তি নাগরিকতাহীনও হইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Citizen'. Distinguish a Citizen from an Alien.

(S. F. 1957 ; C. U. 1954, '58)

'নাগরিকে'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[১১১-১১৩ এবং ১১৪-১১৫ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between citizens and aliens. How can citizenship be acquired ?

(H. S. (C) 1962)

নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়?

[১১৪-১১৫ এবং ১১৬-১২০ পৃষ্ঠা]

3. How can citizenship be acquired and how is it lost ?

(H. S. (C) Comp. 1960)

কিভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যাইতে পারে এবং কিভাবেই উহার বিলোপ ঘটে?

[১১৬-১২০ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between : (a) Resident Aliens and Non-resident Aliens ; (b) Friendly Aliens and Enemy Aliens.

পার্থক্য নির্দেশ করঃ (ক) বসবাসকারী বিদেশীয় এবং অ-বসবাসকারী বিদেশীয়; (খ) মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় এবং শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়।

[১১৫ পৃষ্ঠা]

দশম অধ্যায়

সুনাগরিকতা
(Good Citizenship)

বর্তমান পৃথিবীর আদর্শ গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মানবসমাজ সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবন গড়িয়া তুলিতে আকাংক্ষিত। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শকে সার্থক করিতে হইলে নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি গুণ বর্তমান থাকা প্রয়োজন—কারণ, গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব নাগরিকের উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং তাহাদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের গুণাগুণ ও সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ। যে-সকল গুণ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা যে-নাগরিকের মধ্যে আছে তাহাকেই 'সুনাগরিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের

সুনাগরিক কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন হইল, সুনাগরিকতার এই অপরিহার্য লক্ষণগুলি কি কি? লর্ড ব্রাইস সুযোগ্য নাগরিকের তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সুনাগরিককে (১) বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, (২) সংযমী এবং (৩) বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে। বর্তমান সমাজ সমস্যাবহুল; এই সকল সমস্যা আবার জটিল। সুতরাং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে নাগরিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি বুঝিতে পারিবে না এবং উহাদের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে না। ফলে, সে মন্দ লোক কর্তৃক ভুল পথে চালিত হইতে পারে। এইজন্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সুনাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে উক্তি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নাগরিককে ভালমন্দ, সত্যাসত্যের উপলব্ধি করিবার মত যোগ্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে। এই জ্ঞান ব্যতীত সে নিজের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবে না। সুনাগরিকতার জ্ঞানগত দিক ছাড়া নৈতিক দিকও আছে। নৈতিক দিক হইতে সুনাগরিকতার জন্য আত্মসংযম এবং সমাজচেতনা বা বিবেকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই গুণাবলীর কথা চিন্তা করিয়াই অন্যতম আধুনিক ইংরাজ লেখক বার্নস (Delisle Burns) বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিককে সমাজদরদী ও স্বাধীনচিত্ত হইতে হইবে। আত্মসংযম ব্যতীত সুষ্ঠু ও সবল সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। আত্মসংযমী ব্যক্তিই সমাজের সামাজিক কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিতে পারে, সাময়িক উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে এবং সহিষ্ণুতার সহিত অপরের মতামতের বিচার করিতে পারে। আবার বিবেক-

সুনাগরিকতার তিনটি লক্ষণ:

১। বিচারবুদ্ধি

২। আত্মসংযম, এবং
৩। বিবেক

সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা নাগরিকই সমাজের কল্যাণে নিজেকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিয়োগ করে, নাগরিক-দায়িত্ব পালন করে এবং প্রয়োজন হইলে সামাজিক স্বার্থের জন্য নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকে। সে নির্ভীক হইলেও উদ্ধত নহে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইলেও বলপূর্বক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। মোটকথা, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন নাগরিক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সমাজবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত। গণতন্ত্রের বনিয়াদ এইরূপ নাগরিক ভিন্ন গড়িয়া তোলা যায় না।

সুনাগরিক সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to Good Citizenship) ঃ সুনাগরিকতার পথে নানা প্রকারের বাধাবিঘ্ন আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনটি—যথা, (ক) নির্লিপ্ততা, (খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং (গ) দলীয় মনোভাব।

সুনাগরিকতার পথে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক :

(ক) নির্লিপ্ততা (Indolence) ঃ নির্লিপ্ততাকেই সুনাগরিকতার প্রধান অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। নির্লিপ্ততার জন্যই নাগরিক সাধারণের কার্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীন ও উৎসাহহীন হইয়া পড়ে এবং নাগরিক-কর্তব্যকে অবহেলা করিয়া চলে। সর্বসাধারণের কাজ বিশেষভাবে কাহারই কাজ নয়—এই মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া নাগরিক সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্যটুকু ভুলিয়া যায়। সে মনে করে আরও দশজন ত' আছে ; সুতরাং তাহাকে না হইলেও চলিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, সাধারণের কার্যে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা খুব কম থাকে বলিয়া নাগরিক উৎসাহহীন হইয়া এই সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে চেষ্টা করে।

ক। নির্লিপ্ততা

কিভাবে নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়

এইরূপ মনোভাবের জন্য সে নির্বাচনের সময় ভোটদান হইতে বিরত থাকে, নিজের মতামতকে সত্য জানিয়াও তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে চায় না, শত্রুর আক্রমণে দেশ বিপন্ন হইলেও দেশরক্ষাকার্যে অগ্রসর হয় না এবং অবিলম্বে খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা না থাকিলে সাধারণের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় না। নির্লিপ্ততার জন্যই আবার সে পৌরকর্তব্যকে (civic duties) এড়াইয়া চলে। অথচ সমাজ-বন্ধনের গোড়ার কথা হইল সহযোগিতা ; সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সামাজিক কল্যাণ ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ সম্ভব হয় না, আর একমাত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তির শুভবুদ্ধিপ্রসূত কর্মপ্রচেষ্টাই সমাজ-কল্যাণকে সর্বাধিক এবং সমাজজীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। সমাজজীবনকে দুর্বল রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত

নির্লিপ্ততা কিভাবে প্রকাশ পায়

নির্লিপ্ততার ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবন উভয়ই ব্যাহত হয়

করা যায় না। সমাজ পংগু ও শৃংখলিত হইয়া পড়িলে সমাজভুক্ত মানুষও পংগু ও শৃংখলিত হইতে বাধ্য। তাই কর্মজড়তা, মানসিক অবসাদ ও ব্যক্তিগত লোভ মানুষের পরম শত্রু।

কিন্তু বর্তমান সময়ে নানাবিধ কারণে নাগরিকদের মধ্যে নির্লিপ্ততা প্রসারের সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমত, গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মত প্রাচীন যুগের রাষ্ট্র আকারে ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং স্বল্প জনসংখ্যাসমন্বিত। সুতরাং নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্র আয়তনে এবং জনসংখ্যায় বৃহৎ। এই বিশাল আয়তন ও জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া মনে করে। যেমন, নির্বাচনের সময় সে মনে করে অগণিত ভোটের মধ্যে তাহার একটি ভোটের মূল্য অতি সামান্যই। এই মনোভাবের দরুন সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও কর্মবিমুখ হইয়া পড়ে।

নির্লিপ্ততার কারণ

১। বৃহদাকার রাষ্ট্র

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক দিক ছাড়া অন্যান্য দিকের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৃষ্টি অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে। যেমন, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ, শিল্প, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে মানুষ অধিক মত্ত হইয়া পড়ায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে এবং নাগরিক-কর্তব্যে অবহেলার মনোভাব অধিকাংশের মধ্যে সংক্রমিত হইতেছে।

২। নানাদিকে নাগরিকের আকর্ষণ বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশগুলিতে জীবনসংগ্রাম তীব্রতর হইয়া পড়িয়াছে। জীবনধারণের জন্য উপার্জন করিতেই মানুষের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়; অবসর তাহার হাতে সামান্যই থাকে। এই অবস্থায় ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চিন্তা বা কার্য করিবার সুযোগ অতি সামান্যই পায়।

৩। জীবনসংগ্রামের তীব্রতা

চতুর্থত, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা উভয়ই মানসিক অসাড়তা টানিয়া আনে। ভারতের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। এতদিন পর্যন্ত ভারতের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই ছিল না। পুঁথিগত বিদ্যাকে কোন রকমে মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল উহার একমাত্র সার্থকতা। ফলে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার বা জানিবার কোন আকাংক্ষাই থাকিত না বলিলেও চলে। শুধু ইহাই নয়, অধিকাংশের ভাগ্যে এ-শিক্ষাও জুটিত না। সম্প্রতি অবশ্য আমাদের দেশে শিক্ষাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজিবার চেষ্টা চলিতেছে।

৪। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা

(খ) **ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private Interest) :** নির্লিপ্ততার পরেই সুনাগরিকতার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে মানুষ অনেক সময়ই নাগরিক-কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করিতে প্রয়াস পায়। নানাভাবে এই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়—যথা, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান। অনেক সময়ই উৎকোচের বিনিময়ে ভোট ক্রয়বিক্রয় চলে। উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোটপ্রদান না করিয়া অযোগ্য প্রার্থীকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লোভে নির্বাচিত করা হয়। সরকারী দল অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়লাভের আশায় গুণাগুণ বিচার না করিয়া প্রভাবশীল ব্যক্তিদের খেতাব ও সম্মান বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার হাতে বিভিন্ন কাজের 'কণ্ট্রাক্ট' প্রদানের ক্ষমতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্যবসায়ীশ্রেণী, ঠিকাদার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এক-দিক দিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা অপেক্ষা সমাজের অধিক অহিতসাধন করে। স্বার্থের হানাহানি সমাজবন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় এবং সমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অনবরত চলিতেই থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম সমাজধর্ম, লোভ রিপু তাহার প্রধান হন্তারক।

খ। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা

কিভাবে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে

(গ) **দলীয় মনোবৃত্তি (Party Spirit) :** দলীয় মনোবৃত্তিকে সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার ইহাও বলা হয় যে, গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলপ্রথা। দলপ্রথার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে, জনমত সংগঠিত ও মূর্ত হয়, নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন ও নীতি-নির্ধারণ এবং স্বৈরাচারিতার পথকে অবরোধ করিতে পারে। তাহা হইলে সুনাগরিকতা ও দলপ্রথার মধ্যে বিরোধ কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ-সাধন করিতে চায়। এই আদর্শ হইতে যখন কোন দল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, যখন ইহা সাধারণের বৃহত্তম মংগলের পরিবর্তে দলভুক্ত মুষ্টিমেয়ের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্রে পরিণত হয় তখনই ইহা সমাজবিরোধী হইয়া সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। দলীয় সদস্যগণ দলীয় আনুগত্যের ফলে নাগরিকতার আদর্শ ভুলিয়া যায় এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে থাকে। ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, এখনও

গ। দলীয় মনোবৃত্তি

আদর্শভ্রষ্ট দলই সুনাগরিকতার অন্তরায়

এমন দল আছে যাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াইয়া আপন সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধক ছাড়া সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত অভিমতপ্রদানই সুনাগরিকতার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হইলে, উহাদের বিভিন্ন দিকের মতামত জানিতে হইবে। এক্ষেত্রে, সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সাধারণ নাগরিকদের উপর ইহাদের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং ইহারা যে-ধরনের সংবাদাদি সরবরাহ করে তাহার দ্বারাই অনেক পরিমাণে নাগরিকদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অনেক সময়ই সংবাদপত্রগুলি বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া সাধারণ নাগরিককে ভুলপথে পরিচালিত করে। এইজন্যই লর্ড ব্রাইস উক্তি করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন বিভিন্ন ঘটনাকে বিকৃত করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়া চলে।

ঘ। অন্যান্য প্রতিবন্ধক—সংবাদপত্র প্রভৃতি

কিভাবে সংবাদপত্র প্রতিবন্ধকের কার্য করিতে পারে

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটির জন্যও নাগরিকগণ অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ না পাইয়া নির্লিপ্ত হইয়া পড়ে। সংখ্যালঘু দলভুক্ত নাগরিকগণ যদি দেখে যে, কোনমতেই তাহারা আইন-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না তবে নির্বাচন প্রভৃতিতে তাহাদের কোন উৎসাহ থাকে না; রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের দ্বারা তাহারা নাগরিকের কর্তব্যও পালন করিতে পারে না।

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটি-জনিত প্রতিবন্ধকতা

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দূরিকরণের পন্থা (Measures to remove the Hindrances to Good Citizenship):

সুনাগরিকতার অন্তরায়সমূহের আলোচনার পর স্বাভাবিক-ভাবেই আলোচনা করিতে হয় যে, কিভাবে এই সকল প্রতিবন্ধককে দূর করা যায়। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন প্রতিবিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই সকল প্রতিবিধানকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—(১) শাসন-তান্ত্রিক প্রতিবিধান, এবং (২) নৈতিক প্রতিবিধান।

দুই প্রকার প্রতি-বিধান: (১) শাসন-তান্ত্রিক, (২) নৈতিক

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান: নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন প্রবর্তনের দ্বারা সুনাগরিকতার পথ সুগম করাই এই প্রকার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য। দেখা যায়, অনেক নাগরিকই নির্বাচন ব্যাপারে নির্লিপ্ত এবং ভোট-প্রদানে বিরত থাকে। এই নির্লিপ্ততা গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়। কারণ, নাগরিকগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিলে নির্বাচনের ফলা-

কলকে 'জনমতের প্রকাশ' (expression of public opinion) বলিয়া ধরা ভুল হইবে।

এইজন্য অনেকের মতে, ভোটপ্রদান বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সকল দেশের আইন অনুসারে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ভোট না দেওয়া দণ্ডনীয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত নাগরিক গড়িয়া তোলা যায় না—নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে অনুভূতি ও উৎসাহের উদ্রেক না করিতে পারিলে কোন সুফলই ফলিবে না। শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের মাধ্যমেই নাগরিকদের মধ্যে কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্ধি ও সচেতনা জাগ্রত করা সম্ভবপর হয়।

১। বাধ্যতামূলক ভোট দান

ইহা প্রকৃত প্রতিকার নহে

আবার বলা হয়, গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না, অন্যান্য সময়েও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা একদিকে যেমন সরকার জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, অপরদিকে নাগরিকগণও তেমনি সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহের মধ্যে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতির (Recall) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ল্যাস্কি প্রমুখ বহু আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্রসমূহে নির্বাচকদের সংখ্যা এত বেশী এবং সমস্যাসমূহ এত জটিল যে, গণভোট বা গণ-উদ্যোগের দ্বারা আইন নির্ধারণ করা সম্ভব বা কাম্য নয়।

২। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

অনেকে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দিহান

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের আর একটি প্রধান সমস্যা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার বিচার-বিবেচনায় সংখ্যালঘিষ্ঠগণের মতামত প্রকাশের সুযোগসুবিধা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা না করিলে স্বভাবতই সংখ্যালঘিষ্ঠগণ মনে করিবে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই এবং তাহাদের স্বার্থ অসংরক্ষিত। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতির সাহায্যে তাহারা ভোটসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসনলাভ করিতে পারে না। এমন হইতে পারে যে, তাহারা মোট নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগের সমর্থন পাইয়াও আইনসভায়

৩। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব

* ৪৯ পৃষ্ঠা।

প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য অনেক দেশে আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থার নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) ব্যবস্থা আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দল ভোটসংখ্যার অনুপাতে আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যেমন, আইনসভায় যদি ১০০টি আসন থাকে তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল মোট নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগ হইলে উহারা ২৫টি আসন অধিকার করিতে পারিবে। আমাদের দেশে রাজ্যসভার নির্বাচনে এই পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রনীতিবিদগণের মধ্যে অনেকেই এই পদ্ধতিকে সুনজরে দেখেন না—কারণ, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে একাধিক দল লইয়া 'সম্মিলিত সরকার' (coalition government) গঠিত হয়। এই ধরনের সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। সুতরাং উহা কাম্য নহে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা—সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

বর্তমানে এই পদ্ধতিকে সমর্থন করা হয় না

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ছাড়া সকল রাষ্ট্রেই দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য শাস্তি-প্রদানের ব্যবস্থা আছে—যেমন, ভারতে উৎকোচ প্রদান, ভোটদাতাদের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার, ভোটদানকেন্দ্র হইতে ব্যালট কাগজ সরানো, ইত্যাদি কার্য বেআইনী ও অসাধু আচরণের অন্তর্গত।

৪। দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নৈতিক প্রতিবিধান: সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়কে দূর করিবার জন্য শাসনযন্ত্রের উন্নতিসাধনই যথেষ্ট নয়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সমস্ত ব্যবস্থাই বিফল হইতে বাধ্য। সুতরাং আসল সমস্যা হইল মানুষের নৈতিক বা মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন। তাহা হইলেই নাগরিকদের মধ্যে সমাজবোধ, উদ্যম ও শুভবুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। ইহার জন্য চাই জনসাধারণের জন্য সুশিক্ষা—এ-শিক্ষা কেবল জীবিকার্জনেই সাহায্য করিবে না, অপরের প্রতি দরদী ও সমাজহিতের প্রতি অনুগত করিয়াও তুলিবে।

নৈতিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব

সংক্ষিপ্তসার

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের। সুনাগরিক বিচারবুদ্ধি, আত্মসংযম, বিবেক প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত হয়।

সুনাগরিকতার পথে নানা প্রতিবন্ধক আছে—যথা, ১। নির্লিপ্ততা, ২। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং ৩। দলীয় মনোভাব। তন্মধ্যে নির্লিপ্ততাই প্রধান। নির্লিপ্ততার কারণ হইল বর্তমানের বৃহদাকার রাষ্ট্র, স্থানাদিকে নাগরিকের আকর্ষণবৃদ্ধি, জীবনসংগ্রামে তীব্রতা এবং অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। ইহাদের জন্য নাগরিক সামাজিক কর্তব্য এড়াইয়া চলে।

ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের ফলে নাগরিক সমাজের ক্ষতি করে।

দলীয় মনোবৃত্তির ফলে নাগরিক জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে।

ইহা ছাড়াও সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে।

প্রতিবিধান : প্রতিবিধান প্রধানত দুই প্রকারের—১। শাসনতান্ত্রিক, এবং ২। নৈতিক।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের মধ্যে (ক) বাধ্যতামূলক ভোটপ্রদান ; (খ) গণভোট, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ; (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ; (ঘ) সমাজবিরোধী ও দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম দমন প্রভৃতি প্রধান।

নৈতিক প্রতিবিধান হইল নাগরিককে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তোলা।

প্রশ্নোত্তর

1. Define a citizen. What are the qualities of a good citizen ?

(H. S. (H) 1961)

নাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সুনাগরিকের গুণাবলী কি কি ? [১১১-১১৩ এবং ১২২-১২৩ পৃষ্ঠা]

2. What do you understand by 'Good Citizenship' ? Describe the factors that hinder it. (C. U. 1947)

'সুনাগরিকতা' বলিতে কি বুঝ ? যে যে বিষয় ইহার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে তাহা বর্ণনা কর।

[১২২-১২৬ পৃষ্ঠা]

3. What are the hindrances to Good Citizenship ? State briefly how they can be removed. (C. U. 1959 ; En. 1962)

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকগুলি কি কি ? কিভাবে উহাদের দূর করা যায় তাহা দেখাও।

[১২২-১২৬ এবং ১২৬-১২৮ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

(Rights and Duties of Citizens)

অধিকার কাহাকে বলে ? (What are Rights ?) : সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চায়—তাহার আত্মশক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। সাধারণের এই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া সুন্দর নাগরিক জীবন গড়িয়া তোলাই সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি সুযোগসুবিধার। যেমন সাধারণের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য চাই শিক্ষার সুযোগ। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এইরূপ যে-সকল সুযোগসুবিধার প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাদিগকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অধিকার বলিতে আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা বুঝায়

প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নিকট হইতে এই সকল সুযোগসুবিধা বা অধিকার

দাবি করিতে পারে; আর রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য অধিকারগুলি প্রদান করিয়া নাগরিককে সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিতে সহায়তা করা। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিতে পারি: (যে-সকল সামাজিক সুযোগসুবিধা ব্যতীত মানুষ তাহার পূর্ণ উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইতে পারে না তাহাদিগকে অধিকার বলা যায়।)

অধিকারের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, অধিকারের উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগপ্রদান।

অধিকারের বৈশিষ্ট্য:

১। অধিকার আত্ম-বিকাশে সহায়তা করে

দ্বিতীয়ত, অধিকার হইল সামাজিক সুযোগসুবিধা—অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ অধিকার ভোগ করিতে পারে, সমাজের বাহিরে নয়। সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। যেমন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের জন্য আমি দাবি করি যে অপরে আমার গতিবিধিতে বাধা দিবে না; অপরেও সেইরূপ দাবি করে যে আমি তাহাদের গতিবিধিতে বাধা দিব না। কিন্তু সমাজ-বহির্ভূত লোক কাহার উপর দাবি করিবে? এবং কেই বা তাহার দাবি মানিয়া লইবে? সুতরাং সমাজ-বহির্ভূত অধিকার বলিয়া কিছু নাই।

২। সমাজের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না

তৃতীয়ত, অধিকার চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ইহারাও পরিবর্তিত হইতেছে। অন্যভাবে বলা যায়, অধিকার স্থান কাল এবং অবস্থার আপেক্ষিক। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আদিম যুগে মানুষ যখন বনজংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন শ্রমিক-সংঘ গড়িবার অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু বর্তমান শিল্প-সভ্যতার যুগে শ্রমিক-সংঘ গঠনের অধিকার শ্রমিকদের একটি বিশেষ মূল্যবান অধিকার। আবার এক সময় ছিল যখন কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা একটি প্রধান অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইত; এখন কিন্তু সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রবর্তিত হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক

উদাহরণ

চতুর্থত, অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা হইলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সুযোগসুবিধা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলেই সমানভাবে এই সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে। যখন এইরূপ ঘটে তখনই অধিকার হইয়া উঠে ব্যক্তিগত ও

৪। অধিকার সকলের জন্য

সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক সার্থক অধিকার। এইরূপ সার্থক অধিকারের প্রচেষ্টাই গণতান্ত্রিক আদর্শ।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Rights): নানাভাবে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। আইনগত অধিকার আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—প্রধানত এই দুই প্রকারের হয়। ইহার উপর সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। নিম্নে অধিকারের এই সকল শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইল:

(১) নৈতিক ও আইনগত অধিকার (Moral and Legal Rights): সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিকেই 'নৈতিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইরূপ অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। ফলে, নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানের কোন উপায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে মাতাপিতার নৈতিক অধিকার রহিয়াছে বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের নিকট হইতে আদর-যত্ন পাইবার। এখন কোন সন্তান যদি এই কর্তব্যপালন না করে তবে মাতাপিতা আইনে তাহার প্রতিবিধান পাইতে পারেন না।

নৈতিক অধিকার সমাজের ন্যায়বোধ দ্বারা সমর্থিত

আইনগত অধিকার হইল আইনানুমোদিত পারস্পরিক দাবি। আইন দ্বারা অনুমোদিত বলিয়া রাষ্ট্র ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ইহা ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে প্রতিকার পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার আছে। কেহ অপরের জীবননাশ করিলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

আইনগত অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের আইন

আইনগত অধিকারই প্রকৃত নাগরিকের অধিকার। নৈতিক অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকে না বলিয়া নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে ইহা লইয়া বড় একটা আলোচনা করা হয় না।

(২) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights): বলা হইয়াছে যে, আইনগত অধিকারকে সাধারণত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সামাজিক অধিকার বলিতে বুঝায় সেই অধিকারগুলিকে যাহা ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুসভ্য সামাজিক জীবনযাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার, পরিবার-গঠনের অধিকার প্রভৃতি এই সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এগুলি না থাকিলে মানুষের জীবন বন্য পশুর জীবনে পরিণত হইয়া পড়িত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ।

সামাজিক অধিকার কাহাকে বলে

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কাহাকে বলে

বর্তমান যুগে নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত।

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার: দেশ ও কাল ভেদে সামাজিক অধিকারের পার্থক্য ঘটিয়া থাকিলেও কতকগুলি সামাজিক অধিকারকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে মানুষের পক্ষে সামাজিক জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। নিম্নে মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির বর্ণনা করা হইল:

(ক) জীবনের অধিকার (Right to Life): জীবনের অধিকার বলিতে বাঁচিয়া থাকার অধিকার বুঝায়। ইহা মৌলিক সামাজিক অধিকার-গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই অধিকার না থাকিলে অন্য সকল অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমাকে যদি কেহ যখন ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে এবং তাহার যদি কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমার পক্ষে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস করা অর্থহীন। এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পুলিস-বাহিনী, বিচার-ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। হব্‌সের মতে, এইভাবে জীবনরক্ষার সুযোগ লাভ করিবার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। আত্মরক্ষার অধিকার জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করাও অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty): "জীবনধারণই যথেষ্ট নয়, ধারণোপযোগী জীবনও হওয়া প্রয়োজন।" মানুষ সামাজিক জীব। সে চায় পরিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে। এইজন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন স্বাধীনতার অধিকারের। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে দুইটি অধিকার বুঝায়—যথা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবার অধিকার বা সুযোগ। এই অধিকার থাকিলেই মানুষ নিজেকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। বর্তমানে কেহই যে দাসত্বপ্রথা সমর্থন করে না, তাহার কারণ হইল দাসত্ব মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া ইহা সুন্দর এবং সার্থক জীবনেরও পরিপন্থী। স্বাধীনতার অধিকার অব্যাহত অধিকার নয়। যুদ্ধের সময়ে বা আভ্যন্তরীণ শৃংখলার প্রয়োজনে ইহা কিছুটা খর্ব করা যাইতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার বলিতে কি বুঝায়

(গ) স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Opinion): গণতন্ত্র হইল সেই শাসন-ব্যবস্থা যাহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত-গঠনের জন্য প্রয়োজন মত-প্রকাশের স্বাধীনতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের—(ক) বাক্-স্বাধীনতা, এবং (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। মৌখিক ও লিখিতভাবে

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের

স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাহাদের অধিবাসীদের দিয়াছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া মানহানিকর, দুর্নীতিমূলক, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রভৃতি কোন কিছু বলিবার বা লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময় বা জনস্বার্থের খাতিরে ইহা খর্বও করা যাইতে পারে।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): জীবনধারণের জন্য কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপরিহার্য এবং ইহা ভোগ ও অর্জনের ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজ-বন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি।" ইহার অর্থ হইল, যে-সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ-সাধন করে, সে-সমাজের বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িবে। ফলে সমাজ ভাঙনের পথে চলিবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিষয়ে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত যে, স্বোপার্জিত সম্পত্তিভোগের অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত। তবে ব্যক্তি-গত সম্পত্তির অধিকার অবাধ নয়; সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

(ঙ) চুক্তির অধিকার (Right to Contract): স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের সংগে চুক্তির অধিকার জড়িত। মানুষের যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে, তবে তাহার পক্ষে চুক্তি করিবার অধিকার থাকাও প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ন্যায্য চুক্তির অধিকার আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। একথাও অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন চুক্তির অধিকারকেই স্বীকার করে যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল। বেআইনী, দুর্নীতিমূলক অথবা সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কোন চুক্তিকে রাষ্ট্র কখনই চুক্তির মর্যাদা দেয় না।

(চ) পরিবার-গঠনের অধিকার (Right to Family): পারিবারিক জীবনযাপনের অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার। পরিবারই আদিমতম সমাজ কিনা সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও* বর্তমানে ইহা যে সমাজ-জীবনের কেন্দ্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে হয়ত' সমাজ চলিতে পারে, পারিবারিক জীবন না থাকিলে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং এই অধিকার সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

(ছ) স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Religion): বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই অধিকারটিকে মানিয়া লইয়াছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা সমাজের প্রগতির লক্ষণ। ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

---

* ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

(জ) **সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association):** সমাজে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আশা ও আকাংক্ষাকে রূপায়িত করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাংক্ষা ছাড়াও অন্যান্য আশা-আকাংক্ষাও আছে। তাই প্রয়োজন হয় অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের। মানুষের জীবন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া এই অধিকারটিকে অধিকাংশ রাষ্ট্রই মানিয়া লইয়াছে।

(ঝ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার (Right to Equality before Law): বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের চক্ষে সমানাধিকার অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অভাজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

(ঞ) ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার (Right to Preserve Distinct Language and Culture): সংখ্যালঘুদের জন্য এই অধিকারটি অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার লিখিতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

এই অধিকারটি সংখ্যালঘুদের জন্য

(ট) শিক্ষার অধিকার (Right to Education): শিক্ষা ব্যতীত মানুষ আত্মবিকাশে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেক দেশে শিক্ষার অধিকারও অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের প্রগতির সংগে সংগে সামাজিক মৌলিক অধিকারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার:

(ক) স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (Right of Residence): রাষ্ট্রের যে-কোন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার নাগরিকের আছে। বিদেশীয়ের এই অধিকার নাই।

(খ) প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার (Right to Protection while staying Abroad): নাগরিকের বিদেশে অবস্থানকালীন রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদি নাগরিক বিদেশে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের কাছে যদি কোন প্রতিকার না পায়, তবে নাগরিকের রাষ্ট্র তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) নির্বাচন করিবার বা ভোটদানের অধিকার (Right to Vote): নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। নাগরিক ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য

পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া ইহার প্রসার বিশেষ কাম্য এবং জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের উপলব্ধি হইলে তবেই শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত গণ-তান্ত্রিক রূপ ধারণ করে।

ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

এ-সম্বন্ধে অবশ্য কিছুটা মতবিরোধ আছে এবং এই কারণে ভোটদানের অধিকার সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করা হইতেছে।

(ঘ) নির্বাচিত হইবার অধিকার (Right to be Elected): গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের নির্বাচিত হইবার অধিকারও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ পদে নির্বাচিত হইবার জন্য নাগরিকের পক্ষে উপযুক্ত বয়স্ক বা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজন হয়। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচিত হইবার অধিকার সকল নাগরিকের না থাকিলেও যোগ্যতাসম্পন্ন, উপযুক্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকে।

(ঙ) সরকারী চাকরিতে অধিকার (Right to hold Public Office): অধিকাংশ রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার আছে। সরকারী চাকরি করিয়াও নাগরিক শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ-গ্রহণ করে। অনেক সময় বিদেশীয়কেও সরকারী চাকরিতে লওয়া হয়; কিন্তু বিদেশীয়ের কোন অধিকার নাই।

(চ) আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition): নাগরিকগণ আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে।

অর্থ নৈতিক অধিকার: পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নাগরিকের আইনগত অধিকার প্রধানত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—এই দুই প্রকার হইলেও, সম্প্রতি অর্থ নৈতিক অধিকার (economic rights) বিশেষ গুরুত্ব-লাভ করিয়াছে। অর্থ নৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ ও বেকারত্বের ভয়ভাবনা হইতে মুক্তি। ইহার জন্য নাগরিকের যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে, তাহার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাকে পর্যাপ্ত মজুরি দিতে হইবে, সে-যাহাতে যথেষ্ট অবকাশ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি। আধুনিক সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এই সকল অধিকার মানিয়া লওয়া হইতেছে। ইহার উপর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার অধিকারও দেওয়া হইতেছে।

অর্থনৈতিক অধিকারের স্বরূপ

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রশ্ন (The Question of Universal Adult Suffrage) : ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হইবে তাহা লইয়া মোটামুটি দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) বলে। ইহার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় :

ভোটাধিকারের ভিত্তি

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তি

গণতন্ত্র যখন জনগণেরই শাসন (rule of the people) তখন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। নতুবা গণতন্ত্র মুষ্টিমেয়ের শাসনে পরিণত হইয়া মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে। বলা যায়, গণতন্ত্রে ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

দ্বিতীয়ত, শাসননীতির ফলাফল যখন সকলকেই ভোগ করিতে হয় তখন ঐ নীতি নির্ধারণের ভার সকলের উপরই থাকা উচিত। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করে না—তাহাদের দাবি উপেক্ষিতই হইতে থাকে। সুতরাং সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয় তবে উহাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র সাম্যকে সমর্থন করে বলিয়াও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। একমাত্র বয়স ছাড়া অন্য কোন কারণে বা অজুহাতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে বৈষম্যকে সমর্থন করা হয়। ফলে গণতন্ত্রও অলীক প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয় মতবাদে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে, যোগ্যতা না থাকিলে এই অধিকার কাহাকেও দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মিলের মতে, শিক্ষাই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই ভোটদানের অধিকারী হইবার জন্য কিছুটা পড়িবার, কিছুটা লিখিবার ও কিছুটা অংক কষিবার জ্ঞান অর্জন করা চাই। একথা স্বীকার্য যে, শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নাগরিককে উন্নত স্তরে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যদি সুযোগসুবিধার অভাবে অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তাহার জন্য দায়ী হইল সমাজ-ব্যবস্থা ; এবং অশিক্ষার অজুহাতে যদি জনসাধারণকে ভোটাধিকার বা নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে

বিপক্ষে যুক্তি :

১। শিক্ষার যুক্তি

রাষ্ট্র কোন সময়ই শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণসাধনে আগ্রহান্বিত হইবে না। ইহা ছাড়া, নির্বাচনের সমস্যা বুঝিবার জন্য স্কুলকলেজে শিক্ষার্জনের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই কাম্যভাবে ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে পারে। এমনও দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষিত লোক—যেমন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তার পথে ইহার সমাধান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

আবার অনেকের মতে, শিক্ষা নহে সম্পত্তির মালিকানাই ভোটাধিকার অর্জনের মাপকাঠি হওয়া উচিত। কারণ, যাহাদের সম্পত্তি নাই দেশের প্রতি তাহাদের দরদ থাকে না এবং তাহাদের বিশেষ কর প্রদান করিতে হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সরকারী অর্থের অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়।

২। সম্পত্তির যুক্তি

সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নীতি। সামন্ততান্ত্রিক যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। বর্তমানে এই নীতিকে কেহই সমর্থন করেন না—কারণ, সম্পত্তির মালিকানার সহিত নাগরিকতার গুণের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি করিলে ধনীরাই নিজের স্বার্থে শাসনকার্য চালাইবে।

উপসংহারে বলা যায়, জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বলিলাম এইজন্য যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সমস্যা বুঝিবার বা জানিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে না। আমাদের দেশে কোন নাগরিকের একুশ বৎসর বয়স না হইলে সে ভোটাধিকার পায় না। এইভাবে সর্বত্র ভোটদানের বয়স নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া গ্রহণকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কারণ, ইহারা দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে অপারগ।

উপসংহার: বর্তমানে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen): নাগরিকের অধিকারের আলোচনার পর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়—কারণ, অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তাহা হইলে অপরকে কর্তব্যপালন করিয়া চলিতে হইবে। আবার অপরে যদি অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে আমাকে কর্তব্যপালন করিতে হইবে। যেমন, আমার যদি জীবনের

অধিকার ভোগের জন্যই কর্তব্যপালন করিতে হয়

নিরাপত্তার অধিকার থাকে তাহা হইলে অপরের কর্তব্য রহিয়াছে আমার জীবননাশ না করার। আবার অপরের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকিলে আমার কর্তব্য রহিয়াছে অপরের জীবনহানি না করার। সুতরাং কর্তব্যের তাৎপর্য, বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

কর্তব্য কাহাকে বলে? (What are Duties?): কোন কিছু করিবার অথবা না করিবার দায়িত্বকেই কর্তব্য আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রকে আনুগত্য প্রদান করিবার অথবা অপরের জীবনহানি না করিবার। আধুনিককালে নাগরিকের দায়িত্ব বা কর্তব্যের উপর অধিকারের মতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য (Legal and Moral Duties): অধিকারের মত কর্তব্যকেও দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) আইনগত কর্তব্য, এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। আইনের দ্বারা যে-সকল দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা ভংগ করিলে রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা থাকে তাহাদের আইনগত কর্তব্য বলা হয়। যেমন, আয় অনুযায়ী আয়কর দেওয়া নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। কেহ এই কর্তব্যপালন না করিলে তাহাকে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী শাস্তিপ্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে নৈতিক কর্তব্য হইল সেই সকল দায়িত্ব, যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক বোধের উপর নির্ভরশীল। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করা হইলে ব্যক্তি সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় হয় না। অর্থাৎ, তাহাকে আইন-আদালতের হস্তে শাস্তিভোগ করিতে হয় না। যেমন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু কোন সন্তান এই কর্তব্য অবহেলা করিলে বা পালন না করিলে তাহাকে আইন-নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। অবশ্য নৈতিক ও আইনগত কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ সকল দেশে এক নহে। এক দেশে যাহা নৈতিক কর্তব্য অপর দেশে তাহা আইনগত কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। যেমন, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের নির্বাচনের সময় ভোটপ্রদান করা নৈতিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বেলজিয়াম বা সুইজারল্যাণ্ডে ভোটপ্রদান করা আইনগত অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সমর্থিত

নৈতিক কর্তব্যের ভিত্তি সমাজের বিবেক

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সকল সময় সুস্পষ্ট নয়

অনেক সময় নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। যেমন, আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু ইতিহাসে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, অনেক সময় আইন অধিকাংশ লোকের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করিয়াছে, এবং ফলে কাম্য সমাজজীবনের পরিপন্থী হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য হইল এই প্রকার বিকৃত রাষ্ট্র ও বিকৃত আইনের বিরোধিতা করা। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সময় আমরা 'আইন অমান্য আন্দোলন' চালাইয়াছি। তবে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সমস্ত দিকের সম্যক বিচার-বিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত আইন ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে

নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য (Different Kinds of Duties of a Citizen) : ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রত্যেক নাগরিকের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য রহিয়াছে।

সামাজিক সংগঠনের মূল ভিত্তি ও প্রাথমিক সংস্থা হইল পরিবার। পরিবারের অংগ হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিতপালিত হয় এবং আত্ম-বিকাশের পথে অগ্রসর হয়; ইহার মধ্য দিয়াই সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে; ইহার মধ্যেই স্নেহ মমতা ভালবাসা সহযোগিতা প্রভৃতি মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। সুতরাং সুস্থ ও সবল পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের অপরিহার্য সর্ত।

ক। পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব-বন্ধনের দ্বারাই সুখী ও সুস্থ পরিবার গড়িয়া তোলা সম্ভব। পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে সন্তানসন্ততিদের লালন-পালন করার ও শিক্ষা দেওয়ার; সন্তানসন্ততিদের কর্তব্য রহিয়াছে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের ভক্তি ও মান্য করার; স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব রহিয়াছে সুখেদুঃখে এক সহযোগে ও একাত্মভাবে সংসার-ধর্ম পালন করার। ভারতীয় সমাজে পরিবার শুধু স্বামীস্ত্রী সন্তানসন্ততিদের লইয়া গঠিত নয়, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই দিক দিয়া পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের অপর সকলের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হয়। যাহা হউক, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের দ্বারাই নাগরিক কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে। যেখানে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল সেখানে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে।

নাগরিকের এই কর্তব্যই প্রাথমিক

পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই নাগরিকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে। সমাজকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে; সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই সে বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রা সম্ভব করিয়াছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণ বিকাশের যে আকাংক্ষা

খ। সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

রহিয়াছে তাহা কখনও সমাজের বাহিরে সফল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মংগল ও সমষ্টিগত মংগল অংগাংগিভাবে জড়িত। অপরের শক্তির সহিত নিজের শক্তিকে সংযুক্ত করিয়া, অপরের কল্যাণের সহিত নিজের কল্যাণের সামঞ্জস্যসাধন করিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

সমাজের প্রতি কর্তব্য কিভাবে পালন করিতে হইবে

এইজন্য প্রত্যেক নাগরিককে অপরের প্রতি দরদ ও সহযোগিতার ভাব লইয়া চলিতে হইবে। অপরের অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে। যাহারা অক্ষম, যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের কল্যাণসাধন করা তাহার নাগরিক-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ; সকল প্রকার সমাজসেবামূলক কার্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন নাগরিকের অন্যতম আদর্শ।

ভারতের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশাল ভারতের অগণিত জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করে পল্লী অঞ্চলে এবং পল্লীই ভারতের প্রাণকেন্দ্র। দুর্ভাগ্যবশত বহুদিনের অবহেলা ও শোষণের ফলে পল্লীজীবন আজ নিষ্প্রাণ। সেখানে না আছে শিক্ষা, না আছে সম্বল, না আছে স্বাস্থ্য। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে এই অবহেলিত জনগণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, সমবায় সংগঠন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি পন্থার সাহায্যে পল্লীসমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে-প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য। মোটকথা, সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। এই কর্তব্য-পালন করিয়া সামাজিক শান্তি, সামঞ্জস্য ও মংগল প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

ভারতের উদাহরণ

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতিও কতকগুলি কর্তব্যপালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনগত পালনীয় হইলেও কতকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল (ক) আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) আইন মান্য করা এবং (গ) করপ্রদান করা।

গ। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

(ক) আনুগত্য : আনুগত্য (allegiance) নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয়, তবে তাহার নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতিও অনুগত হওয়া। নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শকে মানিয়া লইয়া সর্বদা তাহার উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হইবে ; আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা

রক্ষায় সর্বদা তাহাকে সরকারী কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। এইভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়।

(খ) আইন মান্য করিয়া চলা: নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত। সুতরাং সে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলিবে। নিজে আইন মান্য করাই যথেষ্ট নয়, অপর সকলে যাহাতে মান্য করে তাহার দিকেও নাগরিককে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নাগরিককে আইন মান্য করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হইবে বলিয়া যে সকল আইনই বিনা প্রতিবাদে মান্য করিয়া চলিতে হইবে এইরূপ মতবাদ অনেকে সমর্থন করেন না। আইন যদি ব্যক্তির অধিকার হরণ করে, ইহা যদি সুষ্ঠু সমাজজীবনের পরিপন্থী হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান: রাষ্ট্র নাগরিকগণের সংগঠন; নাগরিকগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কোন সংগঠনের কার্যই অর্থ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। নাগরিকগণের সংগঠন রাষ্ট্র যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান করা। যে-ব্যক্তি কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে সে নাগরিক-মর্যাদা পাইবার অধিকারী নহে।

(ঘ) অন্যান্য কর্তব্য: উপরি-উক্ত তিনটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়া নাগরিকের আরও কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের উপর কোন কর্মভার অর্পণ করে তবে নাগরিকের তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যদি নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নাগরিকের সে-কর্ম গ্রহণ করা উচিত। যেমন, কোন বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে, আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সৎভাবে ভোট দেওয়াও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য।

6. অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties): অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। বস্তুত, মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবি থাকে। এই দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ হইল কতকগুলি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই দায়িত্বগুলিই কর্তব্য। আইনের দ্বারা অনুমোদিত হইলে ইহারা আইনগত কর্তব্যে পরিণত হয়। সুতরাং কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের কল্পনা করা যায় না। আমার অধিকারভোগ অপরের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের অধিকারভোগ আমার কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে। যেমন, রাস্তা না

অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে

খাইয়া পথ চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দেওয়া।* যাহাতে এই অধিকার অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য আমারও কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়া দেওয়া। আবার জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করিবার।

উদাহরণ

অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা সমাজ-বহির্ভূত নয়, সমাজের মধ্যেই ইহা নিহিত। সুতরাং এই সকল সামাজিক সুযোগসুবিধা এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন ব্যক্তি ও সমাজের উভয়েরই সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অসামাজিকভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকারের উদ্ভব হয় নাই। এইজন্য প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত একই সময় ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। মোটকথা, সমাজের মধ্যে থাকিয়া অধিকার ভোগ করা হয় বলিয়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজকে কিছুটা প্রতিদান দেওয়া প্রয়োজন। এইজন্যই এইরূপ উক্তি প্রচলিত আছে যে, যে-ব্যক্তি কার্য করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সমাজের উৎপাদন-কার্যে অংশগ্রহণ না করিয়া সমাজের নিকট হইতে ভোগের দাবি করিতে পারে না। আবার নাগরিকের যদি ভোটদানের অধিকার থাকে, তাহার কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এবং সমস্যাসমূহের সম্যক বিচার-বিবেচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটদান করা।

প্রত্যেকটি অধিকারের সংগে কর্তব্য সংযুক্ত আছে

অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই আইনের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না, এবং ঐ অধিকারকে আইনগতভাবে বলবৎ করিবারও উপায় থাকে না। শুধু ইহাই নয়। স্বীকৃত অধিকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত না করিলে উহার মূল্য বিশেষ থাকে না—উহা নামমাত্র অধিকার হইয়া পড়ে। আমাদের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তবেই রাষ্ট্র আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য, করপ্রদান প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য দাবি করিতে পারে। সুতরাং একদিকে অধিকারভোগের জন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যেমন কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রের কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া

ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য

এই কর্তব্যপালন করিয়া তবেই রাষ্ট্র আনুগত্য প্রভৃতি দাবি করিতে পারে

* "If I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give me reasonable room."

লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার। এই কারণেই উন্নত দেশসমূহে মৌলিক অধিকারসমূহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেশের প্রধান আদালতের উপর উহাদের সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ইহাই করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য-পালন না করিলে নাগরিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে পারে

রাষ্ট্র যদি তাহার কর্তব্যপালনে পরাংমুখ হয় তবে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ল্যাস্কি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন যে, প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু সমস্ত দিকের বিচার-বিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না করিলে আইন ও শৃংখলার পরিবর্তে অরাজকতা ও সমাজবিরোধী শক্তি প্রশ্রয় পাইবে।

সংক্ষিপ্তসার

আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধাকেই অধিকার বলা হয়। অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। অধিকার আত্মবিকাশে সহায়তা করে; ২। সমাজের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না; ৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক; ৪। অধিকার সকলের জন্য।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ: প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। নৈতিক অধিকার সমাজের ন্যায়বোধ দ্বারা সমর্থিত; আইনগত অধিকারের ভিত্তি রাষ্ট্রের আইন। দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে। ইহা ছাড়া, অর্থনৈতিক অধিকারও আছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: সামাজিক অধিকার বলিতে সেই সকল সুযোগসুবিধাকে বুঝায় যাহা সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল রাষ্ট্রের কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ।

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার: ১। জীবনের অধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। চুক্তির অধিকার, ৬। পরিবার-গঠনের অধিকার, ৭। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, এবং ৮। ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার—এই কয়টি হইল মৌলিক সামাজিক অধিকার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: ১। স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, ২। প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, ৩। ভোটাধিকার, ৪। নির্বাচিত হইবার অধিকার, ৫। সরকারী চাকরিতে অধিকার, এবং ৬। আবেদন করিবার অধিকারকে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়।

অর্থনৈতিক অধিকার: সম্প্রতি অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রশ্ন: সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার লইয়া বিশেষ মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে, সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করা উচিত। অনেকের মতে আবার উহা মাত্র যোগ্য নাগরিকদেরই দেওয়া উচিত। এই যোগ্যতার মান কি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে হয় শিক্ষা না-হয় সম্পত্তিকেই ভোটদান-যোগ্যতার মাপকাঠি করা উচিত। বর্তমানে অবশ্য এইভাবে ভোটাধিকার সংকুচিত করার নীতিকে মানিয়া লওয়া হয় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সকলের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

নাগরিকের কর্তব্য: অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। কর্তব্য হইল কিছু করিবার বা না-করিবার দায়িত্ব। কর্তব্য আইনগত ও নৈতিক উভয়ই হইতে পারে। নাগরিকের কর্তব্যের তিনটি দিক আছে—১। পরিবারের প্রতি কর্তব্য, ২। সমাজের প্রতি কর্তব্য, এবং ৩। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য প্রধানত চারি প্রকারের—১। আনুগত্য, ২। আইন মান্য করিয়া চলা, ৩। নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান, এবং ৪। অন্যান্য কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য : মানুষের সমাজবোধ হইতে উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক দাবি অধিকার ও কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হয়। প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত কর্তব্য সংযুক্ত আছে। ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য ; ব্যক্তির নিকট হইতে আনুগত্য রাষ্ট্রের অধিকার।

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the rights and duties of a Citizen in a modern State (P. U. 1961)

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১৩১-১৩৫ এবং ১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠা]

2. What is meant by the term 'Right' ? Distinguish between (a) Legal and Moral Rights, (b) Civil and Political Rights. Give illustrations. (C. U. 1953)

অধিকার কাহাকে বলে ? (ক) আইনগত ও নৈতিক অধিকার, এবং (খ) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [১২৯-১৩২ পৃষ্ঠা]

3. Define the term 'Right' of a citizen. Enumerate the principal Civil and Political Rights of a citizen. (H. S. (H) Comp. 1961)

নাগরিকের অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিকের প্রধান প্রধান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের উল্লেখ কর। [১২৯-১৩১ এবং ১৩২-১৩৫ পৃষ্ঠা]

4. Describe the Fundamental Civil Rights of a Citizen of a modern State.

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর। [১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা]

5. Write an essay on the Duties of a Citizen. (S. F. 1955)

নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ছোট একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

[ইংগিত : পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের প্রতিই নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।...(১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা)]

6. "Rights and Duties go together." Explain. (H. S. (H) 1961)

"অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত জড়িত।" ব্যাখ্যা কর। [১৩৭-১৩৮ এবং ১৪১-১৪৩ পৃষ্ঠা]

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—"Rights imply duties." Discuss.

"অধিকার বলিতে কর্তব্য বুঝায়।" আলোচনা কর।

7. Argue for and against Universal Adult Suffrage. (C. U. 1961 ; P. U. 1962 ; En. 1962)

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[১৩৪-১৩৫ এবং ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা]

8. What is meant by Adult Suffrage ? How do you justify it ? Should there be any limitation to Adult Suffrage ? (H. S. (C) 1960)

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কাহাকে বলে ? তুমি কি কি কারণে ইহা সমর্থন কর ? প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কি কোন সীমা থাকা উচিত ? [১৩৪-১৩৫ এবং ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা]

9. Explain the term 'Franchise'. What is Adult Franchise ? Do you justify it in the case of India ? (H. S. (H) Comp. 1961)

'ভোটাধিকার' শব্দটি ব্যাখ্যা কর। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার কাহাকে বলে ? ভারতের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার তুমি কি সমর্থন কর ?

[১৩৪-১৩৫, ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা এবং ভারতের শাসন ব্যবস্থার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় প্রশ্ন]

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কোন উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা এবং মানিয়া চলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে বিশৃংখলা দেখা দিবে, সামাজিক কাজকর্ম অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি সুদূর অতীতেও যখন রাষ্ট্র সরকার জেল পুলিস প্রভৃতি গড়িয়া উঠে নাই, মানুষ তখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসন মানিয়া লইয়া সহজ সরল সামাজিক জীবনযাপন করিত। মোটকথা, নিয়মকানুন ব্যতীত জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চলা সম্ভব নয়। সভা বল, সমিতি বল, মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক বল, সর্বত্রই নিয়মকানুন না থাকিলে অরাজকতা বিরাজ করিবে। সাধারণ ফুটবল খেলার কথা ধরিলে দেখা যায় যে, খেলার নিয়মকানুন না থাকিলে বা না মানিলে খেলাই হইবে না। স্কুলের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, স্কুল-পরিচালনার নিয়মকানুন না থাকিলে এবং উহাদের না মানিয়া চলিলে স্কুলের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার কথা ধরিলে দেখা যায়, যানবাহন চলাচলের নিয়মকানুন না মানিয়া চলিলে দুর্ঘটনা ও বিশৃংখলা দেখা দিবে। মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, যাহার যাহা ইচ্ছা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিলে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই থাকিবে। সুতরাং নিয়মকানুন সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য এবং উহারা সমাজজীবনের মধ্যেই নিহিত।

নিয়মকানুন সংগবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য সর্ত

কিন্তু সকল সামাজিক নিয়মকানুন আইন নয়

কিন্তু সমাজে মানুষ যে-সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলে তাহাদের প্রত্যেকটিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন আখ্যা দেওয়া হয় না। আইন বলিতে রাষ্ট্রের বিধি বুঝায়। অর্থাৎ, যে-সকল নিয়মকানুনকে রাষ্ট্র সৃষ্টি বা স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করে তাহাদিগকেই আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই আইন কেহ ভংগ করিলে রাষ্ট্র শাস্তিপ্রদান করে। পুলিস সৈন্য আদালত ও জেল এই কারণেই রাখা হয়।

যে-সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয় তাহাই আইন

আইনব্যতীত সমাজে অন্যান্য নিয়মকানুনও আছে—যথা, সামাজিক নিয়ম-কানুন, নৈতিক নিয়মকানুন, বিভিন্ন সমিতির নিয়মকানুন, ইত্যাদি। প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, ফ্যাশান প্রভৃতি হইল সামাজিক নিয়মকানুন; আর

সত্যকথন, সত্যভংগ ও প্রবঞ্চনা না করা, অপরের অনিষ্টসাধন না করা, ইত্যাদি নৈতিক নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির সংগে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান পার্থক্য হইল যে আইনভংগ করা হইলে রাষ্ট্রশক্তি শাস্তিপ্রদান করে, কিন্তু অন্যান্য নিয়মকানুন মান্য না করা হইলে রাষ্ট্রের নিকট কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। তবে রাষ্ট্রের হাতে শাস্তিভোগ না করিতে হইলেও তাহাকে সমাজের নিন্দা অথবা বিবেকের দংশন সহ্য করিতে হয় অথবা সভাসমিতি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিয়ম অনুসারে বয়ঃকনিষ্ঠ বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মান করিয়া চলিবে। কেহ যদি এ-নিয়ম ভংগ করে অপর দশজনে তাহার নিন্দা করিবে, কিন্তু আইন-আদালতে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। নৈতিক নিয়মানুসারে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা অন্যায়; কিন্তু এ-নিয়ম ভংগ করা হইলে রাষ্ট্র-প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। তবে ব্যক্তি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিলে তাহার অনুশোচনা হয়।

অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আইনের পার্থক্য

তবে একথা মনে করা ভুল হইবে যে, সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের নীতির সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল রীতিনীতি ও ন্যায়-অন্যায়ের নীতি গড়িয়া উঠে তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রণীত হয়। এক সময় আমাদের দেশে সহমরণ প্রথা বা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু আজ উহা আইনত দণ্ডনীয়।

সামাজিক রীতিনীতির সহিত আইনের সম্পর্ক

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উইলসনের (Woodrow Wilson) ভাষায় "আইন হইল মানুষের প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।"* অধ্যাপক হল্যাণ্ড (Holland) বলেন, "আইন হইল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মকানুন।"**

আইনের সংজ্ঞা

এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টই ধরা পড়ে। প্রথমত, আইন মাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে; মানুষের আভ্যন্তরীণ মনের চিন্তা বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেমন, চুরি করা আইনত দণ্ডনীয়, কেহ চুরি করিলে তাহাকে

আইনের বৈশিষ্ট্য :

* Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government.

** A law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority.

শাস্তিপ্রদান করা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি চুরির চিন্তা বা বাসনা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ধরা এবং তাহাকে বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মানুষের বাহিরের ব্যবহার বা আচরণ লইয়াই আইনের কাজ-কারবার। দ্বিতীয়ত, আইনের পিছনে থাকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তি। অর্থাৎ, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিস আদালত জেল প্রভৃতির মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করিয়া আইন মান্য করিতে বাধ্য করায়। তৃতীয়ত, যে-পর্যন্ত না রাষ্ট্র প্রচলিত রীতিনীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহা বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে সে-পর্যন্ত উহা আইন বলিয়া গণ্য হয় না।

১। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে
২। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই আইন বলবৎ করে
৩। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন নিয়মকানুনই আইনে পরিণত হয় না

আইনের উৎস (Sources of Law): আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি— যথা, প্রথা, ধর্ম, বিচারের রায়, ন্যায়বিচার, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা এবং আইন প্রণয়ন।

১। **প্রথা (Custom):** আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল প্রথা। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র আইনসভা জেল পুলিস সৈন্য প্রভৃতি ছিল না। তবুও সমাজজীবন বিশৃংখল ছিল না। মানুষ তখন প্রথার সাহায্যেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া লইত। পরিবার, গোষ্ঠী এবং উপজাতির আচার-ব্যবহারের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রথা গড়িয়া উঠে। ধর্মের ভয়েই হউক অথবা অপরের অনুসরণে বা প্রয়োজনের তাগিদেই হউক সকলে আচার-ব্যবহার বা প্রথাকে মানিয়া চলিত। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া সমাজের নেতৃবৃন্দ এই সকল প্রথার ভিত্তিতেই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানেও রাষ্ট্রের আইনকানুনের উপর প্রথার অসামান্য প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের বহু আইনই প্রথাগত আইন।

প্রথা সর্বপ্রাচীন উৎস

বর্তমানেও প্রথার গুরুত্ব রহিয়াছে

২। **ধর্ম (Religion):** প্রাচীনকালে প্রথাগত অনুশাসন ও ধর্ম এমনভাবে মিশিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইত না। প্রথাই ছিল আইন, আর আইনই ছিল ধর্ম। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া উহার স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল; এবং প্রত্যক্ষভাবে দলপতি রাজা বা পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহার নির্দেশকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। বর্তমানেও আইনের উপর ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের দেশে, হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে

ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা

বর্তমানে ধর্মের প্রভাব

ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাদের ভিত্তিতে মনু ও কোরানের বিধান বর্তমান রহিয়াছে।

৩। **বিচারের রায় (Judicial Decisions):** বিচারের রায় আইনের আর একটি উৎস। অতি প্রাচীনকালে প্রথা ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের সাহায্যে সহজেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যাইত। কিন্তু পরে যখন সমাজ জটিল রূপ ধারণ করিল তখন আর প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফলে বিচারকের আসনে আসীন দলপতি বা রাজা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচারের রায় ভবিষ্যতে বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল।

বিচারের রায় হইতে আইনের সৃষ্টি

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়। মূল আইনে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে; আইনের অর্থও সুস্পষ্ট না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের ফাঁক পূরণ করেন, আইনের অর্থও সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন। এই কার্য প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নকার্য। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিচারপতি হোম্‌স (Holmes) বলিয়াছেন, "বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করিয়া যাইবেন।"

এখনও বিচারপতিগণ আইন প্রণয়ন করেন

৪। **ন্যায়বিচার (Equity):** ন্যায়বিচার আইনের আর একটি উৎপত্তিস্থল। এই সূত্রটির প্রকৃতি বিচারের রায়ের মতই। বিচারপতির কার্য ন্যায়বিচার করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় ন্যায়বিচার করা যায় না। বর্তমান সমাজ বিশেষভাবে গতিশীল বলিয়া কোন আইন কিছুদিন ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে পর উহা সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। ধরা যাউক, দেশের আইন অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে; কিন্তু সমাজে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ জাগরিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিজস্ব ন্যায়বোধ অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, নূতন আইনেরও সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের উদাহরণে অস্পৃশ্যতা সমর্থনকারী যে-আইন বর্তমান আছে তাহার স্থলে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইন প্রবর্তিত হইতে পারে।

ন্যায়বিচারের ফলেও আইনের সৃষ্টি হয়

৫। **পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা (Scientific Commentaries):** আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক সভ্য দেশেই আইন-সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আইনজীবী ও বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইন অনেক সময় প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। পরবর্তী যুগে প্রথার পরিবর্তন ঘটিলেও আইনটি

প্রচলিত থাকে। ফলে ঐ আইন সমাজের ধ্যানধারণার সহিত অসংগত হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় আইন যে-উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বর্ণনা করেন। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আইনের উপর টীকা ও রচনা বিভিন্ন দেশের আইনের অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে মনুর টীকাই ছিল হিন্দু আইনের মূলভিত্তি। বর্তমানে অবশ্য হিন্দু সংহিতা (The Hindu Code) পাস হওয়ায় হিন্দু আইন মনুর ব্যাখ্যা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়

৬। **আইন প্রণয়ন (Legislation):** আইন প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভা কর্তৃক আইন রচনা। আধুনিক যুগে এই আইন প্রণয়নই আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আইনসভা জনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের রূপদান করে। প্রথা, ধর্মীয় নীতি, ন্যায়বোধ প্রভৃতি প্রায় সকলই আইনসভা দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হইতেছে। ফলে সমাজে অন্যান্য সূত্র হইতে উদ্ভূত আইন ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, আবার হিন্দু সংহিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হিন্দু সংহিতা, প্রথা, ধর্ম, পণ্ডিত ব্যক্তিদের টীকা প্রভৃতির ভিত্তিতে উদ্ভূত পুরাতন হিন্দু আইনকে অপ্রচলিত করিয়াছে।

বর্তমানে আইনসভা প্রণীত আইনই সর্বপ্রধান উৎস

উপসংহার: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে আইনের উৎসসমূহ সকল সময়ে একই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। প্রাচীনতম যুগে প্রথার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর ক্রমে ঐ স্থান অধিকার করে ধর্ম, বিচারের রায় ও ন্যায়বিচার। পরে সভ্যতা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আইন প্রণয়ন ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা উভয়ে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে আবার একমাত্র আইন প্রণয়নই আইনের প্রধান উৎপত্তিস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আইন ও নীতি (Law and Morality): প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না—কারণ, তখন রাষ্ট্রীয় জীবন একমাত্র নৈতিক আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইত। এই দিক দিয়াই এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে মংগলময় জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব—অর্থাৎ,

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মংগলময় জীবন গঠন করা; এবং একমাত্র এই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও এইরূপ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি লিখিয়াছেন, "নাগরিকগণ সকল অসত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হউক, রাষ্ট্রপাল নীতিপরায়ণ হইয়া দেশরক্ষা করুন, মেঘ নাগরিকগণের সুকৃতির ফলে সর্বঋতুতে বারিবর্ষণ করুক, এবং সকলে বন্ধু-স্বজন সহবাসে আনন্দ উপভোগ করুক।" আইন ও নৈতিক বিধি প্রাচীনকালে এইভাবে অভিন্ন থাকিলেও বর্তমানে উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে।

অতীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল

পরে অবশ্য উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে

প্রথমত, নীতিশাস্ত্রের পরিধি আইন অপেক্ষা ব্যাপকতর। নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের বাহিরের আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র অনুসারে শুধু যে লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় তাহাই নহে, অনিষ্টের চিন্তা করাও অনুচিত। অপরদিকে আইনের উদ্দেশ্য হইল লোকের বাহিরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বভাববশে চুরি করিলে যে-শাস্তি হয়, কয়েকদিন অনাহারে থাকিয়া চুরি করিলে তদপেক্ষা লঘু দণ্ডই হয়। উপরন্তু, আইন মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না; কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন বাহ্যিক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখা যায় যে, এরূপ অনেক কার্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া ঘোষিত হয় যাহা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে। মিথ্যা বলাকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না; কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা যতক্ষণ কাহারও ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইহা আইনের গণ্ডির মধ্যে আসে না।

১। বর্তমানে উভয়ের পরিধি এক নহে

দ্বিতীয়ত, সমাজের কল্যাণসাধন আইনের উদ্দেশ্য। এই কারণে সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াও আইন প্রণীত হয়, কিন্তু নৈতিক সূত্র রচিত হয় একমাত্র ন্যায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে যাহা বেআইনী তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। প্রেক্ষাগৃহে বা ট্রামে-বাসে ধূমপান করা বেআইনী, কিন্তু দুর্নীতিমূলক নহে।

২। উদ্দেশ্যও পৃথক

তৃতীয়ত, প্রয়োগের দিক হইতেই আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আইন প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনভংগকারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নীতি প্রযুক্ত হয় মানুষের নিজের বিবেক ও সমাজের অনুশাসন দ্বারা। ফলে নৈতিক বিধিভংগের শাস্তি হইল সম্পূর্ণ মানসিক—নিজের বিবেকের দংশন এবং লোকের 'ছি ছি' সহ্য করা।

৩। প্রয়োগের দিক হইতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে

পরিশেষে, আইন নির্দিষ্ট, কিন্তু নৈতিক সূত্র অনির্দিষ্ট। আইন কি তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায়; কিন্তু কোন্‌টি সুনীতি এবং কোন্‌টি দুর্নীতি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নৈতিক বিশ্বাস অনেকাংশে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং একজনের নিকট যাহা দুর্নীতিমূলক, অপর একজনের নিকট তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। অস্পৃশ্যতাকে অনেকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করেন, অনেকে করেন না।

৪। আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট

এইভাবে আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইলেও উভয়ের মধ্যে আজও গভীর সম্পর্ক বর্তমান আছে, এবং চিরকালই থাকিবে। আইন ও নৈতিক সূত্র উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে বাধ্য। সমাজের ন্যায়বোধ—অর্থাৎ, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইনও আবার কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। পূর্বে যে আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথার বিলোপের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই সুনীতি আহ্বানেরও অন্যতম উদাহরণ।* কিন্তু আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা সমাজের উপর চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে আইনকে বলবৎ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ লোক মদ্যপানকে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা অসম্ভব। এই কারণে অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এইজন্য আইন প্রণীত হয় নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। অবশ্য প্রচলিত নীতি যদি বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে তবে আইনের মাধ্যমে উহার পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না করিলে রাষ্ট্র কখনই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সামগ্রিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে এখনও গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে

স্বাধীনতা (Liberty): আইনের পরই স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে; অপরদিকে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আইন স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে; বরং আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি। এই কারণে স্বাধীনতার স্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

আইন স্বাধীনতার বিরোধী নহে

* ১৪৬ পৃষ্ঠা।

স্বাধীনতার স্বরূপ (Nature of Liberty) : স্বাধীনতা অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (political ideal)। এই আদর্শ যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়াছে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীকদের অনুসরণে প্রাচীনকালে স্বাধীনতা বলিতে বুঝাইত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসরণের জন্য বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি বাধাবিহীনভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকিতে পারে তবেই সে স্বাধীন। স্বাধীনতার এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে—কারণ, আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়া তাহার কার্যাবলী নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা

কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা না বুঝাইয়া এমন একটি পরিবেশকে (atmosphere) বুঝায় যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি সেইরূপ পরিবেশ রক্ষার কথা বলিতেছি যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।"*

স্বাধীনতা অধিকারের ফল

অতএব বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশের সৃষ্টি হয় অধিকারের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।**

বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বাধীনতা হইল আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। আত্মবিকাশের বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারের অস্তিত্ব থাকিলে তবেই এই পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে অধিকারভোগের উপর। আমার যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থাকে, তবেই আমার গতিবিধির স্বাধীনতা থাকিতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন অধিকার যখন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সহায়ক হয়, তখনই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।

দেখা গেল, স্বাধীনতা বলিতে বাধানিষেধ রহিত অবস্থা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না—বুঝায় অধিকারের অস্তিত্ব।† এক দিক দিয়া কিন্তু স্বাধীনতাকে

* By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.

** "Liberty is a product of rights." Laski

† Liberty implies not the absence of restraints but the presence of rights.

'নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা দ্বারা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধা বা অধিকারের উপর বাধানিষেধ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত থাকা। অর্থাৎ, যে যে অধিকার স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি করে তাহারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না; হইলে স্বাধীনতা সংকুচিত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার সীমাবদ্ধ হইলে গতিবিধির স্বাধীনতাও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না।

স্বাধীনতা বলিতে যে-অধিকার বুঝায় তাহা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে

ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতা থাকিলেই যে ব্যক্তি তাহার পূর্ণ আত্মবিকাশে সমর্থ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধার যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। বাক্-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি সরকারের সমালোচনায় বিমুখ থাকিয়া সরকারকে স্বৈরাচারী হইবার সুযোগ প্রদান করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হইয়া উঠে নিরর্থক। এইজন্যই ইংরাজ লেখক ম্যাথু আরনল্ড্ (Mathew Arnold) বলিয়াছেন, "যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না পাই তাহাতে কিছু যায় আসে না।" সুতরাং স্বাধীনতা প্রদান করা যেরূপ রাষ্ট্রের কর্তব্য, ইহার যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাও তেমনি ব্যক্তির কর্তব্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ব্যক্তির যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অধিকার থাকে তবে ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার দায়িত্ব বা কর্তব্যও তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

ব্যক্তি যদি স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারে তবেই উহা সার্থক হয়

(৮) আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty): রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তবেই স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারে। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং আইনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে আইনসংগত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলা হয়। আইনসংগত বলিয়া এরূপ স্বাধীনতা অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না, কারণ আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ—সকলের জন্য ব্যক্তির যথেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ। সকলকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই আইন দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইংরাজ লেখক বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতা আইন ও রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল

দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।" কারখানার মালিকের পক্ষে যেমন শ্রমিকের কার্যের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি শ্রমিকের পক্ষেও সে যে-কার্যে নিযুক্ত হইবে তাহার সর্তাবলী—যথা, মজুরি, কয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইবে, ইত্যাদি—নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকের এই স্বাধীনতা না থাকিলে শ্রমিক একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত হইবে, সে তাহার আত্মশক্তিকে বিকশিত কবিবার সুযোগ পাইবে না। সুতরাং মালিকের স্বাধীনতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে; শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে হইবে।

আইনসংগত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতা যখন প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় তখন ইহা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বজায় থাকে না। আইনই এই নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করে বলিয়া আইন স্বাধীনতার ভিত্তি।

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

যাঁহারা আইনকে স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতাকে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। যথেচ্ছাচারিতার ফলে কয়েকজনের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশেরই আত্মবিকাশ হয় ব্যাহত। শিল্পপতির যথেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা থাকিলে শ্রমিকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্পপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট কার্যের সর্ত মানিয়া লইতে হইবে, তাহাকে যে-কোন মজুরিতে কার্য করিতে হইবে। আবার যদি ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অব্যাহত হয় তবে এক ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্র আচরণের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐ স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। এইভাবে অব্যাহত বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ফলে দুর্বল সবলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, ব্যক্তির লোভে সমষ্টির স্বার্থহানি ঘটে।

আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় থাকে না

তাই প্রয়োজন হইল আইনের। আইন সকলের অধিকার ও আচরণের সীমা নির্দেশ করিয়া সবলের লোভের কবল হইতে দুর্বলকে রক্ষা করে। ইহার ফলে সকলের পক্ষেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই হইল সকলের আত্মবিকাশে সহায়তা করা—মাত্র কয়েকজনের নহে। সুতরাং আইনই স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় রাখে। আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ। তবে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ উহা সকলের স্বাধীনতা সংরক্ষণে সমর্থ হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, ক্রীতদাস প্রথার যুগে আইনের ফলে ক্রীতদাস-[illegible] সুবিধা হইত, ক্রীতদাসের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইত না।

আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty): এতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতার যে-রূপ লইয়া আলোচনা করা হইল তাহাকে ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা বা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। উপরন্তু, ব্যক্তির ন্যায় জাতির পক্ষেও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই শেষোক্ত স্বাধীনতাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা' বলা হয়। নিম্নে স্বাধীনতার এই সকল রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক

১। **সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty):** সমাজজীবনে ব্যক্তির পক্ষে যে-স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় তাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলা হয়। সামাজিক অধিকারগুলি (Civil Rights) ভোগের দ্বারাই এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি বুঝায়।

সামাজিক অধিকার সামাজিক স্বাধীনতার উপাদান

২। **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty):** রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। নাগরিক-জীবনে এই স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক দল-গঠনের অধিকার, সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান

৩। **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty):** সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা বুঝায় নাগরিকের পক্ষে অভাব-অনটনের ভাবনা ও সর্বদা বেকারত্বের ভয় হইতে মুক্তি এবং পর্যাপ্ত অবসর। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে প্রত্যেককে উপযুক্ত মজুরি ও পর্যাপ্ত অবসর প্রদান করিতে হইবে, বেকারত্বের ভাবনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে। অন্নচিন্তাতেই মানুষের যদি দিন কাটিয়া যায়, উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও যদি সে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিতে পারে, বেকার হইবার ভয়ে তাহাকে যদি সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় তবে তাহার নিকট মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বাচনাধিকার প্রভৃতির কোনই

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন

মূল্য থাকে না। এই কারণে সমভোগবাদীরা (Communists) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty): অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও জাতীয় স্বাধীনতা অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ-পাশ হইতে দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার মুক্তি। দেশ পরাধীন থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে আত্মবিকাশের সহায়ক অধিকারসমূহ ভোগ করা সম্ভব হয় না। মাত্র স্বাধীন দেশের লোকই পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় স্বাধীনতার—অর্থাৎ, বৈদেশিক অধীনতা হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার।

জাতীয় স্বাধীনতা অন্য প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty): আমরা দেখিয়াছি যে, রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয় সরকারের দ্বারা; সরকার আমাদের মতই সাধারণ লোক লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময় সাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতারক্ষার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার। ইহাদিগকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (safeguards) বলা হয়।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কাহাকে বলে

স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে গৃহীত হইলে উহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে। জনসাধারণ জানিতে পারে যে তাহাদের অধিকার কি কি। নির্দিষ্ট অধিকার ভংগ করা হইলে আদালতে প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আদালতের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা অন্যতম রক্ষাকবচ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকেও স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু পূর্ণ অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্ভব বা কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। তবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা হইল বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না। এ-সম্পর্কে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।*

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ—ইহা প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

* ৮৮-৮৭ পৃষ্ঠা।

'আইনের অনুশাসন'ও (Rule of Law) স্বাধীনতার একটি প্রধান রক্ষা-কবচরূপে পরিগণিত হয়। 'আইনের অনুশাসন' বলিতে মোটামুটি দুইটি জিনিস বুঝায়—(১) আইনানুসারে শাসন, এবং (২) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। অর্থাৎ, সরকার যে-সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা আইন-প্রদত্ত হইবে এবং সকলের জন্যই একই প্রকার আইন থাকিবে। সুতরাং বেআইনীভাবে কাহারও স্বাধীনতা খর্ব করা যাইবে না; এবং একই প্রকার অপরাধ করিলে সকলকে একই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত না হইলেও এইভাবে আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা হয়।

৩। আইনের অনুশাসন

তবুও বলা যায়, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। কারণ, আইন-প্রদত্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়া থাকে এবং বর্তমান দিনের ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন পক্ষপাতহীন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-সমাজে ধনী-দরিদ্র উভয়ই আছে সে-সমাজের আইনে ধনীদেরই সুবিধা হয়, দরিদ্রদের নহে।

ইহাও প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ জনপ্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং আইন-সভায় বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা সরকারের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে। এই দুই কারণে সরকার জন-স্বাধীনতা হরণ করিতে সাহসী হয় না।

৪। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাদিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিতে হইবে।* কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই সকল পদ্ধতি বিশেষ অনুসৃত হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ নাই।

৫। গণভোট, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতি

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল স্বাধীনতাকামী নাগরিক সম্প্রদায়। এইরূপ নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ থাকিবে। বিনামূল্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না—ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিক-গণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মূল্য। স্বাধীনতাকামী নাগরিক সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোনরূপে স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে অবিলম্বে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন

৬। স্বাধীনতাকামী নাগরিকগণই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ

* ৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

হইলে সেই সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জনও দেয়। এইজন্য গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles) বলিয়াছেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য" এবং "সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র"।*

ল্যাস্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও ইহার প্রকাশের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি হইল এই সকল ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলিও থাকা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

সংঘবদ্ধ জীবনের পক্ষে নিয়মকানুন অপরিহার্য। যে-সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত হয় তাহাদিগকে আইন বলে।

আইনের সংগে অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের পার্থক্য এইখানে যে আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্র-শক্তি দণ্ডপ্রদান করে, কিন্তু অন্য কোন নিয়মকানুন ভংগ করিলে রাষ্ট্র-প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না—কেবল সামাজিক অপমাননা সহ্য বা অনুশোচনা ভোগ করিতে হইতে পারে।

আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়: ১। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে; ২। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন নিয়মকানুনই আইনে পরিণত হয় না।

আইনের উৎস: আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি—(ক) প্রথা, (খ) ধর্ম, (গ) বিচারের রায়, (ঘ) ন্যায়-বিচার, (ঙ) পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা, এবং (চ) আইন প্রণয়ন।

আইন ও নীতি: অতীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল। পরে অবশ্য উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে। বর্তমানে ১। উভয়ের পরিধি এক নহে, ২। উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক, এবং ৩। প্রয়োগের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

তবুও আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রের আইন রচিত হয়; আইন আবার কুনীতিকে দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে।

স্বাধীনতা: স্বাধীনতা বলিতে যথেচ্ছাচারিতা বুঝায় না—বুঝায় আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।

যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে না পারিলে স্বাধীনতা নিরর্থক।

আইন ও স্বাধীনতা: স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইন ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ-কার্য সম্পাদন করিয়া স্বাধীনতাকে প্রকৃত বা সার্থক করিয়া তুলে। তবে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ: স্বাধীনতা প্রধানত দুই প্রকারের—ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায় বা জাতিগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জাতিগত স্বাধীনতাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। অপর সকল প্রকার স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ: স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু শাসক-বর্গ ক্ষমতার আসনে বসিয়া আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অকাম্য আইন প্রণয়ন দ্বারা এবং অন্যান্যভাবে সাধারণের স্বাধীনতা হরণে মনোযোগী হইতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ রক্ষাকবচের।

* "Eternal vigilance is the price for liberty" and "secret of liberty is courage.'

নিম্নলিখিতগুলিই স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ :

১। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ, ২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ৩। আইনের অনুশাসন, ৪। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা, ৫। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, এবং ৬। স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define Law ? What are the different sources of Law ? (C. U. 1958)

কিভাবে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? আইনের উৎস কি কি ? [১৪৬-১৪৯ পৃষ্ঠা]

2. Define Law. Indicate the connection between Law and Morality. (C. U. 1960)

আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন ও নীতির মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে দেখাও।

[১৪৬-১৪৭ এবং ১৪৯-১৫১ পৃষ্ঠা]

3. How would you define Liberty ? Distinguish between different forms of Liberty. (C.U. 1950, '57)

কিভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

[১৫২-১৫৩ এবং ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা]

4. Examine the relation between Law and Liberty. (S. F. 1959)

আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্নটি এই ভাবেও আসিতে পারে—

"Law is the condition of Liberty." Explain. (C. U. 1950, '52 ; H. S. (C) Comp. 1960)

"আইন স্বাধীনতার সর্ত।"—ব্যাখ্যা কর। [১৫১ এবং ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠা]

5. What is meant by Liberty ? How is it related to Law ? (H. S. (H) 1960, '62 ; C. U. 1962 ; P. U. 1962)

স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় ? আইনের সংগে উহার সম্পর্ক কি ? [১৫১-১৫৪ পৃষ্ঠা]

6. Define Liberty. What are its main safeguards ? (En. 1961)

স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। স্বাধীনতার প্রধান প্রধান রক্ষাকবচ কি কি ?

[১৫২-১৫৩ এবং ১৫৬-১৫৮ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রকৃত্যক

(Public Services)

রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতির ন্যায় শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণের পক্ষে সমুদয় বিষয় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না—কারণ, তাঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প। কিন্তু সরকারী কাজ হইল আকারে বিরাট, অসংখ্য এবং ক্রমবর্ধমান। উপরন্তু রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতির পদ অস্থায়ী। তাঁহারা আজ আছেন কাল নাই; শাসন সংক্রান্ত জটিল বিষয় সম্পর্কে তাঁহাদের সম্যক জ্ঞান থাকারও কথা নয়। সুতরাং প্রয়োজন হয় সংখ্যায় বহুগুণ অধিক একদল দক্ষ স্থায়ী সরকারী কর্মচারীর যাঁহারা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করিবেন, শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবেন এবং

রাষ্ট্রকৃত্যক কাহাকে বলে

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিবেন। সামগ্রিকভাবে এই সকল সরকারী কর্মচারী 'রাষ্ট্রকৃত্যক' বা 'জনপালন কৃত্যক' (civil service) নামে পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রকৃত্যকের প্রত্যেক সভ্যকে 'রাষ্ট্রভৃত্য' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : বলা হইয়াছে, রাষ্ট্রভৃত্যগণ স্থায়ী সরকারী কর্মচারী। স্থায়িত্বই রাষ্ট্রভৃত্যপদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রভৃত্যগণের পদ দলীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত নহে। যে রাষ্ট্রনৈতিক দলই শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন রাষ্ট্রভৃত্যদের নিরপেক্ষভাবে তাহারই অধীনে কার্য করিয়া যাইতে হয়। সুতরাং নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রকৃত্যকের আর একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রভৃত্যগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতনামা (anonymous) থাকেন। অর্থাৎ, শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা নাম জাহির করিতে পারেন না; সুখ্যাতি বা অখ্যাতি কোনটিই তাঁহাদের প্রাপ্য নয়। শাসনকার্য সুপরিচালিত হইলে কৃতিত্ব কর্মকর্তাদেরই প্রাপ্য; আবার সুপরিচালিত না হইলে তাহার দায়িত্ব ঐ কর্মকর্তাদেরই বহন করিতে হয়। খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইলে লোকে খাদ্যমন্ত্রীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিবে; আবার খাদ্য-পরিস্থিতি সংকটজনক অবস্থা ধারণ করিলে লোকে খাদ্যমন্ত্রীকেই দোষারোপ করিবে।

বৈশিষ্ট্য :
১। পদের স্থায়িত্ব
২। নিরপেক্ষতা
৩। অজ্ঞাতনামা থাকা

কার্যাবলী (Functions) : সংক্ষেপে রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলীর উল্লেখও করা হইয়াছে—যথা, দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করা, শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া। সুতরাং রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী প্রধানত তিন ধরনের। প্রথমত, রাষ্ট্রভৃত্যগণ দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কার্য হইল নীতি-নির্ধারণ করা। প্রয়োজনমত এইভাবে নির্ধারিত নীতি ব্যবস্থা বিভাগ দ্বারা আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রভৃত্যগণ দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এই সকল আইনকে কার্যকর করেন। দৈনন্দিন শাসন-পরিচালনা বলিতে ইহাই বুঝায়।

কার্যাবলী তিন ধরনের
১। দৈনন্দিন শাসন-কার্য পরিচালনা

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার চিরপরিবর্তনশীল। আজ এক রাষ্ট্রনৈতিক দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর একদল শাসনভার গ্রহণ করিতেছে। সরকারের এই পরিবর্তনের মধ্যে শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখেন রাষ্ট্রভৃত্যগণ। ইঁহাদের জন্যই শাসনযন্ত্র পূর্বের মতই চলিতে থাকে—বাহিরের লোক বুঝিতেও পারে না যে প্রধান কর্মকর্তাদের পরিবর্তন

২। শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা

ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে বার বার কর্মকর্তাদের পরিবর্তন সাধারণ লোকের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় নাই।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতি শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের পদ ক্ষণস্থায়ী। তাঁহারা দলীয় নেতা এবং দলীয় রাষ্ট্রনীতির ফলেই শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হন। দলীয় আবহাওয়া পরিবর্তিত হইলে তাঁহাদিগকে শাসনক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে হয়। ফলে তাঁহাদের পক্ষে শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু বর্তমানে শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যতীত উহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব। এইজন্য প্রয়োজন হয় শাসনকার্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একদল ব্যক্তির। রাষ্ট্রভৃত্যগণই এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করিয়া কর্মকর্তাদের নীতি-নির্ধারণে সহায়তা করেন।

৩। কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা

নিয়োগ-পদ্ধতি (Mode of Appointment): দেখা যাইতেছে, শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে রাষ্ট্রকৃত্যকের দক্ষতার উপর। এইজন্য রাষ্ট্রভৃত্যগণের নিয়োগ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দেখিতে হইবে যে স্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণ যেন কর্মকুশলতা, সততা প্রভৃতিতে উচ্চস্তরের মানুষ হন। সুতরাং একমাত্র গুণকেই নিয়োগের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। উপরন্তু, নিয়োগ ব্যাপারে শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কোন হাত থাকা উচিত নয়। থাকিলেও স্বজনপ্রীতি ও অনুগ্রহ বিতরণের ফলে সমগ্র শাসনযন্ত্রই দূষিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং নিয়োগ স্থায়ী নিয়মাবলী অনুসারে কোন নিরপেক্ষ কমিশনের মাধ্যমেই করা উচিত। বর্তমানে প্রত্যেক সভ্যদেশই এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রের জন্য একটি এবং প্রত্যেক রাজ্যের একটি করিয়া রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশন (Public Service Commission) আছে।* রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশন উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ, নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ, চাকরিতে বদলি ও উন্নতি, নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্ত বিষয়, পেনসন্‌ ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেয়। সরকার অবশ্য পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে লোক সরকারকে সন্দেহ করিবে এবং জনমত সরকারের বিরুদ্ধে যাইবে বলিয়া সরকার রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশনের সুপারিশকে মানিয়া চলিতেই চেষ্টা করে।

নিয়োগ-পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশন

* ভারতে বিশেষ ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি করিয়া সংযুক্ত কমিশনও থাকিতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করিবার জন্য বহুসংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। সামগ্রিকভাবে ইহারা 'রাষ্ট্রকৃত্যক' বা 'জনপালন কৃত্যক' নামে পরিচিত। ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের প্রত্যেককে 'রাষ্ট্রভৃত্য' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

বৈশিষ্ট্য : ১। পদের স্থায়িত্ব, ২। নিরপেক্ষতা এবং ৩। অজ্ঞাতনামা থাকা—রাষ্ট্রকৃত্যকের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

কার্যাবলী : রাষ্ট্রকৃত্যকের কার্যাবলী প্রধানত তিন ধরনের—১। দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা, ২। শাসনকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা, এবং ৩। কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা।

নিয়োগ-পদ্ধতি : শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেকাংশে রাষ্ট্রভৃত্যগণের দক্ষতা ও সততার উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহাদের নিয়োগ-পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ দেশে নিয়োগ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রভৃত্য কমিশনের মাধ্যমেই করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. **What are Public Services ? Indicate their characteristics and functions.**

রাষ্ট্রকৃত্যক কাহাদের বলে ? উহাদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা]

2. **What are Public Services ? What are their essential characteristics and functions ?** (H. S. (H) Comp. 1962)

রাষ্ট্রকৃত্যক কাহাদের বলে ? তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী কি কি ? [১৫৯-১৬১ পৃষ্ঠা]

3. **Write a note on 'Public Service Commission.'**

'রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশনে'র উপর একটি টীকা রচনা কর। [১৬১ পৃষ্ঠা]

4. **Explain the functions of 'Public Service Commission'.** (S. F. 1959)

'রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ-কমিশনে'র কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। [১৬১ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

গণতন্ত্রকে জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সেবক বলিয়াই গণ্য করা হয়। জনসাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য জনসাধারণের মতামত অনুসারেই তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন—নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য বা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে নহে।

গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব :

বিভিন্ন দিক হইতে এইরূপ জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইহাতে সকল নাগরিকেরই বুদ্ধিবিবেচনা ও অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্র ও সমাজের মংগলসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকায় প্রত্যেকেই তাহার ধ্যানধারণা ও আশা-আকাংক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারে। ফলে রাষ্ট্রও সাধারণের অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানিয়া তদনুযায়ী নীতি-নির্ধারণ ও আইনকানুন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয়।

১। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সকলের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী। ইহা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রত্যেকেরই সমাজকে কিছু-না-কিছু দান করিবার আছে। ফলে ইহা প্রত্যেক নাগরিকের মতামতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ইহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, ব্যক্তিরও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। অতএব, গণতন্ত্রে জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে।

২। জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনমতের ভয়ে শাসনকার্যের পরিচালকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহসী হন না। জনসাধারণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সরকারী নীতির সমালোচনার সুযোগ থাকায় শাসনকার্যের পরিচালকবর্গকে সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। কারণ, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ক্ষমতা জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণের সমর্থন হারাইলে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তাঁহাদিগকে সকল সময়ই জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং জনমত অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। অনেক সময় জনমত অনুকূলে না থাকার জন্য আইনসভা বা মন্ত্রিসভাকে নিজস্ব নীতি বা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরপক্ষে আবার জনমতের চাপে নূতন নীতি, সংস্কার বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। পশ্চিমবংগের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সহিত একমত হইয়া একবার পশ্চিমবংগ ও বিহারকে মিলাইয়া একটি রাজ্যে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। জনমতের চাপে তাঁহাদিগকে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

৩। জনমতের জন্য স্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়

গণতন্ত্রে শাসকবর্গ জনমতকে ভয় করিয়া চলেন তাহার মূলে আছে বিরোধী দলের অস্তিত্ব। গণতন্ত্রে একাধিক দল থাকায় বিরোধী দল থাকিবেই। এই বিরোধী দল বা দলসমূহই শাসকবর্গের ত্রুটিবিচ্যুতি জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া জনমতকে নিজ অনুকূলে টানিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই সরকারী দলকে সর্বদা সতর্ক ও সংযত থাকিতে হয়—শাসকবর্গকে দেখিতে হয় যেন শাসনকার্য পরিচালনায় দোষত্রুটি বা দুর্বলতা না থাকে। এইভাবে বিরোধী দলের মাধ্যমে জনমতই হইয়া দাঁড়ায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক।

৪। সরকারকে সতর্ক ও সংযত হইয়া চলিতে হয়

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

তাই গণতন্ত্রকে সুপরিচালিত করিতে হইলে, সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে জনমত গঠন ও প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বস্তুত, যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে উহার জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থার উপর। জনমত গঠন ও প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকিলে গণতন্ত্র মিথ্যায় পর্যবসিত হয়, কোনক্রমেই উহা জনগণের শাসনে (Rule of the People) পরিণত হয় না।

জনমত কাহাকে বলে ? (What is Public Opinion ?): গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, জনমত কাহাকে বলে ? এ-সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণ বা সাধারণের যে অভিমত তাহাকেই 'জনমত' আখ্যা দেওয়া হয়। অধ্যাপক লাওয়েল (Lowell) বলেন, জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সমাজস্থ সকলের অভিমত হওয়ার প্রয়োজনও হয় না। বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সকলের একমত থাকে না। লোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এরূপ প্রত্যেক বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করে বলিয়া মতামত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ফলে উহাদের মধ্যে কোন কোনটি অন্যান্যগুলি অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবলতর অভিমতগুলিকেই জনমত বলিয়া অভিহিত করা হয়।

জনমতের ধারণা সুস্পষ্ট নহে

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে প্রবলতর অভিমতই জনমত

আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত বলিয়া স্বীকৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। অধিকসংখ্যক লোকে কোন অভিমত পোষণ করিলেও তাহাদের আস্থা যদি দৃঢ় না হয় তবে উহা জনমত বলিয়া গৃহীত হয় না। বস্তুত, সমাজে যে মতানুসারে সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা সুসংবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীরই অভিমত। এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুসংগঠিত সংখ্যালঘুর সুদৃঢ় মতামতই জনমত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

এইভাবে যে-অভিমত জনমত বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা সকলের বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত না হইলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশকে উহা মানিয়া লইতে হইবে; অন্তত উহার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা চলিবে না। জনমত যখন সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করে তখনই ইহা সম্ভব হয়।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জনমতের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে পারে: গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সুদৃঢ় অভিমতই জনমত। সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক বলিয়া ইহাকে অধিকাংশ লোকে মোটামুটিভাবে মান্য করিয়া থাকে।

জনমতের সংজ্ঞা

জনমতের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহা 'জনগণের নয় এবং মতও নয়' (neither public, nor an opinion)। জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাসীন বা অজ্ঞ হয়, অথবা সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক জ্ঞান থাকে না। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অপরের অনুকরণেও বিশেষ মতামতের সমর্থন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যাহা 'জনমত' নামে পরিচিত হয়, দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা স্বার্থান্বেষীশ্রেণীর মত। অজ্ঞতা বা অনুকরণ প্রবৃত্তিবশত সাধারণে ঐ মতকেই মোটামুটি সমর্থন করিয়া উহাকে জনমতে পরিণত করে। এইরূপ হইলে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই আলোচনার সুরুতেই বলা হইয়াছে যে প্রয়োজন হইল সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থার।

জনমত গঠন ও প্রকাশের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম (Organs of Public Opinion) : জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যম হইল—(১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং (৬) আইনসভা।

১। **মুদ্রাযন্ত্র (Press) :** জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। শিক্ষাবিস্তারের সংগে সংগে সংবাদপত্র, সাময়িক-পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির পাঠসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় এবং যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা জনসাধারণের মতামতকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। সরকারও জনসাধারণের মুখপাত্র হিসাবে সংবাদপত্রের সমালোচনার ভয়ে সংযত থাকে। এইজন্য বলা হয় যে গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি স্বাধীন সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে না। অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন এবং নির্ভীকভাবে সরকারের সমালোচনার পরিবর্তে তাহারা সংবাদকে বিকৃত করে, সত্য ঘটনাকে চাপিয়া যায় এবং সরকার বা দলের সাফাই গাহিতে থাকে। ইহার কারণ হইল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায় বা দলীয় মুখপত্র হিসাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষসমর্থন বা দলীয় স্তুতিবাদ উহাদের অপরিহার্য নীতি হইয়া দাঁড়ায়।

এইজন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত মালিকানা ও দলীয় প্রভাব হইতে সংবাদপত্রগুলিকে মুক্ত করিয়া উহাদিগকে প্রকৃত জনসেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা। সাময়িকপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। উহাদিগের লেখক ও প্রকাশকদের

সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠনে মুদ্রাযন্ত্রের দায়িত্ব

পক্ষে দল ও স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া প্রকৃত জনমত গঠন ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

২। **বেতার ও চলচ্চিত্র (Radio and Cinema)**: বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদি শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের নিকট সংবাদাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়। বেতার ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের হিতাহিত করিবার শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে কাম্য জনমত গঠন ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে বেতার ও চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। দেখিতে হইবে যে উহারা যেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই গুণকীর্তন না করিতে থাকে।

বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক

৩। **শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions)**: জনমত গঠনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যকার ছাত্র হইল আগামী দিনের সক্রিয় নাগরিক, চিন্তানায়ক এবং শাসন-পরিচালক। স্কুলকলেজে ছাত্ররা যে ধ্যানধারণা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় হিটলারের অধীনে জার্মেনীর শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা গণতন্ত্রসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যবিষয়কে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অনুকূল করিতে হইবে, শিক্ষকগণকে গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ

৪। **সভাসমিতি (Platform)**: জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সভাসমিতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভাসমিতিতে মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নেতৃগণের আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে জনসাধারণও নিজেদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। আবার এই সভাসমিতির মধ্য দিয়া জনগণের মনোভাবের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এইভাবে সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়। এইজন্য বলা হয় যে সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অংগস্বরূপ।

সভাসমিতি দ্বারা কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়

৫। **রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties)**: সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম অংগ হইলে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ হইল ইহার প্রাণ। রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নিজ সপক্ষে জনমত গঠন করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ করা। ইহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক দলই সভাসমিতি আহ্বান করে, সংবাদপত্র ইত্যাদির

রাষ্ট্রনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ

মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। জনসাধারণ দলীয় আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য হইতে আপন মতামত গঠন করিতে সমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সেই মতামত প্রকাশ করে।

৬। **আইনসভা (Legislatures)ঃ** রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত জনমত গঠন ও প্রকাশের আর একটি মাধ্যম হইল আইনসভা। আইনসভা বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্ষেত্র। এখানে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করে। আইনসভায় তর্কবিতর্ক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনমত গঠনে আইনসভা সভাসমিতি অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। উপরন্তু, আইনসভাতেই জনমত প্রতিফলিত হয়। সরকারী দল ও বিরোধী দল আইনসভায় যে আলোচনা-সমালোচনা, সমর্থন ও বিরোধিতা করে তাহা জনমতের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করে।

আইনসভা জনমত গঠন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্র

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম
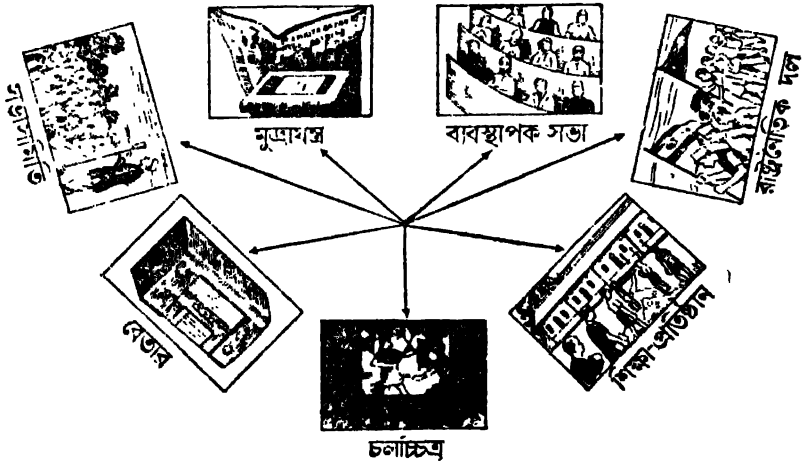
সংক্ষিপ্তসার

গণতন্ত্র জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। কিন্তু জনমত সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট নহে। তবুও বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে প্রবলতর অভিমতই জনমত। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। জনমত সকল সময় সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক হইবে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমের মধ্যে (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং (৬) আইনসভা—এই কয়টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Public Opinion? Describe the chief agencies for forming public opinion in modern times. (P. U. 1962)

জনমত বলিতে কি বুঝায়? বর্তমান দিনে জনমত গঠনের প্রধান প্রধান মাধ্যম কি কি?

[১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা]

2. What is Public Opinion? What are its principal organs?

জনমত কাহাকে বলে? উহার প্রধান প্রধান মাধ্যম কি কি? [১৬৪-১৬৭ পৃষ্ঠা]

3. Explain the nature and importance of Public Opinion in modern States. (C. U. 1960)

আধুনিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা]

4. Define 'Public Opinion' and explain how it is related to Democracy. (H. S. (C) Comp. 1961)

জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং কিভাবে উহা গণতন্ত্রের সহিত জড়িত তাহা দেখাও।

Relation between Public opinion and democracy

[৪৭, ৫৩ এবং ১৬২-১৬৪ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

(Political Parties)

তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র জনগণের শাসন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে রাষ্ট্রনৈতিক দল। এইজন্য বলা হয়, রাষ্ট্রনৈতিক দলই গণতন্ত্রের প্রাণ। দলপ্রথা ব্যতীত বর্তমানের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Representative Government) সফল হইতে পারে না—কারণ, জনসাধারণের পক্ষে সুসংগঠিত হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। লোকে রাম শ্যাম যদু হরির মধ্যে কে উপযুক্ত প্রতিনিধি হইবে তাহা সহজে নির্ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভাল সে-সম্বন্ধে সহজেই অভিমত প্রদান করিতে পারে। এখন দেখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় এবং ইহার কার্যাবলী ও গুণাগুণ কি কি?

গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? (What is a Political Party): রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে

আলোচনা করিতে হয় যে 'দল' কাহাকে বলে। কিছু সংখ্যক একমতাবলম্বী ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত হয় তখন তাহারা দল গঠন করিয়াছে বলা যায়। এই অর্থে দলের সাক্ষাৎ সর্বত্রই পাওয়া যায়—যেমন, ফুটবল খেলার দল, অস্পৃশ্যতা বিরোধী দল, ইত্যাদি।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি ঐ একই। অর্থাৎ সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা

'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন' বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণের প্রসার। রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশ্বাস করে যে তাহাদের কর্মসূচী ও কার্যপদ্ধতিই জাতীয় স্বার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল। সুতরাং তাহারা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিলেই জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে। এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া তাহারা প্রচারকার্য চালায় এবং শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া নিজ নিজ কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ লইয়া এরূপ এক জনসমষ্টি যাহা জাতীয় কল্যাণের জন্য গঠিত হইয়াছে।

এই সংজ্ঞা হইতে রাষ্ট্রনৈতিক দলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ একই মতামত ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিষ্ট দলের সভ্যগণ সাম্যবাদের নীতি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হয়। (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলই জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে। (৩) যাহাতে ইহা নিজ নীতি ও আদর্শকে কার্যকর করিতে পারে তাহার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে।

বৈশিষ্ট্য:
১। সভ্যগণ একমতাবলম্বী হয়
২। দল জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে
৩। উহা শাসনক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে

এখন প্রশ্ন উঠে, সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যখন এক তখন বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের হেতু কি? উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, পদ্ধতিগত মতভেদের দরুনই বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ, কোন্ পদ্ধতি, কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকে বলিয়াই গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু লোক হয়ত' দ্রুত সংস্কারসাধনের পক্ষপাতী, আবার কিছু লোক ধীরে ধীরে সংস্কারসাধন করিতে চায়। এ-ক্ষেত্রে দেশের দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব হইবে।

বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের কারণ

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিক-সংঘ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। নাগরিক হিসাবেই বিভিন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রনৈতিক দলে মিলিত হইয়া তাহাদের

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—যথা, ভোটাধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রভৃতি—যথাযোগ্যভাবে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। বিদেশীয়দের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনেরও কোন প্রশ্ন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন নাগরিকগণের অনন্য (exclusive) অধিকার। এই অধিকার ভোগের জন্য তাহাদের একটি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। দেখিতে হয় যে তাহাদের গঠিত দল যেন জাতীয় কল্যাণের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিক-সংঘ বলা যায়

জাতীয় কল্যাণের পরিবর্তে সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কোন দল কার্য করে তবে উহাকে 'উপদল' (Faction) আখ্যা দেওয়া হয়। উপদলের কোন উচ্চ আদর্শ থাকে না, পদ্ধতিও নীতিমূলক হয় না। উহা ন্যায়-অন্যায় যে-কোন পদ্ধতিতে হউক না কেন দলীয় সভ্যগণের স্বার্থসাধন করিতে থাকে। এইরূপ বিকৃত আদর্শের অনুসরণকারী উপদলকে 'চক্রীদল'ও (Clique or Coterie) বলা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দল 'উপদল' হইতে পৃথক

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties): আধুনিককালে সমাজের সম্মুখে অগণিত সমস্যা বিশৃংখলভাবে ছড়ানো থাকে। ইহাদের মধ্য হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণগুলিকে বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির প্রাথমিক কর্তব্য হইল এই কার্য সম্পাদন করা। তাহারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ করিয়া বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে এইগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং ইহাদেরই আশু সমাধান প্রয়োজন।

১। সমস্যা-নির্বাচন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্য

রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে। নাগরিকগণের পক্ষে সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়াই যথেষ্ট নহে, কিভাবে উহাদের সম্যক সমাধান করা যায় সে-সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিই এই ধারণার সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহারা নির্বাচিত সমস্যাগুলির ভিত্তিতে নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। এইভাবে বিভিন্ন নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে কোন্ পদ্ধতিটি সমস্যা-সমাধানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল।

২। ইহা সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে

উপরন্তু, সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থির মত হইলেও কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন সে-সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকিলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের জনসাধারণের সম্মুখে

৩। ইহা প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করে

দাঁড় করায়। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে অমুক ব্যক্তিকে সমর্থন করিলে সমস্যার সমাধান এইভাবে হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি প্রতিনিধি নির্বাচনেও সাহায্য করে। বর্তমান দিনের গণতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দলের এই কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের আরও কার্য আছে। আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি জনমতের বাহন। সভাসমিতির অনুষ্ঠান, দলীয় প্রচার প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক দল জনমতের গঠন ও প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনভার গ্রহণ করে তখন বুঝিতে পারা যায় যে ঐ দলের নীতি ও কার্যসূচী জনমত দ্বারা সমর্থিত। আবার অপর দলের দোষ-ত্রুটিও জনসমক্ষে উপস্থিত করা রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্য। নিজ দলের সপক্ষে সমর্থনলাভের প্রচেষ্টাতেই রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি এই কার্য করিয়া থাকে। এইরূপে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দলের দ্বারা জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়।

৪। ইহা জনমতের গঠন ও প্রকাশে ভূমিকা গ্রহণ করে

পরিশেষে, সমস্যা-নির্বাচন, নীতি-নির্ধারণ, প্রার্থী মনোনয়ন প্রভৃতি নিরর্থক হইয়া পড়ে যদি-না নির্বাচিত সমস্যার সমাধান এবং নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর করিবার কোন উপায় থাকে। এই উপায় হইল শাসনক্ষমতালাভ। সুতরাং শাসনক্ষমতা অধিকার করাকে রাষ্ট্রনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা সমস্যা-নির্বাচন করে, নীতি-নির্ধারণ করে, প্রার্থী দাঁড় করায় এবং প্রচারকার্য চালায়। শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে সমর্থ হইলে পর রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রতিশ্রুত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকে; আর ক্ষমতা হস্তগত করিতে না পারিলে সরকারী দলের দোষত্রুটির আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে।

৫। ইহা শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে

৬। ইহা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবেও কার্য করে

দলপ্রথার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Party System): বলা হয় যে রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত আছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহা বর্তমান দিনের জাতীয় রাষ্ট্রে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত

প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে। অগণিত সমস্যার মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির নির্বাচন, সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ এবং প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সুশৃংখল শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব করে।

গুণ: ১। দলপ্রথা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিরাট দেশে রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকিলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ, লোকে তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিত এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্ক-বিহীন প্রতিনিধিবর্গ শৃংখলাবদ্ধভাবে কোন কাজই করিতে পারিতেন না।

২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে

দ্বিতীয়ত, দলপ্রথা জনমত গঠনে ও প্রকাশে সহায়তা করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দলপ্রথা না থাকিলে জনমত কি, তাহা বুঝা যায় না বলিয়া প্রতিনিধিগণ খুশিমত কার্য করিতে পারেন। এইরূপ ঘটিলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না; উহা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার করে

তৃতীয়ত, দলপ্রথা জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার করে। দলীয় প্রচারকার্য, দলীয় সমালোচনা প্রভৃতি জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলে এবং তাহাদিগকে ভোটদানে উৎসাহিত করে।

৪। দলপ্রথা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ

চতুর্থত, দলপ্রথার সপক্ষে আরও বলা হয় যে ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে বলিয়া সমালোচনার ভয়ে প্রত্যেক দলকেই সংযত হইয়া চলিতে হয়; শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াও কোন দল স্বৈরাচারিতার পথে চলিতে পারে না। চলিলে অন্যান্য দল উহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; এবং ফলে পরবর্তী নির্বাচনে ঐ দল শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে।

৫। ইহার জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংস্কারসাধন সম্ভব হয়

পঞ্চমত, দলপ্রথা থাকিলে শান্তিশৃংখলা ভংগ না করিয়াও কাম্য সংস্কার-সাধন করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক দল জনমতকে সপক্ষে পরিচালিত করিয়া নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনের পর বিজয়ী দল নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া জনমত-অনুমোদিত সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হয়। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে যে স্বার্থের বিরোধিতা বর্তমান থাকে তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়।

৬। ইহা শাসন ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে

ষষ্ঠত, দলপ্রথাই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। আমরা দেখিয়াছি যে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কোনমতেই কাম্য নহে; এবং সুশাসনের জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। পার্লামেন্টীয় সরকারে এই সহযোগিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সেখানে মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই নিযুক্ত হন, এবং দলীয় নেতা বলিয়াই ব্যবস্থাপক সভার সমর্থনলাভ করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি বিশেষভাবে

স্বীকৃত সেখানেও দলপ্রথার জন্যই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে। আইনসভায় রাষ্ট্রপতির যে দল থাকে তাহা রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করিয়া চলে।

পরিশেষে, দলপ্রথা আবার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সহযোগিতা আনয়ন করে। ভারতে বর্তমানে একমাত্র কেরল ছাড়া সকল স্থানে একক কংগ্রেস-সরকার গঠিত হইয়াছে। কেরলেও সংযুক্ত ফ্রণ্ট (United Front) কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিয়াছে। একই দলভুক্ত বলিয়া এই সকল সরকার পরস্পরের সহিত সংযোগিতা এবং পরস্পরের সমর্থন করিয়া থাকে; ফলে সকলে একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৭। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সমন্বয়সাধন করে

এইভাবে দলপ্রথার বিশেষ গুণকীর্তন করা হইলেও উহার কতকগুলি দোষত্রুটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

প্রথমত, বলা যায়, দেশের লোকের এত বিভিন্ন মতামত থাকে যে তাহা মাত্র কয়েকটি দলের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং যে দলীয় ঐক্য দেখা যায় তাহা কৃত্রিম। অনেকে তাহাদের মনোমত দলের সন্ধান না পাইয়া বিশেষ একটি দলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হয়।

ত্রুটি: ১। বলা হয় দলীয় ঐক্য কৃত্রিম

দ্বিতীয়ত, দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশসাধন করে। একবার দলভুক্ত হইলে ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ব মতামতকে চাপা দিয়াও দলীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে সমথন করিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে।

২। দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে

তৃতীয়ত, অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে; এবং দলগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। নির্বাচনের সময়ও নানারূপ দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়। ফলে সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। সাধারণ সময়ে দল অযথা অর্থব্যয় এবং চাকরি, সম্মান প্রভৃতি বিতরণ করিয়া নিজ সমর্থকদের সন্তুষ্ট রাখে।

৩। নানাভাবে জাতীয় স্বার্থের হানি করে

চতুর্থত, দলপ্রথার জন্য অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না—কারণ, বিজয়ী দল নিজেদের সমর্থকদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করে।

৪। অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিকে বাহিরে রাখে

আরও বলা যায় যে, নির্বাচনের সময় অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয়। ফলে হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য, অশোভনীয় বক্তৃতাদি প্রসারলাভ করে এবং জাতীয় জীবনের সংহতি নষ্ট হয়। লোকে দলের ভিত্তিতেই ভাবিতে শিখে, জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

৫। অন্যান্য ত্রুটি

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা (Bi-party and Multi-party System): ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইংরাজ লেখক বার্কারকে অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলেন, একটি-মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলেই সেই দেশকে একনায়কতন্ত্রী (dictatorial) বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কারণ, এইরূপ দেশে গণতন্ত্রের অন্যতম সর্ত রাষ্ট্রনৈতিক দল-গঠনের স্বাধীনতা থাকে না বলিয়াই একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

একাধিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য

সুতরাং গণতন্ত্রে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিতে হইবে বলিয়া ধরা হয়। 'একাধিক' বলিতে যদি মাত্র দুইটি দল থাকে তবে উহাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (bi-party system) বলা হয়; দুই-এর অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে উহা বহুদলীয় ব্যবস্থা (multi-party system) নামে অভিহিত হয়। ইংলণ্ডে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। ঐ দেশে রক্ষণশীল (Conservative) ও শ্রমিক (Labour) এই দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল। উদারনৈতিক (Liberal) ও সাম্যবাদী (Communist) দলের সমর্থকসংখ্যা এত কম যে উহাদের অস্তিত্বকেই একরূপ অস্বীকার করা হয়। অপরদিকে ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দল সংখ্যায় এত বেশী যে কোন দলের পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই সমর্থন করিতে হয়। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নাগরিকদের পক্ষে নীতি-নির্বাচন অতি সহজ হয়। দুইটি নীতির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য লোকে তাহার বিচার সহজেই করিতে পারে; কিন্তু বহুপ্রকার নীতি যদি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ধারণ করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার গুণ:

১। ইহাতে নীতি-নির্বাচন সহজ হয়

আলোচনার দিক হইতেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা সমর্থনীয়। দুইটি দলের কর্মসূচী আলোচনা করা যত সহজ, বহু দলের বহু প্রকারের কর্মসূচীর আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করা তত সহজ নয়।

২। আলোচনাও সহজ হয়

দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই সুসংবদ্ধ সরকারী দল ও শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। বহু দল থাকিলে অধিকাংশ সময় কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে সম্মিলিত সরকার (coalition government) গঠন করিতে হয়। সম্মিলিত সরকারের কোন সুদৃঢ় নীতি থাকে না। পদে পদে

৩। সরকার এবং বিরোধী দল সুগঠিত হয়

মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ইহাকে শাসনকার্য চালাইতে হয়। অপর-দিকে সরকারের বিরোধী যে-সকল দল থাকে তাহারাও ঐক্যবদ্ধ হয় না বলিয়া বিরোধিতাও শক্তিশালী হয় না।

বহুদলীয় ব্যবস্থা সকল মতামতের প্রতিফলনের সহায়ক

অবশ্য বহুদলীয় ব্যবস্থার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, লোকের যে বিভিন্ন মতামত থাকে তাহা বহু দলের মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। দুইটি মাত্র দলের কোনটির নীতির সহিতই যদি আমার মতের মিল না হয় তবে আমি গত্যন্তরবিহীন। বহু দল থাকিলে একটি না একটি নীতির সহিত মিল হইবেই।

তবুও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সমর্থনীয়

তবুও সকল দিকের বিচার-বিবেচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। বহুদলীয় ব্যবস্থার কোন দল একক-ভাবে সরকার গঠন করিতে পারে না বলিয়া সকল সময়ই বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। ফলে সরকারের ঘন ঘন পতন ঘটিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া তুলে।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য। রাষ্ট্রনৈতিক দল রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণবৃদ্ধি।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—১। দলের সভ্যগণ একমতাবলম্বী হয়, ২। দল জাতীয় কল্যাণে সচেষ্ট থাকে, এবং ৩। ঐ উদ্দেশ্যে শাসনক্ষমতালাভের চেষ্টা করে।

কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকে বলিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে 'উপদল' বা 'চক্রীদল' হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থসাধন করে। উপদল দলের সভ্যগণের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট থাকে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী: রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১। সমস্যা-নির্বাচন; ২। সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করা; ৩। প্রতিনিধি নির্বাচনে সাহায্য করা; ৪। জনমত গঠন ও প্রকাশে ভূমিকা গ্রহণ করা; ৫। শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করা; এবং ৬। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করা।

দলপ্রথার গুণ: ১। দলপ্রথা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে; ২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে; ৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার করে; ৪। ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ; ৫। ইহা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে শাসন-সংস্কার সম্ভব করে; ৬। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে; এবং ৭। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সমন্বয়সাধন করে।

ত্রুটি: বলা হয় ১। দলীয় ঐক্য কৃত্রিম; ২। দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে; ৩। নানাভাবে জাতীয় স্বার্থের হানি করে; ৪। অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনকার্যের বাহিরে রাখে; ৫। হিংসা দ্বেষ মনোমালিন্য প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া জাতীয় কল্যাণের হানি ঘটায়।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা: গণতন্ত্র একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত চলে না। সকল দিকের বিচার-বিবেচনা করিয়া বহুর পরিবর্তে দুইটি দলের সপক্ষেই মত প্রদান করিতে হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by a Political Party ? Are Political Parties inevitable in a Democracy ? Give reasons for your answer. (C. U. 1951)

রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ ? গণতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল কি অপরিহার্য ? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [১৬৮-১৭০ পৃষ্ঠা]

2. Define 'Political Party' and explain the functions and utilities of Political Parties in a modern Democracy.
(C. U. 1957 ; H. S. (C) Comp. 1960 ; P. U. 1961)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির কার্য ও গুণাবলী ব্যাখ্যা কর। [১৬৮-১৭৩ পৃষ্ঠা]

3. What is a Political Party ? Distinguish between a Party and a Faction.

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রনৈতিক দলকে উপদল হইতে পৃথক করিয়া দেখাও।
[১৬৮-১৭০ পৃষ্ঠা]

4. Define Political Party, and indicate its merits and demerits.
(C. U. 1959, '62)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উহার গুণাগুণ বর্ণনা কর। [১৬৮-১৬৯ এবং ১৭১-১৭৩ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the relative advantages of Multi-Party and Bi-Party system.
(C. U. 1954 ; B. U. 1961)

বহুদলীয় ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থার গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা কর। [১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা]

পরিশিষ্ট

শাসনতন্ত্র

(Constitutions)

[বিষয়টি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও একাদশ শ্রেণীতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা শুরু করিবার পূর্বে ইহা পড়িয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।]

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই কতকগুলি করিয়া নিয়মকানুন থাকে। এই নিয়মকানুনগুলি অনুসারেই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, সদস্যদিগের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নির্ধারিত হয়। সামগ্রিকভাবে এই নিয়মকানুনগুলিকে গঠনতন্ত্র (Constitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

শাসনতন্ত্র কাহাকে বলে

রাষ্ট্রও অন্যতম প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি করিয়া গঠনতন্ত্র থাকে। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রকে রাষ্ট্রনৈতিক গঠনতন্ত্র (Political Constitution) বা 'শাসনতন্ত্র' বলা হয়। শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রের গঠন কি হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হইবে, নাগরিকগণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ হইবে ইত্যাদির বিষয় নির্ধারিত হয়। সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে

সংজ্ঞা

গিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন শাসনতন্ত্র হইল সেই সকল নিয়মকানুনের সমষ্টি যাহা অনুসারে সরকারের ক্ষমতা, নাগরিকের অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণীত হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classifications of Constitutions) : শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে (ক) লিখিত ও অলিখিত, এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগই সুপরিচিত।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র (Written and Unwritten Constitutions) : শাসনতন্ত্রের মূল নীতি ও বিষয়গুলি এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকিলে উহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র (Written Constitutions) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অপরদিকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় যে, শাসন সংক্রান্ত মৌলিক নীতি ও বিষয়গুলিকে লিপিবদ্ধ বা দলিলভুক্ত করা হয় নাই এবং উহারা প্রধানত প্রথা, আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রই অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রধানত প্রথা ও রীতিনীতির (Constitutional Conventions) ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা যায়।

উদাহরণ

লিখিত ও অলিখিত—এই দুই শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রসমূহের শ্রেণীবিভাগ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে। কারণ, এরূপ কোন শাসনতন্ত্রই নাই যাহা সম্পূর্ণভাবে লিখিত বা সম্পূর্ণভাবে অলিখিত। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কিন্তু এই শাসনতন্ত্রের এরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যাহা লিখিত ও বিধিবদ্ধ। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র মূলত লিখিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকটিতে বেশ কিছু অলিখিত অংশ আছে। যাহা হউক, শাসনতন্ত্র 'প্রধানত' লিখিত হইলে উহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র এবং 'মূলত' অলিখিত হইলে উহাকে অলিখিত শাসনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Written and Unwritten Constitutions) : লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকার শাসনতন্ত্রেরই গুণাগুণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে লিখিত শাসনতন্ত্র লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহা বিশেষ সতর্কতার সহিত ও আলাপ-আলোচনার পর প্রণীত হয়। ফলে স্বভাবতই উহা অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, লিখিত সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতি (special procedure) অবলম্বনের প্রয়োজন হয় বলিয়া উহা অলিখিত সংবিধান অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। অর্থাৎ, জনমতের গতি পরিবর্তন বা শাসকগণের খেয়ালখুশির ফলে উহা যখন তখন পরিবর্তিত হয় না। তৃতীয়ত, লিখিত সংবিধানে সাধারণত নাগরিকগণের মৌলিক

লিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ

অধিকার বিধিবদ্ধ থাকে। ইহার ফলে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারিতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অপরদিকে, লিখিত সংবিধানের পরিবর্তন বিশেষ সহজসাধ্য নহে বলিয়া উহা সময়ের সহিত সংগতি হারাইয়া ফেলিতে পারে। অর্থাৎ, লিখিত শাসনতন্ত্রের জন্য কাম্য সংস্কারসাধন ব্যাহত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সংস্কার-আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিলে দেশে বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটিতে পারে। আরও বলা হয় যে, মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করাই যথেষ্ট নহে; ঐ অধিকার সংরক্ষিত হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করে দেশের জনগণ ও দেশের বিচার-ব্যবস্থার উপর। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অলিখিত, উহাতে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ নাই; তবুও ইংরাজরা অন্য কোন দেশের লোক অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে না। সুতরাং মৌলিক অধিকার ঘোষণার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ-উদ্দেশ্যেই যে লিখিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে, এ-ধারণা ভুল।

ত্রুটি

অলিখিত শাসনতন্ত্র সুপরিবর্তনীয় হয় বলিয়া উহা সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। ফলে এই প্রকার সংবিধান জনপ্রিয় হয় এবং বিপ্লবের আশংকা হইতে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয়ত, অলিখিত সংবিধান শুধু তত্ত্বগত ভিত্তিতেই রচিত হয় না; উহা জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি রাখে। সুতরাং উহা সুপরিচালিত হয়। ত্রুটি হিসাবে বলা যায় যে অলিখিত শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না— উভয়কেই সমান মর্যাদা দেয়। উপরন্তু, শাসনতন্ত্র অলিখিত হইলে বিচার বিভাগ অকাম্যভাবে প্রভাবশালী হইয়া উঠে। কারণ, ঐ বিভাগই নির্ধারণ করে যে কোন্‌টি শাসনতান্ত্রিক আইন এবং কোন্‌টি নয়। অনেকের মতে, আবার অলিখিত শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের উপযোগী নয়। কারণ, এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ সর্বদাই শাসকবর্গের ক্ষমতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া সুস্পষ্টভাবে জানিতে চাহে যে শাসনতন্ত্রের বিধান কি।

অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণ

ত্রুটি

মোটামুটিভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনশীল জনগণের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র কাম্য হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণ যদি অজ্ঞ ও বিদ্রোহপ্রবণ হয় তবে সুনির্দিষ্ট লিখিত সংবিধান গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

উপসংহার

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible and Rigid Constitutions): লিখিত ও অলিখিত—এইভাবে শাসনতন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া বর্তমানে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগই অধিক সুপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই

শ্রেণীবিভাগের জন্য আমরা লর্ড ব্রাইসের নিকট ঋণী। যে-শাসনতন্ত্রকে সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে আইনসভা অতি সহজে পরিবর্তন করিতে পারে তাহাকে সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Flexible Constitution) আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের বেলায় সংশোধন ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন-প্রকার পার্থক্য নাই। অপরপক্ষে, যে-শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না—পরিবর্তনের জন্য যখন এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় তখন তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র (Rigid Constitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে-প্রণালীতে সাধারণ আইন পাস করে, ঠিক সেই প্রণালীতেই শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত আইন পাস করিতে সমর্থ। অপরপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেস (Congress) যে-পদ্ধতিতে সাধারণ আইন পাস করিতে পারে সে-পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না।

উদাহরণ

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই উহা দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে এরূপ কোন কথা নাই। যেমন, নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত কিন্তু উহা সুপরিবর্তনীয়—কারণ, সাধারণ আইনসভা সাধারণ পদ্ধতিতেই উহার পরিবর্তনসাধন করিতে পারে।

শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেই দুষ্পরিবর্তনীয় হয় না

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Defects of Flexible and Rigid Constitutions) : সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে। দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের সময় এবং সংকট-কালীন অবস্থায় এইরূপ শাসনতন্ত্রকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা হয়।

সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ

কিন্তু স্থিতিশীলতার অভাব সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। পরিবর্তন অতি সহজসাধ্য বলিয়া এইরূপ শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়ে এবং কারণে-অকারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। সাময়িক উত্তেজনার বশে বহু কল্যাণকর আইনও অপসারিত হয়। সাধারণ আইন হইতে শাসনতন্ত্রের পৃথক মর্যাদা না থাকায় উহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাও থাকে না। সহজ পরিবর্তনযোগ্য বলিয়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থও সংরক্ষিত হয় না।

ত্রুটি

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ সুপরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণের ঠিক বিপরীত। দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র স্থিতিশীল, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। সাময়িক উত্তেজনা, গণ-আন্দোলনের ফলে অথবা সাধারণ আইনসভায়

খেয়ালখুশি অনুযায়ী ইহা যখন তখন পরিবর্তিত হয় না। এই প্রকার শাসনতন্ত্র অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং ইহা দ্বারা নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যসমূহের অধিকার সংরক্ষণের জন্য দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।*

দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ

অপরদিকে দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র সময়ের সহিত তাল রাখিতে পারে না। কোন কল্যাণকর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় বলিয়া তাহা কার্যকর করা কঠিন হইয়া পড়ে। ফলে সংস্কারকামীরা বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে। মেকলেকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, বিপ্লবের প্রধান কারণ হইল জাতি যখন অগ্রসর হয় শাসনতন্ত্র তখন স্থিতিশীল থাকে। দ্বিতীয়ত, দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভার বিচার বিভাগের উপর থাকে বলিয়া এইরূপ শাসনতন্ত্র বিচার বিভাগের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হয়। বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্রের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতে পারে।

ত্রুটি

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত দোষত্রুটি অপসারণের জন্য আধুনিক লেখকগণ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, শাসনতন্ত্র ব্রটেনের শাসনতন্ত্রের মত অতটা সুপরিবর্তনীয় হইবে না, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অতটা দুষ্পরিবর্তনীয়ও হইবে না। এই দুই-এর মধ্যপন্থাই অনুসরণ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সংক্ষিপ্তসার

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি করিয়া গঠনতন্ত্র থাকে। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রকে শাসনতন্ত্র বলা হয়। শাসনতন্ত্র অনুসারে সরকারের ক্ষমতা নাগরিকদের অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ: নানাভাবে শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দুইটি শ্রেণীবিভাগই অধিক সুপ্রচলিত—(ক) লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র, এবং (খ) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত নহে; তবুও এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের গুণাগুণ পরস্পরের বিপরীত। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের গুণাগুণও পরস্পরের বিপরীত। বর্তমানে এই দুই প্রকার শাসনতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define the term Constitution. Distinguish between Flexible and Rigid Constitutions. Illustrate your answer by reference to the Constitution of India. (H. S. (C) Comp. 1961)

শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কি কি তাহা দেখাও। ভারতের সংবিধানের উল্লেখ করিয়া প্রশ্নের উত্তর দাও।

[১৭৬ এবং ১৭৮-১৭৯ পৃষ্ঠা এবং ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ২২-২৩ পৃষ্ঠা দেখ।]

2. Define the term 'Constitution' and distinguish between Written and Unwritten Constitutions. State the merits and demerits of each. (H.S. (C) 1960)

'শাসনতন্ত্র' শব্দটির সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। উভয়ের গুণাগুণ বিবৃত কর। [১৭৬-১৭৮ পৃষ্ঠা]

* ... পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(Features of the Constitution of India)

ঐতিহাসিক পরিক্রমা

ভূমিকা : ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইত। যখন ভারতীয়গণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন ঠিক হয় যে স্বাধীন ভারতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হইবে। ১৯৪৬ সালে এই গণপরিষদ গঠন করা হয়; এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 'ভারতের গণপরিষদ' এবং 'পাকিস্তানের গণপরিষদ'—এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়।

গণপরিষদ

বর্তমান শাসনতন্ত্রের রচনা, গ্রহণ ও প্রবর্তন

ভারতের গণপরিষদ ভারতীয় জনগণের পক্ষে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে থাকে। রচনাকার্য সমাপ্ত হইলে ইহা ১৯৪৯ সালে ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় জনগণের পক্ষেই গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক দুই মাস পরে—অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এই শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করা হয়। ইহা 'ভারতীয় সংবিধান' (The Constitution of India) নামে অভিহিত; এবং এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই বর্তমান সাধারণতান্ত্রিক ভারতের (Republican India) শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Features of the Constitution of India) : ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করিতে পারা যায় :

১। ভারতীয় সংবিধান সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল

(১) ভারতীয় সংবিধান লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল। ইহা যখন প্রবর্তিত হয় তখন ইহাতে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ (Articles) এবং ৮টি তপশীল (Schedules) ছিল। তখন হইতে আজ পর্যন্ত এই সংবিধানের মোট ১৪ বার সংশোধন করা হইয়াছে।* ইহার ফলে সংবিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমত, তপশীলের সংখ্যা

---

* ১৯৬২ সালেই দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংশোধন পাস করা হয়। দ্বাদশ সংশোধন দ্বারা গোয়া, দমন ও দিউকে অন্যতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়, ত্রয়োদশ সংশোধন দ্বারা ষোড়শ অংগরাজ্য নাগাভূমি গঠন করা হয়, এবং চতুর্দশ সংশোধন দ্বারা পণ্ডিচেরিকে অন্যতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং কেন্দ্র-শাসিত কয়েকটি অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পর সরকারী কার্যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। সংবিধানের আর এক দফা সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থাকে উঠাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ফলে ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পরও সরকারী কার্যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইতে থাকিবে।

৮ হইতে ৯-এ দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে অনুচ্ছেদের ক্রমিক সংখ্যা ঐ ৩৯৫ থাকিলেও বিভিন্ন সংশোধনের ফলে সংবিধানের মধ্য হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ পুরাপুরি ও কয়েকটি অনুচ্ছেদের কিছু অংশ বাদ গিয়াছে, এবং কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংগে কিছু কিছু অংশ সংযুক্তও হইয়াছে। তৃতীয়ত, রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলসমূহের গঠন সংক্রান্ত প্রথম তপশীল, রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত চতুর্থ তপশীল প্রভৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মোটকথা, নানা হ্রাসবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর লিখিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম রহিয়া গিয়াছে।

সংবিধান বিরাট ও জটিল হইবার কারণ

ভারতীয় সংবিধান বিপুলায়তন ও জটিল হইবার মূলে রহিয়াছে নিম্নলিখিত কারণগুলি : (ক) সংবিধানে মাত্র কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থাই সন্নিবিষ্ট হয় নাই ; জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। (খ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কও বিশেষ জটিল। (গ) সংবিধানে বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। যথা, সরকারী চাকরি, ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায়, তপশীলভুক্ত জাতি ও জনগোষ্ঠী (Scheduled Castes and Scheduled Tribes), সরকারী ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবিধানে অনেকগুলি ধারা আছে। (ঘ) সংবিধানে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকারই বর্ণিত হয় নাই, কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিও উল্লিখিত হইয়াছে। (ঙ) সংবিধান বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রকে বহুলাংশে অনুকরণ করিয়াছে।

২। ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র

(২) সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, (ক) ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। (খ) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় শাসন-ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক। (গ) আবার ভারত সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ, ভারতে রাজার স্থান নাই—শাসনক্ষমতা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি-বর্গের হস্তে ন্যস্ত। ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি।

৩। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র

(৩) সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা 'রাজ্যসংঘ' (Union of States) বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ, বলা যায় যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে নাই। কিন্তু ভারতকে সম্পূর্ণভাবে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিপক্ষেও যুক্তি রহিয়াছে। ভারতীয় 'যুক্তরাষ্ট্রে' কেন্দ্রের হস্তে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়

দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, জরুরী ও শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারেন। এইজন্য বলা হয় যে, সাধারণতান্ত্রিক ভারতের শাসন-ব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক। জনৈক আধুনিক শাসনতন্ত্রবিদের মতে, ভারত 'অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র' (Quasi-federal State)।

৪। ভারতীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সুপরিবর্তনীয় উভয়ই

(৪) ভারতীয় সংবিধান একাধারে দুষ্পরিবর্তনীয় ও সুপরিবর্তনীয়। ইহার কতক অংশের সংশোধনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাকী অংশের পরিবর্তন সাধারণ আইন পাসের পদ্ধতিতে সহজেই করা চলে। এই বৈশিষ্ট্যটির জন্যও ভারতকে 'অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সমগ্রটাই সাধারণত দুষ্পরিবর্তনীয় হয়।

৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে

(৫) সংবিধানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করিয়া এ-দেশের শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্য অবাধ নহে; নানাভাবে উহাদিগকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

৬। নির্দেশমূলক নীতিও ঘোষণা করা হইয়াছে

(৬) মৌলিক অধিকার ছাড়াও সংবিধানে শাসনপরিচালনার কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) ঘোষণা করা হইয়াছে। শাসনকর্তাগণ শাসন-কার্য পরিচালনা করিবার সময় এগুলি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন। এই নীতিগুলি সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Social Welfare State) দ্যোতক।

৭। ধর্ম-নিরপেক্ষতা ভারত-রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট দিক

(৭) ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে (secularism) ভারত-রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট দিক বলিয়া ধরা হয়। ভারতে কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) নাই। জাতি ধর্ম বর্ণ বিশ্বাস এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের জন্য এক এবং অভিন্ন নাগরিক-অধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিতে পারে না।

৮। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থাও অন্যতম বৈশিষ্ট্য

(৮) সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পূর্ণ পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকারের প্রবর্তন। ব্রিটিশ আমলে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও উহা নানাভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন পূর্ণ দায়িত্বশীলতার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে এই দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতেও সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা 'ভারতীয় সংবিধান' অনুসারে পরিচালিত হয়। এই সংবিধান ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক রচিত।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। ভারতীয় সংবিধান সর্বাপেক্ষা বিরাট, বিষয়বহুল ও জটিল; ২। ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র; অর্থাৎ, ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, শাসন-ব্যবস্থা সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত এবং ভারতে রাজার কোন স্থান নাই; ৩। ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র; ৪। সংবিধান আংশিকভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় এবং আংশিকভাবে সুপরিবর্তনীয়; ৫। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; ৬। ইহাতে নির্দেশমূলক নীতিও ঘোষণা করা হইয়াছে; ৭। ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র; ৮। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্নোত্তর

1. **State and explain the chief characteristics of the Indian Constitution.**
(C. U. 1958 ; H. S. (C) 1962)

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর। [১-৩ পৃষ্ঠা]

2. **Explain the main features of the present Constitution of India.**
(H. S. (H) 1962)

ভারতের বর্তমান সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। [১-৩ পৃষ্ঠা]

Note

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা
(The Preamble to the Constitution of India)

বর্তমান কালে প্রায় সকল দেশের লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রথমেই একটি করিয়া প্রস্তাবনা (Preamble) সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। এই প্রস্তাবনাকে সংবিধানের ভূমিকা বলিয়া বর্ণনা করা যায়। অর্থাৎ, পুস্তকের যেমন ভূমিকা, সংবিধানেরও তেমনি প্রস্তাবনা। ভূমিকা মূল পুস্তকের অংশ নয়, প্রস্তাবনাও সংবিধানের কার্যকরী অংশের (operative part) অন্তর্ভুক্ত নয়। ভূমিকায় যেমন লেখকের মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ইংগিত দেওয়া হয়, প্রস্তাবনাতেও তেমনি সংবিধানের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও আইনগত ভিত্তির বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও কার্যকরী অংশে কোন অস্পষ্টতা থাকিলে প্রস্তাবনার সাহায্যে তাহা দূর করা যায়। ধরা যাউক, সংবিধানের কার্যকরী অংশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা হয় যে, প্রস্তাবনায় কি

'প্রস্তাবনা' কাহাকে বলে

প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য

আছে। প্রস্তাবনায় যদি ধর্মীয় সাম্যের উল্লেখ থাকে তবে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকিতে পারিবে না; এবং ফলে রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ (secular) হইতে হইবে।

সংবিধানের প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন প্রস্তাবনা অতি সংক্ষেপে সংবিধান রচনার কারণ বর্ণনা করে, আবার কোন কোন প্রস্তাবনায় ভাষার আড়ম্বর এবং উচ্চ আদর্শ ও নীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহাতে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় প্রায় সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চ আদর্শেরই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বলা হইয়াছে, প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও আইনগত ভিত্তি বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য ভারত-রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে (Sovereign Democratic Republic) গঠন করা। ইহার মূলনীতি হইল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় (Justice) প্রতিষ্ঠা; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা; এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য অটুট রাখিয়া সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব (Fraternity) বর্ধন করা। প্রস্তাবনায় ভারতের জনসাধারণকে সংবিধানের আইনগত ভিত্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সার্বভৌম ক্ষমতার আধার ভারতের জনসাধারণের পক্ষে গণপরিষদে এই সংবিধান গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সংবিধান-নির্দিষ্ট সকল ক্ষমতাই জনসাধারণ হইতে প্রাপ্ত।

প্রস্তাবনা অনুসারে সংবিধানের উদ্দেশ্য—সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠন

সংবিধানের মূলনীতি

জনগণই সংবিধানের আইনগত ভিত্তি

এখন 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' বর্ণনাটি লইয়া কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'সার্বভৌম' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, আভ্যন্তরীণ বিষয়েই হউক আর বৈদেশিক ব্যাপারেই হউক, ভারত স্বাধীনভাবে আপন নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ—অন্য কোন রাষ্ট্র উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' সম্বন্ধে আলোচনা: 'সার্বভৌম' শব্দের অর্থ

'গণতান্ত্রিক' শব্দটি দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, ভারতে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় জনসাধারণের নির্দেশে। সংবিধানে সার্বিক প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভারতীয় নাগরিকগণই স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। গণতন্ত্রকে আবার শুধু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও সংবিধানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের

'গণতান্ত্রিক' শব্দের অর্থ

বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি সামাজিক গণতন্ত্রেরই দ্যোতক। আবার রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম নির্দেশমূলক নীতি—যথা, বেকার, বার্ধক্য ও পীড়িত অবস্থায় সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারও এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সূচক হিসাবে গণ্য হইতে পারে।

'সাধারণতন্ত্র' শব্দের অর্থ

বর্তমান সময়ে 'সাধারণতন্ত্র' বলিতে এমন এক গণতন্ত্রকে বুঝায় যেখানে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন চিহ্নই থাকে না। এই অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি হইল সাধারণতন্ত্র। অপরদিকে ইংলণ্ড কিন্তু সাধারণতান্ত্রিক নহে—কারণ, সেখানে রাজপদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ভারতকে 'সাধারণতন্ত্র' বলিয়া অভিহিত করার অর্থ দাঁড়ায় যে ভারতে রাজা বা রাজতন্ত্রের কোন স্থান নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পদপ্রাপ্ত হন না—জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হন।

সার্বভৌম সাধারণতান্ত্রিক ভারত ও কমনওয়েলথের সদস্যপদ

কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেন যে, ভারত যদি সার্বভৌম এবং সাধারণতন্ত্রীই হয় তবে সে 'কমনওয়েলথে'র পূর্ণ সদস্য থাকে কি করিয়া? কারণ নিয়ম হইল, কমনওয়েলথের প্রত্যেক সদস্য-দেশের পক্ষে ব্রিটিশরাজকে (The British Crown) কমনওয়েলথের মধ্যে প্রধান (Head of Commonwealth) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ব্রিটিশরাজ এইভাবে কমনওয়েলথের শীর্ষস্থানে অবস্থিত থাকায় ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং সাধারণতান্ত্রিক রূপ ক্ষুণ্ণ হয় কি না? উত্তরে বলা হয়, ভারত 'কমনওয়েলথ্ অব নেশনসে'র সভ্য হইলেও ভারতের মর্যাদা অন্যান্য সদস্যদের মর্যাদা হইতে পৃথক। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত ভারতকে ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় না; ব্রিটেনের রাণী কমনওয়েলথের শীর্ষে অবস্থান করিলেও ভারত সম্পর্কে তাঁহার কোন শাসনতান্ত্রিক কার্য নাই; ভারতের রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রাণীর প্রতিনিধিও নন। কমনওয়েলথ্ দেশগুলির সংগে ভারত নানা বিষয়ে পরামর্শ করে সত্য; কিন্তু ঐ সকল দেশের কোনটির নির্দেশ বা উপদেশ মান্য করিতে ভারত বাধ্য নয়। উপরন্তু, কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্বেচ্ছায় স্থাপিত। যে-কোন দিন ভারত এই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কমনওয়েলথের বাহিরে আসিতে পারে। সুতরাং ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সাধারণতান্ত্রিক রূপের সহিত কমনওয়েলথের সদস্যপদের কোন অসংগতি নাই।

কমনওয়েলথের সদস্যপদ ভারতের সার্বভৌমিকতা ব্যাহত করে না

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ভারতের অনুকরণে পাকিস্তানও কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা [illegible] করিয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

পুস্তকের যেমন ভূমিকা, সংবিধানেরও তেমনি প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনায় সংবিধানের উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং আইনগত ভিত্তির বর্ণনা করা হয়।

প্রস্তাবনা অনুসারে ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য হইল একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' গঠন করা ; ইহার মূলনীতি ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি করা।

ভারতের জনসাধারণই সংবিধানের আইনগত ভিত্তি। গণপরিষদ জনসাধারণের নিকট হইতেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া সংবিধান রচনা করিয়াছে।

'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' : 'সার্বভৌম' শব্দটির দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, ভারত আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'গণতান্ত্রিক' শব্দের অর্থ হইল যে ভারতে রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয় জনসাধারণের নির্দেশে। 'সাধারণতন্ত্র' শব্দটি দ্বারা ভারতে রাজা বা রাজতন্ত্র থাকিবে না, ইহাই বলা হইয়াছে।'

'সার্বভৌম সাধারণতান্ত্রিক' ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথের সদস্যপদ অযৌক্তিক বা অসংগত নয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the term 'Preamble' to a Constitution? Briefly describe and explain the Preamble to the Constitution of India.
(H. S. (H) Comp. 1961)

সংবিধানের প্রস্তাবনা বলিতে কি বুঝায় ? ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।
[৪-৬ পৃষ্ঠা]

2. "India is a Sovereign Democratic Republic."—Explain what it means.
(H. S. (H) 1960)

"ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।"—ইহা দ্বারা কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। [৪-৬ পৃষ্ঠা]

3. The Preamble to the Indian Constitution states—'India is a Sovereign Democratic Republic.' Explain. (H. S. (H) Comp. 1962)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে—'ভারত অন্যতম সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'। ব্যাখ্যা কর।
[৪-৬ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

নাগরিকতা ও ভোটাধিকার
(Citizenship and Franchise)

ভারতীয় নাগরিকতার দুইটি বৈশিষ্ট্য :

১। এই সম্বন্ধে সংবিধান বিস্তৃত ব্যবস্থা করে নাই

ভারতীয় নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। (১) সংবিধানে নাগরিকতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে পার্লামেণ্ট বা সংসদের হস্তে। মোটামুটিভাবে সংবিধান প্রবর্তনের সময়—অর্থাৎ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ১৯৫৫ সালে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন দ্বারা এ-সম্পর্কে বিস্তৃততর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) অনেক যুক্তরাষ্ট্রে 'দ্বৈত নাগরিকতা'র* ব্যবস্থা থাকে ; ভারতে কিন্তু ইহা নাই। সকল নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক এবং একশ্রেণীভুক্ত। রাজ্যগুলির কোন পৃথক নাগরিকতা নাই।

২। ভারতে 'দ্বৈত নাগরিকতা' নাই

সংবিধান অনুসারে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি দ্বারা ভারতের নাগরিকতা অর্জিত হইয়াছে :

(ক) জন্মস্থান, বসবাস এবং স্থায়ী বসবাসগত পদ্ধতি : যাহারা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা তাহারা যদি ভারতে জন্মিয়া থাকে অথবা তাহাদের পিতামাতার মধ্যে কেহ যদি ভারতে জন্মিয়া থাকেন তবে তাহারা ভারতের নাগরিক। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর ঠিক আগে যাহারা ভারতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক।

নাগরিকতা অর্জনের তিনটি পদ্ধতি

সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে যে, স্থায়ী বসবাস (domicile) নাগরিকতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য সর্ত। কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি নিজে বা তাহার পিতা বা মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ অথবা সেই ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ বৎসর কাল ভারতে বসবাস করিয়া থাকিলেই চলিবে না। নাগরিকতা অর্জনের জন্য এই সর্তগুলির যে-কোন একটির সহিত চাই স্থায়ী বসবাসের অভিপ্রায়।

(খ) পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কে ব্যবস্থা : ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পূর্বে যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহারা যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকে, অথবা তাহাদের পিতামাতা পিতামহ পিতামহী মাতামহ মাতামহীর মধ্যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকেন, এবং তাহারা যদি ভারতে আসিবার পর হইতে এ-দেশে সাধারণত বসবাস করিয়া থাকে, তবে তাহারা ভারতের নাগরিকতা অর্জন করিয়াছে।

১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই বা ঐ তারিখের পর উপরি উক্ত ধরনের যে-সকল ব্যক্তি ভারতে আসিয়াছে তাহারা যদি ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্বে ভারত সরকারের কোন যোগ্য কর্মচারীর নিকট আবেদন করিবার পর উক্ত কর্মচারী কর্তৃক নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তবে তাহারাও ভারতের নাগরিক। কিন্তু আবেদন করিবার পূর্বে অন্তত ছয় মাস ভারতে বসবাস করিতে হইবে।

(গ) ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী মূলত ভারতীয় ব্যক্তিদের নাগরিক-অধিকার : ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে অন্যান্য দেশে

* 'দ্বৈত নাগরিকতা' বলিতে বুঝায় একই সংগে যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যের নাগরিকতা—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা ও নিউইয়র্ক রাজ্যের নাগরিকতা।

যে-সমস্ত ভারতীয় আছে তাহারাও ভারতের নাগরিক হইতে পারে, যদি তাহারা অথবা তাহাদের পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ বা পিতামহী অথবা মাতামহ বা মাতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং যদি তাহারা যে দেশে বাস করিতেছে সেই দেশস্থ ভারত সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে।

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন: নাগরিকতা সম্পর্কে সংবিধানের উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ এই সংবিধান প্রবর্তনের সময় নাগরিকতা অর্জন করিবার মূল নিয়মাবলী মাত্র; এগুলি ভারতীয় নাগরিকতার পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না। এই পূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকতা কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে অর্জন করা যাইতে পারে এবং কি কি কারণে উহার অবসান ঘটে তাহা এই আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান আইনটিতে জন্মগতভাবে, রক্তের সম্পর্কগত সূত্রে, রেজেষ্ট্রিকরণের সাহায্যে, দেশীয়করণের মাধ্যমে এবং কোন ভূখণ্ডের ভারতভুক্তির ফলে সংবিধান প্রবর্তনের পর নাগরিকত্বপ্রাপ্তির ব্যাপক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আইনে নাগরিকতার বিলোপ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে। পরিশেষে, ইহাতে কমনওয়েলথ্ নাগরিকতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ভারত পারস্পরিক ভিত্তিতে কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিকগণকে ভারতীয় নাগরিক যে-সকল অধিকার ভোগ করে তাহা প্রদান করিতে পারে।

এই আইনে নাগরিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে

ভোটাধিকার (Franchise): সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় বলা হইয়াছে যে, গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের সংবিধান সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিককেই ভোটাধিকার দিয়াছে।* বস্তুত, সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার বর্তমান শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংবিধান অনুসারে "লোকসভা এবং প্রতি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইবে।" পরে আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'সংবিধানের ধারা বা আইন অনুসারে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত নয় এবং ২১ বৎসরের কম বয়স্ক নয়' এরূপ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকই নির্বাচক বা ভোটার বলিয়া গণ্য হইবে। শাসনতন্ত্রের বিধান বা আইন অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক নির্বাচন-এলাকায় বসবাস না করার জন্য, মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য এবং নির্বাচনের সময় বেআইনী বা অসাধু আচরণের জন্য

সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

* ২ পৃষ্ঠা।

নির্বাচক হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, প্রত্যেক ভারতীয়ই লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচক যদি সে—

(১) অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক হয়; (২) কোন নির্বাচন-এলাকায় সাধারণত বসবাস করে; (৩) সুস্থ মস্তিষ্ক হয়; এবং (৪) কোন নির্বাচনের সময় অসাধু বা বেআইনী কার্যের সহিত জড়িত না থাকে।

শাসনতন্ত্রে সার্বিক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করার ফলে ভারতবাসীর প্রায় অর্ধেক ভোটাধিকার পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬২ সালের নির্বাচনে প্রায় ৪৪ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে ২১ কোটির অধিক নির্বাচক-তালিকাভুক্ত হয়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের নির্বাচকগণ শেষ পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৪ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; আর বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হইল নির্বাচক। ইহার কারণ, পূর্বে সম্পত্তি আয় শিক্ষা উপাধি

ভারতে ভোটাধিকারের প্রসার

ব্রিটিশ আমলে নির্বাচক জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ
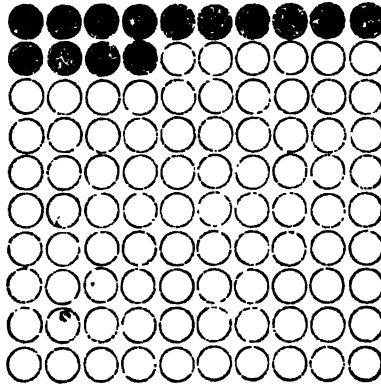
এখন শতকরা ৫০ ভাগ নির্বাচক
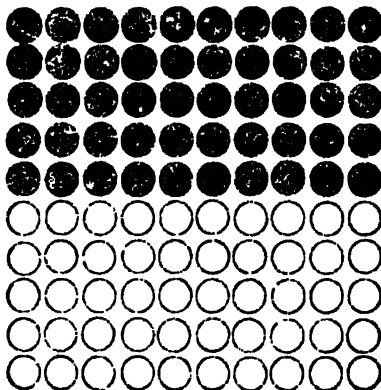
প্রভৃতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান করা হইত; কিন্তু বর্তমানে আইনের চক্ষে অযোগ্য নয় বলিয়া বিবেচিত এরূপ সকলকেই নির্বাচকশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতে স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল নাগরিকই নির্বাচক। ২১ বৎসরকে ভোটাধিকারপ্রাপ্তির বয়স হিসাবে ধরা হইয়াছে। সংবিধানের এই ব্যবস্থাকে সংবিধান প্রণেতৃবর্গের একজন 'গণতন্ত্রের উৎস' (fountain of democracy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

গণতন্ত্রের উৎস

সংবিধানে যখন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় তখন অনেকেই ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিয়াছিলেন, শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা আগে না করিয়া সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়কে ভোটাধিকার প্রদান করায় বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে ভারতে গণতন্ত্র উচ্ছৃংখল জনতার শাসনে পরিণত হইতে পারে। উপরন্তু, ১৯-২০ কোটির মত নির্বাচক সংখ্যা নির্বাচনকার্য পরিচালনা করাও একপ্রকার অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নির্বাচন পরিচালনা করা যে দুঃসাধ্য নয়, তাহা প্রমাণিত হইল। অপরদিকে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপও বজায় রহিল: উহা উচ্ছৃংখল জনতার শাসনে পরিণত হইল না। বস্তুত, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার গণতন্ত্র বা জনগণের শাসনের প্রধানতম সর্ত। অশিক্ষার অজুহাতে ইহা হইতে দূরে থাকিলে গণতন্ত্র অলীকই প্রতিপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে শিক্ষা, সম্পত্তি প্রভৃতির যুক্তিকে বর্তমানে আর মানা চলিতে পারে না। সুতরাং সকল দিক দিয়াই ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, এই অভিমত স্বচ্ছন্দেই প্রদান করা চলে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় নাগরিকতার দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে: ১। সংবিধান নাগরিকতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করে নাই; এ-বিষয়ে পার্লামেন্টের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে। ২। ভারতে দ্বৈত নাগরিকতা নাই। সংবিধান অনুসারে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি হইল তিনটি: ১। জন্মস্থান, বসবাস এবং স্থায়ী বসবাসগত পদ্ধতি; ২। পাকিস্তান হইতে আগতদের সম্পর্কে পদ্ধতি; ৩। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে বসবাসকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে পদ্ধতি।

ইহা ব্যতীত ১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন দ্বারা জন্মের সূত্রে, রেজেস্ট্রিকরণের সাহায্যে, দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রাপ্তির ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ আইন অনুসারে পারস্পারিক ভিত্তিতে ভারত কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিকদের ভারতীয় নাগরিক-অধিকার প্রদান করিতে পারে।

ভোটাধিকার: ভারতীয় সংবিধান সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ ভোটাধিকারী হইয়াছিল; এখন প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ভারতবাসী নির্বাচন-অধিকার ভোগ করে। এই ব্যবস্থাকে 'গণতন্ত্রের উৎস' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতে যখন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয় তখন অনেকে ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা মোটেই অযৌক্তিক হয় নাই। বস্তুত, ইহার দ্বারাই ভারতে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে বলা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the different methods by which Indian Citizenship can be acquired.

যে-যে পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করা যায় তাহা বর্ণনা কর [৩-৯ পৃষ্ঠা]

2. Write a note on Franchise in India.

ভারতে ভোটাধিকারের উপর একটি টীকা রচনা কর। [৯-১১ পৃষ্ঠা]

3. Do you justify Adult Franchise in the case of India ?

(H. S. (II) Comp. 1961)

তুমি কি ভারতের ক্ষেত্রে সার্বিক ভোটাধিকার ব্যবস্থা সমর্থন কর ? [৯-১১ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

মৌলিক অধিকার

(Fundamental Rights)

✓ মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) : নাগরিকদের লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত। এই নাগরিকদের জন্য সুন্দর ও পূর্ণাংগ জীবন সম্ভব করাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এখন সুন্দর ও পূর্ণাংগ জীবন সম্ভব করিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিককে তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশসাধনের জন্য সুযোগসুবিধা দিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ, জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, নির্বাচন করিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রভৃতি সুযোগসুবিধা ব্যতীত নাগরিকগণ তাহাদের জীবনকে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশসাধন করিতে পারে না। এই সকল সুযোগসুবিধাকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে-সকল সুযোগসুবিধা ব্যতীত মানুষ মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের বিকাশসাধন করিতে সমর্থ হয় না এবং সমাজজীবনের উন্নতিবিধানকল্পে কোন অবদান করিতে পারে না সেই সকল সুযোগ-সুবিধাকেই অধিকার আখ্যা দেওয়া হয়।* এখন যে-সকল অধিকার আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হয় এবং আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য হয় তাহাদিগকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের মধ্যে কতকগুলি দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত হইতে পারে আর কতকগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দেশের লিখিত সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হইতে পারে। যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংবিধানের দ্বারা সংরক্ষিত হয়

অধিকার কাহাকে বলে

* UNESCO Committee of Experts on Human Rights (1947)

তাহাদিগকে 'মৌলিক অধিকার' (Fundamental Rights) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাদিগকে 'মৌলিক' বলিয়া বর্ণনা করা হয় এই কারণে যে সাধারণ আইনের দ্বারা সংরক্ষিত অধিকার আইনসভা সাধারণ পদ্ধতিতে আইন পাস করিয়া রদবদল করিতে পারে, কিন্তু সংবিধানের সংশোধন ব্যতীত অথবা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যতীত মৌলিক অধিকারের পরিবর্তন করা যায় না।

মৌলিক অধিকার কাহাকে বলে

আধুনিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুসরণে সংবিধানে এইরূপ মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা একপ্রকার রীতিতে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানও ইহা করিয়াছে। অবশ্য কোন কোন লেখকের মতে, সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সংবিধানে কতকগুলি অধিকার সন্নিবিষ্ট করার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমত, নাগরিকদের কল্যাণ ও পূর্ণাংগ জীবনের পক্ষে কতকগুলি অধিকার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ঐগুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সরকার এবং আইন-সভা উভয়েরই হস্তক্ষেপ হইতে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইল জনমত পরিচালিত রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিতে হইলে মতামত প্রকাশ, সভাসমিতি সংগঠন প্রভৃতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। সুতরাং বলা হয় যে, এই সকল অধিকারকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সরকার এবং আইনসভা উভয়কেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য না হইলে ঐ অধিকারসমূহকে সহজে ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইলে নাগরিকগণ সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারে যে তাহাদের অধিকার কি কি। ফলে তাহারা সতর্ক দৃষ্টি লইয়া অধিকার সংরক্ষণে আগ্রহশীল থাকে।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা

ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights incorporated in the Constitution of India): ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত অধিকারসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। উহাদের কতকগুলিকে 'মৌলিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে 'রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য হইল 'মৌলিক অধিকার' আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য, কিন্তু 'নির্দেশমূলক নীতি' আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নহে। 'মৌলিক অধিকারগুলি' সাধারণ অবস্থায় আইনসভা ও শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকে। একমাত্র আপৎকালীন অবস্থা ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উহাদিগকে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। অধিকারগুলি মৌলিক

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর অধিকার

বলিয়া রাষ্ট্রের যে-কোন আইন উহাদের কোনটির বিরোধী হইলে ঐ আইন বাতিল হইয়া যায়।

মোটামুটিভাবে ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত সাত প্রকারের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে:

(১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality): সাম্যের অধিকার বলিতে নিম্নলিখিত অধিকারগুলিকে বুঝায়—(ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা; (খ) কেবলমাত্র ধর্ম জাতি অথবা নারী বা পুরুষ বলিয়া অথবা জন্মস্থানের দরুন রাষ্ট্র ভেদবিচার করিতে পারিবে না; (গ) সরকারী চাকরিতে সুযোগের সমতা; (ঘ) অস্পৃশ্যতা বর্জন; (ঙ) সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক উপাধি ভিন্ন অন্য উপাধি বিলোপ।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom): প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের (ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হইবার অধিকার, (গ) সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার, (ঘ) ভারতের রাজ্যক্ষেত্রে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার, (ঙ) ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার, (চ) সম্পত্তি ভোগদখল ও ক্রয়বিক্রয় করিবার অধিকার, এবং (ছ) যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যে-কোন উপজীবিকা, ব্যবসায় বা কারবার চালাইবার স্বাধীনতা আছে। ইহা ছাড়া, কাহারও জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আইনসংগত পন্থা ছাড়া হরণ করা চলিবে না। কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী আটক রাখা যাইবে না। কিন্তু গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে এই অধিকার শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy aliens) এবং নিবারক নিরোধের (Preventive Detention) জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নহে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation): মানুষ লইয়া ব্যবসায় ও বেগার খাটানো এবং অন্য কোনপ্রকারে বলপূর্বক শ্রম করানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালক-বালিকাদের কারখানায় বা খনিতে অথবা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion): সকল ব্যক্তিরই স্বাধীনভাবে ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকার আছে। তবে জনশৃংখলা, স্বাস্থ্য ও সদাচারের স্বার্থে এই অধিকার সীমাবদ্ধ করা যায়।

(৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights): নাগরিকদের সকলেরই নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা লিপি ও

সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার আছে। কেবল ধর্ম, মূলবংশ, জাতি বা ভাষার দরুন কোন নাগরিককে সরকার পরিচালিত বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না।

(৬) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): আইনের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। রাষ্ট্র যদি কাহারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সাধারণের স্বার্থে দখল বা অধিকার করিতে চায় তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to Constitutional Remedies): সংবিধানে যে-সমস্ত মৌলিক অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে বলবৎ করিবার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে সুপ্রীম কোর্টে বা প্রধান ধর্মাধিকরণে আবেদন করা চলিবে। সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ বেআইনীভাবে আটক ব্যক্তিকে কারামুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (*habeas corpus*)*, পরমাদেশ (*mandamus*), প্রতিষেধ (prohibition), অধিকার-পৃচ্ছা (*quo warranto*), উৎপ্রেষণ (*certiorari*) প্রভৃতি ধরনের নির্দেশ বা আদেশ বা লেখ (writs) জারি করিতে পারে। হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণেরও এ সমস্ত আদেশ জারি করিবার ক্ষমতা আছে। আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইলে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকারকে অকার্যকর করিয়া রাখিতে পারেন।

অধিকারগুলি অবাধ কিনা? (Are these Rights absolute?):

কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি নিরংকুশ বা অবাধ নহে। কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে সমাজজীবনে বিশৃংখলা বা অরাজকতা দেখা দিবে। সুতরাং যাহাতে সকল ব্যক্তি সমানাধিকার ভোগ করিতে পারে, যাহাতে রাষ্ট্রের বা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য অধিকারের উপর

* বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (*habeas corpus*): কি কারণে আটক করা হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য আদালত এই প্রকার আদেশ দ্বারা অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার হুকুম দিতে পারে; এবং আটক আইনসংগত না হইলে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার নির্দেশ প্রদান করে।

পরমাদেশ (*mandamus*): ইহা দ্বারা আদালত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, নিম্নতন আদালত ও সরকারকে আপন কর্তব্য পালন করিতে আজ্ঞা দেয়।

প্রতিষেধ (prohibition): ইহার সাহায্যে উচ্চতন আদালত নিম্নতন বিচারালয়কে আপন অধিকারের সীমার মধ্যে থাকিয়া কায করিতে বাধ্য করে।

অধিকার-পৃচ্ছা (*quo warranto*): যখন কোন ব্যক্তি যে-পদের যোগ্য নয় সেই পদ অধিকার বা দাবি করে তখন অধিকার-পৃচ্ছা দ্বারা তাহার দাবি বৈধ কিনা অনুসন্ধান করা হয়; দাবি বৈধ না হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়।

উৎপ্রেষণ (*certiorari*): কোন আদালত বা প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমা লংঘন করিলে উহার হস্ত হইতে বিচারকে উচ্চতন আদালতের হস্তে অর্পণ এবং ক্ষমতা-বহির্ভূত সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য উৎপ্রেষণের লেখ (writ of *certiorari*) জারি করা হয়।

যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিতে হয়। মোটকথা, সামাজিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধান এইজন্য বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের উপর কি কি বাধানিষেধ থাকিবে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, বাক্‌ ও মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা যায়। সংবিধানে এই অধিকারটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বাধানিষেধের উল্লেখ করিয়াছে: (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, (২) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন, (৩) জনশৃংখলা, (৪) শ্লীলতা বা সদাচার, (৫) বিচারালয়ের অবমাননা, (৬) মানহানি, এবং (৭) অপরাধ অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা। আবার আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা প্রবর্তিত থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি আদেশ প্রদান করিয়া আদালতের মাধ্যমে অধিকারসমূহকে বলবৎ করিবার অধিকারকে স্থগিত রাখিতে পারেন।

সংক্ষিপ্তসার

আত্মবিকাশের উপযোগী অপরিহার্য সুযোগসুবিধাগুলি যদি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া সাধারণ আইনসভা ও শাসন-কর্তৃপক্ষের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের আওতার বাহিরে থাকে তবে তাহারা 'মৌলিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত হয়। বর্তমান সময়ে সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা একরূপ রীতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে এইভাবেই অধিকারের সম্যক সংরক্ষণ সম্ভব—এইভাবেই উহারা আইন ও শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থাকিয়া 'মৌলিক' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত অধিকারসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) মৌলিক অধিকার, (খ) শাসন-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত অধিকারগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিসমূহ আদালতে বলবৎযোগ্য নহে।

ভারতীয় সংবিধানে সাত প্রকারের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে—যথা, (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার, এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

এই অধিকারগুলি নিরংকুশ বা অবাধ নহে। কোন অধিকারই অবাধ হইতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানে উক্ত অধিকারগুলির উপর কি কি বাধানিষেধ থাকিবে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the Fundamental Rights of the Indian Citizen under the Constitution of India? Why are they called 'Fundamental'? (H. S. (C) 1960)

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার কি কি? উহাদিগকে মৌলিক বলা হয় কেন? [১২-১৫ পৃষ্ঠা]

2. Describe the Fundamental Rights that have been incorporated in the Constitution of India. Are these rights absolute? (C. U. 1954)

ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট মৌলিক অধিকারগুলির বর্ণনা কর। এই অধিকারগুলি কি অবাধ? [১৩-১৬ পৃষ্ঠা]

3. State at least four of the Fundamental Rights of an Indian citizen. How are these Fundamental Rights protected in the Indian Constitution? (H. S. (H) 1961)

ভারতীয় নাগরিকের অন্তত চারিটি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ কর। কিভাবে মৌলিক অধিকারগুলিকে ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত করা হইয়াছে? [১৩-১৫ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

(Directive Principles of State Policy)

বলা হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি বিবৃত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রেরণা যোগাইয়াছে আয়ারলণ্ডের শাসনতন্ত্র। নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইল 'অর্থনৈতিক ও সমাজ-কল্যাণমূলক অধিকার'। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, দেশশাসন ব্যাপারে এই নীতিগুলি মৌলিক এবং আইন প্রণয়নে এই সকল নীতির প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় পুলিসী রাষ্ট্র (Police State) নয়, উহা হইল সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র।* গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই যথেষ্ট নয়, উহাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত না করিতে পারিলে গণতন্ত্র বাস্তবে কার্যকর হইতে পারে না। সমাজ-কল্যাণকর কাজকর্মের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধনে রাষ্ট্রকে নিয়োজিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে কার্যকর করার দায়িত্ব যে শাসকবর্গের রহিয়াছে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে সংবিধানে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র-গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সংবিধানের নির্দেশ

সংগে সংগে আবার সংবিধানে এ-কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, কোন আদালত এই নীতিগুলিকে বলবৎকরণে বাধ্য করিতে পারিবে না। অর্থাৎ, সরকার যদি এই নীতিগুলি অনুসরণ না করে অথবা ভংগ করিয়া চলে, তাহা হইলে আদালতে তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইবে না। নীতিগুলি প্রয়োগ করা বা না-করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সরকারের খুশির উপর। মৌলিক অধিকারগুলির বেলায় কিন্তু আদালতের ক্ষমতা রহিয়াছে ঐগুলিকে কার্যকর করিবার। কোন মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিয়া যদি আইন পাস করা হয়, তাহা হইলে আদালত ঐ আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে বাধ্য। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিবিরোধী কোন আইনকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না। আবার এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকার হইতে

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে পার্থক্য

---

* ৩ পৃষ্ঠা।

ব্যাপকতর এবং সমাজ-কল্যাণকর ও অর্থনৈতিক অধিকার হইল এই নীতিগুলির বিষয়বস্তু। কিন্তু এই নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে। যদি মৌলিক অধিকারের সহিত নির্দেশমূলক নীতির বিরোধ বাধে তাহা হইলে নির্দেশমূলক নীতিসংবলিত আইন বাতিল হইয়া যাইবে।

সংবিধানে উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

ভারতীয় সংবিধানে যে-সমস্ত নির্দেশমূলক নীতির কথা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :

(১) জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে যাহাতে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) রাষ্ট্র এমন নীতি অবলম্বন করিবে, (ক) যাহাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই জন্য উপযুক্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হয়, (খ) যাহাতে সর্বসাধারণের কল্যাণে দেশের সম্পদ সকলের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয়, (গ) যাহাতে ধনদৌলত ব্যবসাবাণিজ্য মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হইয়া সাধারণের স্বার্থের হানি না করে, (ঘ) যাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান কার্যের জন্য সমান বেতন পায়, (ঙ) যাহাতে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার না হয়, এবং (চ) যাহাতে শৈশব ও যৌবন শোষণের হাত হইতে রক্ষা পায়।

(৩) কার্যের ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকারাবস্থায় ও বার্ধক্যে, পীড়িতাবস্থায়, অংগহানি হইলে অথবা অন্যভাবে অভাবে পড়িলে সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) সকল শ্রেণীর শ্রমিক যাহাতে জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পায়, এবং পর্যাপ্ত অবসর, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত সুযোগ ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) রাষ্ট্রকে সমবায় বা ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসারসাধনের বিশেষ প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) সংবিধান চালু হইবার দশ বৎসরের মধ্যে বালকবালিকারা যাহাতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৭) গ্রাম-পঞ্চায়েত সংগঠন, তপশীলভুক্ত জাতি ও জনজাতি (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) এবং অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষাবিষয়ক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতিবিধান, খাদ্যপুষ্টি বৃদ্ধি ও জীবিকার মান উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষি ও পশুপালন সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৮) গুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্থান ও বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন বিভাগ হইতে

বিচার বিভাগের পৃথকিকরণ এবং ভারতের সর্বত্র নাগরিকদের জন্য একই প্রকারের দেওয়ানী আইনের প্রচলন, প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(৯) ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, জাতিতে জাতিতে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং সালিসির মারফত আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতির বর্ণনা করা হইয়াছে। এ-বিষয়ে প্রেরণা যোগাইয়াছে আয়ারল্যণ্ডের সংবিধান।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নহে। এখানেই মৌলিক অধিকারগুলির সহিত ইহাদের মূল পার্থক্য। উপরন্তু, নির্দেশমূলক নীতির বিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু মৌলিক অধিকারবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে না। পরিশেষে, মৌলিক অধিকারের সীমার মধ্যে থাকিয়াই নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে কার্যকর করিতে হইবে।

সমাজ-কল্যাণকর ও অর্থনৈতিক অধিকারই এই নির্দেশমূলক নীতিসমূহের বিষয়বস্তু। বিশেষ বিশেষ নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে—১। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, ২। সকলের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের ব্যবস্থা, ৩। শোষণের অবসান, ৪। পীড়িত ও বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্যের ব্যবস্থা, ৫। জীবনধারণোপযোগী মজুরির ব্যবস্থা, ৬। সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসারসাধন, ৭। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, ৮। গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন, ৯। গুরুত্বপূর্ণ স্মারক ও বস্তু সংরক্ষণ, এবং ১০। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টা—ভারত-রাষ্ট্রের কর্তব্য।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the Directive Principles of State Policy? Distinguish them from the Fundamental Rights. **(C. U. 1957 ; H. S. (H) Comp. 1960)**

রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি কাহাদের বলে? মৌলিক অধিকারসমূহ হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্দেশ কর। [১৭-১৯ পৃষ্ঠা]

2. Summarise the Directive Principles of State Policy. What is the significance of these principles? **(C. U. 1960)**

নির্দেশমূলক নীতিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। নীতিগুলির তাৎপর্য কি? [১৭-১৯ পৃষ্ঠা]

3. What is meant by Directive Principles of State Policy as adopted in the Constitution of India. Illustrate your answer. **(H. S. (H) 1962)**

ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত 'রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি' বলিতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ উত্তর দাও। [১৭-১৯ পৃষ্ঠা]

4. Write a brief note on the Directive Principles of State Policy as laid down in the Constitution of India. **(C. U. 1962)**

ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতিসমূহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [১৭-১৯ পৃষ্ঠা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র
(The Federation of India)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of the Indian Federation): বর্তমান সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা 'রাজ্য-সংঘ' (Union of States) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহার করিয়া ভারতের বিভিন্ন অংশ যে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত আছে তাহা বুঝানো হইয়াছে। কোন রাজ্য বা অংশের ভারতীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার আইনগত ক্ষমতা নাই।

ভারতকে 'রাজ্যসংঘ' বলা হইয়াছে কেন

ভারতকে 'রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন' বা রাজ্যসংঘ বলা হইলেও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়া বিচার করিলে ভারতকে এককেন্দ্রিক নহে, যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যই সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। (১) এখানে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সংবিধান দ্বারা বণ্টিত হইয়াছে; (২) ভারতীয় সংবিধান লিখিত ও একরূপ দুষ্পরিবর্তনীয়; এবং (৩) ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আছে। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রের হস্তে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং ভারতকে সম্পূর্ণভাবে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। উপরন্তু, দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার দ্বারা ইহাকে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কিভাবে ইহা করিতে পারেন তাহা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রসংগে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষণগুলি বিদ্যমান

আমরা দেখিয়াছি যে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমস্ত শাসনক্ষমতা আইনগতভাবে কেন্দ্রের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্র স্থানীয় সরকারসমূহকে কতকগুলি ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়। এই ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্র আবার ইচ্ছামত ফিরাইয়া লইতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র রাজ্যসমূহের ক্ষমতা কোন সময়ই কাড়িয়া লইতে পারে না।* সাধারণ সময়ে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য কোন রাজ্যের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; কিন্তু ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে আপৎকালীন অবস্থা ইত্যাদি ঘোষিত হইলে রাজ্যের শাসন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে

কিন্তু ভারত একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র

* যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের আলোচনার জন্য পৌরবিজ্ঞানের ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

আসিতে পারে। এই সকল কারণে বলা হইয়াছে যে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের শাসনব্যবস্থা একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন (Federalism in India): ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষ শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া দুই অংশে বিভক্ত ছিল—ব্রিটিশ ভারত এবং ভারতীয় ভারত। ভারতীয় ভারত বলিতে দেশীয় রাজ্যসমূহকে বুঝাইত। শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়াই ব্রিটিশ ভারত আবার দুই অংশে বিভক্ত ছিল—গভর্ণর-শাসিত প্রদেশসমূহ এবং চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশসমূহ। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু নানা কারণে এই পরিকল্পনা কার্যকর হয় নাই।

ব্রিটিশ আমলে ভারতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যখন ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিল তখন ভারতে ৯টি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ, ৫টি চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ এবং ৫৫০-এর অধিক দেশীয় রাজ্য ছিল। এই দেশীয় রাজ্যগুলি আবার ছিল তিন শ্রেণীর। ১০০-এর কিছু অধিক ছিল বৃহৎ দেশীয় রাজ্য; প্রায় ঐ সংখ্যকই ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য; এবং প্রায় ৩৫০টি ছিল ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য যাহাদের জায়গির ছাড়া আর কিছুই বলা যাইত না। ক্ষমতা-হস্তান্তরের সময় ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিতে একরূপ পার্লামেন্টীয় সরকার প্রবর্তিত থাকিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলি রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাতন্ত্রের অধীন ছিল।

ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিবার পর দেশীয় রাজ্যগুলি আইনত স্বাধীন হইল। কিন্তু ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ইহাদের পক্ষে স্বাধীন অবস্থায় থাকা সম্ভব হইল না। ভারতের সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ডোমিনিয়নের* সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইল। ফলে বহু শতাব্দী পরে রাষ্ট্রনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সূত্রে গ্রথিত এক 'মহাভারতে'র উদ্ভব হইল। ভারতে যোগদানের পর ঐ সকল দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে দুইটি শক্তি কার্য করিতে লাগিল: একটি শক্তি ইহাদিগকে একীভূত হইবার প্রেরণা দিতে লাগিল, অপরটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনে সহায়তা করিল। এই দুই শক্তির কার্যের ফলে অনেক দেশীয় রাজ্য পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গেল; অনেক ক্ষেত্রে কয়েকটি বা অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য মিলিয়া রাজ্য-সম্মেলন গড়িয়া উঠিল; কয়েকটি বৃহৎ দেশীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বজায় রহিল। ইহার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা ৫৫০ হইতে ক্রমশ ১৬-তে নামিয়া আসিল।

'মহাভারতে'র উদ্ভব

* 'ভারতীয় ডোমিনিয়ন' (Indian Dominion) বলা হইয়াছে, কারণ ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর ভারত 'ডোমিনিয়ন মর্যাদা' (Dominion Status) লাভ করে। পরে নূতন শাসনতন্ত্র বা ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইলে ভারত প্রজাতন্ত্রে (Republio) পরিণত হয়।

এই ১৬টি দেশীয় রাজ্য ও রাজ্য-সম্মেলন এবং ডোমিনিয়ন ভারতের গভর্ণর-শাসিত ও চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশসমূহ লইয়া ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় 'যুক্তরাষ্ট্র' গঠিত হইল।

ভারতীয় ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহ (The Indian Union and the States): বর্তমান শাসনতন্ত্রে অংগরাজ্যসমূহকে রাজ্য (States) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অংগরাজ্যগুলি (constituent units) সাধারণত একই শ্রেণীর হয়। কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়ন ও রাজ্যসংঘ ছিল এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। তবে রাজ্য-পুনর্গঠন আইন দ্বারা ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে সকল রাজ্যকে একই শ্রেণীভুক্ত করিয়া উপরি-উক্ত সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্ঠাই করা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় সংবিধান যখন ভারতীয় জনগণের পক্ষে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় তখন অংগরাজ্যগুলি সংখ্যায় ছিল মোট ২৮টি। রাজ্যগুলি ক খ ও গ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ক শ্রেণীতে ছিল ৯টি রাজ্য—আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ* এবং পশ্চিমবংগ। খ শ্রেণীতে ছিল ৯টি রাজ্য—হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্য-সম্মেলন, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাংকুর-কোচিন এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ।

অংগরাজ্যসমূহের পুনর্গঠন

গ শ্রেণীতে ছিল ১০টি রাজ্য—আজমীর, ভূপাল, বিলাসপুর, কুচবিহার, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা। ইহা ছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 'ঘ অংশের রাষ্ট্রক্ষেত্র' (Territories) বলিয়া অভিহিত ছিল।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা হইতে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে রাজ্য-পুনর্গঠন পর্যন্ত নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কুচবিহার পশ্চিমবংগের অন্তর্ভুক্ত হয়; বিন্ধ্যপ্রদেশ গ শ্রেণীর রাজ্যে পরিণত হয়; মাদ্রাজ রাজ্যকে ভাঙিয়া মাদ্রাজ ও অন্ধ্র এই দুইটি রাজ্য গঠন করা হয়; এবং ১৯৫৪ সালে বিলাসপুরকে হিমাচলপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরন্তু, ফরাসী উপনিবেশসমূহ ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হয়।

১৯৫৩ সালে অন্ধ্র রাজ্য গঠনের পর ভারত সরকার অবিলম্বে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা ও ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যসমূহের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া এক কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন (States Reorganisation Commission) নামে অভিহিত। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে কমিশনের রিপোর্ট

পুনর্গঠন কমিশন

* পরে নাম পরিবর্তন করিয়া উত্তরপ্রদেশ করা হয়।

ও সুপারিশ প্রকাশিত হয়। সুপারিশ অনুসারে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটিবার কথা ছিল :

১। মোট রাজ্যসংখ্যা ২৭ হইতে কমিয়া ১৬-তে দাঁড়াইবে ;

২। গ শ্রেণীর সকল রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং খ শ্রেণীর যে-সকল রাজ্য বর্তমান থাকিবে তাহারা ক শ্রেণীর রাজ্যগুলির সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া একই শ্রেণীভুক্ত হইবে ;

৩। মাত্র মণিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনে থাকিবে ;

৪। মহাকোশল, কেরল, কর্ণাটক, বিদর্ভ এবং তেলেংগানা—এই পাঁচটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইবে ;

৫। উপরি-উক্ত ১৬টি রাজ্য যথাক্রমে হইবে—অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহাকোশল, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, কর্ণাটক, বিদর্ভ, তেলেংগানা, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবংগ।

রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ বাহির হইবার পর সরকারী ও কংগ্রেসী মহলে বিশেষ আলোচনা চলে, এবং নানা আন্দোলনও সুরু হয়। অবশেষে ভারত সরকার কমিশনের সুপারিশের অনেকাংশে পরিবর্তন-সাধন করিয়া ১৯৫৬ সালে তিনটি আইন পাস করে। আইন তিনটি হইল : রাজ্য-পুনর্গঠন আইন, বিহার-পশ্চিমবংগ ভূমি-হস্তান্তর আইন এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন। এই তিনটি আইনের ফলে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটে :

ভারতীয় রাজ্যসংঘের গঠন

১। ভারতীয় রাজ্যসংঘ ১৪টি রাজ্য ও ৬টি ইউনিয়ন রাষ্ট্রক্ষেত্র (Union Territories) বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত হয়।

২। এই ১৪টি রাজ্য ছিল যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবংগ। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ৬টি ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ (the Laccadive Minicoy and Amindivi Islands)।*

৩। উপরি-উক্ত ১৪টি রাজ্যের প্রত্যেকটি একই শ্রেণীভুক্ত হয়—অর্থাৎ, ক খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যের পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে খ শ্রেণীর রাজ্যপ্রধান রাজপ্রমুখের পদও বিলুপ্ত হয়।

উপরন্তু, সন্নিহিত রাজ্যসমূহের পারস্পরিক, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক এবং সীমানা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধান সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য—এই পাঁচটি 'আঞ্চলিক পরিষদ' (Zonal Councils) গঠন করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদ

* এই দ্বীপপুঞ্জ পূর্বে মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

ইহার পর ১৯৬০ সালে ১লা মে তারিখে আবার বোম্বাই রাজ্যকে দুই ভাগ করিয়া মারাঠী ভাষাভাষী মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং গুজরাটী ভাষাভাষী গুজরাট রাজ্য গঠন করায় ভারতীয় ইউনিয়নের অংগরাজ্যের সংখ্যা ১৪-এর স্থলে ১৫-তে দাঁড়ায়। পরিশেষে, নাগা পাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চলকে (The Naga Hills Tuensang Area) ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নাগাভূমি (Nagaland) নামে অভিহিত করিয়া প্রথমে এক স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা (status of a separate State) দেওয়া হয়, এবং পরে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহাকে নাগাভূমি নামেই পুরাপুরি অংগরাজ্যে পরিণত করা হয়। ফলে বর্তমানে অংগরাজ্যের সংখ্যা ১৬-তে দাঁড়াইয়াছে।

সর্বশেষ রাজ্য নাগাভূমি

ভারতীয় রাজ্যসংঘের বর্তমান গঠন

ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকার	রাজ্য সরকার-সমূহ	কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল-সমূহ
	১। অন্ধ্র প্রদেশ	১। দিল্লী
	২। আসাম	২। হিমাচলপ্রদেশ
	৩। বিহার	৩। মণিপুর
	৪। মহারাষ্ট্র	৪। ত্রিপুরা
	৫। গুজরাট	৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
	৬। মধ্যপ্রদেশ	৬। লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ
	৭। মাদ্রাজ	৭। দাদরা ও নগর হাভেলি
	৮। উড়িষ্যা	৮। গোয়া, দমন ও দিউ
	৯। পাঞ্জাব	৯। পণ্ডিচেরি*
	১০। উত্তরপ্রদেশ	
	১১। পশ্চিমবংগ	
	১২। জম্মু ও কাশ্মীর	
	১৩। মহীশূর	
	১৪। রাজস্থান	
	১৫। কেরল	
	১৬। নাগাভূমি	

* পণ্ডিচেরি ইত্যাদি সমুদ্রোপকূলবর্তী ফরাসী উপনিবেশসমূহ ভারতের নিকট হস্তান্তরিত হয় ১৯৫৬ সালের এক চুক্তির দ্বারা। এই চুক্তি ফরাসী পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে। অধুনা সংবিধানের ১৪শ সংশোধন দ্বারা কয়েকটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে বিধানমণ্ডল ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের সংগে সংগে পণ্ডিচেরি ইত্যাদিকে ৯ম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

এইভাবে অংগরাজ্য ছাড়াও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথাক্রমে ১৯৬১ সালে সংবিধানের দশম এবং ১৯৬২ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন দ্বারা পর্তুগীজ অধীনতাপাশ-মুক্ত ভূতপূর্ব পর্তুগীজ উপনিবেশ দাদরা ও নগর হাভেলি এবং গোয়া, দমন ও দিউ দুইটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর পণ্ডিচেরি প্রভৃতি সমুদ্রোপ-কূলবর্তী ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশসমূহ ভারত ও ফরাসী সরকারের মধ্যে চুক্তিক্রমে ভারতের নিকট হস্তান্তরিত হইয়া অন্যতম কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ফলে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের সংখ্যা ৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯-এ দাঁড়াইয়াছে। অতএব, ভারতীয় রাজ্যসংঘ বর্তমানে ১৬টি অংগ-রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত।

নূতন বিশেষ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন (Distribution of Powers between the Union and States) : শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংবিধান সরকারের ক্ষমতাসমূহকে একদিকে ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং অপরদিকে জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া অপর রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত করিয়া দিয়াছে। ক্ষমতার বণ্টন নিম্নলিখিতভাবে করা হইয়াছে : ক্ষমতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটি তালিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রথম তালিকাকে বলা হইয়াছে 'ইউনিয়ন তালিকা' (Union List)। এই তালিকায় আছে ৯৭টি বিষয়। এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণভাবে ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকাধীন; কোন রাজ্য সরকারের ইহাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই।

ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি

দ্বিতীয় তালিকাকে 'রাজ্য তালিকা' (State List) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। রাজ্য তালিকায় আছে ৬৬টি বিষয়। এই বিষয়গুলি রাজ্য সরকারসমূহের এলাকাধীন। ইহাদের সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা সাধারণ অবস্থায় ইউনিয়ন সরকারের নাই। কিন্তু যদি, (১) জরুরী অবস্থা ইত্যাদি ঘোষিত হয়, অথবা (২) পার্লামেণ্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদন করে যে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই প্রয়োজন, তবে পার্লামেণ্ট রাজ্য সরকারের এলাকাধীন কোন বিষয়ে সমগ্র ভারতের জন্য বা ভারত-রাষ্ট্রের কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (৩) আন্তর্জাতিক সন্ধি প্রভৃতির সর্তাদি পালনের জন্যও রাজ্যের এলাকাধীন কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত বা যে-কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার

কয়েক ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে

ক্ষমতা কেন্দ্রের আছে। (৪) দুই বা ততোধিক রাজ্য অনুরোধ করিলেও পার্লামেণ্ট অনুরোধকারী রাজ্যগুলির সম্পর্কে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহা ব্যতীত, ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন অঞ্চল কোন রাজ্যের অন্তর্গত না হইলে ঐ অঞ্চল সম্পর্কে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ের উপর যে-কোন সময় আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে।

তৃতীয় তালিকাটির নাম হইল 'যুগ্ম তালিকা' (Concurrent List)। যুগ্ম তালিকা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের এলাকাধীন বিষয়গুলি লইয়া রচিত হইয়াছে। এই তালিকায় ৪৭টি বিষয় আছে। এইগুলি সম্পর্কে ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি এই তালিকার কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজ্য সরকার-প্রণীত আইনের সংঘর্ষ বাধে তবে রাজ্য সরকারের আইন বাতিল হইয়া যাইবে।

এখন তিনটি তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন :

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় (৯৭টি)

প্রতিরক্ষা
স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী
যুদ্ধ ও শান্তি
আণবিক শক্তি
পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংক্রান্ত ব্যাপার
রেলপথ
বিমানপথ
নৌ-বিভাগ
প্রধান প্রধান বন্দর
নাগরিকতা
রিজার্ভ ব্যাংক
রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank)
মুদ্রা-ব্যবস্থা
বীমা
জনগণনা
পার্লামেণ্ট প্রভৃতির নির্বাচন
ডাক, তার ও বেতার
লবণ
আফিম
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
বৈদেশিক ঋণ, জাতীয় ঋণ, প্রভৃতি।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় (৬৬টি)

রাজ্যের শান্তিশৃংখলা রক্ষা—অর্থাৎ, পুলিস, বিচার-ব্যবস্থা, জেল ইত্যাদি
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
কৃষি, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা
আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্য
শিক্ষা
বন
মৎস্য
পরিবহণ
সেচকার্য
সমবায় আন্দোলন
রাস্তাঘাট, প্রভৃতি।

যুগ্ম এলাকাধীন বিষয় (৪৭টি)

দেওয়ানী কার্যবিধি
বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ
দেউলিয়া
মূল্য-নিয়ন্ত্রণ
কারখানা
বৈদ্যুতিক শক্তি
সংবাদপত্র, পুস্তক ও মুদ্রাযন্ত্র
শ্রমিক-সংঘ এবং শ্রমিক-সংঘাত
ছোট ছোট বন্দর, প্রভৃতি।

ক্ষমতা বণ্টনের আলোচনা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইউনিয়ন সরকার এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই বিশেষ সম্পর্কের কারণ হইল ভারত সরকার এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মধ্যে বিশেষ চুক্তি। এই চুক্তি দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীর ভারত সরকারকে মাত্র কয়েকটি বিষয় সমর্পণ করিয়া বাকিগুলি নিজ হস্তে রাখিয়াছে। এ-বিষয়ে রাজ্যসমূহের আলোচনা প্রসংগে আরও আলোচনা করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসংঘ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্র; কারণ, এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। ভারতকে অবশ্য 'যুক্তরাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। এই কারণে বলা হয় যে ভারত একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন: ব্রিটিশ আমলেই ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ভারতে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে—যে দিন বর্তমান সংবিধান প্রবর্তিত হয়। অবশ্য ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যায় কিনা সে-বিষয়ে মতবিরোধ আছে।

ইউনিয়ন ও রাজ্যসমূহ: বর্তমানে ভারতীয় রাজ্যসংঘ ১৬টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন: যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অনুসরণে ভারতে ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তিনটি তালিকা রচিত হইয়াছে। প্রথম তালিকায় আছে ইউনিয়ন সরকারের ৯৭টি অনন্য (exclusive) ক্ষমতা। দ্বিতীয় তালিকায় আছে রাজ্যসমূহের ৬৬টি ক্ষমতা। তৃতীয় তালিকাভুক্ত ৪৭টি বিষয় ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারসমূহ উভয়েরই কর্তৃত্বাধীন।

কয়েক ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয় বা যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজ্যের আইনসভা-প্রণীত আইনের সংঘর্ষ বাধিলে প্রথমোক্ত আইন বলবৎ হইবে এবং দ্বিতীয়োক্ত আইন বাতিল হইয়া যাইবে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে ক্ষমতা একটু স্বতন্ত্রভাবে বণ্টিত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The Constitution of India is more unitary than federal." Discuss.
"ভারতীয় সংবিধান প্রকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় অপেক্ষা এককেন্দ্রিক।" আলোচনা কর।
[২-৩ এবং ২০-২১ পৃষ্ঠা]

2. State the nature of the Indian Federation as established by the Constitution of India. (H. S. (C) 1960)
ভারতীয় সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বর্ণনা কর। [২-৩ এবং ২০-২১ পৃষ্ঠা]

3. State and explain the important characteristics of the Federation in India. (H. S. (H) Comp. 1960 ; H. S. (H) 1961)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর। [২-৩ এবং ২০-২১ পৃষ্ঠা]

4. Write an essay on Federalism in India.

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন লইয়া একটি ছোট প্রবন্ধ রচনা কর। [২১-২৫ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the scheme of distribution of powers between the Union and the States under the Constitution of India. (H. S. (H) Comp. 1961, '62)

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি লইয়া আলোচনা কর। [২৫-২৭ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

ইউনিয়ন সরকার

(Union Government)

শাসন বিভাগ (The Executive) : বলা হইয়াছে, স্বাধীন ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে।* এই দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদ লইয়া গঠিত; এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগ রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা ও রাজ্যসভা—এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। শাসন বিভাগের আলোচনা রাষ্ট্রপতি হইতে সুরু করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতি (The President) : রাষ্ট্রপতিকে ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া অভিহিত করা চলে। ডাঃ আম্বেদকারের ভাষায়, "আমাদের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের পতি, কিন্তু শাসন বিভাগের কর্তা নহেন। তিনি জাতির প্রতীক, কিন্তু জাতিকে শাসন করেন না।" শাসন বিভাগের কর্তা হইলেন প্রধান মন্ত্রী। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর পদের সহিত আমাদের রাষ্ট্রপতির পদের কতকটা তুলনা করা চলে। আইনত উভয়েই প্রধান শাসক হইলেও, কার্যত দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে উভয়েই মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। উভয়েরই পদের মর্যাদা আছে, কিন্তু কাহারও কর্তৃত্ব নাই; সুতরাং দায়িত্বও নাই।

রাষ্ট্রপতি-পদের প্রকৃতি

নির্বাচন (Election) : রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন না। তিনি এক বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচকমণ্ডলী (ক) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, এবং (খ) রাজ্যের বিধানসভাসমূহের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ লইয়া গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন

* ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

ভোটের ব্যাপারে দুইটি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে—(ক) দেখা হয় যে পার্লামেন্টের সদস্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে যেন মোট ততগুলি ভোট থাকে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণের; এবং (খ) যেন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে সমতা থাকে। এই দুইটি নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা নির্ধারিত হয়:

প্রথমে রাজ্যের জনসংখ্যাকে ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেওয়া হয়। ভাগফলকে আবার ১০০০ দ্বারা ভাগ করা হয়। এইবার যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই হইল ঐ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত প্রত্যেক সদস্যের ভোটদানের সংখ্যা। এই সংখ্যাকে ঐ রাজ্যের নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ঐ রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে। সকল রাজ্যের মোট ভোটসংখ্যাগুলি যোগ করিলে যে-সংখ্যা হইবে, তাহাই পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা। (পূর্বেই বলা হইয়াছে রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মোট যতগুলি ভোট থাকে ততগুলিই ভোট থাকে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের।) পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা পাওয়া গেলে তাহাকে নির্বাচিত সদস্য-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে-ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহাই পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রত্যেকের ভোটদানের সংখ্যা।*

যে-পদ্ধতি দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহা একটি জটিল পদ্ধতি। সংবিধানে ইহাকে এক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation by means of the Single Transferable Vote) বলা হইয়াছে। পদ্ধতিটি এইরূপ: ভোটাধিকারী ব্যালট কাগজে নির্বাচনপ্রার্থীদের নামের পাশে তাঁহার পছন্দ (preference) অনুসারে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা বসাইবেন। ২য়, ৩য় এবং পরবর্তী পছন্দ তিনি নাও জানাইতে পারেন, কিন্তু প্রথম পছন্দ তাঁহাকে জানাইতেই হইবে। না জানাইলে তাঁহার ভোট বাতিল হইয়া যাইবে।

ভোটদান সমাপ্ত হইলে ব্যালট কাগজের মোট সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ

---

* বিষয়টিকে বুঝাইবার জন্য একটি কল্পিত উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, পশ্চিমবংগের জনসংখ্যা মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ এবং পশ্চিমবংগের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা ২৫২। এই জনসংখ্যাকে সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১ লক্ষ। এই ভাগফলকে আবার এক হাজার দ্বারা ভাগ করিলে (১,০০,০০০÷১০০০) ভাগফল হয় ১০০। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পশ্চিমবংগের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ১০০ ভোট থাকিবে। নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৫২ হওয়ায় সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা হইবে ২৫,২০০। এইভাবে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি সকল রাজ্যের সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা বাহির করা যাইতে পারে। তারপর এই সকল মোট ভোটসংখ্যাকে যোগ দিলে যে-সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাই হইল পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোটসংখ্যা। উহাকে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে।

করিয়া তাহার সহিত এক যোগ করা হয়। ইহাতে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে 'কোটা' (Quota) বলে। প্রথমে ১ম পছন্দের ভোটগুলি গণনা করিয়া দেখা হয় যে, কেহ কোটা পাইয়াছেন কিনা। কোটা পাইলেই তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়; কেহ কোটা না পাইলে সর্বনিম্ন-সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়া তাঁহার প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদেব নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। ইহাতেও যদি কেহ কোটা না
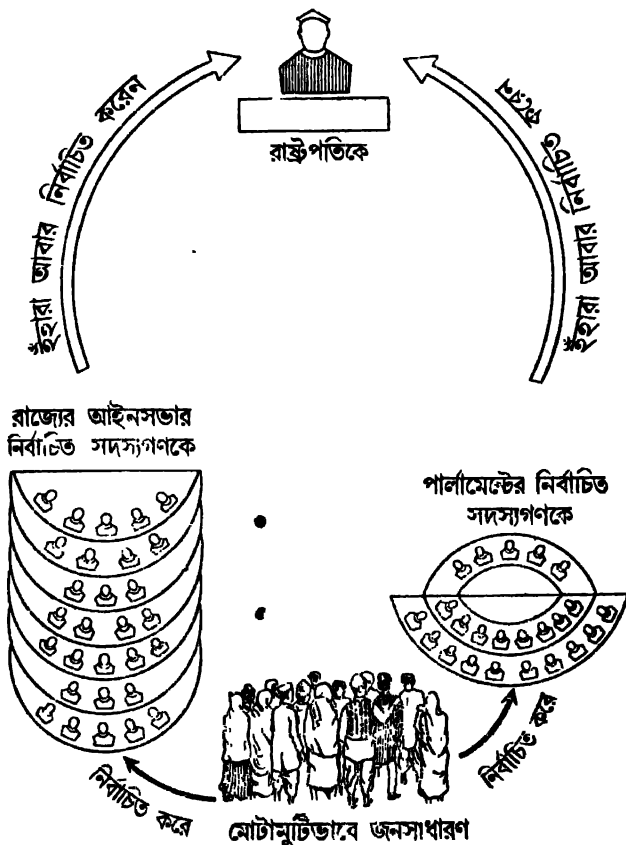
পান তবে তৃতীয়বার এইরূপ করা হয়। এইভাবে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না একজন প্রার্থী কোটা প্রাপ্ত হন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থীবাদ ও ভোট-হস্তান্তরকার্য চলিতে থাকে।

এইরূপ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ: রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এইরূপ জটিল পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বনের তিনটি কারণ আছে।

কেন এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে

(ক) ভারতের ন্যায় বিশাল দেশে বিপুল নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার;

(খ) নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না করাই যুক্তিযুক্ত; করিলে তিনি প্রকৃত শাসনক্ষমতা দাবি করিতে পারেন। তাঁহাকে প্রকৃত শাসনক্ষমতা দিলে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকে না; এবং ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার (Parliamentary Government). স্বরূপও বজায় রাখা যায় না;

(গ) রাষ্ট্রপতি যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে, অর্থাৎ মোট ভোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশী পাইয়া, নির্বাচিত হন সেই উদ্দেশ্যে 'সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যদি সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত তবে রাষ্ট্রপতি-পদে নিবাচনপ্রার্থীর সংখ্যা বেশী থাকিলে রাষ্ট্রপতি সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোটেও নির্বাচিত হইতে পারিতেন। এইরূপ ঘটনা গণতন্ত্রের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই এক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি (Tenure and Removal of the President): রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন। কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তিনি পদত্যাগও করিতে পারেন। শাসনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আবার পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই বিচার করিতে পারে সংবিধানভংগের অভিযোগে। যে-কোন পরিষদ সংবিধানভংগের অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে। অভিযোগ প্রস্তাবাকারে আনিতে হয়। এইরূপ প্রস্তাব আনয়ন করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন এক-চতুর্থাংশের দ্বারা স্বাক্ষরিত অন্তত চৌদ্দ দিনের এক লিখিত নোটিস দিয়া প্রস্তাব উত্থাপনের অভিপ্রায় জানাইতে হইবে। ইহার পর প্রস্তাবটি ঐ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাস হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে পার্লামেন্টের এক পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অপর পরিষদ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে বা অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী পরিষদ যদি উহার মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে রাষ্ট্রপতি পদ হইতে অপসারিত হইবেন।

কিভাবে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়

রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচনপ্রার্থীকে অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। লাভজনক কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট বা কোন রাজ্যের আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না। এরূপ কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে যে-দিন তিনি

রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সেই দিন হইতে তাঁহার পার্লামেণ্টের বা রাজ্যের আইনসভার পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শাসনভার গ্রহণের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান অনুযায়ী শপথ বা স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হয় যে তিনি বিশ্বস্ততার সহিত রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করিবেন, সাধ্যানুসারে সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন এবং নিজেকে ভারতীয় জনগণের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (Powers of the President) : ইউনিয়ন সরকারের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য তিনি দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি অনুযায়ী মন্ত্রি পরিষদের পরামর্শ অনুসারেই এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইনত সকল ক্ষমতাই রাষ্ট্রপতির ; তাঁহার নামেই শাসনকার্য পরিচালিত এবং সরকারী আদেশসমূহ প্রচারিত হয়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা হইল মন্ত্রি-পরিষদের। ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতিকে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায় মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার এই মৌলিক নীতিটি স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়—শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, আইন বিষয়ক ক্ষমতা, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।

(ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা: রাজ্যপালগণ, প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General), নির্বাচন কমিশনার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, এ্যাটর্নী-জেনারেল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান 'সদর-ই-রিয়াসৎ' রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বীকৃত হন।

রাষ্ট্রপতি স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর প্রভৃতি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির (Union Territories) শাসনকার্য রাষ্ট্রপতিরই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শাসন বিষয়ে সমতা ও সহযোগিতার জন্য তিনি এক আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter State Council) নিযুক্ত করিতে পারেন।* জরুরী অবস্থায় তিনি রাজ্যপালের শাসন-পরিচালনা সম্পর্কে যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিবার অথবা তাহার দণ্ডাদেশ হ্রাস করিবার অথবা দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

* রাজ্য-পুনর্গঠন আইন অনুসারে ৫টি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(খ) আইন বিষয়ক ক্ষমতা : পার্লামেন্টীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগ বা পার্লামেন্টের একটি অংগ। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল (Bill) আইনে পরিণত হইতে পারে না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তিনি সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, অথবা বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে ফেরত পাঠাইতে পারেন।*

কেন্দ্রের আইন ছাড়াও রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হইতে পারে। রাজ্যের আইনসভা কোন বিল পাস করিলে তাহা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল নিজে সম্মতি বা অসম্মতি কোন কিছুই জ্ঞাপন না করিয়া বিলটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সরাসরি তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারেন। এ-ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সম্মতি না দিবার ক্ষমতা আছে।

রাজ্যের আইন প্রণয়ন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ বা রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাতেও তাঁহার অনধিক দুইজন ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিবার ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সাধারণত পার্লামেন্টের উদ্বোধনী সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় সরকারী কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং যে-যে কারণে অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো হয়। পার্লামেন্টের যে-কোন পরিষদে তিনি অন্য যে-কোন সময় বক্তৃতা করিতে বা নির্দেশ পাঠাইতে পারেন।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী রাখা এবং নিম্ন পরিষদ বা লোকসভাকে ভাঙিয়া দিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে।

পার্লামেন্ট অধিবেশনে না থাকিলে রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। এইরূপ আইন বা অর্ডিন্যান্স পার্লামেন্ট অধিবেশনে বসার পরও ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত কার্যকর থাকিতে পারে।

(গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা : পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী ব্যয়বরাদ্দ করিবার এবং খরচের অনুমতি দিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকে আইনসভার হস্তে। কিন্তু শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্দের দাবি করা না হইলে এবং খরচের অনুমতি চাওয়া না হইলে আইনসভা ব্যয়বরাদ্দ করিতে বা খরচের অনুমতি দিতে পারে না। আবার নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার সুপারিশ ব্যতিরেকে শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে বরাদ্দের দাবি করা যায় না। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে ব্যয়বরাদ্দের কোন দাবি করা যায় না।

পার্লামেন্টীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার রীতি

* অর্থ-সম্বন্ধীয় কোন বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো যায় না।

তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত অর্থ-সম্বন্ধীয় কোন বিলই লোকসভায় আনয়ন করা যায় না।

রাষ্ট্রপতি প্রতি ‘আর্থিক বৎসরে’র (Financial Year)* প্রারম্ভে সেই বৎসরের জন্য ইউনিয়ন সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব লইয়া একটি বিবৃতি মন্ত্রী মারফত পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে পেশ করান। এই বিবৃতিকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বাজেট’ (Budget) বলা হয়।

অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য তহবিল

অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বাধীনে একটি তহবিল (Contingency Fund) আছে। ইহার পরিমাণ ১৫ কোটি টাকার মত। হঠাৎ কোন অনিশ্চিত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইলে পার্লামেণ্টের অনুমোদন পাইবার পূর্বেই তিনি এই তহবিল হইতে ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতিকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর বা তাহার পূর্বেই একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করেন।

তিন ধরনের জরুরী সংক্রান্ত ক্ষমতা

(ঘ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা: ভারতের বর্তমান সংবিধান তিন ধরনের জরুরী অবস্থার কল্পনা করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দিয়াছে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা ভারতের বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তবে তিনি ‘আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা’ (Proclamation of Emergency) করিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইনসভা

১। আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা

—অর্থাৎ, পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ অনুমোদন করিলে এই ঘোষণা দুই মাসেরও অধিক বলবৎ থাকিতে পারে। ঘোষণা বলবৎ থাকাকালীন ইউনিয়ন সরকার রাজ্য সরকারের এলাকাধীন আইন বিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে। ইহা ছাড়া এইরূপ জরুরী অবস্থা বর্তমান থাকাকালীন রাষ্ট্রপতিও কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন।

এইরূপ ঘোষণার দৃষ্টান্ত

ভারতে এ-পর্যন্ত একবার এইরূপ আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষণা করা হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে চীন কর্তৃক সীমান্ত আক্রমণের ফলে ভারতের নিরপত্তা বিপন্ন হইলে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি কোন রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া

* আর্থিক বৎসর এপ্রিল মাস হইতে পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাস পর্যন্ত।

অথবা অন্য কোন কারণে মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ঐ রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হওয়া সম্ভব নহে, তবে তিনি ঘোষণার দ্বারা ঐ রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতাই নিজ হস্তে তুলিয়া লইতে পারেন এবং আইন বিষয়ক সকল ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে প্রদান করিতে পারেন। রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের কোন ক্ষমতা অবশ্য তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না বা কাহাকেও প্রদান করিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির এইরূপ ঘোষণাকে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা' (Failure of Constitutional Machinery) ঘোষণা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অনুমোদন পাইলে এইরূপ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সর্বাধিক তিন বৎসর পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারে।

২। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা

পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরল রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে এইরূপ শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সমগ্র দেশের বা দেশের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি এক 'আর্থিক সংকটাবস্থা' (Financial Emergency) ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এইরূপ সংকটাবস্থায় সরকারী কর্মচারীর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যাইতে পারে।

৩। আর্থিক সংকটাবস্থার ঘোষণা

উপরাষ্ট্রপতি (The Vice-President): ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতিও আছেন। তিনি পদাধিকার বলে পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ বা রাজ্যসভার সভাপতি। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এক নির্বাচন-সংস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন।* নির্বাচন-পদ্ধতিকে এ-ক্ষেত্রেও 'এক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' বলা হইয়াছে। আবার রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিকেও কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পদচ্যুত করা যায়। তবে রাষ্ট্রপতির ন্যায় এই পদচ্যুতির ক্ষেত্রে ঠিক ইমপিচ্‌মেণ্ট পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদও পাঁচ বৎসর। রাজ্যসভায় মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের দ্বারা পদচ্যুতির প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং ঐ প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি প্রদান করিলেই উপরাষ্ট্রপতি তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে অথবা তিনি অসুস্থ বা পদচ্যুত হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন। মৃত্যু, পদচ্যুতি বা পদত্যাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্ট্রপতি অবশ্য

* ১৯৬১ সালে সংবিধানের একাদশ সংশোধন দ্বারা এই নির্বাচন-সংস্থার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সংশোধনের পূর্বে সংবিধানের ব্যবস্থা ছিল যে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্যগণ সংযুক্ত অধিবেশনে মিলিত হইয়া উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করিবেন।

রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন না—রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন মাত্র। রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের দ্বারাই পূরণ করা হয়।

মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রি-পরিষদের হস্তে এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার স্বেচ্ছাধীন কোন ক্ষমতা থাকে না।

ভারতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবার জন্য এবং তাঁহাকে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রি-পরিষদ আছে। প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান মন্ত্রী হইলেন পার্লামেণ্টের নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রি-পরিষদের আলাপ-আলোচনা ও প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাত করান। রাষ্ট্রপতি যে-বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহিবেন সে-বিষয়ে তাঁহাকে জ্ঞাত করানো প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য।

প্রত্যেক মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের দুইটি পরিষদের যে-কোন একটির সদস্য হইতে হয়। যদি এরূপ কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন যিনি পার্লামেণ্টের কোন পরিষদেরই সভ্য নহেন, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে হইবে। না হইতে পারিলে তাঁহার মন্ত্রিত্ব বজায় থাকিবে না। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল।

সকল মন্ত্রীই মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য নহেন। যাঁহারা মন্ত্রি-পরিষদের সভ্য তাঁহাদের 'পরিষদভুক্ত মন্ত্রী' (Cabinet Ministers) বলা হয়। তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers) আছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীরা পদমর্যাদায় পরিষদ-ভুক্ত মন্ত্রিগণ অপেক্ষা নিম্ন।

সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিগণের পদে অধিষ্ঠিত থাকা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও, মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী বলিয়া যতদিন লোকসভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিনই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লোকসভার আস্থাভাজন কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রি-মণ্ডলীকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করেন না। পদচ্যুত করিলে তাঁহাকে আর একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পদচ্যুত মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি যদি লোকসভার আস্থা থাকে, তবে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করা অর্থহীন, কারণ নবগঠিত মন্ত্রি-মণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপন করিয়া লোকসভা উহাকে পদচ্যুত করিবে। তবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে মন্ত্রি-মণ্ডলী সংবিধানভংগ করিতেছে, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত

লোকসভার নিকট মন্ত্রি-পরিষদের যৌথ দায়িত্ব

রাষ্ট্রপতিকে কেন মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে

করিয়া এবং সংগে সংগে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করা উচিত। এইজন্যই রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী (The Prime Minister): ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার বিধি অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃতপক্ষে প্রধান শাসনকর্তা। ভারতীয় সংবিধান বা ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। প্রধান মন্ত্রী শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নহেন, তিনি পার্লামেণ্টের বা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণেরও নেতা। তিনি মন্ত্রি-পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরিষদভুক্ত মন্ত্রী কে কে হইবেন, কোন্ কোন্ মন্ত্রীর উপর কোন্ কোন্ দপ্তরের ভার থাকিবে—এই সকল বিষয় নির্ধারণ করেন তিনিই। তিনি যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভাও ভাঙিয়া যায়। তিনিই রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের অধিবেশন প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শ দেন। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার বিধান অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভাঙিয়া দিবার জন্যও পরামর্শ দিতে পারেন। যতদিন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার পদ অধিকার করিয়া থাকেন, ততদিনই তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রি-পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনিই প্রধানত রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়। উপমা দিয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র যেমন সূর্য, মন্ত্রি-পরিষদের কেন্দ্র তেমনি প্রধান মন্ত্রী।

প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত প্রধান শাসনকর্তা

পদমর্যাদার দিক দিয়া প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা নিম্ন হইলেও প্রধান মন্ত্রীকেই প্রকৃত প্রধান জননায়ক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature): ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগ বা আইন বিভাগকে পার্লামেণ্ট বলা হয়। পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি পরিষদ বা কক্ষ লইয়া গঠিত। উচ্চতর পরিষদের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নতর পরিষদের নাম লোকসভা।*

পার্লামেণ্টের তিনটি অংশ

রাজ্যসভা: রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৫০ জনের অধিক হইতে পারিবে না। সদস্যগণের মধ্যে চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবা—এই চারিটি

* পূর্বে ইংরাজীতে ইহাদের যথাক্রমে 'Council of States' এবং 'House of the People' বলা হইত। এই দুইটির বাংলা প্রতিশব্দ ছিল 'রাজ্য-পরিষদ' ও 'লোকসভা'। বর্তমানে সরকারীভাবে ভারতীয় নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে রাজ্য-পরিষদ না বলিয়া 'রাজ্যসভা' বলা হয়।

বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন সদস্য সকল সময়েই থাকিবেন। বাকী অনধিক ২৩৮ জন হইবেন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি (representatives)। সংবিধান অনুসারে প্রতিনিধিসংখ্যা ২৩৮ অবধি হইতে পারিলেও বর্তমানে এই সংখ্যা হইল মাত্র ২২৬ জন।* এই ২২৬ জন প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রপতি-মনোনীত ১২ জন সদস্য লইয়া বর্তমানে রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা হইল ২৩৮ জন।

রাজ্যসভার গঠন

রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।** কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বিশেষভাবে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন। বর্তমানে রাজ্যসভায় রাজ্যসমূহের ২১৮ জন, এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের ৮ জন প্রতিনিধি আছেন। পশ্চিমবংগের প্রতিনিধিসংখ্যা হইল ১৬ জন।

রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং পুনরায় মনোনয়ন ও পুনর্নির্বাচন দ্বারা তাঁহাদের শূন্য আসন পূর্ণ করা হয়।

রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ

রাজ্যসভার সদস্য হইবার জন্য প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পদাধিকারবলে ভারতের উপরাষ্ট্রপতিই হইলেন রাজ্যসভার সভাপতি (Chairman)। সভার একজন সহ-সভাপতিও (Deputy Chairman) আছেন। তিনি সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হন।

লোকসভা: লোকসভা অংগরাজ্যসমূহ হইতে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত অনধিক ৫০০ জন এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২৫ জন—সর্বাধিক এই ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়।† অবশ্য অংগরাজ্য-সমূহের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ৬ জন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ

---

* পূর্বে রাজ্যসভায় রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের ২২৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে নূতন অংগরাজ্য নাগাভূমি এবং নূতন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরি—উভয়ই ১ জন করিয়া প্রতিনিধি রাজ্য-সভায় প্রেরণের অধিকারী হওয়ায় বর্তমান সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২২৬-এ দাঁড়াইয়াছে।

** রাজ্যের বিধানসভায় মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য থাকিতে পারেন। মনোনীত সদস্যদের ভোট দিবার অধিকার নাই।

† পূর্বে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২০ জন সদস্য লোকসভায় আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু নূতন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরির জন্য লোকসভায় আসনের ব্যবস্থা করিবার সময় দেখা যায় যে এই সংখ্যা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাই সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন দ্বারা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে সদস্যসংখ্যা ২০ হইতে ২৫-এ এবং লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যা (মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য বাদে) ৫২০ হইতে ৫২৫-এ লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

দ্বারা নির্বাচিত হন না। তাঁহারা পরোক্ষভাবে ঐ রাজ্যের আইনসভার সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের সদস্যগণ কিভাবে লোকসভায় আসন গ্রহণ করিবেন তাহা পার্লামেন্ট আইন করিয়া স্থির করিয়া দেয়। এই আইন অনুসারে দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া আসেন এবং বাকী কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি হইতে সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন।

নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে তপশীলী বর্ণ ও কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা সংবিধান প্রবর্তনের পর ২০ বৎসর—অর্থাৎ, ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে।

ইহা ছাড়া শাসনতন্ত্রে এই বিধানও আছে যে, যদি রাষ্ট্রপতি ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় লোকসভায় উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে নাই বলিয়া মনে করেন, তবে তিনি এই সম্প্রদায় হইতে সংবিধান প্রবর্তনের ঐ ২০ বৎসর পর্যন্ত অনধিক দুইজন সদস্য এই পরিষদে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই মনোনয়নের ফলে লোকসভার সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫২৫-কে ছাড়াইয়া ৫২৭-এ পৌঁছিতে পারে।

বর্তমানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা উক্ত সর্বাধিক ৫২৫-এর পরিবর্তে (বা মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য ধরিয়া ৫২৭-এর পরিবর্তে) হইল ৫১০ জন। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য হইলেন ৪৯৪ জন। বাকী ১৬ জন হইলেন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য, নাগাভূমি, পণ্ডিচেরি, দাদরা ও নগর হাভেলি, গোয়া দমন দিউ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, আসামের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং ইংগ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। নবগঠিত রাজ্য নাগাভূমি হইতে নির্বাচিত সদস্য আসন গ্রহণ করিলে মনোনীত সদস্য পদত্যাগ করিবেন। পশ্চিমবংগ হইতে ৩৬ জন সদস্য লোকসভায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

লোকসভার জীবনকাল সাধারণত পাঁচ বৎসর। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রপতি এই পরিষদকে যে-কোন সময়ে ভাঙিয়া দিতে পারেন। আপৎকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ইহার কার্যকাল ১ বৎসরের জন্য বৃদ্ধিও করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন পরিষদপাল (Speaker) এবং একজন উপপরিষদপাল (Deputy Speaker) থাকেন।

লোকসভার জীবনকাল পাঁচ বৎসর

সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্টের দুই অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয় না।

অধিবেশন
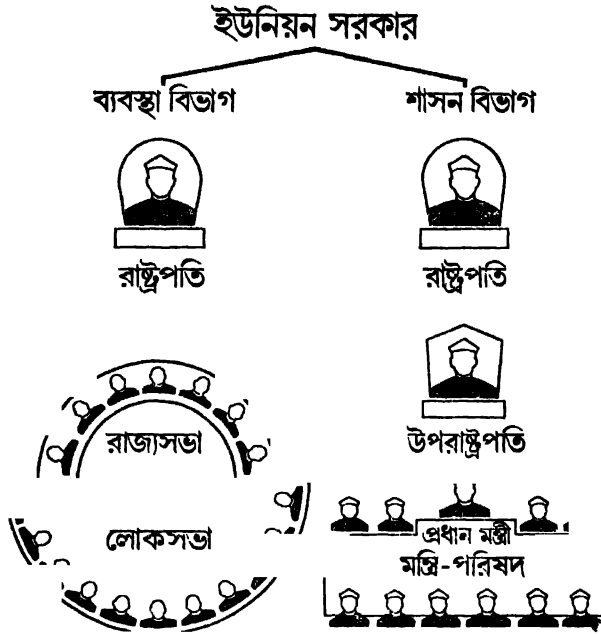
ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগকে পার্লামেন্ট বলা হয়। পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি এবং দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। উচ্চতর পরিষদের নাম রাজ্যসভা; নিম্নতর পরিষদকে বলা হয় লোকসভা। রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত। বাকী সদস্যগণ রাজ্যসমূহের বিধানসভাগুলির সদস্যগণ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত।

লোকসভা প্রধানত জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত অনধিক ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত।

শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদ লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। মন্ত্রি-পরিষদ শাসনকার্যে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয় এবং সহায়তা করে।

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল।

মন্ত্রি-পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে কার্য করে। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপাত ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্য (Powers and Functions of Parliament) : ইউনিয়ন এবং উভয় এলাকাধীন তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। যদি উভয় এলাকাধীন তালিকার অন্তর্গত কোন বিষয়ে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের সহিত কোন রাজ্যের আইনসভা-প্রণীত আইনের সংঘর্ষ বাধে, তবে রাজ্যের আইনের অসংগতিপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়া যাইবে এবং কেন্দ্রের আইনই বলবৎ থাকিবে। সাধারণ অবস্থায় রাজ্যগুলির অন্তর্গত অঞ্চলের জন্য রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত

আইন বিষয়ক ক্ষমতা

ঘোষণা করেন, তবে পার্লামেণ্টকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত বা ভারতের যে-কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়াও রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্য সম্পর্কে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে অর্পণ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া আরও তিনটি ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে—যথা, (১) যদি রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে স্থির করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই পার্লামেণ্টের পক্ষে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা উচিত। (২) যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য পার্লামেণ্টকে এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে এবং সম্মতি দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইন মাত্র অনুরোধকারী রাজ্যগুলিতেই প্রযুক্ত হইবে, অপর রাজ্যগুলিতে নহে। (৩) আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদির সর্তাদি রক্ষার জন্য পার্লামেণ্ট সমগ্র ভারত বা ভারত-রাষ্ট্রের যে-কোন অঞ্চলের জন্য যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।*

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী মারফত একটি 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদে পেশ করান।** এই বিবৃতিতে 'কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়' (Charged on the Consolidated Fund of India), এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে অন্যান্য ব্যয় করিবার প্রস্তাবগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়। যে-ব্যয়গুলি কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য তাহা লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে। এই ধরনের ব্যয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, লোকসভার পরিষদপাল ও উপপরিষদপালের বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের এবং নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষকের বেতন ভাতা ও পেনসন্, সরকারী ঋণজনিত ব্যয়, প্রভৃতিই প্রধান। এই ব্যয়গুলি ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যয় লোকসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লোকসভার ব্যয় সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা নাই। কিন্তু কর-নির্ধারণ ও সরকারী ঋণ সংক্রান্ত পূর্ণ ক্ষমতা লোকসভার আছে। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত করধার্য বা ঋণসংগ্রহ করা যায় না। করনীতি ও সরকারী ঋণপদ্ধতিতে যে-কোন পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত ব্যয়বরাদ্দের কোন অর্থ পার্লামেণ্টের নিকট দাবি করা যায় না বা কোন 'অর্থ বিল' লোকসভায় আনয়ন করা যায় না।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই হইবে যে পার্লামেণ্টের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বলিতে প্রধানত লোকসভার ক্ষমতাই বুঝায়। উচ্চতর পরিষদ

* ২৫-২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

** ৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

বা রাজ্যসভার আইন বিষয়ক ক্ষমতা নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভার সমতুল্য হইলেও, অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া বলা যায়। অর্থ সংক্রান্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। এইরূপ বিল লোকসভায় পাস হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয় বটে, কিন্তু উহাকে বাতিল করিবার ক্ষমতা রাজ্যসভার নাই। এই পরিষদ এই প্রকার বিলের সংশোধনের জন্য সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। লোকসভায় এইরূপ সুপারিশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিলেও বিল দুই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া

পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা পার্লামেন্টের অন্যতম প্রধান কার্য। এই উদ্দেশ্যে সংবিধান মন্ত্রি-পরিষদকে যৌথ-ভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল করিয়াছে। লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে অথবা মন্ত্রি-পরিষদের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে মন্ত্রি-পরিষদকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পাস অথবা মন্ত্রি-পরিষদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াও পার্লামেণ্ট অন্যভাবে মন্ত্রি-পরিষদকে সংযত রাখিতে সমর্থ হয়। শাসন বিভাগের উপর পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটু পরেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

পার্লামেন্টের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এককভাবে সংবিধান পরিবর্তনের আংশিক ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে। কিন্তু সংবিধানের এমন কতক-গুলি ধারা আছে যাহাদের পরিবর্তন পার্লামেণ্ট রাজ্যগুলির আইনসভার অর্ধেকের সম্মতি পাইলে তবেই করিতে পারে।

অন্যান্য ক্ষমতা

সংবিধানভংগের জন্য সংবিধান-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিচার করিয়া পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের আছে।

পার্লামেণ্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ (Control of the Executive by Parliament): পার্লামেণ্ট কিভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। প্রথমত, লোকসভা সাধারণভাবে সরকারী আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন ভোট-সাপেক্ষ ব্যয়

* ৩১ এবং ৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

নির্বাহ করা যায় না, করধার্য বা ঋণসংগ্রহও করা যায় না। ইহা ছাড়া সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থা ঠিকমত পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য লোকসভার দুইটি কমিটি আছে।* মন্ত্রিগণ এই কমিটিদ্বয়ের সদস্য হইতে পারেন না। পার্লামেণ্টের নির্দেশ উপেক্ষা করা হইলে, অর্থ অপচয় করা হইলে, বেআইনীভাবে অর্থব্যয় করা হইলে ও ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা না করা হইলে কমিটিদ্বয় মন্ত্রি-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিভাবে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পার্লামেণ্ট অন্যান্য যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে তাহার মধ্যে খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, বাজেটের সমালোচনা প্রভৃতিই প্রধান।

আয়-ব্যয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

পার্লামেণ্টের সদস্যগণ খবরাখবরের জন্য মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানের পর প্রত্যহ আধ ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হয়। কোন জরুরী ব্যাপার আলোচনা করিবার জন্য যে-কোন সদস্য লোকসভায় বা রাজ্যসভায় মুলতবী প্রস্তাব (Adjousnment Motion) আনয়ন করিতে পারেন—অর্থাৎ, প্রস্তাব করিতে পারেন যে সভার সাধারণ কর্মসূচী বন্ধ রাখিয়া এখন ঐ বিষয়ে আলোচনা করা হউক। বিষয়টি বিশেষ জরুরী না হইলে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ (Calling Attention) করা যাইতে পারে। ১৫ দিনের নোটিস দিয়া সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব আনয়ন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যের আছে। এরূপ প্রস্তাব পাস হইলে উহাকে কার্যকর করিবার জন্য পরিষদপাল (Speaker) উহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া সদস্যগণ সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনা ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বাজেট পেশ কালেও এই সুযোগ মিলে।

অন্যান্য পদ্ধতি

ইহা ছাড়া সরকারী প্রতিশ্রুতি ঠিকমত প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্যও কিছুদিন পূর্বে লোকসভা একটি কমিটি গঠন করিয়াছে।** মন্ত্রিগণ-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করা হইলে অথবা ঠিকমত প্রতিপালিত না হইলে কমিটি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারকে নিয়ন্ত্রণের আর একটি কমিটি হইল অধস্তন বা অর্পিত আইন সংক্রান্ত কমিটি।† বর্তমান সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্য দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছে। এই কারণে পার্লামেণ্ট

সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি

অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি

---

* **Committees on Public Accounts and on Estimates**

** **Committee on Government Assurances**

† **Committee on Subordinate Legislation**

শাসন বিভাগের হাতে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু শাসন বিভাগ যাহাতে এই অর্পিত ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়।

চরম ক্ষেত্রে লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিয়া অথবা সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যে মন্ত্রি-পরিষদের পতন ঘটাইতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের উপরি-উক্ত প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রি-পরিষদকে সর্বদা সতর্ক ও সংযত হইয়া চলিতে হয়। কারণ প্রথমত, লোকসভায় পরাজয় ঘটিলে মন্ত্রি-পরিষদকে সরাসরি পদত্যাগ করিতে হইতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, নির্বাচকদের নিকট জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলে পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের আশা থাকে না।

পার্লামেণ্টের শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতা। রাজ্যসভায় পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না।

পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the two Houses of Parliament): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই পার্লামেণ্টের পরিষদদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

১। অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভার একচেটিয়া

প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্যসভার ক্ষমতা অতি সামান্যই; এ-বিষয়ে লোকসভাই একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ আইন পাসের ব্যাপারে কিন্তু উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন। এইরূপ আইনের জন্য বিল উভয় পরিষদে পাস হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে

২। অন্যান্য আইন পাসের ব্যাপারে পরিষদদ্বয় সমক্ষমতাসম্পন্ন

দুই পরিষদের মধ্যে যদি মতবিরোধ ঘটে তবে রাষ্ট্রপতি পরিষদদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা বিলটিকে গ্রহণ করিলে উহা পাস হয়, প্রত্যাখ্যান করিলে উহা বাতিল হইয়া যায়।

৩। মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকটই দায়িত্বশীল

তৃতীয়ত, সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে আবার লোকসভা রাজ্যসভা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদ লোকসভার নিকটই দায়িত্বশীল, এবং রাজ্যসভার পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না বলিলেও চলে।

সংক্ষিপ্তসার

ইউনিয়ন সরকারের শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রি-পরিষদ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। তিনি পরোক্ষভাবে এক বিশেষ নির্বাচন-সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ৫ বৎসর। শাসনকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ সংবিধানভংগের অভিযোগে তাঁহার বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক, ভারতীয় নাগরিক এবং লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলিয়া রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি চারি প্রকারের ক্ষমতা ভোগ করেন—যথা, (ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইন বিষয়ক ক্ষমতা, (গ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (ঘ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা। জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা আবার তিন শ্রেণীর—১। আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা, ২। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণা, ৩। আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা।

উপরাষ্ট্রপতি : উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। রাষ্ট্রপতির পদ অস্থায়ীভাবে শূন্য হইলে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করেন।

মন্ত্রি-পরিষদ : পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার নীতি অনুসারে মন্ত্রি-পরিষদই প্রকৃত শাসক। মন্ত্রি-পরিষদ প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় এবং লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য যে-কোন সময় মন্ত্রি-পরিষদকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

প্রধান মন্ত্রী : প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত প্রধান শাসনকর্তা। তিনি শুধু মন্ত্রিসভার নেতা নহেন, পার্লামেন্টের বা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণেরও নেতা। আবার প্রধান মন্ত্রীকেই প্রকৃত প্রধান জননায়ক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

ব্যবস্থা বিভাগ : ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা বিভাগকে পার্লামেন্ট বলা হয়। পার্লামেন্ট (১) রাষ্ট্রপতি এবং (২) রাজ্যসভা ও লোকসভা—এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন এবং লোকসভা অনধিক ৫২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। লোকসভার জীবনকাল ৫ বৎসর ; রাজ্যসভা কিন্তু চিরস্থায়ী পরিষদ।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা : পার্লামেন্ট নানাপ্রকারের ক্ষমতা ভোগ করে—যথা, (ক) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, এবং (ঘ) সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি।

পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ : আয়-ব্যয়ের উপর কর্তৃত্বের দ্বারা এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন, রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী বক্তৃতা ও বাজেট-প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া সমালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে পার্লামেন্ট শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রধানত লোকসভারই ক্ষমতা, রাজ্যসভার নহে।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক : পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মধ্যে নিম্নতর পরিষদ বা লোকসভাই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। সাধারণ আইন পাসের ব্যাপারে উভয় পরিষদ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা লোকসভারই একচেটিয়া এবং কার্যক্ষেত্রে লোকসভাই শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected?** **(H. S. (H) 1960 ; B. U. 1961)**

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বর্ণনা কর। তিনি কিভাবে নির্বাচিত হন? [৩২-৩৫ এবং ২৮-৩০ পৃষ্ঠা]

2. Briefly describe the position and powers of the President of the Indian Union. (C. U. 1956, '61 ; H. S. (H) 1961)

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা কর। [২৮ এবং ৩২-৩৫ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the relation between (a) the President and his Council of Ministers ; (b) the Council of Ministers and Parliament. (C. U. 1962)

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে এবং মন্ত্রি-পরিষদ ও পার্লামেন্টের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।
[২৮ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা]

4. Describe the composition of the Union Executive. (C. U. 1954)

ইউনিয়ন শাসন বিভাগের গঠন বর্ণনা কর। [২৮ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা]

5. Describe the organisation and powers of the Union Legislature in India. (C. U. 1955,'58 ; H. S. (H) 1962)

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন ও ক্ষমতা বর্ণনা কর। [৩৭-৪২ পৃষ্ঠা]

6. Discuss the relation between the two Houses of the Union Parliament. (H. S. (H) Comp. 1961 ; C. U. 1962)

কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পরিষদের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা কর। [৪০-৪৪ পৃষ্ঠা]

7. How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive ? (H. S. (H) Comp. 1960)

কিভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা (পার্লামেন্ট) কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে ? [৪২-৪৪ পৃষ্ঠা]

8. Explain the position of the Prime Minister under the Indian Constitution. (C. U. 1960)

ভারতীয় সংবিধানে প্রধান মন্ত্রীর পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর। [২৮ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা]

9. Describe the relation between the Union Executive and the Union Legislature in the present Constitution of India. (H. S. (C) 1961)

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ দুই অংশে বিভক্ত—রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রি-পরিষদ। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেন্টীয় বলিয়া এই দুই অংশের সহিত ব্যবস্থা বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা বিভাগ বা পার্লামেন্টের একটি অংগ। মন্ত্রি-পরিষদ আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হয় এবং লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে।...এবং (৩৩, ৩৬-৩৭ এবং ৪২ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা

(Administration of States)

রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থারই অনুরূপ। এখানেও দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত।

রাজ্যপাল (Governor) : জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যের শীর্ষে আছেন একজন করিয়া রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সাধারণত তাঁহার কার্যকাল হইল ৫ বৎসর। তবে রাষ্ট্রপতি

ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারেন। রাজ্যপালকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ও ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান, 'সদর-ই-রিয়াসৎ' (Sadar-I-Riyasat) বলিয়া অভিহিত। কাশ্মীরের সংবিধান অনুসারে তিনি ঐ রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে যিনিই সদর-ই-রিয়াসৎ পদে নির্বাচিত হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজ্যপ্রধান হিসাবে স্বীকার করিয়া লইবেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা (Powers of the Governor): মন্ত্রি-পরিষদ সম্পর্কে রাজ্যপালের কতকগুলি ক্ষমতা আছে—যেমন, মন্ত্রিবর্গকে নিযুক্ত করা, মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইত্যাদি। এ-বিষয়ে পরে আলোচনার জন্য রাখিয়া দিয়া এখন রাজ্যপালের অন্যান্য ক্ষমতা বর্ণনা করা হইতেছে। রাজ্যপাল মন্ত্রিবর্গ ছাড়া রাজ্যের এ্যাডভোকেট-জেনারেল এবং রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যগণকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন। কয়েক ক্ষেত্রে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করিবার বা তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

রাজ্যপাল ব্যবস্থা বিভাগের একটি অংগ

রাজ্যপাল রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগের একটি অংগ। এ-ক্ষেত্রেও তাঁহার পদের সহিত রাষ্ট্রপতির পদের মিল আছে। রাজ্যপাল রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে এবং নিম্নতর পরিষদ বা বিধান-সভাকে ভাঙিয়া দিতে পারেন। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিলকে আইনে পরিণত করা যায় না। রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক পাস হইবার পর প্রত্যেক বিলকে তাঁহার সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হয়। তাঁহার সম্মতির জন্য বিলকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, তাঁহাকে সম্মতি যে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নেই। তিনি সম্মতি না-ও দিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন,* অথবা নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইনসভার এক বা উভয় পরিষদকে আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। আইনসভার যে-কোন পরিষদে বাণী প্রেরণ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। আইনসভার প্রত্যেক অধিবেশনে তিনি সাধারণত উদ্বোধনী বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা

আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। আইনসভা অধিবেশনে বসার ছয় সপ্তাহ পরে এইরূপ আইন আর কার্যকর থাকে না।

* অর্থ-সম্বন্ধীয় বিলকে অবশ্য ফেরত পাঠানো যায় না।

রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতিরেকে খরচের জন্য একটি টাকাও বিধানসভার নিকট দাবি করা যায় না। মন্ত্রী মারফত তিনিই আইনসভার নিকট 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট পেশ করান।

যে রাজ্যের আইনসভার দুইটি কক্ষ বা পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চতর কক্ষ বা বিধান পরিষদে চারুকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে মনোনীত করেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। প্রধানত মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ীই তিনি এই শাসন-ক্ষমতার ব্যবহার করেন।

মন্ত্রি-পরিষদ (Council of Ministers) : রাজ্যপালের কার্যসম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কেন্দ্রের মত এখানেও মন্ত্রি-পরিষদ মুখ্য মন্ত্রীর (Chief Minister) নেতৃত্বাধীনে কার্য করে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের শীর্ষ ব্যক্তিকে অবশ্য বলা হয় প্রধান মন্ত্রী। রাজ্যপাল প্রথমে মুখ্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ; পরে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মুখ্য মন্ত্রী হইলেন রাজ্যের বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। কেন্দ্রের মত রাজ্যসমূহেও মুখ্য মন্ত্রী রাজ্যপাল ও মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার পটভূমিকায় মুখ্য মন্ত্রীকে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রতিচ্ছবি বলা যায়।

মুখ্য মন্ত্রীর ভূমিকা

ভারতীয় সংবিধান রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর উপর বিশেষ কয়েকটি দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। তাঁহাকে মন্ত্রি পরিষদের আইন সংক্রান্ত ও শাসন সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব রাজ্যপালকে জানাইতে হয়। রাজ্যপাল যে যে বিষয়ে জ্ঞাত হইতে চাহেন, সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাত করানোও মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্য। রাজ্যপাল আদেশ করিলে মুখ্য মন্ত্রীকে যে-বিষয় মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত হয় নাই, তাহা বিবেচনার জন্য মন্ত্রি-পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হয়। রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর এই সকল দায়িত্বের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাষ্ট্রপতির যে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রহিয়াছে রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের উপর রাজ্যপালের।

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল। তাঁহাদিগকে আইনসভার কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হয়। যদি এমন কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হন, যিনি আইনসভার সভ্য নহেন, তবে তাঁহাকে হয় ছয় মাসের মধ্যে আইনসভা বা বিধানমণ্ডলের* সভ্য হইতে হয়, না-হয় পদত্যাগ করিতে হয়। আইনত রাজ্যপাল

বিধানসভার নিকট যৌথ দায়িত্ব

* রাজ্যের আইনসভাকে বর্তমানে বাংলায় বিধানমণ্ডল বলা হইতেছে।

যে-কোন মন্ত্রীকে যে-কোন সময় পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেও, মন্ত্রিগণ যতদিন বিধানসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন মন্ত্রীর পদেও আসীন থাকেন। তবে কেন্দ্রের ন্যায় সংবিধান ভংগ করার জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদ ও বিধানসভা ভাঙিয়া পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। আর যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য চলিতেছে না, তবে তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তখন ইচ্ছা করিলে 'শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা' ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature) : প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আইনসভা বা বিধানমণ্ডল আছে। এই আইনসভা রাজ্যপাল (কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 'সদর-ই-রিয়াসৎ') এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের ১৬টি অংগরাজ্যের মধ্যে ১০টিতে—যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশূর, পশ্চিমবংগ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে দুইটি করিয়া এবং বাকী ৬টি রাজ্যে একটি করিয়া পরিষদ আছে। দুই পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং নিম্নতর পরিষদকে বিধানসভা (Legislative Assembly) বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বিধানসভাই বলা হয়।

রাজ্য সরকার
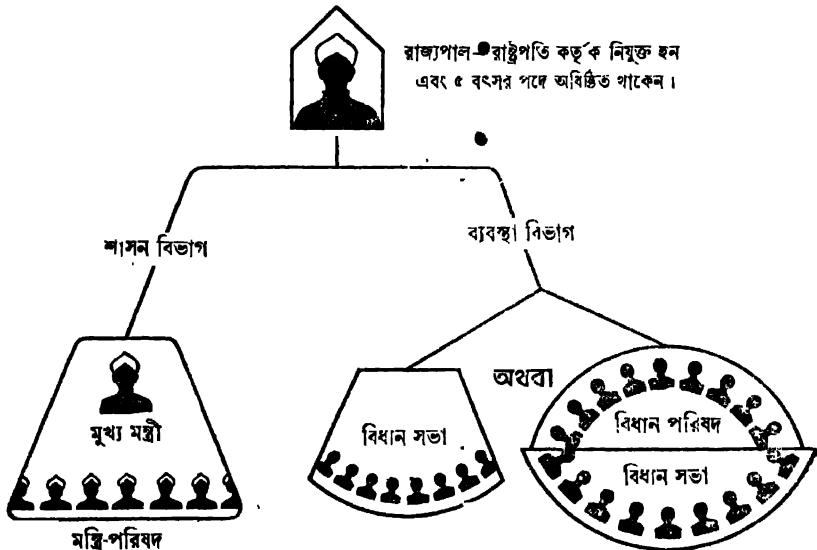
যদি কোন রাজ্যের বিধানসভা মোট সদস্যগণের অধিকাংশের এবং উপস্থিত ভোটপ্রদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ লুপ্ত করিবার জন্য বা সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করিবার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে পার্লামেণ্ট সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ লোপ বা গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বিধান পরিষদ লোপ বা গঠনের ব্যবস্থা

বিধান পরিষদ : বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম এবং বিধান-সভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। সদস্যগণের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্যদের দ্বারা, মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশের

গঠন

রাজ্যের বিধান পরিষদের গঠন পদ্ধতি

বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বিধান সভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী এবং ৪০-এর কম হয় না।

সদস্যগণের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বিধান সভার সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকগণ দ্বারা নির্বাচিত।

মোটামুটি এক-দ্বাদশাংশ গ্র্যাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত।

অবশিষ্টাংশ রাজ্যপাল কর্তৃক শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা ও সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত।
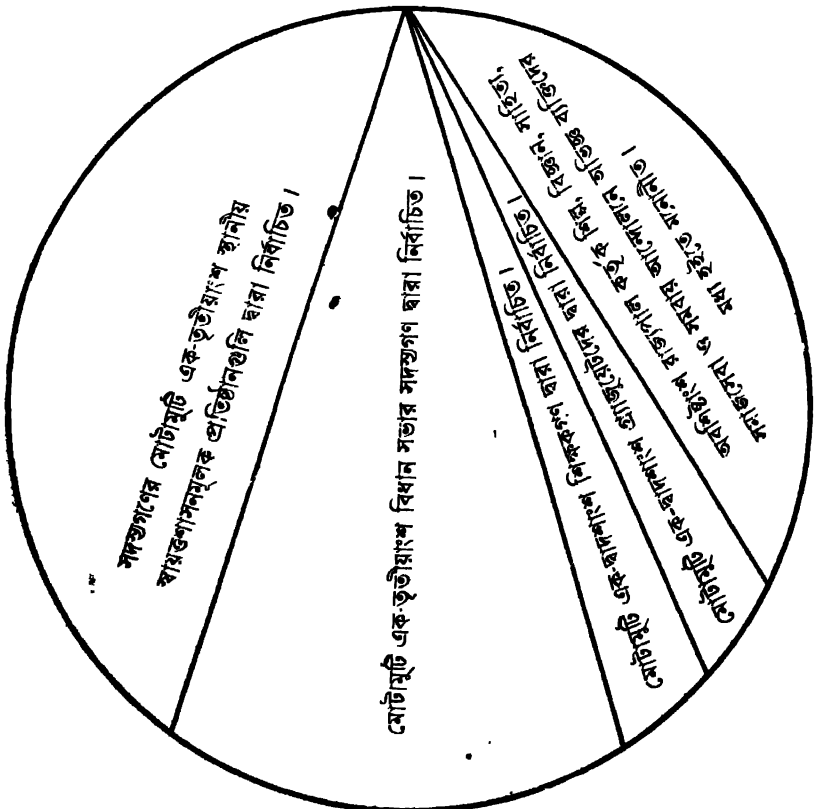
কাছাকাছি গ্রাজুয়েটদের দ্বারা এবং এক-দ্বাদশাংশের কাছাকাছি শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধানসভার কোন সদস্যকে অবশ্য বিধানসভা নির্বাচিত করিতে পারে না। বাকী সদস্যগণ রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। রাজ্যপাল চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা এবং সমবায় আন্দোলনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। বিধান পরিষদের সদস্য হইবার জন্য অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধান পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) থাকেন।

পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদ

পশ্চিমবংগের বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৭৫ জন। ইহার মধ্যে ২৭ জন করিয়া যথাক্রমে বিধানসভা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলির সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত; ৬ জন করিয়া শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটগণ দ্বারা নির্বাচিত। বাকী ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত।

বিধান পরিষদ চিরস্থায়ী পরিষদ—ইহাকে কখনও ভাঙিয়া দেওয়া হয় না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন।

বিধানসভা গঠন

বিধানসভা: বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম বা ৫০০-র বেশী হইতে পারে না। সদস্যবর্গ প্রধানত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিক-গণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সভায় তপশীলী বর্ণ এবং কয়েকটি তপশীলী উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ১৯৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তুলিয়া দেওয়ার কথা ছিল; সংবিধানের অষ্টম সংশোধন দ্বারা উহার মেয়াদ আরও দশ বৎসর বা ১৯৭০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালকেও সংবিধান প্রবর্তনের পর ১০ বৎসর পর্যন্ত—অর্থাৎ, ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস অবধি নিম্নতর পরিষদ বা বিধানসভায় ইংগ-ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে উহার মেয়াদ আরও ১০ বৎসর—অর্থাৎ, ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পশ্চিমবংগের বিধানসভায় ৪ জন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য আছেন। বিধানসভার সদস্য হইতে হইলে অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়।

বিধানসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন পরিষদপাল (Speaker) ও একজন উপপরিষদপাল (Deputy Speaker) থাকেন।

সভার জীবনকাল ৫ বৎসর। তবে রাজ্যপাল ইহাকে ইহার কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিতে পারেন। অপরদিকে আবার জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট ইহার কার্যকাল ১ বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারে।

পশ্চিমবংগের বিধানসভা

পশ্চিমবংগের বিধানসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা ২৫৬ জন। ইহার মধ্যে ২৫২ জন প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচকগণ দ্বারা নির্বাচিত। বাকী ৪ জন হইলেন মনোনীত ইংগ-ভারতীয় সদস্য।

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা (Powers of the State Legislature): বিধানমণ্ডলের রাজ্য তালিকার অন্তর্গত সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা উভয় এলাকাধীন যে-কোন বিষয়েও আইন প্রণয়ন করিতে পারে; তবে উভয় এলাকাধীন কোন বিষয়ে যদি রাজ্যের আইনের সহিত কেন্দ্রীয় আইনের সংঘর্ষ বাধে তবে রাজ্যের আইন যতদূর বিরোধ ততদূর পর্যন্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

করধার্য ও ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতাও বিধানমণ্ডলের আছে। এ-ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডল বলিতে কার্যত একমাত্র বিধানসভাকেই বুঝায়। কারণ, অর্থ সংক্রান্ত বিশেষ কোন ক্ষমতাই বিধান পরিষদের নাই।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

বিধানসভার ব্যয়বরাদ্দ করিবার ক্ষমতা পূর্ণ ক্ষমতা নহে; কতকগুলি ব্যয় ইহার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে—যেমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতির বেতন ও ভাতা, বিধানসভার পরিষদপাল ও উপপরিষদপালের বেতন ও ভাতা, মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন ভাতা ও পেনসন্, রাজ্যের ঋণজনিত ব্যয় প্রভৃতি। প্রধানত এই বিষয়-গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় বিধানসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। অনুমোদিত ব্যয় ঠিকভাবে করা হইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য লোকসভার মতই বিধানসভাগুলির দুইটি করিয়া কমিটি আছে।* রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত বিধানসভার নিকট কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবি করা যায় না। করনীতি ও সরকারী ঋণপদ্ধতি সম্বন্ধে বিধানসভার ক্ষমতা অবশ্য পূর্ণ ক্ষমতা।

মন্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকটে দায়িত্বশীল। বিধানসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সমালোচনা, বিতর্ক, মুলতবী প্রস্তাব ইত্যাদির দ্বারা বিধানমণ্ডলের উভয় কক্ষই মন্ত্রি-পরিষদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তবে এই বিষয়ে বিধানসভা অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ—কারণ, উচ্চতর পরিষদে পরাজয় মন্ত্রি-পরিষদকে ততটা স্পর্শ করে না।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ

নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা (Administration of Nagaland): ভারতের নবতম রাজ্য নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা অন্যান্য অংগরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা হইতে অনেকটা পৃথক। নাগাভূমি অন্যতম পূর্ণ অংগ-রাজ্য হইলেও ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের হস্তে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আইন ও জনশৃংখলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত রাখা হইয়াছে। এই ব্যাপারে রাজ্যপাল মন্ত্রি-পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া

কিছুটা পৃথক শাসন-ব্যবস্থা

* ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি (individual judgment) অনুসারে কার্য করিবেন। অর্থাৎ, তাঁহাকে যে মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মন্ত্রি-পরিষদের সহিত আলোচনা তাঁহাকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু আলোচনার পর তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শকে উপেক্ষাও করিতে পারেন।

রাজ্যপালের বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দ্বিতীয়ত, নাগাভূমির তুয়েনসাং জিলার শাসনকার্য ১০ বৎসরের জন্য রাজ্যপালের অধীনে পরিচালিত হইবে। এই সময়ের মধ্যে এই জিলার অধিবাসীরা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

নাগাভূমির জন্য এক-পরিষদসম্পন্ন বিধানমণ্ডল গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বিধানমণ্ডল বা বিধানসভা প্রায় ১০ বৎসরের জন্য ৪৬ জন এবং পরে ৬০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই ৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সদস্য তুয়েনসাং জিলা হইতে আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) দ্বারা মনোনীত হইয়া আসিবেন; বাকী ৪০ জন সদস্য নাগাভূমির অন্যান্য অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন।

আইনসভা

তুয়েনসাং জিলার উল্লিখিত আঞ্চলিক পরিষদ ঐ জিলার বিভিন্ন উপজাতির (tribes) নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে। এই আঞ্চলিক পরিষদ বিভিন্ন গ্রাম-পরিষদ, এলাকা-পরিষদ প্রভৃতির কার্যের তত্ত্বাবধান করিবে, এবং আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ ব্যতিরেকে নাগাভূমি বিধানমণ্ডলের (Nagaland Legislature) কোন আইন তুয়েনসাং জিলায় কার্যকর হইবে না।

তুয়েনসাং জিলার আঞ্চলিক পরিষদ

ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যবস্থা (Administration of Union Territories): বর্তমানে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল সংখ্যায় হইল ৯টি—যথা, (১) দিল্লী, (২) হিমাচলপ্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৬) লাক্ষা মিনিকয় ও আমীন দ্বীপপুঞ্জ, (৭) ভূতপূর্ব পর্তুগীজ উপনিবেশ দাদরা ও নগর হাভেলি, (৮) গোয়া, দমন ও দিউ, এবং (৯) সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশগুলিসহ পণ্ডিচেরি। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন পাস হইবার পূর্বে সকল কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলেরই শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইত। রাষ্ট্রপতি শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য উহাদের সকলের ক্ষেত্রেই নিয়মকানুন প্রণয়ন করিতে পারিতেন।

বর্তমানে উক্ত চতুর্দশ সংশোধন দ্বারা দিল্লী, হিমাচলপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, পণ্ডিচেরি, এবং গোয়া দমন দিউ—এই ছয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। পরিবর্তন দ্বারা পার্লামেণ্টকে আইন করিয়া এই কয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ

গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গঠিত আইনসভা অধিবেশনে বসিলে পর রাষ্ট্রপতি আর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল সম্পর্কে শান্তি, প্রগতি ও সুশাসনের জন্য কোন নিয়মকানুন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। অপর তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল অবশ্য রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনেই আছে। ইহাদের ক্ষেত্রে বিধান-মণ্ডল ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নাই।

প্রত্যেক কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন একজন করিয়া 'শাসক' (Administrator)। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি শাসককে যে-কোন নামে অভিহিত করিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল দিল্লীর শাসক 'চীফ্ কমিশনার', কিন্তু হিমাচলপ্রদেশের শাসক 'উপরাজ্যপাল' (Lieutenant-Governor) নামে অভিহিত। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের রাজ্যপালকেও শাসক নিযুক্ত করিতে পারেন। যে-কোন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত না হইলে শাসক রাষ্ট্রপতির নিকট দায়িত্বশীল থাকিবেন, কিন্তু আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হওয়ার পর তিনি মোটামুটি নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হইবেন।

পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া যে-কোন কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে। আবার পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের এলাকাও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে প্রসারিত করিতে পারে। শেষোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পণ্ডিচেরিকে মাদ্রাজ রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের এলাকাধীন করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত প্রত্যেক রাজ্যের শীর্ষে আছেন একজন করিয়া রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল : রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং সাধারণত ৫ বৎসরকাল পদে নিযুক্ত থাকেন।

মন্ত্রি-পরিষদ : কেন্দ্রের মত প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মন্ত্রি-পরিষদ আছে। মন্ত্রি-পরিষদ মুখ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে কায করে। মন্ত্রি-পরিষদ বিধানসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

রাজ্যপালের ক্ষমতা : রাজ্যপাল শাসন সংক্রান্ত, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মাত্র।

ব্যবস্থা বিভাগ : রাজ্যের ব্যবস্থা বিভাগকে বিধানমণ্ডল বলা হয়। বিধানমণ্ডল রাজ্যপাল এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। অংগরাজ্যগুলির মধ্যে ১০টিতে দুইটি করিয়া পরিষদ এবং বাকী ৬টিতে একটি করিয়া পরিষদ আছে। দুইটি পরিষদ থাকিলে উচ্চতর পরিষদকে বিধান পরিষদ এবং নিম্নতর পরিষদকে বিধানসভা বলা হয়। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বিধানসভাই বলা হয়।

বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০-এর কম এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয় না। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম বা ৫০০-এর অধিক হইতে পারে না। বিধানসভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন; বিধান পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, গ্রাজুয়েট প্রভৃতিদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা : বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা তিন প্রকারের—(ক) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, (খ) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (গ) শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা : নবগঠিত রাজ্য নাগাভূমির শাসন-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। এখানে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজ্যপালের হস্তে আইন ও জনশৃংখলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ঐ রাজ্যের তুয়েনসাং জিলার শাসনকার্য ১০ বৎসরের জন্য রাজ্যপালের অধীনে পরিচালিত হইবে। তৃতীয়ত, আইনসভায় বর্তমান মোট ৪৬ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন তুয়েনসাং জিলা হইতে পরোক্ষভাবে মনোনীত হইয়া আসিবেন।

ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা : কেন্দ্র-শাসিত বা ইউনিয়ন অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতির অধীনে একজন করিয়া শাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ছয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বিধানমণ্ডল ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Briefly describe the position and powers of the Governor of a State.**
(H. S. (H) Comp. 1960, '62 ; C. U. 1955, '57)

সংক্ষেপে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বর্ণনা কর। [৪৬-৪৯ পৃষ্ঠা]

2. **Discuss the relation between (a) Governor and his Council of Ministers, and (b) Council of Ministers and State Legislature.**

রাজ্যপাল ও মন্ত্রি-পরিষদ এবং মন্ত্রি-পরিষদ ও বিধানমণ্ডলের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।
[৪৭-৪৯ এবং ৫২ পৃষ্ঠা]

3. **Describe the relation between the Governor and the Council of Ministers in a State under the present Indian Constitution. How is the Council of Ministers formed ?** (H. S. (H) Comp. 1961)

ভারতের বর্তমান সংবিধানে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল ও রাজ্যের মন্ত্রি-পরিষদের মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা কর। কিভাবে মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হয় ?

[ইংগিত : রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করা হয়। প্রথমে রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্য মন্ত্রী হইবার জন্য আহ্বান করেন এবং পরে তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন।...(৪৭-৪৯ পৃষ্ঠা)]

4. **What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ?**
(H. S. (H) 1960)

পশ্চিমবংগের আইনসভার (বিধানমণ্ডলের) ক্ষমতা ও কার্যাবলী কি কি ? [৪৮-৪৯ এবং ৫২ পৃষ্ঠা]

5. **Briefly describe the composition and powers of the West Bengal State Legislature.** (B. U. 1961)

পশ্চিমবংগ রাজ্যের বিধানমণ্ডলের গঠন ও ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৫০-৫২ পৃষ্ঠা]

6. **Briefly describe the administration of the Union Territories.**

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের শাসন-ব্যবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ

(Relation between the Centre and the States)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে দুই প্রকার সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়—(ক) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্বন্ধ (legislative relations), এবং (খ) শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ (administrative relations)। ইহাদের মধ্যে ভারতের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্বন্ধের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখন শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধের আলোচনা করা প্রয়োজন।

দুই প্রকারের সম্বন্ধ

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজন হয় সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টনের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন করিয়া দিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সরকারকে পরস্পর হইতে পৃথক রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকার পরস্পর হইতে পৃথক থাকিতে পারে না বলিয়া সংবিধান দ্বারাই আবার তাহাদের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সহযোগিতার সূত্র রচনার ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুত, এই সহযোগিতা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা একরূপ অচল হইয়া পড়ে।

শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

এই সহযোগিতা বা সম্বন্ধ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাকে (Executive Power) এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে, (ক) কেন্দ্রীয় আইনের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে, (খ) ইউনিয়ন সরকারের শাসন পরিচালনায় বিঘ্ন না ঘটে। কিভাবে ইউনিয়ন সরকারের শাসন পরিচালনায় বিঘ্ন না ঘটাইয়া রাজ্য সরকারগুলি তাহাদের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিবে তাহার জন্য ইউনিয়ন সরকার নির্দেশও প্রদান করিতে পারে। কোন রাজ্য এই নির্দেশ অমান্য করিলে রাষ্ট্রপতি ঐ রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।

ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ

ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে নির্দেশদান

ইউনিয়ন সরকার আরও দুইটি বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে— যথা, (১) জাতীয় স্বার্থ বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছে এইরূপ সংসরণ-ব্যবস্থা (communication system) সংরক্ষণের জন্য; (২) রাজ্যের অভ্যন্তরে রেলপথ সংরক্ষণের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পশ্চিমবংগ সরকারকে পশ্চিমবংগের অভ্যন্তরে রেলপথ ইত্যাদির সংরক্ষণের জন্য পুলিস নিয়োগ করিতে হইতে পারে।

* ২৩-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

এই সকল নির্দেশ পালনের জন্য রাজ্য সরকারের যদি কোন অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহা অবশ্য ইউনিয়ন সরকার বহন করিবে।

ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে কার্যভার অর্পণ

কয়েক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সরকার নিজস্ব কার্যভার রাজ্য সরকারের হস্তে অর্পণ করিতে পারে। ইহার জন্যও অতিরিক্ত ব্যয় হইলে তাহা কেন্দ্রকে বহন করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী ও নদী-উপত্যকাগুলি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসাকল্পে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে।

পরিশেষে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে শাসন বিষয়ে সমতা এবং সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি এক আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) নিযুক্ত

বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকার্যের মধ্যে সংহতিসাধন

করিতে পারেন। এইরূপ পরিষদ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের কারণানুসন্ধান করিয়া সংহতিসাধনের জন্য যে সুপারিশ করিবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহা কার্যকর করিতে পারে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে ঐ একই উদ্দেশ্যে ৫টি আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Councils) গঠন করা হইয়াছে।*

সংক্ষিপ্তসার

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যসমূহের মধ্যে দুই প্রকার সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়—(ক) আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত সম্বন্ধ, এবং (খ) শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের জন্যই শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে সহযোগিতা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার চলিতে পারে না।

এই সহযোগিতা বা সম্বন্ধ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি ধারা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের সহিত রাজ্যগুলির শাসনের সামঞ্জস্য থাকে তাহার জন্য এবং অন্যান্য কয়েকটি উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের উপর কতকগুলি শাসনভারও অর্পণ করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the administrative relations between the Union and the States under the Constitution of India. (H. S. (H) 1962)

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত সম্বন্ধ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা]

2. State the relation between the Centre and the States of the Indian Union on Legislative and Executive matters. (H. S. (H) Comp. 1960)

আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্বন্ধ বর্ণনা কর।

[২৫-২৭ এবং ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা]

---

* ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

দশম অধ্যায়

ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারসমূহের আয়-ব্যয়

(Heads of Revenue and Sources of Expenditure of the Union and the State Governments)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা এরূপ-ভাবে বণ্টিত করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে একে অপরের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারসমূহ উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন বা স্বতন্ত্র থাকে।* এই স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে উভয় প্রকার সরকারেরই নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেখানে রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হাত পাতিতে হয় সেখানে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিতে পারে না; তেমনি আবার কেন্দ্রীয় সরকার অর্থের জন্য রাজ্যগুলির উপর নির্ভরশীল হইলে কেন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যও ব্যাহত হয়। অতএব প্রয়োজন হইল প্রত্যেক সরকারের জন্য দায়িত্ব পালনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় এমনভাবে রাজস্ব-প্রাপ্তির পৃথক সূত্র নির্ধারণ করিয়া দেওয়া। তবে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা (administrative expediency), সমতার স্বার্থ (principle of uniformity) এবং পর্যাপ্তির (adequacy) জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য নীতিকে (principle of independence) কতকটা ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্র বলিয়া আর্থিক স্বাতন্ত্র্যও প্রয়োজন

বিষয়টিকে আর একটু পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার প্রথম নীতি হইল স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ, কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের আয়-ব্যয়ের সূত্র পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইবে। কিন্তু সকল সময় এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয়করকে একমাত্র কেন্দ্রীয় রাজস্বের সূত্র হিসাবে নির্দিষ্ট করিলে রাজ্যসমূহের আয় যথেষ্ট হইতে পারে না, অথবা আয়-করকে রাজ্যসমূহের রাজস্বের সূত্র হিসাবে নির্দিষ্ট করিলে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হারে আয়কর ধার্য হইয়া সমতার সূত্রকে ব্যাহত করিতে পারে। আবার রেল-মাসুলের উপর কর যদি রাজ্যসমূহের রাজস্বের সূত্র হয় তবুও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার দিক দিয়া কেন্দ্রের পক্ষেই উহা সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত—কারণ, রেলপথ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। অতএব উপরি-উক্ত চারিটি নীতি —যথা, (১) স্বাতন্ত্র্য, (২) পর্যাপ্তি, (৩) সমতা এবং (৪) শাসনতান্ত্রিক সুবিধার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়াই যুক্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার সরকারের রাজস্বের সূত্র নির্ধারণ করা হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার চারিটি সাধারণ নীতি

যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার এই সকল নীতি অনুসরণ করিয়াই ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির রাজস্বের সূত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানে আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে

উভয় সরকারেরই রাজস্বের সূত্রসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) কর-রাজস্ব (tax revenue) এবং (খ) কর নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue)। যে-রাজস্ব সরাসরি কর হইতে পাওয়া যায় তাহাকে কর-রাজস্ব বলে—যথা, আয়কর, বাণিজ্যশুল্ক, উৎপাদনশুল্ক, বিক্রয়কর প্রভৃতি হইতে আয়।

দুই প্রকার রাজস্বের সূত্র :
১। কর-রাজস্ব

অপরদিকে সেবামূলক কার্য (services) সম্পাদন বা ব্যবসাবাণিজ্য হইতে সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করে তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলা হয়—যেমন, ডাক-বিভাগ, রেলপথ, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India), রাষ্ট্রীয় পরিবহণ প্রভৃতি হইতে আয়।

২। কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

সমতা ও পর্যাপ্তির নীতির অনুসরণে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কর-রাজস্ব হইতে সংগৃহীত অর্থ ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়—যথা, ব্যক্তিগত আয়কর (tax on personal income) এবং কতিপয় উৎপাদনশুল্ক। আবার কতকগুলি কর আছে তাহা ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য ও সংগৃহীত হয়, কিন্তু সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণ টাই রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়—যথা, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর, সম্পত্তিকর (Estate Duty), বিচারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ ষ্ট্যাম্পের উপর ধার্য কর (duty on non-judicial stamp), ইত্যাদি।

দুইটি কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়

কতকগুলি কেন্দ্রীয় করের সম্পূর্ণ টাই রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়

ইহা ছাড়া কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে কয়েকপ্রকার অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা আছে। যেমন, পশ্চিমবংগ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য বাৎসরিক ৮৫০ লক্ষ টাকা এবং সাধারণ ব্যয় সংকুলানের জন্য বাৎসরিক ঐ একই পরিমাণ টাকা পায়। ইহা ছাড়া অনেক রাজ্য তপশীলীউপজাতিদের (Scheduled Tribes) উন্নয়নের জন্য, পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে।

কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলিকে নানাপ্রকার অর্থসাহায্যও করা হইয়া থাকে

আয়কর ইত্যাদির কতটা অংশ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে, বণ্টনযোগ্য অংশ হইতে কোন্ রাজ্য কতটা পাইবে, কেন্দ্র হইতে কোন্ রাজ্যকে কি কি খাতে কতটা অর্থসাহায্য করা হইবে ইত্যাদি বিষয় ফিনান্স কমিশনের (Finance Commission) সুপারিশ অনুসারে নির্ধারিত হয়। বর্তমানে এই সকল ব্যবস্থা তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নির্ধারিত হইয়াছে।

কর বণ্টন, অর্থসাহায্য ইত্যাদি ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে করা হয়

কর-রাজস্বের প্রধান প্রধান সূত্র

ইউনিয়ন সরকারের রাজস্ব (Revenues of the Union Government): ইউনিয়ন সরকারের কর-রাজস্বের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান*:

১। ইউনিয়ন উৎপাদনশুল্ক (Union Excise Duties): উৎপাদনশুল্ক বলিতে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর শুল্ক বুঝায়। ইউনিয়ন সরকার দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বহুবিধ দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া থাকে—যেমন, চিনি, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল, তামাক, বনস্পতি তৈল, টায়ার, টিউব, চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য, বৈদ্যুতিক দ্রব্য ইত্যাদি। কিন্তু মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর করধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের। এগুলিকে রাজ্য সরকারের উৎপাদনশুল্ক (State Excise Duties) বলা হয়।

উৎপাদনশুল্ক কাহাকে বলে

রাজ্য সরকারের উৎপাদনশুল্ক

ইউনিয়ন উৎপাদনশুল্ক বর্তমানে ইউনিয়ন সরকারের রাজস্বের সর্বপ্রধান উৎস এবং এ-পর্যন্ত ৫০টির মত দ্রব্যকে এই করের আওতায় আনা হইয়াছে। এই সূত্র হইতে বর্তমানে বৎসরে ৫২৫ কোটি টাকার মত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত অর্থ হইতে ৩৫টি দ্রব্যের উপর শুল্কের শতকরা ২০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া মিল বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে যে-অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক ধার্য আছে তাহার দরুন সংগৃহীত অর্থও রাজ্য-সমূহকে প্রদান করিতে হয়। এই দুই খাতে রাজ্যসমূহকে অর্থপ্রদানের পর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগে ৪০০ কোটি টাকারও অধিক থাকে।

এই সূত্রে সংগৃহীত অর্থের একাংশ রাজ্য-গুলির মধ্যে বণ্টিত হয়

২। আয়কর (Income Tax): আয়কর ইউনিয়ন সরকারের রাজস্বের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। ভারতীয় আয়কর তিন ভাগে বিভক্ত—(ক) ব্যক্তিগত আয়কর (Tax on Personal Income) বা সাধারণ আয়কর, (খ) উপরিস্থ কর (Super Tax) এবং (গ) 'করপোরেশন কর' বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর আয়কর। ইহাদের মধ্যে উপরিস্থ কর এবং করপোরেশন কর হইতে সংগৃহীত অর্থ সমুদয়ই ইউনিয়ন সরকারের প্রাপ্য; কিন্তু ব্যক্তিগত আয়কর হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের শতকরা ৬৬⅔ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। পশ্চিমবংগ বণ্টিত অর্থের শতকরা ১২·০৯ ভাগ পাইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত আয়করের শতকরা ৬৬⅔ ভাগ রাজ্যগুলি পায়

---

* কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেট হইতে গৃহীত। এই বাজেটে তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশসমূহকে কার্যকর করা হইয়াছে এবং নানাভাবে করবৃদ্ধি করা হইয়াছে। ফলে এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহে প্রদত্ত হিসাব হইতে বর্তমান হিসাবের বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যাইবে।

সকলপ্রকার আয়কর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৎসরে ২৫০ কোটি টাকার মত নিজস্ব আয় হয়।

৩। বাণিজ্যশুল্ক (Customs): বাণিজ্যশুল্ক ইউনিয়ন সরকারের রাজস্বের তৃতীয় উৎস। বাণিজ্যশুল্ক বলিতে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ককে বুঝায়। এই সূত্র হইতে বর্তমানে ভারত সরকারের বৎসরে ২০০ কোটি টাকার কিছু উপর আয় হয়।

৪। মূলধন-লাভকর ও সম্পদকর (Capital Gains Tax and Wealth Tax): এই দুইটি কর ধার্য হয় যথাক্রমে ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে। সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় হইতে যে-লাভ হয় তাহার উপর ধার্য করকে মূলধন-লাভকর এবং ব্যক্তি ও হিন্দু যৌথ পরিবারের সম্পদের উপর ধার্য করকে সম্পদকর বলা হয়। পূর্বে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদকর ধার্য ছিল। বর্তমানে উহা রহিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঐ ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে ব্যয়করও (Expenditure Tax) প্রবর্তিত ছিল। কিন্তু এই কর হইতে উল্লেখযোগ্য অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় উহারও বিলোপসাধন করা হইয়াছে। বর্তমানে সম্পদকর ও মূলধন-লাভকর হইতে বৎসরে ১০-১২ কোটি টাকার মত সংগৃহীত হয়। এই প্রসংগে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূলধন-লাভকর স্বতন্ত্র কর হইলেও বাজেটে উহা হইতে সংগৃহীত অর্থকে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয় না, আয়করের অংশ হিসাবেই দেখানো হয়।

দুইটি নূতন কর

অধুনালুপ্ত ব্যয়কর

৫। সাধারণ দানকর (General Gitt Tax): ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে এই কর প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৎসরে ৩ কোটি টাকার মত আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বর্তমানে ১ কোটি টাকারও কিছু কম সংগৃহীত হইতেছে।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের প্রধান প্রধান সূত্র

ইউনিয়ন সরকারের কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১। রেলপথ হইতে আয় (Income from Railways): রেলপথের লাভ হইতে একটা অংশ ভারত সরকার পাইয়া থাকে। বাকী অংশ রেলপথের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয় এবং রেলপথের রিজার্ভ তহবিলে জমা থাকে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল গড়ে মোটামুটি ৬-৭ কোটি টাকা। তবে বর্তমানে রেলভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদির দরুন ঐ প্রাপ্তির পরিমাণ ২০ কোটি টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে।

রেলপথের লাভের একাংশ ইউনিয়ন সরকার পাইয়া থাকে

২। ডাক ও তার (Post and Telegraph): এই সূত্র হইতে ইউনিয়ন সরকারের বিশেষ আয় হয় না। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সূত্র হইতে আয়ের

পরিমাণ ছিল ৩-৪ কোটি টাকার মত। বর্তমানে উহা হ্রাস পাইয়া ১ কোটি টাকারও কমে দাঁড়াইয়াছে।

৩। মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাংকন (Currency and Coinage): মুদ্রাংকন ও রিজার্ভ ব্যাংকের কাজকারবার হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৎসরে ৪৫-৫০ কোটি টাকার মত আয় হয়।

৪। অন্যান্য সূত্র (Other Sources): অহিফেন, সিন্ধ্রির ন্যায় সরকারী কলকারখানা পরিচালনা, ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India) প্রভৃতি হইতেও ভারত সরকারের কিছু কিছু আয় হয়। বিমান পরিচালনা হইতেও কিছু লাভ হইবার কথা; কিন্তু বর্তমানে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হইতেছে। তবে ভবিষ্যতে এই সূত্র হইতে কিছু কিছু লাভের আশা করা যায়। আবার ভবিষ্যতে কলকারখানা হইতে আয় যে বাড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইউনিয়ন সরকারের মোট আয়

উপরি-উক্ত কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্বসমূহ হইতে বর্তমানে বৎসরে ইউনিয়ন সরকারের ১২২৫ কোটি টাকার উপর আয় হয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ সুরু হইবার পূর্বে বা ১৯৫০-৫১ সালে আয়ের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকার মত।

ইউনিয়ন সরকারের ব্যয় (Heads of Expenditure of the Union Government): ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই ইউনিয়ন সরকারকে অতিরিক্ত করধার্য ইত্যাদির মাধ্যমে আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে হইতেছে। উক্ত ১৯৫০-৫১ সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোটামুটি ৩৮০ কোটি টাকা। বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২০০ কোটি টাকার উপরে দাঁড়ানোর দরুন ১২০০ কোটি টাকার উপর আয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। নিম্নলিখিত খাতে ভারত সরকারের রাজস্বের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়:

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ই সর্বাধিক

১। প্রতিরক্ষা (Defence): প্রতিরক্ষা খাতেই ইউনিয়ন সরকারের ব্যয় সর্বাপেক্ষা অধিক। অংকের হিসাবে ইহা ২৫০ কোটি টাকার মত বা মোট ব্যয়ের শতকরা ২৭ ভাগের কাছাকাছি। তবুও ইহা যে যথেষ্ট নহে চীন কর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রমণের ফলে তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষার দরুন ব্যয় যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

২। বেসামরিক শাসন পরিচালনা (Civil Administration): বেসামরিক শাসন পরিচালনা বলিতে বুঝায় ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ব্যয়বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে সরকারী দপ্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি, বিদেশে দূতাবাসের ব্যবস্থা, দুর্মূল্য ভাতা প্রভৃতি। এই খাতে বর্তমানে মোট ৭০ কোটি টাকার মত ব্যয় হয়।

৩। রাজস্ব হইতে প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Demand on Revenue): রাজস্বসংগ্রহের জন্য যে-ব্যয় হয় তাহাকে রাজস্ব হইতে প্রত্যক্ষ ব্যয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই খাতে বর্তমানে ব্যয় হইল ২০-২৫ কোটি টাকার মত।

রাজস্ব হইতে প্রত্যক্ষ ব্যয় কাহাকে বলে

৪। ঋণজনিত ব্যয় (Debt Services): বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার ঋণগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল ঋণের সুদ প্রদান এবং সময়মত আসল মিটানোর জন্য সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। বর্তমানে এই খাতে বাৎসরিক ব্যয় ২৫০ কোটি টাকার মত।

৫। উন্নয়নমূলক ব্যয় (Developmental Expenditure): শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, বেতার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকারকে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে ব্যয় করিতে হয়। এই খাতে ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইলেও, ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশের পক্ষে ইহা এখনও অত্যল্প বলিয়াই মনে হয়।

৬। অন্যান্য ব্যয় (Other Items of Expenditure): এই সকল ব্যয় ব্যতীতও ভারত সরকারকে পেনসন্, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাস, রাজ্যগুলিকে অর্থসাহায্য প্রভৃতি নানা খাতে ব্যয় করিতে হয়।

উপরে ভারত সরকারের যে-ব্যয়ের বর্ণনা করা হইল তাহাকে 'রাজস্ব খাতে ব্যয়' (Expenditure on Revenue Account) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ছাড়াও ভারত সরকার মূলধন খাতে (Expenditure on Capital Account) নানারূপ ব্যয় করে—যেমন, কলকারখানা নির্মাণ, নূতন রেললাইনের পত্তন, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা ইত্যাদি। ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর হইতে মূলধন খাতে ব্যয় বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

মূলধন খাতে ব্যয়

রাজস্ব খাতে ইউনিয়ন সরকারের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য নিম্নে ছকটি দেওয়া হইল:

১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে প্রদত্ত হিসাব (কোটি টাকায়)

ইউনিয়ন সরকারের আয়		ইউনিয়ন সরকারের ব্যয়	
১। আয়কর ইত্যাদি	২৪৭.৩০	১। প্রতিরক্ষা	৩৪৩.৩৭
২। সম্পদকর ইত্যাদি	১৪.৭৩	২। রাজস্ব খাতে প্রত্যক্ষ ব্যয়	২২.৫৮
৩। বাণিজ্য ও উৎপাদনশুল্ক	৬২৭.১৯	৩। বেসামরিক শাসন-পরিচালনা	৭০.৩১
৪। রেলপথ, মুদ্রাংকন, ডাক, তার ইত্যাদি	৭৩.৪২	৪। ঋণজনিত ব্যয়	২৪৭.৯০
৫। অন্যান্য	২৭৩.৪৭	৫। মোট উন্নয়নমূলক ব্যয়	১৯৪.১১
		৬। রাজ্যসমূহকে অর্থসাহায্য	২১৬.৬১
		৭। অন্যান্য	১৪১.২১
মোট	১২৩৬.১১	মোট	১২৩৬.০৯
		উদ্বৃত্ত	০.০২

রাজ্য সরকারের রাজস্ব (Revenues of the State Government): রাজ্যসমূহের কর-রাজস্বের (tax revenue) মধ্যে ভারতীয় আয়করের অংশ, সম্পত্তিকরের অংশ, ইউনিয়ন উৎপাদন-শুল্কের অংশ, কৃষি-আয়কর, ভূমি-রাজস্ব, ষ্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন, বিক্রয়কর, প্রমোদকর এবং রাজ্য উৎপাদন-শুল্কই প্রধান।

রাজ্য সরকারের প্রধান প্রধান কর-রাজস্ব

১। ভারতীয় আয়করের অংশ (Share of the Indian Income Tax): ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগত আয়ের উপর করের শতকরা ৬৬⅔ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইয়া থাকে। বণ্টনযোগ্য রাজস্বের শতকরা ১২·০৯ ভাগ পশ্চিমবংগের প্রাপ্য। এই সূত্র হইতে পশ্চিমবংগ বৎসরে ১০-১২ কোটি টাকা পাইয়া থাকে।

২। সম্পত্তিকরের অংশ (Share of the Estate Duty): মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর কর ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক ধার্য হইলেও সংগৃহীত রাজস্ব রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। সম্পত্তির মূল্য ৫০ হাজার টাকার কম হইলে সম্পত্তিকর ধার্য করা হয় না। পশ্চিমবংগে স্থাবর সম্পত্তি হইতে যাহা সংগৃহীত হয় তাহার সমগ্রটা এবং অস্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৮·১১ ভাগ পশ্চিমবংগ পাইয়া থাকে।

৩। ইউনিয়ন উৎপাদনশুল্কের অংশ (Share of Union Excise Duties): ইউনিয়ন উৎপাদনশুল্কের বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৩৫টি দ্রব্যের উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত নীট আয়ের শতকরা ২০ ভাগ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। বণ্টনযোগ্য অর্থের মধ্যে পশ্চিমবংগের প্রাপ্য হইল শতকরা ৫·০৭ ভাগ।

ইহা ব্যতীত বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর পূর্বে যে বিক্রয়কর ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া বর্তমানে কেন্দ্রীয় উৎপাদনশুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। এই উৎপাদন-শুল্ক হইতে প্রাপ্য অর্থ রাজ্যগুলিকে পূর্বের বিক্রয়করের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হয়। এই সূত্র হইতে পশ্চিমবংগের প্রাপ্তির পরিমাণ ৬-৭ কোটি টাকার মত।

৪। কৃষি-আয়কর (Agricultural Income Tax): জমিদারী প্রথা বিলোপসাধনের পূর্বে কৃষি-আয়কর হইতে রাজ্যগুলির বেশ কিছুটা আয় হইত। বর্তমানে কিন্তু এই সূত্র হইতে সকল রাজ্যের আয়ের পরিমাণ হইল ৮ কোটি টাকার মত। ইহার মধ্যে পশ্চিমবংগ সরকারের আয় ৩০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি।

কৃষি-আয়করের পরিমাণ কমিতেছে

৫। ভূমি-রাজস্ব (Land Revenue): জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে কৃষি-আয়কর হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে; অপরদিকে কিন্তু ভূমি-

রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। জমিদারী আমলে ভূমি-রাজস্ব হইতে পশ্চিমবংগ সরকারের ১·৫০ কোটি টাকার মত আয় হইত; এখন উহা বাড়িয়া ৭ কোটি টাকার উপরে দাঁড়াইয়াছে। ইহা অবশ্য নীট (net) সংগ্রহের পরিমাণ। মোট (gross) সংগ্রহের পরিমাণ ইহার প্রায় দ্বিগুণ। ভূমি-রাজস্ব হইতে সকল রাজ্যের নীট আয় হয় ১০০ কোটি টাকার উপর।

ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে

৬। ষ্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন (Stamp Duty and Registration): রাজ্যসমূহের রাজস্বের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য সূত্র। ইহা হইতে সকল রাজ্যের ৪০-৪৫ কোটি টাকা এবং মাত্র পশ্চিমবংগের ৪ কোটি টাকার উপর আয় হয়।

৭। বিক্রয়কর (Sales Tax): কর-রাজস্ব হিসাবে বিক্রয়করের স্থান ভূমি-রাজস্বের পরই। পশ্চিমবংগে বর্তমানে অধিকাংশ দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে এবং কয়েকটি বিলাস-দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর শতকরা ৭ টাকা হারে বিক্রয়কর প্রদান করিতে হয়। বর্তমানে বস্ত্র, চিনি ও তামাকের উপর রাজ্যসমূহ বিক্রয়কর ধার্য করিতে পারে না। ইহার উপর কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদনশুল্ক স্থাপন করে এবং প্রাপ্ত অর্থ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। আবার আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিক্রয়কর স্থাপন করে। ইহা হইতে সংগৃহীত অর্থও রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়। বাকী সকল দ্রব্যের উপর রাজ্য সরকারই বিক্রয়কর ধার্য করে। পশ্চিমবংগে বিক্রয়-কর হইতে মোট ২০·২২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। নীট সংগ্রহের দিক দিয়া বিক্রয়করই পশ্চিমবংগের রাজস্বের সর্বপ্রধান সূত্র।

দুই প্রকারের বিক্রয়কর

৮। রেল-মাসুলের উপর কর (Tax on Railway Fares): পূর্বে রেল-মাসুলের উপর ধার্য কর হইতে সংগৃহীত অর্থ রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইত। বর্তমানে এই কর রেল-মাসুলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নির্দিষ্ট ১২·৫ কোটি টাকা রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ইহার মধ্যে পশ্চিমবংগ পাইয়া থাকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা।

৯। রাজ্য উৎপাদনশুল্ক (State Excise Duties): এই উৎপাদনশুল্ক মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি মাদক জাতীয় দ্রব্যের উপর ধার্য করা হয়। এই করের মূল উদ্দেশ্য হইল ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ করা। এইজন্য এই করকে প্রতিরোধকারী বা নিষিদ্ধকারী উৎপাদনশুল্কও (prohibitive excises) বলা হয়। পশ্চিমবংগে এই শুল্ক হইতে ৬ কোটি টাকার উপর আয় হয়।

১০। অন্যান্য কর (Other Taxes): রাজ্যসমূহের কর-রাজস্বের অন্যান্য সূত্রের মধ্যে প্রমোদকর (Entertainment Tax), বিদ্যুৎকর, খনি-স্বত্বের উপর কর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া কয়েকটি রাজ্যে পেশা ও

বৃত্তির উপর ধার্য করও (Tax on Profession) আছে। অবশ্য পশ্চিমবংগে ইহা নাই।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের সূত্রসমূহের মধ্যে জলসেচ-ব্যবস্থাই প্রধান। সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের সংগে সংগে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

ইহার পর আছে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা, পথ পরিবহণ, জলপথ পরিবহণ এবং কিছু কিছু শিল্প। এই সূত্রগুলি হইতেও আয় ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। অপরদিকে অরণ্যসম্পদ হইতে আয় কিন্তু দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ হইল অরণ্যসম্পদের যথেচ্ছ ধ্বংসসাধন। তবে আশার কথা যে বর্তমানে ইহাদের সংরক্ষণ ও পরিমাণবৃদ্ধির উপর দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

নানা সূত্রে—যেমন, তপশীলী জাতিসমূহের উন্নয়ন, বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্যও পাইয়া থাকে।

রাজ্য সরকারের ব্যয় (Expenditure of the States): রাজ্য সরকারের ব্যয়কে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) উন্নয়নমূলক ব্যয়, এবং (খ) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে আছে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচকার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, শিল্প ইত্যাদি। অপর-দিকে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল শান্তিশৃংখলা রক্ষাকল্পে ব্যয়, রাজ্য সরকারের ঋণজনিত ব্যয়, বেসামরিক জনপালন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

উন্নয়নমূলক ব্যয় (Developmental Expenditure): উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইল শিক্ষা খাতে। তবুও ভারতে নিরক্ষরতার তুলনায় এই ব্যয় অতি সামান্যই বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমবংগে বর্তমানে এই খাতে মোট ২১ কোটি টাকার মত ব্যয় হয়। তারপর আছে কৃষি ও সেচকার্যের জন্য ব্যয়। কৃষির সহিত সম্পর্কিত সমবায় আন্দোলনের জন্যও রাজ্য সরকারের বেশ কিছুটা অর্থ ব্যয় হয়। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে রাজ্যগুলির ব্যয় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পরিশেষে আছে শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন খাতে ব্যয়।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যয়

অনুন্নয়নমূলক ব্যয় (Non-developmental Expenditure): অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে রাজ্যের শান্তিশৃংখলা রক্ষাই প্রধান। এই উদ্দেশ্যে পুলিস, জেল ও বিচারের যে ব্যবস্থা করিতে হয় তাহাতেই পশ্চিমবংগের মত অনেক রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। তাহার পর জনপালন কৃত্যকের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ মোটা অর্থ ব্যয় করিতে হয়। দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যয় বিশেষ পরিবর্তনশীল। রাজ্য সরকারের ঋণজনিত ব্যয় কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; কারণ, ঋণসংগ্রহ করিয়া রাজ্য সরকারসমূহ উন্নয়নমূলক কার্যে মনোযোগী হইয়াছে

অনুন্নয়নমূলক ব্যয়

সরকারী ঋণ (Public Debt): ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারসমূহের আয়-ব্যয়ের আলোচনা প্রসংগে সরকারী ঋণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলিলে চলে না। সরকারী ঋণকে সাধারণের ঋণও (Public Debt) বলা হয়। সাধারণের কার্যের জন্য সরকার এই ঋণ সংগ্রহ করে। সরকার উৎপাদনশীল (productive) এবং অনুৎপাদনশীল (unproductive)—উভয় প্রকার ঋণই গ্রহণ করে। উৎপাদনশীল কার্য বলিতে বুঝায় রেলপথ নির্মাণ, সেচ-ব্যবস্থা, শিল্পগঠন প্রভৃতি লাভজনক কার্যসম্পাদন; এবং অনুৎপাদনশীল কার্য বলিতে বুঝায় বাস্তহারাদের সাহায্যদান, দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। ঋণ উৎপাদনশীল হইলে ঋণ দ্বারা সৃষ্ট সম্পত্তির আয় হইতে ঐ ঋণের সুদ প্রদান করা চলে; কিন্তু ঋণ অনুৎপাদনশীল হইলে অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত রাজস্ব সুদ বাবদ ব্যয় করিতে হয়।

১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারত সরকারের মোট ঋণ ছিল ৬৭৯৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৫৭০৪ কোটি টাকার কাছাকাছি দেশের অভ্যন্তর হইতে এবং বাকী ১০৯০ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সংগৃহীত। এই ১০৯০ কোটি টাকার মধ্যে ডলার-ঋণ (Dollar Loan) ছিল ৬৫১ কোটি টাকা। মোট ঋণের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ছিল উৎপাদনশীল।

রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ৩০৭৩ কোটি টাকার মত। ইহার শতকরা ৭০ ভাগই অনুৎপাদনশীল এবং ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গৃহীত।

সংক্ষিপ্তসার

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্র বলিয়া আর্থিক স্বাতন্ত্র্যেরও প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির রাজস্বের সূত্র নির্দিষ্ট করিয়া আর্থিক স্বাতন্ত্র্যেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করিবার সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থার অপর তিনটি নীতি—যথা, পর্যাপ্তি, সমতা ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধা—অনুসরণ করারও প্রয়োজন হয়। ভারতীয় সংবিধানে ইহাও করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারের রাজস্বের সূত্রসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) কর-রাজস্ব এবং (খ) কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব।

কর হইতে সরাসরি যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহাকে কর-রাজস্ব বলে—যেমন, আয়কর, বাণিজ্যশুল্ক, বিক্রয়কর হইতে আয় ইত্যাদি। অপরদিকে সেবামূলক কার্য বা ব্যবসাবাণিজ্য হইতে যে লাভ হয় তাহাকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলে—যথা, ডাক-বিভাগ, রেলপথ প্রভৃতি হইতে আয়।

কর-রাজস্বের মধ্যে কতকগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। কতকগুলি করের আবার সম্পূর্ণটাই শুধু রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। কেন্দ্র হইতে রাজ্যগুলি নানারূপ অর্থসাহায্যও পাইয়া থাকে। কর-বণ্টন, অর্থসাহায্য ইত্যাদি ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুসারে করা হইয়া থাকে।

ইউনিয়ন সরকারের রাজস্ব: ইউনিয়ন সরকারের কর-রাজস্বের মধ্যে ১। ইউনিয়ন উৎপাদনশুল্কের অংশ, ২। আয়করের অংশ, ৩। বাণিজ্যশুল্কের অংশ, ৪। মূলধন-লাভকর ও সম্পদকর, এবং ৫। দানকর—এইগুলি প্রধান।

প্রধান প্রধান কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব হইল: ১। রেলপথ হইতে আয়, ২। ডাক ও তার, ৩। মুদ্রাংকন ও মুদ্রা প্রচলন, ৪। ব্যবসা, কারখানা ইত্যাদি হইতে আয়।

ইউনিয়ন সরকারের ব্যয়: ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত হইল: ১। প্রতিরক্ষা, ২। বেসামরিক শাসন-পরিচালনা, ৩। রাজস্ব হইতে প্রত্যক্ষ ব্যয়, ৪। ঋণজনিত ব্যয়, এবং ৫। উন্নয়নমূলক ব্যয়।

রাজ্য সরকারের রাজস্ব: রাজ্য সরকারের কর-রাজস্বের মধ্যে ১। ভারতীয় আয়করের অংশ, ২। সম্পত্তিকরের অংশ, ৩। ইউনিয়ন উৎপাদনশুল্কের অংশ, ৪। কৃষি-আয়কর, ৫। ভূমি-রাজস্ব, ৬। ষ্ট্যাম্পকর ও রেজিস্ট্রেশন, ৭। বিক্রয়কর, ৮। রেল-মাশুল দরুন প্রাপ্তি, ৯। রাজ্য সরকারের উৎপাদনশুল্ক, ১০। প্রমোদকর, এবং ১১। বিদ্যুৎকর—এইগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ্য সরকারের ব্যয়: রাজ্য সরকারের ব্যয় দুই প্রকারের—(ক) উন্নয়নমূলক, এবং (খ) অনুন্নয়নমূলক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচকার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদিই উল্লেখযোগ্য। অনুন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান হইল শান্তিশৃংখলা রক্ষাকল্পে পুলিস জেল ইত্যাদির জন্য ব্যয়, রাজ্য সরকারের ঋণজনিত ব্যয়, সরকারী কর্মচারীদের বেতন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

সরকারী ঋণ: ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েরই দুই প্রকারের ঋণ আছে—উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল। ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ৬৭৯৪ কোটি টাকার উপর এবং রাজ্যগুলির ঋণ ৩০৭৩ কোটি টাকা।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between Tax Revenue and Non-tax Revenue. What are the main tax revenues of the Government of India? (C. U. 1948)

কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভারত সরকারের প্রধান কর-রাজস্ব কি কি? [৫৯ এবং ৬০-৬১ পৃষ্ঠা]

2. What are the main sources of revenue and heads of expenditure of the Union Government of India? (C. U. 1955)

ভারত সরকারের প্রধান প্রধান রাজস্বের সূত্র ও ব্যয়ের খাত কি কি? [৬০-৬৩ পৃষ্ঠা]

3. Describe the main sources of revenue of the Union Government, and indicate the relative importance of the different sources. (C. U. 1959)

ইউনিয়ন সরকারের রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস বর্ণনা কর; এবং উহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ কর। (৬০-৬২ পৃষ্ঠা]

4. Describe the main sources of revenue and heads of expenditure of the Government of West Bengal. (C. U. 1952,'56; B. U. 1961)

পশ্চিমবংগ সরকারের প্রধান প্রধান রাজস্বের সূত্র ও ব্যয়ের খাত বর্ণনা কর। [৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা]

5. State the main heads of revenue and expenditures of the State Governments under the present Constitution of India. (H. S. (H) Comp. 1961)

ভারতের বর্তমান সংবিধানে রাজ্য সরকারসমূহের প্রধান প্রধান রাজস্বের সূত্র ও ব্যয়ের খাত বর্ণনা কর। [৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা

(System of Judicial Administration)

প্রধান ধর্মাধিকরণ (The Supreme Court): ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা করা চলে। এই পিরামিডের শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। প্রধান ধর্মাধিকরণ একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত। সংবিধান অনুসারে এই আদালত একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন সাধারণ বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। সংবিধানে ইহাও বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। শাসনতন্ত্রের এই বিধান বলে ১৯৫৬ সালে প্রণীত এক আইন দ্বারা পার্লামেণ্ট প্রধান বিচারপতি সমেত মোট বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১১-তে লইয়া যায়। পরে এই সংখ্যাও পর্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় ১৯৬০ সালে আবার একটি সংশোধনী আইন দ্বারা সাধারণ বিচারপতির (other judges) সংখ্যা ১৩-তে এবং ফলে মোট বিচারপতির সংখ্যা ১৪ তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।* ইহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে অস্থায়ী বিচারপতিগণের (Acting Judges) নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে।

প্রধান ধর্মাধিকরণ একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত

প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে ভারতের প্রধান বিচারপতিও বলা হয়। তিনি এবং অন্যান্য বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের বিচারপতি, অভিজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ী ও প্রখ্যাত আইনাভিজ্ঞগণের (eminent jurists) মধ্য হইতে এই আদালতের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করা হয়।

প্রত্যেক বিচারপতি ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য পদত্যাগ করিতে পারেন, অথবা প্রমাণিত অক্ষমতা বা অসদাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের আবেদনক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুতও হইতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল যে, রাষ্ট্রপতি মাত্র পার্লামেণ্টের আবেদনক্রমেই পদচ্যুতির আদেশ দিতে পারেন—নিজ হইতে ইহা করিতে পারেন না। অতএব, অক্ষমতা বা অসদাচরণ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা, তাহা নির্ধারণের ভার পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত—রাষ্ট্রপতির উপর নহে। একবার নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা, অধিকার ইত্যাদির পরিবর্তন

* প্রথম আইনটি Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 এবং সংশোধনী আইনটি Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960 নামে অভিহিত।

করা যায় না। বিচারকদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এলাকা: প্রধান ধর্মাধিকরণের চারি প্রকার এলাকা আছে—যথা, মূল এলাকা, আপিল এলাকা, পরামর্শদান এলাকা এবং নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা।

(ক) মূল এলাকা (Original Jurisdiction): ইউনিয়ন সরকার এবং কোন রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে আইনগত অধিকার লইয়া বিবাদ বাধিলে তাহার বিচার একমাত্র প্রধান ধর্মাধিকরণেই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দুই সরকারের মধ্যে বিবাদ সাধারণত সংবিধানের ব্যাখ্যা লইয়াই বাধে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপরই সংবিধানের ব্যাখ্যার ভার থাকে। সংবিধানের ব্যাখ্যা করিয়া আদালত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়।* ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বলিয়া ইহা 'ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক' (Interpreter and Guardian of the Constitution of India) বলিয়া অভিহিত। প্রধান ধর্মাধিকরণের মূল এলাকায় অবশ্য পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সন্ধি বা চুক্তি সংক্রান্ত কোন মামলা করা যায় না।

(খ) আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction): প্রধান ধর্মাধিকরণের আপিল বিভাগে হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ হইতে আপিল করা চলে। এই আপিল তিন শ্রেণীর হইতে পারে—শাসনতান্ত্রিক, ফৌজদারী ও দেওয়ানী।

আপিল এলাকা তিন প্রকারের

কোন মামলায় মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে ইহাতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে প্রধান ধর্মাধিকরণ যদি নিশ্চিন্ত হয় যে সত্যই মামলাটিতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে উহা আপিল করিবার বিশেষ অনুমতি (special leave) দিতে পারে।

কোন দেওয়ানী মামলায় অন্যূন বিশ হাজার টাকার দাবিদাওয়া জড়িত আছে বলিয়া মহাধর্মাধিকরণ সার্টিফিকেট দিলে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। ইহা ব্যতীত মহাধর্মাধিকরণ যদি সার্টিফিকেট দেয় যে, মামলাটি প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপিলযোগ্য তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট আপিল করা চলে।

ফৌজদারী মামলাতেও কয়েক ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। যথা, (ক) নিম্নতর আদালত হইতে

* পৌরবিজ্ঞানের ৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

মহাধর্মাধিকরণে আপিল হইবার পর, মহাধর্মাধিকরণ যদি আসামীর খালাসের আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে; অথবা (খ) মহাধর্মাধিকরণ যদি নিম্নতর কোন আদালত হইতে মামলা বিচারের জন্য নিজের নিকট উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিচারে আসামীকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করে; অথবা (গ) মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে এই মামলার আপিল-বিচার প্রধান ধর্মাধিকরণে হওয়া উচিত।

পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া প্রধান ধর্মাধিকরণের আপিল এলাকা বাড়াইয়া দিতে পারে।

(গ) পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction): রাষ্ট্রপতি আইন বা ঘটনা সংক্রান্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধান ধর্মাধিকরণের অভিমত জানিতে পারেন। পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত ভারত সরকারের চুক্তি বা সন্ধি সংক্রান্ত কোন মামলা ধর্মাধিকরণের মূল বিভাগে আনয়ন করা না গেলেও পরামর্শদান বিভাগে আনয়ন করা চলে। অর্থাৎ, এই সকল বিষয়ে
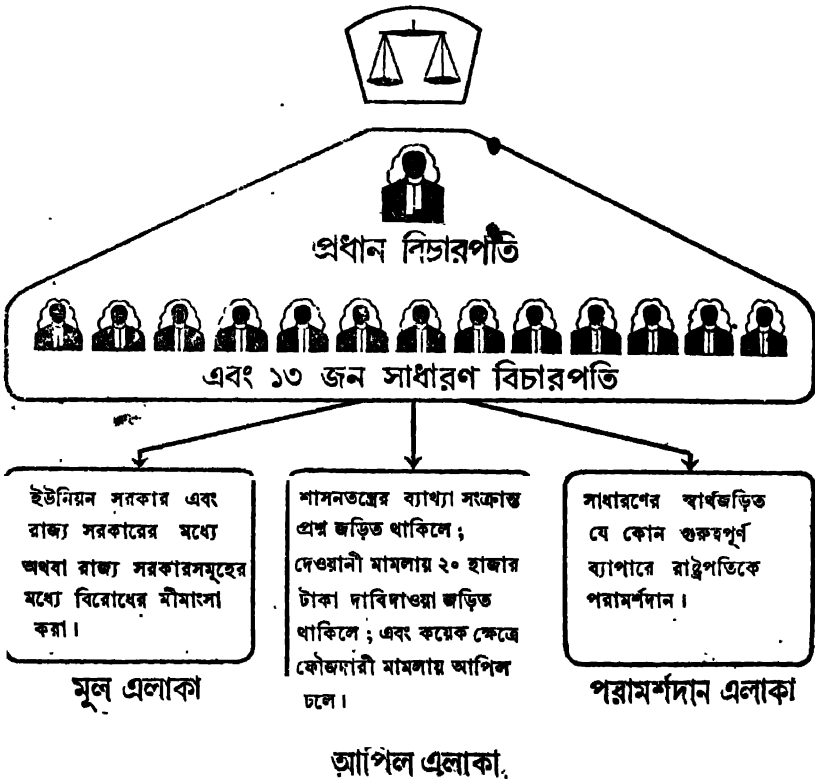
রাষ্ট্রপতি প্রধান ধর্মাধিকরণের মতামত জানিতে পারেন ; কিন্তু এই সকল বিষয় লইয়া প্রধান ধর্মাধিকরণে মামলা রুজু করা যায় না।

(ঘ) নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা (Jurisdiction to issue directions, orders or writs) : মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) রক্ষা করার ভারও প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহা নির্দেশ আদেশ বা লেখ (writs) জারি করিতে পারে।*

অন্যান্য ক্ষমতা

উপরি-উক্ত চারিটি এলাকা ছাড়া সকল বিচারালয়ের রায়ের সংশোধন করার ক্ষমতাও প্রধান ধর্মাধিকরণের আছে। কিন্তু কোন সামরিক আদালতের রায় সংশোধন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

প্রধান ধর্মাধিকরণ যাহাতে নিরপেক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে তাহার জন্য ইহাকে ইহার কর্মচারী নিযুক্ত করিবার এবং তাহাদের চাকরি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই আবার ইহার ব্যয় লোকসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

মহাধর্মাধিকরণসমূহ (High Courts) : প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণ থাকিবে। বর্তমানে ভারতের ১৬টি অংগরাজ্যের মধ্যে ১৪টিতে একটি করিয়া এবং আসাম ও নাগাভূমি উভয়ের জন্য একটি (High Court of Assam and Nagaland)—এই মোট ১৫টি মহাধর্মাধিকরণ আছে।

সকল মহাধর্মাধিকরণে বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। কোন্ মহাধর্মাধিকরণে কত জন বিচারপতি থাকিবেন তাহা রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। প্রধান বিচারপতি ও সাধারণ বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়াই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। সাধারণ বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ঐ মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করিতে হয়। বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।** তবে এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে অকর্মণ্যতা অথবা অসদাচরণের জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের মত অপসারিত করা চলে।

কাহাদের মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি নিযুক্ত করা যায়

অন্তত ১০ বৎসর ভারতের বিচার বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা অন্তত ১০ বৎসর ধরিয়া কোন মহাধর্মাধিকরণে এ্যাডভোকেট হিসাবে কার্য করিতেছেন—এরূপ যে-কোন ভারতীয় নাগরিককেই মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা যায়।

---

* ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন দ্বারা বিচারপতিদের ৬২ বৎসর পর্যন্ত পদে বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাজ্যের মধ্যে মহাধর্মাধিকরণই সর্বোচ্চ আপিল আদালত। নিম্নতর আদালতগুলি হইতে মহাধর্মাধিকরণে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার মামলারই আপিল করা চলে। কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণের মূল এলাকাও আছে। এই মূল এলাকায় বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। গুরুতর ফৌজদারী মামলায় আসামী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়রা সোপরদ্দ হইলে মহাধর্মাধিকরণে এই দায়রা বিচার হয়।

মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা

উপরি-উক্ত ক্ষমতা ছাড়াও মহাধর্মাধিকরণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আছে। মহাধর্মাধিকরণ রাজ্যের সকল নিম্নতর আদালতের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। নিম্নতর কোন আদালতের কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে, তাহা উঠাইয়া মহাধর্মাধিকরণ তাহার বিচার করিতে পারে।

মহাধর্মাধিকরণের উপরও মৌলিক অধিকার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মহাধর্মাধিকরণ শাসন বিভাগের উপর নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিতে পারে।

প্রধান ধর্মাধিকরণের মত মহাধর্মাধিকরণেরও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ও কর্মচারী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। মহাধর্মাধিকরণ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ও রাজ্যের বিধানসভার ভোট-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

নিম্নতর আদালতসমূহ (Subordinate Courts): মহাধর্মাধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিম্নতম আদালত হইতে আলোচনা সুরু করিলে বিচার-ব্যবস্থা সহজবোধ্য হয়।

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থা: পূর্বে দেওয়ানী বিচারের নিম্নতম আদালত ছিল ইউনিয়ন কোর্ট। বর্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এই কোর্টের স্থানাধিকার করিতেছে 'ন্যায় পঞ্চায়েত' বা পঞ্চায়েত আদালত। প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের জন্য এইরূপ একটি আদালত থাকে। এই আদালতের কার্য হইল ছোট ছোট মামলার মীমাংসা করা। সাধারণত এইরূপ আদালতের রায়কে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল করিবার ব্যবস্থাও আছে। গ্রামীণ আদালতের সুবিধা হইল যে গ্রামবাসীদের ছোটখাট বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার জন্য নিজেদের কাজকর্ম বন্ধ করিয়া অন্যত্র যাইতে হয় না।

বড় বড় সহরে এইরূপ ছোট ছোট মামলার বিচার করিবার জন্য ছোট আদালত আছে। মফস্বল অঞ্চলে যে-সকল মামলা ন্যায় পঞ্চায়েতের এলাকায় পড়ে না, তাহাদের বিচার হয় মুন্সেফের আদালতে। মহকুমা ও জিলা সহরে এবং কয়েক ক্ষেত্রে অন্যান্য সহরেও মুন্সেফের আদালত থাকে। মুন্সেফের

বিচারের বিরুদ্ধে সব-জজের আদালতে আপিল করা চলে। মামলার দাবিদাওয়া বেশী হইলে মামলা রুজু করিতে হয় সব-জজের আদালতে। সব-জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের আদালতে আপিল করা চলে। জিলা জজের এবং কয়েক ক্ষেত্রে সব-জজের বিচারের বিরুদ্ধে মহাধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে। জিলা জজ জিলার দেওয়ানী আদালত-সমূহের তত্ত্বাবধান করেন। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরে মাঝারি ধরনের দেওয়ানী মামলার বিচার হয় নগর-আদালতে (City Courts)।

ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থা : দেওয়ানী বিচারের মতই গ্রামাঞ্চলে ছোট-খাট ফৌজদারী মামলার বিচার হইত ইউনিয়ন বেঞ্চে।* বর্তমানে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ন্যায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত আদালতের হস্তে এই ভার অর্পণ করা হইয়াছে। সহরাঞ্চলে এই ধরনের মামলার বিচার করেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। বেতনভোগী ও অবৈতনিক উভয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীর হন। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে জিলা জজের নিকট আপিল করা চলে। অনেক সময় জিলা ম্যাজিস্ট্রেটও নিম্নতর আদালতসমূহ হইতে ফৌজদারী মামলার আপিল শুনিয়া থাকেন। কলিকাতার

বিচার-ব্যবস্থা
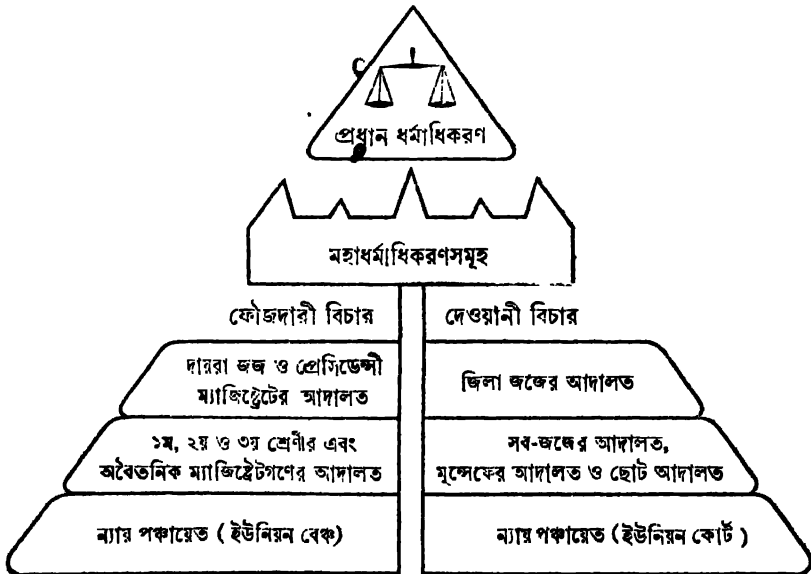
* ইউনিয়ন বোর্ডের দেওয়ানী বিচারের শাখাকে বলা হইত ইউনিয়ন কোর্ট এবং ফৌজদারী বিচারের শাখাকে বলা হইত ইউনিয়ন বেঞ্চ। সকল ইউনিয়ন বোর্ড উঠিয়া না যাওয়ায় কিছু কিছু ইউনিয়ন কোর্ট ও ইউনিয়ন বেঞ্চ এখনও বর্তমান আছে।

ন্যায় মহানগরীতে ফৌজদারী বিচার করিবার জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আছেন। অপরাধ গুরুতর হইলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দায়রা সোপরদ্দ করেন। দায়রা জজ অনেক রাজ্যে জুরির সাহায্যে বিচার করেন। জিলা জজই জিলার দায়রা জজ। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরে দায়রা বিচার হয় নগর-আদালত ও মহাধর্মাধিকরণে। মহাধর্মাধিকরণে আবার দায়রা জজ ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী হয়। মহাধর্মাধিকরণ হইতে কয়েক ক্ষেত্রে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপিল করা চলে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রধান ধর্মাধিকরণ : ভারতের বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণ। সুপ্রীম কোর্ট একাধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রধান আপিল আদালত। ইহা ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ১৩ জন অপর বিচারপতি লইয়া গঠিত। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এলাকা : প্রধান ধর্মাধিকরণের এলাকা চারি প্রকারের—(১) মূল এলাকা, (২) আপিল এলাকা, (৩) পরামর্শদান এলাকা এবং (৪) নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিবার এলাকা। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিচারালয়ের রায় সংশোধন করিবার ক্ষমতাও ইহার আছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার ভারও ইহার উপর অর্পিত।

মহাধর্মাধিকরণসমূহ : প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্ট আছে। সকল মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

রাজ্যের মধ্যে মহাধর্মাধিকরণই সর্বোচ্চ আপিল আদালত; কয়েকটি রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণের মূল এলাকাও আছে। ইহা রাজ্যের মধ্যে সকল নিম্নতর আদালতের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ইহা নির্দেশ আদেশ বা লেখ জারি করিতে পারে।

নিম্নতর আদালতসমূহ : প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের পর ভারতের বিচার-ব্যবস্থা দুইভাগে বিভক্ত—(ক) দেওয়ানী বিচার, (খ) ফৌজদারী বিচার। দেওয়ানী বিচারের জন্য আছে যথাক্রমে (১) ন্যায় পঞ্চায়েত, (২) মুন্সেফের আদালত, (৩) সব-জজের আদালত, (৪) জিলা জজের আদালত এবং (৫) নগর-আদালত।

ফৌজদারী বিচারের জন্য আছে যথাক্রমে (১) ন্যায় পঞ্চায়েত, (২) অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণের আদালত, (৩) বেতনভোগী ম্যাজিস্ট্রেটগণের আদালত, (৪) জিলা জজের আপিল ও দায়রা আদালত এবং (৫) নগর-আদালত।

প্রশ্নোত্তর

1. **Describe the organisation of the Judiciary in India. (H.S. (H) 1961,'62)**
ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সংগঠন বর্ণনা কর। [৬৯-৭৫ পৃষ্ঠা]

2. **Briefly describe the composition, jurisdiction and powers of the Supreme Court of India. (C. U. 1958,'61 ; B. U. 1961)**
ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন, এলাকা ও ক্ষমতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৬৯-৭২ পৃষ্ঠা]

3. **State the composition and functions of the Supreme Court of India. (H. S. (H) 1960)**
ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী বিবৃত কর। [৬০-৭২ পৃষ্ঠা]

4. **Describe the organisation and functions of the Supreme Court of India. (H. S. (H) Comp. 1962)**
ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৬৯-৭২ পৃষ্ঠা]

দ্বাদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা

(Local Self-Government)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা ঃ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সভ্য জগতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজধানী-গুলি হইতে সকল অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ঠিকভাবে মিটানো সম্ভব হয় না বলিয়াই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন হয়। বর্ধমানে মহামারী প্রতিরোধ বা জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা বর্ধমান হইতেই করা সম্ভব—দিল্লী বা কলিকাতায় বসিয়া আদেশ নির্দেশ টেলিফোন বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে নহে। দ্বিতীয়ত, স্বায়ত্তশাসনের ইচ্ছাও মানুষের প্রকৃতিগত। এই কারণে সকল ব্যাপারে বহিঃনিয়ন্ত্রণ লোকে পছন্দ করে না। রাজধানী কলিকাতা হইতে নির্দেশ আসার পর বহরমপুরের পথঘাট সারানো হইবে এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বহরমপুরবাসীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তৃতীয়ত, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনকার্যের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য করে। অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ প্রথমে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষানবীসী করিয়া পরে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শাসনকার্যের উপযুক্ত হন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, যে-দেশে ভাল স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই সে-দেশে গণতন্ত্র কোনমতেই সফল হইতে পারে না। পরিশেষে, ন্যায় ও মিতব্যয়িতার দিক দিয়াও স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া উপায় নাই। কলিকাতার নাগরিক-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পল্লীবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করিলে অন্যায় কার্যই করা হয়। আবার কলিকাতার নাগরিক-জীবনের সুখসুবিধার জন্য নাগরিকগণ-প্রদত্ত অর্থের ব্যয়ের ভার কলিকাতার নাগরিকগণের উপরই দেওয়া উচিত। এরূপ ভারার্পণেই মিতব্যয়িতার সম্ভাবনা থাকে।

ভারতের স্বায়ত্তশাসন ঃ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে 'সভা', 'সমিতি', 'পঞ্চায়েত' প্রভৃতি বহু উন্নত ধরনের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে পারা যায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের এই নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহার স্থানাধিকার করে পাশ্চাত্য ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা। বর্তমানে ভারতে যে-সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি প্রধানত ব্রিটিশ আমলেই সৃষ্ট।

ভারতে পাশ্চাত্য ধরনের সর্বপ্রথম স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হইল মাদ্রাজ

পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন। ইহা ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা অন্যান্য কয়েকটি সহরে পৌর-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সহর পৌরসংঘ (Municipality) স্থাপনের অধিকার পায়। এই শতাব্দীতেই আরও দুইটি আইন পাস হওয়ার ফলে ভারতের পাশ্চাত্য ধরনের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা বিশেষ প্রসারলাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৯ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলে ভারতের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা উন্নতি ও গণ-তান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠন : ভারতের বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাদিগকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—গ্রামীণ ও পৌর। গ্রামীণ বলিতে গ্রামীণ বা পল্লী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায়। পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন বোর্ড এবং জিলা বোর্ড এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা কয়েকটি গ্রাম লইয়া এবং জিলা বোর্ডের এলাকা একটি জিলার সমগ্র পল্লী অঞ্চল লইয়া। ইহা ছাড়া সেদিন পর্যন্ত এক একটি মহকুমার পল্লী অঞ্চল লইয়া এক একটি স্থানীয় বা লোকাল বোর্ড ছিল। বর্তমানে উহাদিগকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের একটি শ্রেণীবিভাগ

সহর অঞ্চলে বড় বড় নগরের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বলা হয়। ভারতে কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনা দিল্লী আমেদাবাদ প্রভৃতি মহানগরে এবং চন্দননগরের মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরে করপোরেশন আছে। অন্যান্য সহরের প্রতিষ্ঠানকে পৌরসংঘ বা মিউনিসি-প্যালিটি বলা হয়। অনেক সময় যে-যে সহরে সেনানিবাস আছে, সেখানে সেনানিবাস সংঘ বা 'ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড' থাকে। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান বা 'ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট' থাকে। বড় বড় বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান বা 'পোর্ট ট্রাষ্ট' থাকে।

বর্তমান ভারতের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আর একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা চলে। এই শ্রেণীবিভাগ হইল ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলিতে একমাত্র গ্রাম-পঞ্চায়েতকেই বুঝায় ; অপর কোন প্রতিষ্ঠান ভারতের নিজস্ব নহে।

আর একটি শ্রেণীবিভাগ

নিম্নে প্রধানত পশ্চিমবংগের পটভূমিকায় প্রধান প্রধান স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণিত হইল।

গ্রাম-পঞ্চায়েত (Village Panchayats) : ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছে যে, গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান।

ব্রিটিশ আমলের পূর্বে ভারতের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত সভা ছিল। ব্রিটিশ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, জিলা বোর্ড প্রভৃতি গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়ায় এই গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই পঞ্চায়েতগুলির পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। ফলে, কয়েকটি প্রদেশে পঞ্চায়েত আইন পাস হয় এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। ইহার পর ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম নির্দেশ অনুসারে পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালের মধ্যে ভারতের পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৯০ ভাগ পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার অধীনে আসে।

পঞ্চায়েতের কার্যের মধ্যে গ্রামের শান্তিশৃংখলা রক্ষা, গ্রামের জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যোন্নয়ন, ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি মামুলী কর্তব্য ছাড়া সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, সর্বাংগীণ পল্লীসংস্কার, উন্নয়নমূলক কার্য প্রভৃতিও আছে। মোটকথা, স্বাধীন ভারতের পল্লীগঠন কার্যে পঞ্চায়েতকে অন্যতম ভিত্তি করা হইয়াছে; এবং এই ভিত্তিতেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ বা পল্লী উন্নয়নের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েতের প্রাধান্য বা পঞ্চায়েতী রাজ (Panchayati Raj) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে পশ্চিমবংগের গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বর্ণনা হইতেই এ-ধারণা করা যাইবে।

কাম

পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েতঃ পশ্চিমবংগ গ্রাম-পঞ্চায়েত আইন পাস হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সাল হইতে এই আইনকে কার্যকর করা হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডের বিলোপসাধন করিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

পশ্চিমবংগ পঞ্চায়েত আইন কোন অঞ্চলে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলে রাজ্য সরকার সেই অঞ্চলে এক বা ততোধিক গ্রাম-সভার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। প্রত্যেক গ্রাম-সভা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিধানসভার নির্বাচকদের লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রাম-সভাকে একবার করিয়া বাৎসরিক সাধারণ সভা এবং একবার করিয়া যাণ্মাসিক সভার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

গ্রাম-সভা

গ্রাম-সভার কার্যনির্বাহের ভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত। এই গ্রাম-পঞ্চায়েত গ্রাম-সভার সদস্যবর্গ দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত অনধিক ১৫ জন এবং অন্যূন ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহা ছাড়াও সরকার কয়েকজন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারে। এই মনোনীত সদস্যদের ভোটাধিকার এবং অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইবার অধিকার নাই।

গ্রাম-পঞ্চায়েত

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ হইলেন যথাক্রমে গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহ-

সভাপতি। পঞ্চায়েতের সভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়াও তাঁহারা দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য দায়ী। পঞ্চায়েতের, এবং ফলে সভাপতি ও সহ-সভাপতির, কার্যকাল ৪ বৎসর। পঞ্চায়েতের প্রাথমিক কার্যের মধ্যে আঞ্চলিক জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, মহামারী প্রতিরোধ, পানীয় জল সরবরাহ, পথঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, সাধারণের ব্যবহার্য পুষ্করিণী, পশুচারণভূমি শ্মশানঘাট কবরস্থান প্রভৃতির সংরক্ষণ, গ্রামোন্নয়নের জন্য শ্রমদান সংগঠন প্রভৃতিই প্রধান।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ

ইহা ছাড়াও রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর নিম্নলিখিত কর্তব্যভার অর্পণ করিতে পারে—যথা, প্রাথমিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন; ফেরিঘাটের তত্ত্বাবধান; সেচকার্য; অধিক খাদ্য-ফলাও অভিযান পরিচালনা; পশুমড়ক নিবারণ ও গো-মহিষাদির জাত উন্নত করার ব্যবস্থা; পতিত জমির পুনরুদ্ধার; বৃক্ষরোপণ; সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার প্রবর্তন; ভূমি-প্রথার সংস্কারে সহায়তা; ইত্যাদি।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বাকী কার্যগুলি পরিচালনা করে অঞ্চল-পঞ্চায়েত। এক একটি অঞ্চল-পঞ্চায়েত পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম-সভা লইয়া গঠিত হয়। গ্রাম-সভার অনধিক ২৫০ জন সদস্যপিছু একজন করিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়। পঞ্চায়েতের ন্যায় অঞ্চল-পঞ্চায়েতের কার্যকাল ৪ বৎসর। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে প্রধান ও উপপ্রধান নামে অভিহিত হন।

অঞ্চল-পঞ্চায়েত

প্রধান ও উপপ্রধান

অঞ্চল-পঞ্চায়েতের কার্যের বর্ণনায় প্রথমেই আঞ্চলিক শান্তিশৃংখলা রক্ষার উল্লেখ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে অঞ্চল-পঞ্চায়েত চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করে এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ছাড়া করধার্য প্রভৃতি আয়ের ব্যবস্থা এবং ন্যায়-পঞ্চায়েত পরিচালনা করা হইল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

ন্যায়-পঞ্চায়েতের কার্য হইল ছোটখাট বিচারের ব্যবস্থা করা। ন্যায়-পঞ্চায়েতগুলি অঞ্চল-পঞ্চায়েত দ্বারা গঠিত এবং ইহারই মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ন্যায়-পঞ্চায়েতের বিচারকগণ নির্বাচিত হন। নির্বাচন গ্রাম-সভার সদস্যগণের মধ্য হইতে করা হয়।

ন্যায়-পঞ্চায়েত

বলা হইয়াছে, করধার্য প্রভৃতি দ্বারা অর্থসংগ্রহের ভার অঞ্চল-পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত। এই সকল অর্থ 'অঞ্চল-পঞ্চায়েত ভাণ্ডার' নামে একটি তহবিলে সঞ্চিত হয় এবং তাহা হইতে অঞ্চল-পঞ্চায়েতের নিজস্ব কার্য পরিচালনার জন্য এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত ও ন্যায়-পঞ্চায়েতের কার্য পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

১৯৫৭ সাল হইতে পশ্চিমবংগে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচন সুরু

হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত পাঁচ হাজারের মত গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের নির্বাচন সমাধা হয় এবং শতকরা ৩০ ভাগের উপর পল্লীবাসী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে আসে। শেষপর্যন্ত এই রাজ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সংখ্যা যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৪ হাজারে দাঁড়াইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। তখন রাজ্যের সমগ্র পল্লী অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনে আসিবে।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board): ভারতের অন্যান্য রাজ্য পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার প্রবর্তনকার্য একপ্রকার শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবংগে পল্লী অঞ্চলের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ অংশে ইউনিয়ন বোর্ডের অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে। তবে এই রাজ্যেও ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠাকার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা হইল একটি ইউনিয়ন লইয়া। একটি ইউনিয়ন কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। পশ্চিমবংগের ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ১৯১৯ সালের বংগীয় স্বায়ত্তশাসন আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা হইল ৬ জন হইতে ৯ জন। সকল সভ্যই নির্বাচিত। নির্বাচন সাধারণত ৪ বৎসর অন্তর হয়। সুতরাং বোর্ডের কার্যকালও ৪ বৎসর।

গঠন

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে ইউনিয়নের অধিবাসী সকল প্রাপ্তবয়স্কই ভোট দিতে পারে না। ভোটাধিকার পাইবার জন্য অধিবাসীর পক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়াও ন্যূনতম হারে ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কর অথবা ন্যূনতম হারে সেস দেওয়া চাই, অথবা স্কুল ফাইন্যাল বা অনুরূপ কোন পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া চাই।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যনির্বাহের ভার বোর্ডের সভাপতির (President) উপর ন্যস্ত। তিনি সভ্যগণের মধ্য হইতে সভ্যগণ দ্বারা ঐ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সার্কেল অফিসার নামে সরকারী কর্মচারীর মাধ্যমে রাজ্য সরকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির তদারক করে এবং উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এক একজন সার্কেল অফিসারের এলাকায় অনেকগুলি করিয়া ইউনিয়ন বোর্ড থাকে।

ইউনিয়নের মধ্যে যাহাতে শান্তিশৃংখলা বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই বোর্ডের প্রধান কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বোর্ড চৌকিদার ও দফাদার নিযুক্ত করে। গ্রামগুলির মধ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করাও বোর্ডের অন্যতম কার্য। গ্রামগুলির রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, পশুমড়ক প্রতিরোধ করা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করা, ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়-প্রকার মামলার বিচার করা, ইত্যাদি

কার্য

হইল বোর্ডের অন্যান্য কর্তব্য। ইহা ছাড়াও অনেক সময় ইউনিয়ন বোর্ডকে জিলা বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কর্তব্যসমূহও পালন করিতে হয়।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইল 'ইউনিয়ন রেট' বা চৌকিদারী কর। এই উৎস হইতে বোর্ডের আয়ের তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

আয়

চৌকিদারী কর ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাধীন সম্পত্তির মালিকের উপর ধার্য করা হয়। ইহা ব্যতীত জিলা বোর্ড ও রাজ্য সরকার ইউনিয়ন বোর্ডকে সামান্য সামান্য সাহায্যও করিয়া থাকে।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের অন্যান্য পন্থার মধ্যে আছে গ্রামের খোঁয়াড়, ফেরিঘাট, মামলার ফী, মামলার জরিমানা ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে বোর্ডের বাজার প্রভৃতি সম্পত্তিও থাকে; এই উৎস হইতেও কিছু কিছু আয় হয়।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের যে-আয় হয় তাহা কোন মতেই পল্লী অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বোর্ডের আয়ের

ব্যয়

বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইয়া যায় চৌকিদার ও দফাদারের মাহিনা মিটাইতে। ফলে জনকল্যাণকর কার্যে অতি অল্প অর্থই ব্যয় করা সম্ভব হয়। ভারতের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার এক সমালোচকের ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, যদি গ্রামীণ পুলিস—অর্থাৎ, চৌকিদার ও দফাদারগণই ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের সমগ্রটা খাইয়া ফেলে তবে জনকল্যাণ সাধিত হইবে কিরূপে?

তবে ইউনিয়ন বোর্ড লইয়া বিশেষ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ বর্তমানে উহারা বিলুপ্তির পথে। শীঘ্রই পঞ্চায়েত-ব্যবস্থা উহাদের স্থানাধিকার করিয়া উহাদিগকে অতীতের বস্তু করিয়া তুলিবে।

জিলা বোর্ড (District Board) ঃ জিলা বোর্ডের এলাকা একটি জিলার সমগ্র পল্লী অঞ্চল লইয়া। পশ্চিমবংগে জিলা বোর্ডের সভ্যসংখ্যা

গঠন

৯-এর কম হইতে পারে না এবং সাধারণত ৩৫-এরও অধিক হয় না। বর্তমানে সভ্যগণের সকলেই ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতৃগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। পূর্বে যে সভ্যগণের একাংশের মনোনয়ন-ব্যবস্থা ছিল তাহা এখন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের মত জিলা বোর্ডের কার্যকালও ৪ বৎসর। বোর্ডের সভ্যগণের মধ্য হইতে সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন সভাপতি এবং এক বা একাধিক সহ-সভাপতি থাকেন। সভাপতির উপরেই কার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য বোর্ড স্থায়ী বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্মসচিব (secretary), বাস্তুকার (engineer), স্বাস্থ্যাধিকারিক (health officer) প্রভৃতিই প্রধান।

কোন বোর্ড কর্তব্যপালনে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা স্বেচ্ছায়

কার্যসম্পাদনে অবহেলা করিলে রাজ্য সরকার উক্ত বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।

জিলা বোর্ডকে বিভিন্ন ধরনের কার্য করিতে হয়। তবে জিলা বোর্ডের উপর শান্তিশৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নাই। বোর্ডের অন্যতম কার্য হইল জিলার রাস্তাঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ করা। জনস্বাস্থ্যরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যোন্নতি করাও জিলা বোর্ডের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বোর্ডকে গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসাইতে হয়, পুষ্করিণী খনন এবং পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হয়, দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর ঔষধ বিতরণ করিতে হয় এবং সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। টিকা দিবার ব্যবস্থা ও সমস্ত টিকাদারদের নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার বোর্ডের উপর। পশুমড়ক নিবারণ ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থাও জিলা বোর্ডকে করিতে হয়। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলকে অর্থ, খাদ্য ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য করিতে হয়। জিলার অভ্যন্তরে শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্বও বোর্ডের উপর রহিয়াছে। বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলির দেখাশুনায় জিলা স্কুল বোর্ডকে সহায়তা করে। শিক্ষকদের নিয়োগ করা ও বেতন দিবার ব্যবস্থাও বোর্ড করে। কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের জন্য বোর্ড বৃত্তি দান করে। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করিবার ক্ষমতাও বোর্ডের আছে।

কার্য

জিলা বোর্ডের অন্যান্য কার্যের মধ্যে ডাকবাংলো, বিশ্রামাবাস, হাট-বাজার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বোর্ড জিলায় পারাপারের সুবন্দোবস্ত করে এবং অনেক সময় ছোটখাট রেলপথ নির্মাণের জন্য রেল কোম্পানীকে অর্থসাহায্য করে।

জিলা বোর্ডের প্রধান আয় হইল রোড সেস বা পথকর হইতে। জিলায় জমির খাজনার উপর এই কর ধার্য করা হয়। রাস্তা ও পুলের উপর শুল্ক (toll) ধার্য করিয়া এবং ফেরিঘাট, খোঁয়াড় প্রভৃতি জমা দিয়াও বোর্ডের কিছু আয় হয়। জিলার মধ্যে ছোট রেলপথ থাকিলে উহা হইতে কিছু লভ্যাংশ জিলা বোর্ড পাইয়া থাকে। ব্যয় সংকুলানের জন্য বোর্ড ঋণ গ্রহণ করিতে পারে।

আয়

জিলা বোর্ডের আয়ের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ ব্যয় হয় কর্মচারিগণের বেতন বাবদ, প্রায় ২৫ ভাগ ব্যয় হয় জনস্বাস্থ্যের জন্য, প্রায় ১৭ ভাগ ব্যয় হয় রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য এবং শিক্ষাখাতে ব্যয় হয় শতকরা ১৪ ভাগ মাত্র। বাকী অংশ ব্যয় হয় অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনে।

ব্যয়

সম্প্রতি রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ রাজ্যে জিলার স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থাকে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা

'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ' (democratic decentralisation) নামে অভিহিত। ইহাতে জিলা বোর্ড তুলিয়া দিয়া তিন-পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান (three-tier machinery) গঠন করা হইয়াছে। প্রথম পর্যায়ে বা ভিত্তিস্থলে আছে গ্রাম-পঞ্চায়েত, মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছে ব্লক-পঞ্চায়েত সমিতি (Block Panchayat Samiti), এবং সর্বোপরি আছে জিলা পরিষদ। এই তিনটি পর্যায় পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত এবং উহাদের উপর জিলার সকল প্রকার পৌর ও উন্নয়ন কর্তব্যভার (civic and developmental activities) অর্পিত হইয়াছে। পশ্চিমবংগ সহ বাকী রাজ্যগুলিও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছে।* সুতরাং ইউনিয়ন বোর্ডের ন্যায় জিলা বোর্ডেরও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নহে।

জিলার স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার নূতন রূপ

পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality): কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনার ন্যায় মহানগরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বলা হয় এবং অন্যান্য সহরের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা হয় পৌরসংঘ বা মিউনিসিপ্যালিটি। সকল ক্ষেত্রে পৌরসংঘ যে একটি সহর লইয়া গঠিত হয় তাহা নহে। অনেক সময় পাশাপাশি কয়েকটি সহর লইয়াও একটি পৌরসংঘ গঠিত হয়।

পশ্চিমবংগের পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (Bengal Municipal Act, 1932) দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৯৩২ সালে পাস হওয়ার পর অবশ্য এই আইনের বহু পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে।

পৌরসংঘের কার্য পরিচালনার ভার সংঘের সভ্যদের উপর ন্যস্ত। সভ্যগণ পৌরাধ্যক্ষ বা কমিশনার নামে পরিচিত। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে এক নহে। কোন্ পৌরসংঘে কতজন পৌরাধ্যক্ষ থাকিবেন তাহা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তবে কোনও ক্ষেত্রে ৯-এর কম এবং ৩০-এর বেশী পৌরাধ্যক্ষ থাকেন না। সকল পৌরাধ্যক্ষই বর্তমানে নির্বাচিত। পূর্বে নির্বাচন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইত না। নির্বাচনে মাত্র রেট, লাইসেন্স ফী ইত্যাদি প্রদানকারী এবং অন্তত ২১ বৎসর বয়স্ক স্কুল ফাইন্যাল বা অনুরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই ভোট দিতে পারিত। বর্তমানে কিন্তু ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে বংগীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। ফলে ভবিষ্যতে পৌরাধ্যক্ষগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইবেন।

গঠন

পৌরাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও

* পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের মধ্যেই এই আইন পাস করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

একজন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচিত করেন। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক সহ-সভাপতিও থাকেন। সভাপতি পৌরাধ্যক্ষগণের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁহাদের নির্দেশানুসারে পৌরসংঘের কার্য পরিচালনা করেন। অধিকাংশ সময় তিনি সহ-সভাপতির হস্তে কয়েকটি কার্যের ভার ছাড়িয়া দেন। সভাপতি বা পৌরসংঘপাল এবং উপপৌরসংঘপালের পদ অবৈতনিক। পৌরাধ্যক্ষগণও কোন বেতন বা ভাতা পান না।

বেতনভোগী কর্মচারীর মধ্যে কর্মসচিব, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (Sanitary Inspectors), কার্য-পরিদর্শক (Overseer) প্রভৃতিই প্রধান। কোন কোন পৌরসংঘে আবার স্বাস্থ্যাধিকারিক (Health Officer), বাস্তুকার (Engineer) প্রভৃতির পদও থাকে। আয় ১ লক্ষ টাকার অধিক হইলে পৌরসংঘ একজন মুখ্য কার্যনির্বাহক (Chief Executive Officer) নিযুক্ত করিতে পারে।

পৌরসংঘকে বহুবিধ কার্য করিতে হয়। এই কার্যগুলিকে অনেক সময় দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য, এবং (২) স্বেচ্ছাধীন কার্য। অপরিহার্য কার্য বা কর্তব্য হইল সেগুলি যেগুলিকে নগরের স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় কোনমতেই বর্জন করা যায় না। যেমন, নগরজীবনের পক্ষে রাজপথ অপরিহার্য বলিয়া রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ পৌরসংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

কার্য

স্বেচ্ছাধীন কার্য হইল সেগুলি যাহা আয় অধিক হইলেই পৌরসংঘগুলি সম্পাদন করে—যেমন, হাসপাতাল স্থাপন বা কলের জলের ব্যবস্থা করা সকল পৌরসংঘের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং এই দুইটি স্বেচ্ছাধীন কার্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে অন্তত নলকূপ বসাইয়া পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা পৌরসংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

কার্যাবলীর শ্রেণীবিভাগ

অপরিহার্য ও স্বেচ্ছাধীন কর্তব্যের সীমারেখা অবশ্য সকল সময় সুস্পষ্ট নহে। তাই এই শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ না করিয়া সাধারণত পৌরসংঘগুলি যে-সকল কার্য সম্পাদন করে তাহারই বর্ণনা করা হইতেছে।

পৌরসংঘ তাহার এলাকার রাস্তাঘাট, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং ইহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে; রাজপথগুলি আলোকিত ও জলসিঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা করে।

পৌরসংঘ সহর হইতে ময়লা ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে; সহরে বন-জংগল ও অপরিষ্কার পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইবার ব্যবস্থা করে; পুষ্করিণী খনন করিয়া, নলকূপ বসাইয়া, জলকল বসাইয়া পানীয় জল সরবরাহ করে। সংঘ মহামারীর প্রতিরোধকল্পে টিকা দেয় এবং চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, প্রসূতি-আগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে পৌরসংঘ জন-স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্যেই ইহাদের উপর ঔষধ ও খাদ্যাদির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

পৌরসংঘ সহরে গোরস্থান, শ্মশান প্রভৃতি স্থাপন ও তত্ত্বাবধান করে। অধিকাংশ স্থানে সংঘ গৃহাদি নির্মাণও নিয়ন্ত্রণ করে। এই সকল স্থানে পরিকল্পনা অনুসারে গৃহনির্মাণকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে পৌরসংঘের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সংঘ সহরে অগ্ন্যুৎপাত প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা এবং বিপজ্জনক গৃহাদি অপসারণ করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করে।

পৌরসংঘের অপর একটি কার্য হইল এলাকার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে ক্রয় ও বিক্রয়ের ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করা। জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখাও পৌর-সংঘের কার্য।

পরিশেষে, শিক্ষাবিস্তার পৌরসংঘের একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সংঘ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রভৃতিতে অর্থসাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে পৌরসংঘ আবার জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে।

কার্যের মত পৌরসংঘের আয়ের উৎসও বহুবিধ। প্রধান উৎস হইল এলাকার জমি ও গৃহাদির আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের উপর কর বসানো। ইহাকে হোল্ডিং রেট (Holding Rate) বলা হয়। ইহা ছাড়াও জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, পথঘাট আলোকিত করার জন্যও জমি ও গৃহাদির উপর কর ধার্য করা হয়।

আয়

জমি ও গৃহাদির উপর এইরূপে কর ধার্য করা ছাড়াও পৌরসংঘ এলাকার অন্তর্গত সকল ব্যবসায়, বৃত্তি প্রভৃতির উপর কর ধার্য করে। ফলে দোকানদার, অন্যান্য ব্যবসায়ী, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতিকে কর দিতে হয়। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতির উপর কর বসাইয়া পৌরসংঘের আয় হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত বাজারের উপরও পৌরসংঘ কর ধার্য করিতে পারে। অনেক সময় গৃহপালিত পশুর জন্য মালিকদের নিকট হইতে অনুমতি বা লাইসেন্স বাবদ কিছু আয় হয়। কোন কোন রাজ্যে পৌরসংঘগুলির পুরঃশুল্ক বা চুংগি (Octroi) ধার্য করিবার ক্ষমতা আছে। পশ্চিমবংগের পৌরসংঘগুলির এই কর ধার্য করিবার ক্ষমতা নাই।

পৌরসংঘের এলাকায় খেয়া পারাপারের বন্দোবস্ত বা পুল থাকিলে এই উৎস হইতেই সংঘের আয় হয়।

সংঘ বাজার, ডাকবাংলো, বিশ্রামাবাস প্রভৃতি সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে; হইলে এই উৎস হইতেও সংঘের আয় হয়। অনেক ক্ষেত্রে মোটরযান হইতে সংগৃহীত করের একাংশ পৌরসংঘগুলি পাইয়া থাকে। সরকার সংঘের উপর কোন বিশেষ কর্তব্যভার অর্পণ করিলে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও প্রদান করিয়া থাকে।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পৌরসংঘগুলিকে ঋণ প্রদান করে। সরকারের অনুমতি লইয়া সংঘ জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহও করিতে পারে।

উপরি-উক্ত উৎসগুলি হইতে যে আয় হয় তাহা বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনে ও কর্মচারিগণের বেতন দিতে ব্যয় করা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জল ও ময়লা নিষ্কাশন বাবদ এবং কর্মচারীদের বেতন দিতেই অধিকাংশ অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়; শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যয় করা সম্ভব হয় না।

ব্যয়

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন (Calcutta Corporation): কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ পাটনা আমেদাবাদ বাংগালোর পুণা প্রভৃতির ন্যায় মহানগরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন বলা হয়। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবংগের অন্তর্ভুক্ত পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরেও একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান ১৯৫১ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। ১৯৫২, ১৯৫৫, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে আইনটির কিছু কিছু সংশোধন করা হইয়াছে, এবং ১৯৬৩ সালের প্রথমে আর এক দফা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার ভার বর্তমানে ৮০ জন নির্বাচিত কাউন্সিলার, ১ জন পদাধিকারবলে কাউন্সিলার ও ৫ জন অল্ডারম্যান বা নগরপাল—এই ৮৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। সাধারণ সদস্যগণ কাউন্সিলার বলিয়া পরিচিত। পদাধিকারবলে যিনি কাউন্সিলার তিনি হইলেন কলিকাতা নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। কাউন্সিলারগণ ৫ জন অল্ডারম্যান বা নগরপাল নির্বাচিত করেন। পূর্বে কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানের নির্বাচন প্রতি ৩ বৎসর অন্তর হইত। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এক আইন পাস করিয়া কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৩ বৎসর হইতে ৪ বৎসর করা হইয়াছে। সুতরাং এখন নির্বাচন ৪ বৎসর অন্তর হয়। ইহার উপর রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে এই পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল আরও ১ বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে।

গঠন

পূর্বে কাউন্সিলার-নির্বাচন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হইত না। ট্যাক্স, রেট, লাইসেন্স ফী ইত্যাদি প্রদানকারী এবং স্কুল ফাইন্যাল বা তদনুরূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ ২১ বৎসর বয়স্ক হইলে তবেই ভোটাধিকার পাইত। কিন্তু উপরি-উক্ত ১৯৬২ সালের সংশোধন দ্বারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করা হইয়াছে। ফলে ভবিষ্যতে পৌরসংঘসমূহের ন্যায় কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

পৌর-প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে মেয়র এবং সহ-সভাপতিকে ডেপুটি মেয়র বলা হয়। তাঁহারা ১ বৎসরের জন্য সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন।

কার্যনির্বাহের জন্য কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সভ্য লইয়া

গঠিত কয়েকটি স্থায়ী কমিটি আছে। তন্মধ্যে কর, অর্থ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, নগরোন্নতি ও পরিকল্পনা কমিটি প্রধান।

বিভিন্ন এলাকায় পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহার জন্য অনেকগুলি এলাকা কমিটি (Borough Committees) গঠন করা হইয়াছে। এক একটি এলাকা কমিটি কয়েকটি পল্লী লইয়া গঠিত হয়।

নূতন আইন দ্বারা কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানে কমিশনার নামে একটি পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কমিশনার রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য হইল পৌর-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা। তাঁহাকে মুখ্য কার্য-নির্বাহক (chief executive) বলিয়া অভিহিত করা যায়। তাঁহার হস্তে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। আইনে সাধারণ সময়ে দুইজন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে চারজন পর্যন্ত সহকারী কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থাও আছে।

পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা পৌরসংঘের কার্যেরই অনুরূপ। তবে আয় বেশী বলিয়া পৌর-প্রতিষ্ঠান নগরজীবনের উন্নতিকল্পে অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান নগরের রাস্তাঘাট, উদ্যান, চত্বর প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে; শ্মশানঘাট ও গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণ করে; পথঘাট আলোকিত ও জলসিঞ্চিত করে; নগরের জল ও ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে; পানীয় ও অশোধিত জল সরবরাহ করে; নগরবাসীদের সুবিধার জন্য বাজারের প্রতিষ্ঠা করে।

কার্য

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও রক্ষা কল্পে পৌর-প্রতিষ্ঠান অন্যান্য কতকগুলি কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে—যেমন, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করিবার জন্য টিকা দেওয়া, ঔষধ ও খাদ্যাদি বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা, পশুহত্যাশালা স্থাপন করা, হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলিকে অর্থসাহায্য করা, ইত্যাদি।

সহরের গৃহনির্মাণও ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন। কলিকাতায় গৃহনির্মাণ বা গৃহের রদবদল করিতে হইলে পরিকল্পনাটি পৌর-প্রতিষ্ঠানকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়।

শিক্ষাবিস্তার পৌর-প্রতিষ্ঠানের একটি প্রাথমিক কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান অনেক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনেক বিদ্যালয়কে ইহা অর্থসাহায্যও করে। ইহার পরিচালনাধীনে একটি বাণিজ্যিক জাদুঘরও আছে। এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল কুটির শিল্পের প্রচার।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আয় ৯ কোটি টাকার মত। কিছুদিন পূর্বেও আয় মাত্র আড়াই কোটি টাকা ছিল। জমি ও বাড়ীর আনুমানিক বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য কর হইল আয়ের প্রধান উৎস। এই কর শতকরা ১৫ টাকা হইতে ২৩ টাকা

আয়

হারে ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় উৎস হইল ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর ধার্য কর। তাহার পর আছে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতির উপর ধার্য কর। বাজার প্রভৃতি সম্পত্তি হইতেও কিছু আয় হয়। মোটরযানের উপর ধার্য সরকারী করের একাংশও পৌর-প্রতিষ্ঠান পাইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত উপায়ে সংগৃহীত আয় বিবিধ কার্যসম্পাদনে ব্যয়িত হয়।

ব্যয়

কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা দিতেই আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয়িত হয়।

সেনানিবাস সংঘ (Cantonment Board): নগরের যে-সকল অঞ্চলে সেনানিবাস আছে সেখানে একটি করিয়া সেনানিবাস সংঘ থাকে। সংঘের কার্য প্রতিরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়।

নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান (Improvement Trust): কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে একটি করিয়া নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান আছে। পশ্চিমবংগে কলিকাতা ছাড়া হাওড়াতেও একটি নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। নগরের উন্নতি করাই এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য। নগরের উন্নতি বলিতে অপরিষ্কার বস্তি পরিষ্কার ও অপসারণের ব্যবস্থা করা, নূতন বাসযোগ্য এলাকার সৃষ্টি করা, নূতন রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, উদ্যান চত্বর ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি স্থাপন করা বুঝায়। এইগুলি করিয়া নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান নগরের সুন্দর রূপ দিতে চেষ্টা করে। ইহারা পৌর-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পায়। নূতন বাসযোগ্য জমি বিক্রয় করিয়াও ইহাদের আয় হয়।

বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান (Port Trust): কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান আছে। বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ইহাদের কার্য। বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও ইহারা মালগুদাম, জেটি প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, ফেরি ষ্টীমার দ্বারা নদী-পারাপারের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। বন্দরে যে-সকল জাহাজ আসে তাহাদের নিকট শুল্ক আদায় করাই আয়ের প্রধান উৎস।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ভারতে যে-সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দৃষ্ট হয় তাহাদের অধিকাংশ ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট। ভারতের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা হইল গ্রাম-পঞ্চায়েত। সুতরাং ভারতে দুই ধরনের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) ভারতীয় ও (খ) পাশ্চাত্য ধরনের। (ক) গ্রামীণ ও (খ) পৌর—স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান হইল (১) গ্রাম-পঞ্চায়েত, (২) ইউনিয়ন বোর্ড, এবং (৩) জিলা বোর্ড—এই তিন প্রকারের। পৌর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রধানত পাঁচ ধরনের—যথা, (১) পৌরসংঘ বা মিউনিসি-প্যালিটি, (২) পৌর-প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশন, (৩) সেনানিবাস সংঘ, (৪) নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান, এবং (৫) বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান।

গ্রাম-পঞ্চায়েত : সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে স্বাধীন ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হইতেছে। পশ্চিমবংগে এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে আইন পাস করা হয়। পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত-সমূহ ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডের বিলোপসাধন করিয়া উহাদের স্থানাধিকার করিতেছে।

পঞ্চায়েতের কার্যের মধ্যে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন, ছোট ছোট বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতিই প্রধান। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বের একাংশও পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড : পশ্চিমবংগে ইউনিয়ন বোর্ড ১৯১৯ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা ৬ হইতে ৯ জন। দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের ভার সভাপতির হস্তে ন্যস্ত। কার্য মোটামুটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের মতই। ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী কর হইতে আয়ের তিন-চতুর্থাংশ সংগৃহীত হয়।

জিলা বোর্ড : জিলা বোর্ডের সভ্যসংখ্যা ৯ হইতে ৩৩ জন। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার ১ জন সভাপতি এবং ১ বা ২ জন সহ-সভাপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া, অনেক বেতনভোগী স্থায়ী কর্মচারীও থাকে। জিলার পথঘাট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যোন্নতি, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ, শিক্ষাবিস্তার, হাটবাজার, বিশ্রামাবাস স্থাপন প্রভৃতি জিলা বোর্ডের প্রধান কার্য।

রোডসেস বা পথকর আয়ের প্রধান সূত্র।

পৌরসংঘ : কলিকাতার ন্যায় মহানগরী ব্যতীত অন্যান্য সহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পৌরসংঘ বলা হয়। পশ্চিমবংগে পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। সভ্যসংখ্যা ৯ হইতে ৩০-এর মধ্যে নির্দিষ্ট। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার সভাপতি ও সহ-সভাপতির হস্তে ন্যস্ত। অবস্থা অনুসারে সংঘের অনেক বেতনভোগী কর্মচারীও থাকে।

পৌরসংঘগুলি দুই প্রকারের কার্য সম্পাদন করে—(১) অপরিহার্য ও (২) ইচ্ছাধীন। অপরিহার্য কার্য হইল সেইগুলি যাহা নাগরিক-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক—যেমন, রাজপথ নির্মাণ ও সংরক্ষণ। অপরদিকে ইচ্ছাধীন কর্তব্য তাহাদিগকেই বলা হয় যাহা পৌরসংঘ আয় অধিক হইলেই সম্পাদন করে—যেমন, হাসপাতাল স্থাপন ও কলের জলের ব্যবস্থা। এই দুই প্রকার কার্যের মধ্যে সীমারেখা অবশ্য সকল সময় সুস্পষ্ট নহে।

হোল্ডিং রেট, পেশা ও বৃত্তির উপর ধার্য কর এবং যানবাহনের উপর কর—এই কয়টিই আয়ের প্রধান সূত্র। ইহার উপর হাটবাজার প্রভৃতি খাতেও কিছু কিছু আয় হয়।

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান : কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান সংশোধিত ১৯৫১ সালের আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। ইহা ৮১ জন কাউন্সিলার এবং ৫ জন অল্ডারম্যান বা নগরপাল লইয়া গঠিত। কার্যকাল ৪ বৎসর। সভাপতি মেয়র নামে অভিহিত। একজন ডেপুটি মেয়রও আছেন।

কার্য পৌরসংঘের কার্যের অনুরূপ। তবে আয় বেশী বলিয়া ইহা অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। বর্তমান আয় ৯ কোটি টাকার মত। হোল্ডিং রেট এবং ব্যবসায় বৃত্তি ও যানবাহনের উপর ধার্য করই আয়ের সূত্র।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান : সেনানিবাস অঞ্চলে একটি করিয়া সেনানিবাস সংঘ, কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে একটি করিয়া নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক বন্দরে একটি করিয়া বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the organisation and functions of the Village Union Boards in West Bengal. (H. S. (C) 1961

পশ্চিমবংগে গ্রামীণ ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সংগঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৮০-৮১ পৃষ্ঠা

2. Describe the constitution and functions of District Boards in India. (H. S. (H) 1960)

ভারতে জিলা বোর্ডগুলির গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৮১-৮৩ পৃষ্ঠা]

/3. **Describe the system of village self-government in West Bengal.**
(C. U. 1959,'61 ; B. U. 1961)

পশ্চিমবংগের গ্রামসমূহে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণনা কর।

[ইংগিত : গ্রামসমূহে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা (Village Self-Government) গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা (Rural Self-Government) হইতে পৃথক। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণনায় জিলা বোর্ড, পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন বোর্ড সকলেরই উল্লেখ করিতে হইবে, কিন্তু গ্রামসমূহে প্রবর্তিত স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার বর্ণনায় জিলা বোর্ডকে বাদ দিয়া অপর দুইটির আলোচনা করিতে হইবে।

পশ্চিমবংগের গ্রামসমূহে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা এতদিন ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। এখন গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানাধিকার করিতেছে।...(৭৭-৮১ পৃষ্ঠা)]

4. **Give a brief idea of the organisation of Village Panchayats in West Bengal.**

পশ্চিমবংগে গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সংগঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [৭৭-৮০ পৃষ্ঠা]

5. **Give an outline of the Municipal Administration in West Bengal.**

পশ্চিমবংগে পৌর শাসন-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[ইংগিত : 'পৌর শাসন-ব্যবস্থা' বলিলে পৌরসংঘ (Municipality) এবং কলিকাতা ও চন্দননগরের পৌর-প্রতিষ্ঠান (Municipal Corporations) উভয় সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইবে। ...(৮১-৮৮ পৃষ্ঠা)]

6. **Indicate the functions and sources of revenue of the Municipalities in West Bengal.** **(H. S. (H) 1961)**

পশ্চিমবংগে পৌরসংঘগুলির কার্যাবলী ও আয়ের উৎস নির্দেশ কর। [৮৩-৮৬ পৃষ্ঠা]

7. **Describe the composition and functions of the Calcutta Corporation.**
(C. U. 1958,'62)

কলিকাতা করপোরেশনের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৮৬-৮৮ পৃষ্ঠা]

8. **Explain the functions of (a) Improvement Trust and (b) Port Trust.**

(ক) নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান, এবং (খ) বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[৮৮ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক দল

(The Indian Political Parties)

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ প্রধানত দুইটি ভিত্তিতে সংগঠিত হইত—(ক) জাতীয়তাবাদ, এবং (খ) ধর্ম। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত দল ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এবং ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা গাড়য়া উঠিয়াছিল।

স্বাধীনতার পর ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে। ফলে, সাম্প্রদায়িক দলগুলি কোনমতে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে বলা যায়।

স্বাধীনতার ফলে জাতীয়তাবাদের দিনও একরূপ শেষ হইয়াছে। কিন্তু তবুও কংগ্রেস দলের প্রভাবপ্রতিপত্তি কমে নাই। ইহার কারণ হইল, বর্তমানে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নহে—অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই সংগঠিত। বস্তুত, বর্তমান দিনের স্বাধীন সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এইরূপ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতে ছাড়া অন্যভাবে দল গঠন করা চলে না। তাই এইভাবেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি গঠিত হইতেছে।

ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে মাপকাঠি করিয়া নির্বাচন-কমিশন (Election Commission) চারিটি রাষ্ট্রনৈতিক দলকে সর্ব-ভারতীয় দল বলিয়া অভিহিত করে—যথা, (ক) কংগ্রেস, (খ) কমিউনিস্ট দল, (গ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, এবং (ঘ) ভারতীয় জনসংঘ। পরে আবার ১৯৬২ সালে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ঠিক করে যে কোন দলকেই 'সর্ব-ভারতীয় দল' আখ্যা না দিয়া রাজ্য হিসাবে দলগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। কোন দলের পক্ষে যে-কোন রাজ্যে স্বীকৃতিলাভের জন্য মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের অন্তত শতকরা ৩ ভাগ পাইতে হইবে। এই ভিত্তিতে মাত্র কংগ্রেসই সকল রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে রাষ্ট্রনৈতিক দল হিসাবে নির্বাচন-কমিশনের অনুমোদন লাভ করে, আর অধিকাংশ রাজ্যে অনুমোদন পায় কমিউনিস্ট দল ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল। জনসংঘ ও নবগঠিত স্বতন্ত্র দল মাত্র ছয়টি করিয়া রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভারতের পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে দেখা যায় যে পূর্বের চারিটি সর্ব-ভারতীয় দল এবং নবোদ্ভূত স্বতন্ত্র দল—এই পাঁচটিই ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল রহিয়া গিয়াছে। তবে উহাদের শক্তির তারতম্য ঘটিয়াছে। যেমন, কংগ্রেসের কিছুটা এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিশেষ শক্তিহ্রাস ঘটিয়াছে, কিন্তু অপরদিকে স্বতন্ত্র দল তাহাদের এই প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছে। নিম্নে এই দলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস: নানা কারণে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা-লাভের পর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগি অচল হইয়া পড়ায় কংগ্রেস অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী ও শান্তির আদর্শ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচার করা হয় যে, (১) কংগ্রেস ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; (২) আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য কংগ্রেস বিশেষ চেষ্টা করিবে, কিন্তু কোন শক্তিজোটে (power bloc) যোগদান করিবে না; (৩) ধর্মবিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে কংগ্রেস

কংগ্রেসের পূর্বতন ও বর্তমান আদর্শ

স্বীকার করে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করে ; (৪) সুনাগরিক গড়িয়া তোলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

ইহার পর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা (Socialist Pattern of Society) গঠনের নীতি গ্রহণ করে এবং এই নীতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়া উহাকে কার্যকর করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর তৃতীয় পরিকল্পনা রচনায় কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর আরও গুরুত্ব আরোপ করে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের পুনরুল্লেখ ছাড়াও গোয়া, দমন ও দিউকে পর্তুগীজ অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসের কিছুটা শক্তিহ্রাস ঘটিয়াছে। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাসমূহে এই দলের অধিকৃত আসনসংখ্যা ১০০-র মত কমিয়া ২২৮০-তে দাঁড়াইয়াছে। তবুও কংগ্রেস-অধিকৃত আসনসংখ্যা অন্য যে-কোন দলের আসনসংখ্যা হইতে অনেক অধিক। উপরন্তু, একমাত্র কংগ্রেসই দেশের সকল আইনসভায় আসন অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং একমাত্র কংগ্রেকেই সর্ব-ভারতীয় দল বলিয়া অভিহিত করা চলে। বস্তুত, নির্বাচন-কমিশন 'সর্ব-ভারতীয় দল' এই আখ্যা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও কংগ্রেস বেসরকারীভাবে এই আখ্যাই পাইয়া আসিতেছে।

একমাত্র কংগ্রেসই সর্ব-ভারতীয় দল আখ্যা পাইতে পারে

(খ) কমিউনিস্ট দল ঃ বর্তমানের কমিউনিস্ট দল পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশ মাত্র ছিল। পরে কংগ্রেস হইতে বাহিরে আসিয়া কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পৃথক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

কমিউনিস্ট দলের চরম উদ্দেশ্য ভারতে সকল প্রকার পুঁজিবাদের (capitalism) অবসান করিয়া এক শ্রেণীহীন বর্ণহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে অবশ্য আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দলের মূল লক্ষ্য হইল বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, পরোক্ষ করভার হ্রাস, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ভূমির পুনর্বণ্টনকার্য দ্রুত সম্পাদন, শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অধিকার প্রদান। এই সকল বর্তমান লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিলে ধীরে ধীরে সাম্যবাদী-সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে বলিয়াই কমিউনিস্ট দলের ধারণা।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলের বর্তমান লক্ষ্য

পুঁজিবাদের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট দল [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আওতা এবং কমনওয়েলথের গণ্ডির বাহিরে

আসিতে চায়। তৃতীয় নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট দল ভারতের সহিত সীমান্ত লইয়া চীনের বিবাদের আপোষ-মীমাংসার কথাই বলে। তবে ভারতের ভূখণ্ডের কোন অংশ যে হস্তান্তর করা চলিবে না তাহাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে।

বৈদেশিক নীতি

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কমিউনিস্ট দলের শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। বর্তমানে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাসমূহে এই দলের অধিকৃত আসনসংখ্যা যথাক্রমে ২৯ এবং ১৮৪।

(গ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ঃ ১৯৫২ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি পৃথক দল—কৃষক-মজদুর-প্রজা দল বা সংক্ষেপে কৃষক-প্রজা দল এবং সমাজতন্ত্রী দল—মিলিয়া ঐ নির্বাচনের পর প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করে।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল

কৃষক-প্রজা দলের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহারা প্রথম সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫২) কিছুদিন পূর্বে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া এই দল গঠন করেন এবং নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলও পূর্বে কংগ্রেসের এক অংশ ছিল। স্বাধীনতার পর ইহার নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস সংগঠনের বাহিরে আসিয়া পৃথক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং কৃষক-প্রজা দলের সহিত মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখেন।

বর্তমানে সম্মিলিত প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের লক্ষ্য প্রকৃত সমাজতন্ত্রের (real socialism) প্রতিষ্ঠা। ইহার জন্য, এই দলের মতে, কৃষকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করিতে হইবে, ব্যাংক-ব্যবসায়, খনি প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন করিতে হইবে, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং রোপণ-শিল্পসমূহকেও (plantation industries) রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে, ধনীদের সম্পদ ও ব্যয়ের উপর কর ধার্য করিতে এবং মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির মাহিনা কমাইয়া সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দল প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার কথাও বলে এবং জাতীয় সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

কর্মসূচী

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলেরই যে সর্বাপেক্ষা শক্তিহ্রাস ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। লোকসভায় এই দলের অধিকৃত আসনসংখ্যা ১৯ হইতে কমিয়া ১২-তে দাঁড়াইয়াছে, এবং রাজ্য বিধানসভাসমূহে অধিকৃত আসনসংখ্যা ২১৫ হইতে ১৭৯-তে পরিণত হইয়াছে।

(ঘ) ভারতীয় জনসংঘ ঃ ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়। স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর জনসংঘ কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ে;

তৎসত্ত্বেও ইহা চতুর্থ সর্ব-ভারতীয় দল হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দলের একরূপ অকল্পিত শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। লোকসভায় ইহার অধিকৃত আসনসংখ্যা ৪ হইতে ১৪-তে এবং বিধানসভাসমূহে উহা ৪৬ হইতে ১১৬-তে দাঁড়ায়। জনসংঘের ঘোষিত নীতিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ইত্যাদি থাকিলেও সাধারণত এই দলকে হিন্দু রক্ষণশীলতার সমর্থক বলিয়াই মনে করা হয়।

(ঙ) **স্বতন্ত্র দল**: স্বতন্ত্র দল ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত হয়। গঠনে অনুপ্রেরণা যোগান শ্রীরাজাগোপালাচারী। স্বতন্ত্র দল 'পরতন্ত্র' বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। এই দলের মতে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ আর্থিক ও সামাজিক জীবনে মোটেই সুফল প্রসব করে না; ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এই নিয়ন্ত্রণ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেও পারে। সুতরাং কৃষককে উদ্যোগের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, শিল্প-বাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিতে হইবে, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা সংকুচিত করিতে হইবে, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে এবং আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে আসিতে পারেন তাহাও দেখিতে হইবে। এইভাবে ব্যক্তিকে নিজের অধীন বা স্বতন্ত্র করিয়াই ভারতের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা এবং দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গঠিত হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র দল তৃতীয় নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই দল সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। ইহা লোকসভায় ১৮টি এবং রাজ্য বিধানসভাসমূহে ১৭০টি আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

উপসংহার: উপরে বর্ণিত চারিটি সর্ব-ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক দল এবং নবগঠিত স্বতন্ত্র দল ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট দল আছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা এবং নবগঠিত সমাজতন্ত্রী দলের (Socialist Party) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল ছোট ছোট দলের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতে তিন-চারিটির অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিবে না। ফলে তখন ত্রিদলীয় বা চতুর্দলীয় ব্যবস্থা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিবে।

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীন ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতেই দল গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের তৃতীয় নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পাঁচটিকে প্রধান বলিয়া অভিহিত করা যায়—যথা, (ক) কংগ্রেস, (খ) কমিউনিস্ট দল, (গ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল, (ঘ) ভারতীয় জনসংঘ এবং (ঙ) স্বতন্ত্র দল। ইহার মধ্যে স্বতন্ত্র দল নবগঠিত। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় নির্বাচনের পর এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের আদর্শ। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠন কংগ্রেসের নূতন গৃহীত নীতি।

কমিউনিস্ট দল : কমিউনিস্ট দলের চরম লক্ষ্য ভারতে এক শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে ইহা অবশ্য কয়েকটি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল : পূর্বের কৃষক-মজদুর-প্রজা দল এবং ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল মিলিয়া বর্তমানের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছে। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ভারতে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

ভারতীয় জনসংঘ : স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই দল মধ্যে কিছুটা দুর্বল হইলেও আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বতন্ত্র দল : ইহা শ্রীরাজাগোপালাচারীর অনুপ্রেরণায় গঠিত হইয়াছে। ইহা সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কমাইয়া দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে চায়।

প্রশ্নোত্তর

1. **Give a brief description of the main political parties of India.**

ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [২০-২৪ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতে নাগরিক-জীবনের সমস্যা

(Civic Problems in India)

ভারতের ন্যায় দেশে নাগরিক-জীবনের সমস্যা

প্রত্যেক দেশেই নাগরিক-জীবনের সম্মুখে নানাবিধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা রহিয়াছে। ভারতের ন্যায় দেশে এই সকল সমস্যা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতের ন্যায় দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (underdeveloped country) বলা হয়। স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনগ্রসরতার (backwardness) সহিত দেখিতে পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে ও নগরাঞ্চলে একরূপ আদিম জীবনযাত্রা। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এখানে সেই আদিম পদ্ধতিতেই কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া কৃষক কোনমতে জীবনধারণ করে। নগরাঞ্চলে কোটি কোটি লোক বস্তির মধ্যে ছোট ছোট খুপরির মত ঘরে কোনমতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করে। অনেকের আবার সে সৌভাগ্যটুকুও জুটে না। তাহারা পথেঘাটে পার্কে রেল-ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া দেয়। এ-দেশে বহু লোক পেট ভরিয়া দু'বেলা খাইতে পায় না; আবার যাহা খাইতে পায় পুষ্টিকারিতার দিক হইতে তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। ভারতে প্রতি বৎসর বসন্ত কলেরা টাইফয়েড

প্রভৃতি সংক্রামক রোগে অসংখ্য লোক মারা যায়। ইহার উপর ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও যক্ষ্মার প্রকোপ ত' আছেই। দেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, অশিক্ষিতের হার অত্যধিক; বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসীর সহিত শিক্ষার আলোকের কোন সম্পর্কই নাই। এইরূপ আদিম জীবনযাত্রাকে উন্নত করাই হইল আমাদের নাগরিক-জীবনের সর্বপ্রধান সমস্যা। এই মৌলিক সমস্যার সমাধান না হইলে সুন্দর নাগরিক-জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

গ্রামোন্নয়নের সমস্যা (Problem of Village Development): দেখা গেল, ভারতে গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই নাগরিক-জীবন অনুন্নত ও সমস্যা-প্রপীড়িত। সুতরাং গ্রামীণ ও পৌর (urban) জীবন—উভয়েরই উন্নতিসাধন করিতে হইবে, উভয়েরই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হইতে হইবে। এখন প্রথমে গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ভারত বিশেষভাবে গ্রামীণ ভারত। এ-দেশে শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তবুও নগরাঞ্চলের তুলনায় ভারতের গ্রামাঞ্চল অধিকমাত্রায় দুর্দশাগ্রস্ত। একমাত্র অনগ্রসর কৃষি হইতে কৃষক তাহার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারে না; বৎসরে তাহাকে কয়েক মাস বেকারাবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয়। কৃষিকার্য আবার দৈবের উপর নির্ভরশীল। যদি সুবৃষ্টি হয় তবেই কৃষক কোনমতে দিন চালাইতে পারে; অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে ঋণ বা ভিক্ষা ছাড়া তাহার পক্ষে গত্যন্তর থাকে না। তাহার উপর আছে শিক্ষার অভাব, বাসস্থান পানীয় জল প্রভৃতির অব্যবস্থা। পথঘাটে যানবাহনের অবস্থাও শোচনীয়। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চল একরূপ দুর্গম হইয়া উঠে। সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। মোটকথা শতকরা ৮৩ জন ভারতবাসী এই সভ্য যুগেও একরূপ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে বাস করে। ইহাই আমাদের গ্রামময় ভারতের রূপ; ইহাই আমাদের গ্রামীণ ভারতের সমস্যা।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects): বর্তমানে গ্রামীণ ভারতের সর্বাংগীণ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই পরিকল্পনাকে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাও বলা হয়। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি—(ক) গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা, এবং (খ) গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করা।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় ১৯৫৬ সালে। ঐ বৎসর উত্তরপ্রদেশের (তৎকালীন সংযুক্তপ্রদেশ) গোরক্ষপুর, এটওয়া ও সেবাগ্রামে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের কতিপয় স্থানে ব্যাপকভাবে

গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা সুরু করা হয়। পরীক্ষার সফলতায় উৎসাহিত হইয়া পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে ইহার প্রবর্তন করে। ক্রমে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধি প্রসারিত হইতে থাকিলে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রিদপ্তরের সৃষ্টি করে। এই মন্ত্রিদপ্তর সমাজোন্নয়ন মন্ত্রি-পরিষদ (Ministry of Community Development) নামে অভিহিত হয়। পরে সমবায়ও এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহা সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Community Development and Cooperation) নামে পরিচিত হয়।

সূত্রপাত

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার দায়িত্ব হইল রাজ্য সরকারের। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে 'রাজ্য উন্নয়ন কমিটি' (State Development Committee) রহিয়াছে। রাজ্যের মধ্যে জিলাগুলিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য রহিয়াছে জিলা পরিষদ (Zila Parishads)। ইহার পরের স্তরে আছে 'ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি' (Block Panchayat Samitis)। সর্বশেষে গ্রামীণ স্তরে রহিয়াছে পঞ্চায়েত সমিতি (Panchayat Samitis)। বর্তমানে এই পঞ্চায়েত সমিতির উপরই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং সাধারণত ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ প্রভৃতি ঊর্ধ্বতন সংস্থা সমন্বয়সাধন ও তদারক করিয়া, উপদেশ দিয়া এবং সাহায্য বণ্টন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। গ্রাম-পঞ্চায়েত সমিতি মহিলা মহল, গ্রামীণ শিক্ষক, সমবায় সমিতি প্রভৃতির সহযোগে কার্য করে। এই পর্যায়ে গ্রামসেবকের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি প্রত্যেক ১০টি গ্রামের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন করিয়া গ্রামসেবক আছে। তাহার কার্য হইল দ্বারে দ্বারে গ্রামোন্নয়নের বার্তা বহন করিয়া বেড়ানো এবং গ্রামবাসিগণকে পরস্পরের সহযোগিতায় কার্য করিতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা। এই গ্রামসেবকের উপর সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল।

সংগঠন

পঞ্চায়েত সমিতির উপর পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়ন। এই সর্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল: (১) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি; (২) গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নতিসাধন ও পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার, (৩) বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ (underemployment) সমস্যার সমাধান, (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, (৫) জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, (৬) আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, (৭) বাসস্থানের

উদ্দেশ্য

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন

কেন্দ্রীয় সরকার

সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তর

↓

রাজ্য সরকার

রাজ্য উন্নয়ন কমিটি

মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দপ্তরের মন্ত্রিগণ ও উন্নয়ন কমিশনার লইয়া গঠিত

↓

জিলা

জিলা পরিষদ

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতিগণ এবং জিলা হইতে প্রেরিত পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ লইয়া গঠিত

↓

ব্লক

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতিগণ এবং অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত শ্রেণী প্রভৃতির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত

ব্লক পঞ্চায়েতের কার্যভার ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী ও ৮জন সম্প্রসারণ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত

↓

গ্রাম

পঞ্চায়েত

গ্রামসেবক

সুব্যবস্থা, এবং (৮) কুটির শিল্পের উন্নয়ন। এই বিষয়গুলির মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষির উন্নয়নের সমস্যার প্রশ্ন সমাধান করিতে পারিলেই অন্যান্য সমস্যা সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণে গ্রামীণ উৎপাদন পরিকল্পনার (village production plan) মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই পরিকল্পনার কর্মসূচীর দুইটি প্রধান বিষয় হইল: (১) ঋণ সার বীজ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা; (২) কৃষিক্ষেত্রে সেচের জলের ব্যবস্থার জন্য খননকার্য, বাঁধ দেওয়া, গ্রামের পুষ্করিণী সংরক্ষণ, প্রভৃতি।
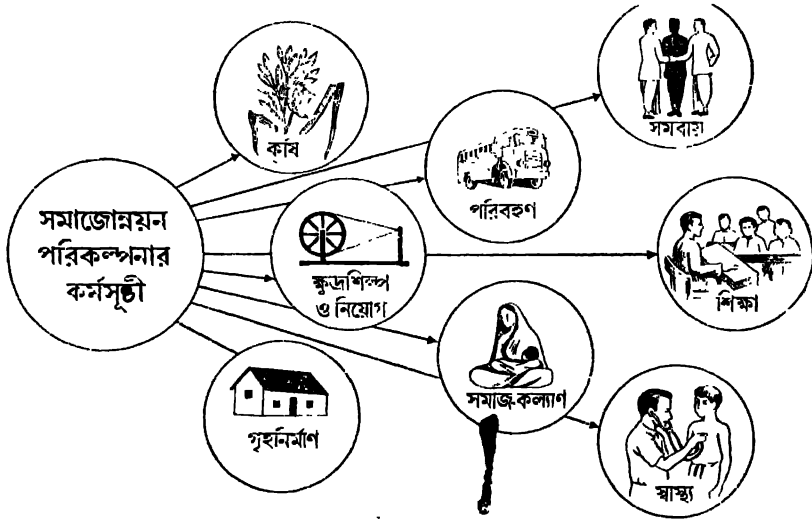
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব গ্রামীণ পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত হইলেও কর্মসূচী প্রণীত হয় ব্লকের ভিত্তিতে। এক একটি ব্লক ৬০-৭০ হাজার লোক ও ১৫০-২০০ বর্গমাইল আয়তন-সমন্বিত মোটামুটি ১০০ গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলি কর্মসূচীকে ঠিকমত রূপ দিতেছে কিনা, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি তাহার তদারক করে। অতএব, ব্লকই উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং শেষপর্যন্ত উহাকে সফল করিবার জন্য দায়ী। এইরূপ প্রত্যেক ব্লকের পরিকল্পনা লইয়া জিলার পরিকল্পনা এবং সকল জিলার পরিকল্পনা লইয়া রাজ্যের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রস্তুত হয়।

দুইটি বর্তমান বৈশিষ্ট্য:

১। উন্নয়ন কর্মসূচীর একক হইল ব্লক

এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল গ্রামীণ পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ—এই তিনটি সংস্থাই জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। অতএব, বর্তমানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও

রূপদানের ভার জনসাধারণের সংগঠনসমূহের (people's organisations) হস্তেই ন্যস্ত। এই ব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ' (democratic decentralisation) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের জন্যই পঞ্চায়েত-গুলিকে নূতনভাবে গড়িয়া পঞ্চায়েতী রাজের (Panchayati Raj) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

২। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ ও পঞ্চায়েতী রাজ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে গ্রামোন্নয়নের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ আমলেও কিছু কিছু গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল, কখনই সামগ্রিকভাবে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয় নাই; মাত্র বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ জীবনের ত্রুটিসমূহ দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কখনও বা কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; কখনও বা কিছু পথঘাট নির্মাণ করা হইয়াছে; কখনও বা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; কখনও বা শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা করা হইয়াছে; ইত্যাদি। এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সংহতি কোনকালেই ছিল না। ফলে ভারতের গ্রামীণ জীবন সংহতভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, পূর্বে সকল প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে। তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দপ্তরখানায় বসিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন, বড় জোর তাঁবু ফেলিয়া পুলিস লোকজন লইয়া সমারোহের সহিত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও গ্রামবাসিগণকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন নাই, গ্রামবাসী-দিগকে কাছেও ডাকেন নাই। ইহার ফলে গ্রামবাসিগণ একরূপ ধরিয়া লইয়াছিল যে গ্রামোন্নয়ন সরকারের কর্তব্য।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা এই দৃষ্টিভংগিরই পরিবর্তনসাধন করিতে চায়। মাত্র সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা যে গ্রামোন্নয়ন কার্য সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহাই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং প্রয়োজন হইল গ্রামবাসীদের সমবায়িক সহযোগিতা। তাহারা সরকার হইতে অর্থ-সাহায্য পাইবে, উপদেশ পাইবে সত্য; কিন্তু তাহাদিগকে নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা সুন্দর গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫৯ সালের পর্যবেক্ষণ দলের (Study Team) সুপারিশ অনুযায়ী 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ' ও 'পঞ্চায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। দ্বিতীয়ত, বিক্ষিপ্ত-ভাবে গ্রামীণ জীবনের এদিক-ওদিকের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা করিলে তাহা বিফল হইতে বাধ্য—কারণ, গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। সুতরাং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা একই সংগে গ্রামীণ জীবনের সকল সমস্যাকে আক্রমণ করিতে হইবে। কৃষির উন্নয়ন,

জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষাবিস্তার, বাসস্থানের সুব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ—কোন কিছুকেই বাদ দিলে চলিবে না। পরিশেষে, গ্রামবাসীদের গ্রামোন্নয়ন কার্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে—সাধারণ গ্রামসেবক। এই গ্রামসেবক গ্রামে গ্রামে সকলের সহিত মিশিয়া তাহাদের আপন করিয়া লইবে, তাহাদিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহাদের জন্য নব জীবনের বার্তা বহন করিয়া আনিবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই গান্ধীজি গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে নূতনভাবে পল্লী-উন্নয়নের কাজ সুরু করিয়াছিলেন।

গ্রামসেবক ও তাহার ভূমিকা

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সম্পর্কিত আর একটি বিষয় হইল জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service)। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস অবধি কোন সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে কাজ সুরু করিবার পর উহাকে তিন বৎসর যাবৎ জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাধীনে রাখা হইত। অর্থাৎ, ঐ সময় ধরিয়া গ্রামসেবকের মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইত। এইভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর ঐ সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রকে পুরাপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হইত। অতএব, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব পর্যন্ত সমাজোন্নয়নের দুইটি পর্যায় ছিল—যথা, সম্প্রসারণ সেবার অপেক্ষাকৃত অগভীর উন্নয়ন পর্যায় (less intensive phase of development), এবং সমাজোন্নয়নের গভীর বা আত্যন্তিক উন্নয়ন পর্যায় (intensive phase of development)।

সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা

উক্ত তারিখ হইতে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সেবার পার্থক্য দূর করা হইয়াছে। বর্তমানে সমাজোন্নয়ন ব্লক খুলিবার পূর্বে এক বৎসর ধরিয়া সংশ্লিষ্ট ব্লককে প্রাক্ উন্নয়ন পর্যায়ে (pre-extension phase) রাখা হয়। এই অবস্থায় কৃষির উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা উৎসাহ দেখাইলে ঐ ব্লককে সরাসরি সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অপসারণ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ সুরু হয় ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে। ৯ বৎসরের কিছু পরে—অর্থাৎ, ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে ২৩.১৭ কোটি জনসংখ্যা-সমন্বিত ৪.১৬ লক্ষ গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে আসে। ঐ সময়-ব্লকের সংখ্যা ছিল ৩৫৯০টি। ইহা ছাড়া, প্রাক্-উন্নয়ন পর্যায়ে (pre-extension phase) ছিল ৬৮০টি ব্লক।*

সমাজোন্নয়নের প্রসার

* Report of the Ministry of Community Development and Cooperation for 1961-62

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ভারতের সমগ্র গ্রামবাসীকে পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যেই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা। এখন ঐ লক্ষ্যকে পিছাইয়া ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, তৃতীয় পরিকল্পনার ঠিক মাঝামাঝি সময়ে বা সুরু হইতে ঠিক ১১ বৎসর পরে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়ন সেবাধীনে আসিবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন (Evaluation of the Community Projects) : ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত, কৃষিপ্রধান দেশে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সম্ভাবনা অপরিমেয় বলিলেও চলে। কিন্তু দেখা যায় যে, ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রগুলি বিশেষ সফল হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল পরিচালনাগত ত্রুটি। এই ত্রুটি দূর করা আশু প্রয়োজন। নচেৎ, এই অভূতপূর্ব ও সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। বর্তমানে পুনর্গঠনের দ্বারা এই সকল ত্রুটি দূরিকরণের প্রচেষ্টাই চলিতেছে। ইহার উপর তৃতীয় পরিকল্পনায় যে একপ্রকার ব্লকগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া রাজ্যগুলি উন্নয়নকার্যে অগ্রসর হইতেছে, ইহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্যা (Problem of Urban Development) : ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নগরাঞ্চলের গুরুত্ববৃদ্ধির জন্য নগরসমূহের সংখ্যা ও নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগরসমূহ অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠার দরুন নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এখনই যদি এই সমস্যাসমূহের সমাধানে যত্নবান না হওয়া যায় তবে ভবিষ্যতে ইহারা নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাহিরে যাইতে পারে।

নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্যা মূলত তিনটি : (ক) পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগরজীবনের উন্নয়ন, (খ) বাসস্থান-ব্যবস্থার প্রসার, এবং (গ) প্রগতিশীল ও সুচিন্তিত পন্থায় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উন্নয়ন। সমস্যা তিনটির মধ্যে তৃতীয়টি সম্পর্কে একরূপ বিশদ আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আলোচনা একটু পরেই করা হইবে। সুতরাং এখন মাত্র প্রথমটি সম্পর্কেই আলোচনা করা হইতেছে।

নগরাঞ্চল উন্নয়নের তিনটি প্রধান সমস্যা

পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগরজীবনের উন্নতির জন্য প্রথমে দেখিতে হইবে যে, আগামী ১০-১৫ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন নগরের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। এই দিক হইতে নগরসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন—(ক) কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী কানপুর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির ন্যায় পুরাতন সহর, এবং (খ) দুর্গাপুর চিত্তরঞ্জন সিন্ধ্রি ভিলাই রুরকেলা প্রভৃতির ন্যায় নূতন সহর। পুরাতন ও নূতন উভয় প্রকার সহরের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এক একটি উন্নয়ন

কিভাবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগরজীবনের উন্নতিসাধন করিতে হইবে

পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে। পুরাতন নগরগুলির বেলায় দেখিতে হইবে যে, কিভাবে গৃহনির্মাণের উপযোগী এবং অন্যান্য জমির সর্বাধিক কাম্য ব্যবহার করা যায়। নূতন নগরগুলির বেলায় যাহাতে তাহাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ঘটে সে-দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নগরোন্নয়নের পথে যদি জমির মালিক প্রভৃতি বাধার সৃষ্টি করে তবে প্রয়োজনীয় আইন পাস করিয়া প্রতিবন্ধক দূর করিতে হইবে।

উন্নয়ন কর্মসূচীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগরোন্নয়নের কর্মসূচীর মধ্যে দুইটি বিষয়কে নিশ্চয়ই স্থান দিতে হইবে—যথা, (ক) নাগরিক-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি, এবং (খ) নিয়োগের সম্ভাবনার প্রসার। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়—পথঘাট, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, পার্ক, চত্বর, পানীয় জল, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে নগরকে সুন্দর করিয়া তোলার সংগে সংগে যাহাতে নগরাঞ্চল হইতেই লোক জীবিকার সংস্থান করিতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নগর পরিকল্পনার জন্য 'মাষ্টার প্ল্যান'

আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থাতে এইভাবেই নগরাঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। যাহাতে নগরাঞ্চলের উন্নয়ন সুপরিকল্পিতভাবে চলিতে পারে তাহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় মাষ্টার প্ল্যান (Master Plans) রচনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্ল্যান বা পরিকল্পনার প্রথম কার্য হইবে কিভাবে জমির ব্যবহার করা হইবে মোটামুটিভাবে স্থির করিয়া দেওয়া, এবং পরে নাগরিক ও আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করা। ইহার ফলে সহরাঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা—সরকারী, বেসরকারী ও সমবায়িক—যে-সকল প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে সংহতিসাধন করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে ঠিক করা হইয়াছে যে এরূপ পরিকল্পনা বড় বড় সহর, রাজধানী, বন্দর, নূতন শিল্পাঞ্চল প্রভৃতিতে চালু করা হইবে। নগরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই মাষ্টার প্ল্যান গ্রহণের দায়িত্ব হইল রাজ্য সরকারগুলির। ইহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে সীমাবদ্ধভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক লইয়া গঠিত একটি নগর পরিকল্পনা সংগঠন (a Town Planning Organisation) স্থাপন করিতে হইবে।*

নাগরিক-জীবনের তিনটি সাধারণ সমস্যা (Three Common Civic Problems): গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ সমস্যা

* চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজন হওয়ায় রাজ্যগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা অনেকাংশে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে মাষ্টার প্ল্যানের ন্যায় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পরিত্যক্তই হইতে পারে।

ছাড়াও বর্তমানে ভারতের নাগরিক-জীবনে তিনটি সাধারণ সমস্যা রহিয়াছে। ইহারা হইল (১) খাদ্য-সমস্যা, (২) স্বাস্থ্য-সমস্যা, এবং (৩) বাসস্থান-সমস্যা।

খাদ্য-সমস্যা (Food Problem): সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারত বর্তমানে খাদ্য-সমস্যা প্রপীড়িত। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া দেশের লোককে অন্ন যোগাইতে হয়। বর্তমানের এই অবস্থাকেই সাধারণত ভারতের খাদ্য-সমস্যা (Food Problem of India) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

খাদ্য-সমস্যার তিনটি দিক:

কিন্তু ইহা খাদ্য-সমস্যার একটি দিক মাত্র। ইহাকে পরিমাণগত দিক (quantitative aspect) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। খাদ্য-সমস্যার আর দুইটি দিক হইল গুণগত দিক (qualitative aspect) এবং মূল্যের দিক। এখন এই তিনটি দিক সম্বন্ধেই পৃথকভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

খাদ্য সমস্যার পরিমাণগত দিক (Quantitative Aspect of the Food Problem): ১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এই দেশে প্রথম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ইহার পূর্বে সুজন্মার বৎসরে ভারত খাদ্য রপ্তানিই করিত; কিন্তু এখন হইতে নিয়মিত আমদানি সুরু করে। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশবিভাগের ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িয়া যায়, কারণ জনসংখ্যার তুলনায় অধিক চাষের জমি পাকিস্তানের অংশে পড়ে।

১। পরিমাণগত দিক বা খাদ্য-ঘাটতি

খাদ্য-ঘাটতি মিটাইবার জন্য ভারতকে বাহির হইতে অধিক খাদ্যশস্যের আমদানির ব্যবস্থা করিতে হয়। পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) হিসাব অনুসারে দেশবিভাগের পর হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতকে ১২০০ কোটি টাকার মত খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের পরও আমদানির প্রয়োজন মিটে নাই। এমনকি ১৯৬১-৬২ সালেও খাদ্যদ্রব্য আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১২৭ কোটি টাকা। যদি ভারতে খাদ্যাভাব না থাকিত তবে এই অর্থ দ্বারা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে আরও বহুদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত।

খাদ্য-সমস্যার গুণগত দিক (Qualitative Aspect of the Food Problem): খাদ্য-সমস্যার গুণগত দিক বলিতে বুঝায় পুষ্টিকারিতার (nutritional) দিক। পুষ্টিকারিতা বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের ন্যায় দেশে প্রত্যেকের পক্ষে গড়ে অন্তত ১৪ আউন্স করিয়া খাদ্যশস্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু ১০৫/৮ আউন্স হিসাব ধরিয়া 'রেশনিং'-এর মাধ্যমে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুতরাং সে-দিন পর্যন্ত জীবনধারণের জন্ম প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্যও সরবরাহ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার

২। গুণগত দিক বা পুষ্টিকারিতার অভাব

শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) অবশ্য মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ আউন্সের মত দাঁড়ায়, এবং আশা করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৭.৫ আউন্সে দাঁড়াইবে।

কিন্তু দৈনিক এই পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করিলেই প্রয়োজন মিটে না। পুষ্টিকারিতা বিশেষজ্ঞগণ বলেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ন্যূনতম ৩০০০ ক্যালোরি-মূল্যের (of caloric value) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। ভারতে বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ২১০০। আশা করা হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা ২৩০০-এর মত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গুণগত দিক হইতে খাদ্যগ্রহণে ভারত ন্যূনতম মানে পৌঁছিতে পারে নাই। উপরন্তু, দুগ্ধ এবং অন্যান্য সংরক্ষণমূলক খাদ্য (protective food) গ্রহণের পরিমাণও অতি অল্প। ভারতের নিরামিষাশী জনগণ তাহাদের খাদ্যের স্বাভাবিক পুষ্টিকারিতার অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে না। অনেক সময় আবার রন্ধনের গুণে তাহার যেটুকু খাদ্যমূল্য আছে তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলে। ফলে সুষম খাদ্যের (balanced diet) অভাবে তাহারা অপুষ্টিজনিত নানারূপ ব্যাধি-কবলিত হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে, শিশু ও প্রসূতির অত্যধিক মৃত্যুহার, যক্ষা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ এই সুষম খাদ্যের অভাবেরই ফল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাম্প্রতিক বিবরণী অনুসারে খাদ্যপুষ্টির দিক দিয়া ভারতের মান ৪০টি দেশের নীচে এবং ভারতে খাদ্যপুষ্টির মান দিন দিন অবনতির দিকেই যাইতেছে।

খাদ্য-সমস্যার মূল্যগত দিক (Price Aspect of the Food Problem): বর্তমানের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য ; কিন্তু সংগে সংগে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই হইল খাদ্য-সমস্যার মূল্যগত দিক। ইহার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দশা এবং অর্ধাহার ও অনাহারের পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করা আশু প্রয়োজন। তাহা না হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নের যে-কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

৩। মূল্যগত বা মূল্যবৃদ্ধির দিক

খাদ্য-সমস্যার উক্ত তিনটি দিকের মধ্যে দুইটির—যথা, পরিমাণগত ও মূল্যগত দিকের সমাধানের চেষ্টা নানাভাবে করা হইতেছে। প্রথমত, কৃষির উন্নয়ন, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে খাদ্য বাহির হইতে আমদানি করিয়া ঘাটতি মিটানো হইতেছে। তৃতীয়ত, রেশনিং প্রথা, ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রভৃতির মাধ্যমে যাহাতে সকলে ন্যায্য মূল্যে ন্যূনতম খাদ্য পায় তাহারই ব্যবস্থা করা হইতেছে। চতুর্থত, কয়েক

অবলম্বিত প্রতিবিধান

শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম দামেও (at subsidised prices) মধ্যে মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

সমস্যার গুণগত দিকের সমাধানে বিশেষ কিছুই করা সম্ভব হয় নাই

কিন্তু খাদ্য-সমস্যার গুণগত দিকের সমাধানে বিশেষ কিছু করিয়া উঠা এখনও সম্ভব হয় নাই। অল্প সময়ের মধ্যে ইহা সম্ভবও নহে—কারণ লোকের আয়বৃদ্ধি এবং দুগ্ধ মাছ মাংস ফল ইত্যাদি সংরক্ষণমূলক খাদ্যের যথেষ্ট উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যতিরেকে ভারতের ন্যায় দেশে সাধারণের জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় না।

১৯৫৭ সালে খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। খাদ্য-সমস্যার প্রকৃতি বিচার ও ইহার প্রতিবিধান নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৫৭ সালের জুন মাসে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটি 'খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি' (Foodgrains Enquiry Committee) নামে পরিচিত। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে কমিটি নিম্নলিখিত অভিমতগুলি প্রদান করে :

কমিটির অভিমত

১। খাদ্যোৎপাদন অপেক্ষা সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যান্য দিকের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইতে পারিত তাহা সম্ভব হয় নাই।

২। বর্তমানে যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার কারণ হইল : (ক) লোকের আর্থিক আয় (money income) বৃদ্ধি, (খ) খাদ্যগ্রহণের পরিমাণবৃদ্ধি, (গ) খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তন, এবং (ঘ) মজুত করিবার ইচ্ছাবৃদ্ধি।

৩। আগামী কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতে খাদ্য-ঘাটতিই থাকিবে।

৪। দেশে এমন কতকগুলি অঞ্চল যেগুলিকে ঘাটতি অঞ্চল (deficit areas) বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্য সুসম্পাদিত হয় না এবং বৃহদায়তন ও কুটির শিল্পও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা অতি দরিদ্র। বর্তমান মূল্যে প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া খাইবার সংগতি তাহাদের নাই।

এই প্রকার খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে কমিটি যে-সকল প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ করে তাহা হইল :

কমিটির সুপারিশ

১। সমগ্র দেশে খাদ্যোৎপাদনের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি হইবে প্রাথমিক লক্ষ্য।

২। আগামী কয়েক বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া যাইতে হইবে।

৩। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দমিত রাখিবার জন্য খাদ্যশস্যের বণ্টন-ব্যবস্থার 'নিয়ন্ত্রণ' (control) প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণ বলিতে অবশ্য পূর্ণ খাদ্য-রেশনিং না

বুঝাইয়া খোলা বাজারে নিয়মিত খাদ্যশস্য ক্রয়বিক্রয়, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে খুচরা ক্রয়বিক্রয়, সরকার কর্তৃক পাইকারী ব্যবসা পরিচালনা, যথেষ্ট পরিমাণে চাউল মজুত রাখা, ইত্যাদি বুঝানো হইয়াছে।

৪। উপরন্তু, (ক) একটি মূল্য স্থিতিকরণ বোর্ড (a Price Stabilisation Board), এবং (খ) একটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (a Foodgrains Stabilisation Organisation) স্থাপন করিতে হইবে। বোর্ডের কার্য হইবে কিভাবে মূল্যে স্থায়িত্ব আনয়ন করা যায় সে-সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করা এবং সংগঠনের কার্য হইবে ঐ নীতিকে কার্যকর করা।

৫। লোকের খাদ্য-স্বভাবের পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে। যাহারা বর্তমানে প্রধানত চাউল খায় তাহাদিগকে গমের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে।

৬। কুটির শিল্প ইত্যাদির প্রসার দ্বারা ঘাটতি অঞ্চলসমূহের লোকের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। নচেৎ, খাদ্যোৎপাদন বর্তমান জনসংখ্যার সহিত কোনমতেই তাল রাখিতে পারিবে না।*

১৯৫৯ সালে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞের দল ভারতের খাদ্য-সমস্যার পর্যালোচনা করে। দলটির মতে, ভারতের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে মোট ১১ কোটি টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭·৬ কোটি টনের মত। সুতরাং খাদ্যশস্যের প্রায় ৩½ কোটি টন উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। নচেৎ তৃতীয় পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে এবং সমাজ, অর্থ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিপর্যয় আসিবে।

যাহা হউক, শেষপর্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১০ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হয় এবং পরিকল্পনার সুরু হইতেই মূল্য স্থিতিকরণের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। হয়ত' ইহাতেই খাদ্য-সমস্যা কতকটা আয়ত্তের মধ্যে থাকিত। কিন্তু ১৯৬২ সালের শেষভাগ হইতে চৈনিক আক্রমণের ফলে যুদ্ধের যে আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে খাদ্য-সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবার আশংকা দেখা দিয়াছে। ফলে বর্তমানে (ডিসেম্বর, ১৯৬২) তৃতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের (reorientation) মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যকে বর্ধিত করিবার এবং মূল্য স্থিতিকরণের আরও জোরালো পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা চলিতেছে।**

* ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাদ্যোৎপাদনের সম্পর্কের আলোচনা অর্থবিদ্যা অংশের ৭২-৭৪ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

** অর্থবিদ্যার ১৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বাস্থ্য-সমস্যা (Health Problem) : স্বাস্থ্য-সমস্যা ভারতের নাগরিক-জীবনের আর একটি প্রধান সমস্যা। যে কোন প্রকার জাতীয় উন্নয়নে স্বাস্থ্যোন্নয়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। জনসংখ্যার কত অংশ উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত থাকিবে বা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় স্বাস্থ্যের উপর। কৃষি ও শিল্পের দক্ষতাও শ্রমিকের স্বাস্থ্য দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়।

এই সমস্যার গুরুত্ব

স্বাস্থ্য বলিতে কেবল রোগরোহিত অবস্থাই বুঝায় না ; বুঝায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও সম্ভাবনাসমূহের সুসংহত বিকাশ—যাহার ফলে ব্যক্তি সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। স্বাস্থ্য বলিতে আরও বুঝায় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান। সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নয়নে শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োগই যথেষ্ট নয় ; যে-সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উপাদান পারিপার্শ্বিক অবস্থা নির্ধারণ করে তাহাদেরও উন্নতি-বিধান করিতে হইবে। অতএব, স্বাস্থ্যোন্নয়ন ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর (National Development Programme) অংগীভূত হইতে বাধ্য।

স্বাস্থ্য বলিতে কি বুঝায়

ভারতের জনস্বাস্থ্যের অবস্থা যে শোচনীয় তাহা নিম্নলিখিত ছকটি হইতে সহজেই ধারণা করা যাইবে :

ভারতের জনস্বাস্থ্যের মান অতি নিম্ন

জন্ম-মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ও জীবনকাল—১৯৪১-৬১*

সময়	জন্মের হার	মৃত্যুর হার	শিশু মৃত্যুর হার		জীবনকাল	
			নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
১৯৪১-৫১	৩৯.৯	২৭.৪	১৭৫.০	১৯০.০	৩১.৬৬	৩২.৪৫
১৯৫১-৫৬	৪১.৭	২৫.৯	১৪৬.৭	১৬১.৪	৩৭.৪৯	৩৭.৭৬
১৯৫৬-৬১	৪০.৭	২১.৬	১২৭.৯	১৪২.৩	৪২.০৬	৪১.৬৮

পৃথিবীর মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ভারতেই সর্বাপেক্ষা প্রবল। এ-দেশে মোট মৃতের শতকরা ৫ ভাগেরও উপর হইল সংক্রামক ব্যাধির জন্য। বিভিন্ন প্রতিবিধান সত্ত্বেও এখনও বৎসরে ১ কোটি লোকের উপর একমাত্র ম্যালেরিয়াতেই ভোগে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হইল ৫০ লক্ষের কাছাকাছি।

মৃত্যু ছাড়া শারীরিক দক্ষতার দিক হইতেও স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা একরূপ সর্ববাদী স্বীকৃত যে ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা উন্নত

* হিসাবটি তৃতীয় পরিকল্পনা হইতে গৃহীত।

দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। ইহার অন্যতম কারণ ভারতীয় শ্রমিকের দুর্বল স্বাস্থ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের স্বাস্থ্যবান শ্রমিকেরা যতটা পরিশ্রম করিতে পারে, নানারূপ ব্যাধি-কবলিত ও ভগ্নস্বাস্থ্য ভারতীয় শ্রমিকের পক্ষে ততটা সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্যের মান নিম্ন কেন

ভারতে জনস্বাস্থ্যের মান নিম্ন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বেশীদূর যাইতে হয় না। অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অপুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, বাসস্থানের দুরবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের অব্যবস্থা, সময়মত চিকিৎসার অভাব, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রভৃতিই হইল ভারতের শোচনীয় স্বাস্থ্যমানের কারণ।

স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য কি কি করিতে হইবে

সুতরাং স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের জন্য আমাদিগকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে, সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করিতে হইবে, চিকিৎসার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জ্ঞান প্রচার করিয়া সাধারণ লোকদিগকে এই বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে।

কি কি করা হইতেছে

১৯৫১-৫২ সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর হইতে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। ইহাতে অন্যান্যের মধ্যে—(১) পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় ব্যবস্থা, (২) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, (৩) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, (৪) গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য চিকিৎসালয় এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা, (৫) শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্য, (৬) ঔষধপত্রাদির উৎপাদন, (৭) যথাসম্ভব পুষ্টিকারিতাবৃদ্ধি এবং (৮) চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ ও প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ঐ পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৪০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচীরই সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বরাদ্দের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয় হয় ২২৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩৪২ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য যে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে পুষ্টিকারিতাবৃদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পুষ্টিকারিতাকেই স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের প্রধানতম বিষয় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে পরিকল্পনা-মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, বর্তমানেই সকল শ্রেণীর জন্য যথাযোগ্য পুষ্টিকারিতাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

বাসস্থান-সমস্যা (**Housing Problem**): বাসস্থানের সমস্যা ভারতের নাগরিক-জীবনের আর একটি প্রধান সমস্যা। তবে এই সমস্যা গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চলেই অধিক প্রকট। হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩০ সাল হইতে ভারতে নগরাঞ্চলের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা ৩-৫ হারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু নূতন গৃহনির্মাণের পরিমাণ হইল শতকরা ২-২.৫ ভাগ মাত্র। ফলে নগরাঞ্চলে বাসস্থানের অভাব বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে এবং পথেঘাটে রেল-ষ্টেশনে রাত্রি যাপন করে এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মোটামুটি হিসাব করা হইয়াছে যে বৎসরে ২.৫ লক্ষ করিয়া গৃহনির্মাণ করিয়া চলিলে নগরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখা যায়।

বাসস্থান-সমস্যার প্রকৃতি

নগরাঞ্চলের বাসস্থান-সমস্যার আর একটি দিক হইল কদর্য বস্তি-জীবন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বস্তি-জীবনকে দেশের অন্যতম কলংক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, এই কলংক দূরিকরণের বিশেষ কোন প্রচেষ্টাই ব্রিটিশ সরকার করে নাই।

বস্তি-জীবনের সমস্যা

গ্রামাঞ্চলের বাসস্থান-সমস্যা অতটা প্রকট না হইলেও ব্যাপকতর। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। মোটামুটি জনসংখ্যার এই ৮৩ ভাগের অবস্থাই শোচনীয়। অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে গ্রামীণ ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগ গৃহের দেওয়াল কাদামাটি দ্বারা নির্মিত; শতকরা ৯৫ ভাগ গৃহে কোন পায়খানার ব্যবস্থা নাই; ব্যবহার্য জল প্রধানত পুষ্করিণী ও কূপ হইতে সংগৃহীত হয়; এবং মাত্র শতকরা ১.৫ ভাগ গ্রামবাসী নলকূপ হইতে পানীয় ও অন্যান্য কার্যে ব্যবহৃত জল সংগ্রহ করিতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের শোচনীয় অবস্থা

বলা যাইতে পারে, ভারতে নাগরিক-জীবনের দুঃখদুর্দশা অনেকাংশে এইরূপ শোচনীয় বাসস্থান-ব্যবস্থার জন্যই। বাসস্থানের সুব্যবস্থা বলিতে বুঝায় কাম্য পারিবারিক জীবন, সুখশান্তি ও উন্নত স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা; অপরদিকে বাসস্থানের অবস্থার দরুন নানারূপ ব্যাধি, অপরাধ, দুর্নীতি প্রভৃতি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়া চলে। ফলে, শেষপর্যন্ত প্রয়োজন হয় হাসপাতাল, কারাগার, উন্মাদ আশ্রম ইত্যাদির সংখ্যা বাড়াইবার।

বাসস্থানের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

ব্রিটিশ শাসনের আমলে বস্তি-সমস্যার প্রতি সরকারী উপেক্ষার উল্লেখ ইতিমধ্যে করা হইয়াছে। শুধু বস্তি-সমস্যা নহে, সামগ্রিকভাবে বাসস্থান-সমস্যা বিদেশী শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশ স্বাধীন
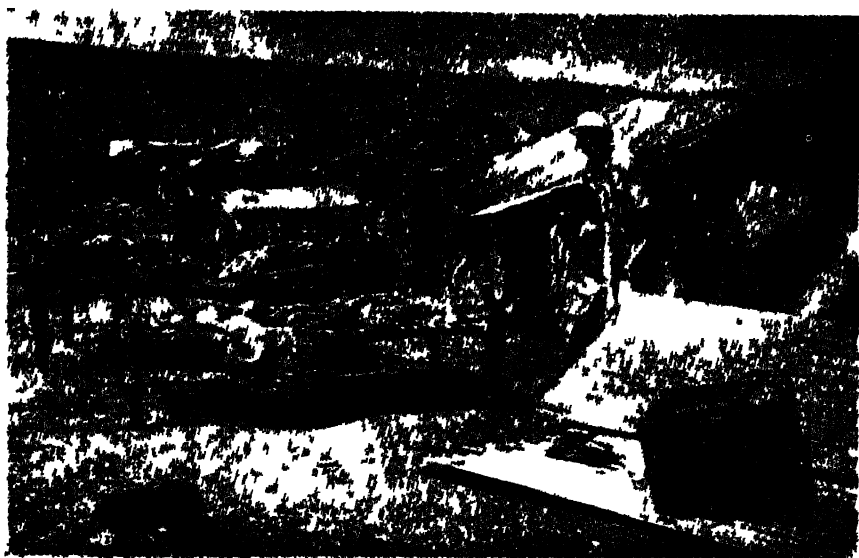
॥ বস্তি জীবন ॥

[১১০ পৃষ্ঠা]

॥ বস্তি অপসারণ করিয়া নূতন বাসগৃহ নির্মাণ ॥

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

ভাঃ

॥ মণিপুরের একটি সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে গ্রামসেবক কৃষকগণকে জাপানী পদ্ধতিতে ধান্য চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছে ॥ [১০১ পৃষ্ঠা]

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ও স্টেটসম্যান পত্রিকার সৌজন্যে ॥

: ভাঃ

হইবার পর স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে ; এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হইলে দেখা যায় যে অন্যান্যের সহিত বাসগৃহের সুব্যবস্থাও উন্নয়ন কার্যক্রমের (Development Programme) মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পূর্বে এই সমস্যা উপেক্ষিত হইলেও বর্তমানে ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে

প্রথম পরিকল্পনায় বাসস্থান-সমস্যার সমাধানকল্পে যে কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয় তাহার মধ্যে ছিল (১) সরকারী অর্থসাহায্যে শিল্প-শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণ (subsidised industrial housing), (২) স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ (low income-groups housing), (৩) বস্তি উন্নয়ন ও অপসারণ, (৪) বসবাসযোগ্য জমি সরকার কর্তৃক অধিকার ও উহার উন্নয়ন, (৫) রোপণ শিল্প-শ্রমিকদের (plantation labour) জন্য গৃহনির্মাণ, (৬) খনিজ শিল্প-শ্রমিকদের জন্য গৃহ-নির্মাণ, এবং (৭) গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের সুব্যবস্থা।

প্রথম পরিকল্পনায় কার্যক্রম

ঐ পরিকল্পনায় বাসস্থান খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৮.৫ কোটি টাকা এবং মোট ১৩ লক্ষের মত বাড়ীঘর নির্মিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ একই কার্যক্রমকে অনুসরণ করা হয়। তবে বস্তি অপসারণ ও গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের সুব্যবস্থার উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। বস্তি-জীবন যাহাতে প্রসারিত না হয় এবং বস্তি যাহাতে যথাসম্ভব অপসারিত হয় তাহার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কয়েকটি রাজ্যে আইন প্রণীত হয় এবং জনাকীর্ণ সহরগুলিতে নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠানগুলি (Improvement Trusts) পূর্বাপেক্ষা সক্রিয় হইয়া উঠে। কয়েকটি সহরে নূতন নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান স্থাপিতও হয়। তবে ভারতের বস্তি-জীবনের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা বলিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ইহার আংশিক সমাধানও সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কার্যক্রম ও ব্যয়বরাদ্দ

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাসস্থান খাতে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। পরে উহাকে কমাইয়া ৮৪ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। ইহার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের বাসস্থানের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল মাত্র ১০ কোটি টাকা। ভারতের বিরাট গ্রামাঞ্চল ও তাহার বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় এই অর্থ যে অতি সামান্যই পরিকল্পনা কমিশন ইহা স্বীকার করিয়াছিল। তবে কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, গ্রামাঞ্চলে বসবাসের সুব্যবস্থাকে এক বিচ্ছিন্ন লক্ষ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না ; ইহাকে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের অংগ হিসাবেই দেখিতে হইবে। কমিশন আশা করে যে, গ্রামীণ জীবনের অন্যান্য উন্নয়নের সংগে সংগে বাসস্থান-সমস্যারও সমাধান হইবে। ফলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গ্রামাঞ্চলের বাসস্থান-সমস্যার সমাধানেরও আংশিক দায়িত্ব অর্পণ করে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও কার্যক্রমের বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। এই পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ ও নগরোন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৪২ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া গৃহনির্মাণের জন্য জীবন-বীমা করপোরেশন (Life Insurance Corporation) ৬০ কোটি টাকার মত ব্যবস্থা করিবে বলিয়া আশা করা হইযাছে। গৃহনির্মাণকার্য যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ বোর্ড (a Central Housing Board) স্থাপনের প্রস্তাব বিচার-বিবেচনা করা হইতেছে।*

তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যক্রম

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে নাগরিক-জীবনের সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে অনগ্রসরতার সহিত দেখিতে পাওযা যায় একরূপ আদিম জীবনযাত্রা।

গ্রামোন্নয়নের সমস্যা: ভারতের গ্রামাঞ্চল ও নগরাঞ্চল উভয়ক্ষেত্রেই নাগরিক-জীবন সমস্যা-প্রপীড়িত। গ্রামাঞ্চলের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের—যথা, অনগ্রসর কৃষি, কৃষকের বেকারাবস্থা, শিক্ষার অভাব, পানীয় জলের অব্যবস্থা, পথঘাটের দুরবস্থা ইত্যাদি।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা: বর্তমানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের গ্রামাঞ্চলের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা হইতেছে। গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা এই পরিকল্পনার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। গ্রামাঞ্চলের সর্বাংগীণ উন্নয়ন বলিতে বুঝায়—(১) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি; (২) পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতিসাধন; (৩) স্বাস্থ্যোন্নয়ন; (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার; (৫) বাসস্থানের সুব্যবস্থা; (৬) কুটির শিল্পের উন্নয়ন; ইত্যাদি।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের সর্বাংগীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা করা হয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়। এই বিষয়ে প্রেরণা যোগাইবার ভার হইল গ্রামসেবকের।

পূর্বে সমাজোন্নয়নের কার্য শুরু করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাধীনে রাখা হইত। ফলে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ছিল আমাদের পল্লী-উন্নয়নের দুইটি পর্যায়। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আনয়ন করিবার লক্ষ্য স্থির ছিল। বর্তমানে এই লক্ষ্যসাধনের সময়কে ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগ অবধি পিছাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিমেয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য ভারতে উহা বিশেষ সফল হয় নাই। তবে বর্তমানে পুনর্গঠনের কার্য চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের কার্যে পঞ্চায়েতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্যা: নগরাঞ্চল উন্নয়নের সমস্যা প্রধানত তিনটি: (ক) পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগরজীবনের উন্নয়ন; (খ) বাসস্থান-ব্যবস্থার প্রসার; এবং (গ) স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উন্নয়ন।

আমাদের উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থায় এই তিনটি সমস্যারই সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

নাগরিক-জীবনের তিনটি সাধারণ সমস্যা: (ক) খাদ্য-সমস্যা, (খ) স্বাস্থ্য-সমস্যা এবং (গ) বাসস্থান-সমস্যা—সাধারণভাবে নাগরিক-জীবনের এই তিনটিই হইল প্রধান সমস্যা।

---

* প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজন হওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনার যে পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে তাহাতে গৃহনির্মাণ খাতে ব্যয় বিশেষ হ্রাস পাইতে পারে।

খাদ্য-সমস্যা : সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারত আজ খাদ্য-সমস্যায় প্রপীড়িত। এই খাদ্য-সমস্যার তিনটি দিক আছে—যথা, (ক) পরিমাণগত দিক বা খাদ্য-ঘাটতি, (খ) গুণগত দিক বা পুষ্টিকারিতার অভাব, (গ) মূল্যগত বা মূল্যবৃদ্ধির দিক। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির সমাধানের প্রচেষ্টা নানাভাবে করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টি বা পুষ্টিকারিতার দিকের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বর্তমানে খাদ্য-সমস্যার সমাধানকল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-সমস্যা : নানা কারণে ভারতে স্বাস্থ্যের মান অতি নিম্ন। ১৯৫১-৫২ সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর হইতে নানাভাবে স্বাস্থ্যোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে আছে—(১) পানীয় জল ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা, (২) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, (৩) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, (৪) গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়, (৫) শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্য, (৬) ঔষধপত্রাদি উৎপাদন, (৭) যথাসম্ভব পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি, এবং (৮) চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ।

বাসস্থান-সমস্যা : বাসস্থান-সমস্যা নগরাঞ্চলেই অধিকতর প্রকট। জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই হারে গৃহনির্মাণ করিয়া উঠা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে বাসস্থানের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে।

নগরাঞ্চলের বাসস্থান-সমস্যার একটি দিক হইল কদর্য বস্তি-জীবন যাহাকে দেশের অন্যতম কলংক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের অবস্থা প্রকট না হইলেও ব্যাপকতর।

ব্রিটিশ আমলে ভারতে বাসস্থান-সমস্যা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছিল; বর্তমানে অবশ্য ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাতে নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বাসস্থান-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Briefly describe the civic problems of India. What measures have been adopted to solve them ?**

ভারতের নাগরিক-জীবনের সমস্যাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর। ইহাদের সমাধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?

[ইংগিত : গ্রামাঞ্চল, নগরাঞ্চল এবং সাধারণ সমস্যা তিনটি—সকলেরই বর্ণনা করিতে হইবে।... (৯৬-১১২ পৃষ্ঠা)]

2. **Briefly describe the features of Community Development as a method of rural reconstruction.** (C. U. 1960)

গ্রামাঞ্চলের পুনর্গঠনের পদ্ধতি হিসাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[৯৫-১০২ পৃষ্ঠা]

3. **Explain the aims of the Community Development Projects in India.** (H. S. (H) Comp. 1962)

ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রগুলির লক্ষ্য কি কি, তাহা ব্যাখ্যা কর। [৯৫-১০১ পৃষ্ঠা]

4. **Give a brief idea of the Food Problem of India. What measures would you suggest for its solution ?**

ভারতের খাদ্য-সমস্যার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও। ইহার সমাধানকল্পে কি কি প্রতিবিধান নির্দেশ করিবে ? [১০৪-১০৭ পৃষ্ঠা]

5. **Discuss the problems of (a) Health and (b) Housing in India.**

ভারতে (ক) স্বাস্থ্য-সমস্যা ও (খ) বাসস্থান-সমস্যার আলোচনা কর। [১০৮-১১২ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের প্রতিরক্ষা

(Defence of India)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে দেশ স্বাধীন হইলে ভারতের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতের জাতীয় সরকার গ্রহণ করে। ইহার ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমেই পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল এক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর (Defence Minister) পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হস্তে স্থল, নৌ ও বিমান —এই তিন রক্ষিবাহিনীর ভার অর্পণ করা হয়। পরে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কতা (Supreme Command) আইনত রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হয়। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সংগঠন ও পরিচালনাগত

স্বাধীনতার পর ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন

[illegible] প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Defence) [illegible]ই থাকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর কার্যালয়সমূহের (Servic[illegible]eadquarters) সহিত পরামর্শ করিয়াই এই দায়িত্ব পালন করে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ (National Defence Council) গঠন করা হইয়াছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর ও জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বে তিন রক্ষিবাহিনীর তিনজন প্রধানের যথাক্রমে এইরূপ আখ্যা ছিল—সৈন্যবাহিনীর প্রধান ও প্রধান সেনাপতি (Chief of the Army Staff and the Commander-in-Chief of the Army), নৌবাহিনীর প্রধান ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ (Chief of the Naval Staff and the Commander-in-Chief of the Navy) এবং বিমানবাহিনীর প্রধান ও বিমানশক্তির অধ্যক্ষ (Chief of the Air Staff and the Commander-in-Chief of the Air Force)। এখন তাঁহাদিগকে শুধু সৈন্যবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সৈন্যবাহিনী (Army) : ভারতের সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই তিনটি অংশ বা 'কমাণ্ড' (Commands) বিভক্ত। আবার প্রত্যেকটি কমাণ্ড কতকগুলি করিয়া অঞ্চলে (Areas) এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল কতকগুলি করিয়া উপ-অঞ্চলে (Sub-Areas) বিভক্ত।

সৈন্যবাহিনীর সদর কার্যালয় নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। ইহা সৈন্যবাহিনীর

প্রধানের (Chief of the Army Staff) অধীনে পরিচালিত হয়। সদর কার্যালয়ের ছয়টি শাখা আছে।* ইহার মধ্যে একটি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা শিক্ষা ও সামরিক খবরাখবর সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়টি নিয়োগ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে। তৃতীয়টির কার্য হইল গমনাগমন, পরিবহণ, বাসস্থান প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা। চতুর্থটি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ করে। পঞ্চমটি সকল প্রকার নির্মাণকার্য পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে রক্ষিবাহিনীর তিনজন প্রধানকে পরামর্শ দেয়। ষষ্ঠটি বদলি, পদোন্নয়ন, অবসর প্রভৃতি সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে।

সংগঠন

নৌবাহিনী (Navy): স্বাধীনতার পর হইতে ভারতের নৌশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। নূতন নূতন আধুনিক রণতরী সংগ্রহ এবং নৌবাহিনীর সভ্যগণকে শিক্ষাদানের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

নয়াদিল্লীর সদর কার্যালয় হইতে নৌবাহিনীর প্রধান (Chief of the Naval Staff) চারিজন সহকারীর সহায়তায় ভারতীয় নৌবাহিনী পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া চারিটি বিষয়ে চারিজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারও আছেন।**

সংগঠন

ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি বিমান শাখাও (Naval Aviation Wing) আছে। এই বিমান শাখার দ্রুত সম্প্রসারণ করা হইতেছে।

বিমানবাহিনী (Air Force): ভারতের বিমানবাহিনী তিন অংশে বিভক্ত: (ক) সংরক্ষণ-সংগঠন (Maintenance Command), (খ) পরিচালনা সংগঠন (Operational Command) এবং (গ) শিক্ষা সংগঠন (Training Command)। সংগঠন তিনটি যথাক্রমে কানপুর, পালাম (দিল্লী) এবং বাংগালোরে অবস্থিত।

সংগঠন

সদর কার্যালয় নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ বিমানবাহিনীর প্রধানের অধীনে কার্য করেন।

১৯৫২ সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত সহায়ক বিমানশক্তি আইন (Auxiliary Air Force Act, 1952) অনুসারে দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবংগ উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাব —এই সাতটি রাজ্যে আসল বিমানবাহিনীকে প্রয়োজনমত সহায়তা করিবার জন্য সহায়ক বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

সহায়ক বিমানবাহিনী

---

* শাখা ছয়টি হইল: (i) General Staff Branch, (ii) Adjutant-General's Branch, (iii) Quartermaster-General's Branch, (iv) Master-General of Ordnance's Branch, (v) Engineer-in-Chief's Branch, এবং (vi) Military Secretary's Branch.

** এই অফিসারগণ হইলেন: (1) Flag Officer Commanding Indian Fleet, (2) Flag Officer, Bombay, (3) Commodore-in-Charge, Cochin, এবং (4) Commodore, East Coast, Visakhapatnam.

শিক্ষা-ব্যবস্থা (Training Organisation) : শিক্ষা ব্যাপারে সৈন্য-বাহিনীর পুরাপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ—অর্থাৎ, ভারতের স্থলবাহিনীকে শিক্ষিত করিবার জন্য বিদেশের সাহায্য লইতে হয় না। বিমান এবং নৌশক্তি এই পর্যায়ে উন্নীত হইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। নিম্নে সামরিক শিক্ষাপ্রদানের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করা হইল।

জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ (National Defence College) : এই কলেজ ১৯৬০ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের 'ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে'র পদ্ধতিতে উচ্চতর অফিসারদের শিক্ষাপ্রদান করা হয়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Defence Academy) : সামরিক শিক্ষাপ্রদান ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহার পুরা নাম হইল 'জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংযুক্ত রক্ষিবাহিনী শাখা' (National Defence Academy and Joint Services Wing)। পূর্বে ইহা দেরাদুনে অবস্থিত ছিল ; বর্তমানে ইহা পুণার নিকটে উঠিয়া গিয়াছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১৫ শতের মত সামরিক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিকভাবে শিক্ষাপ্রদান করে। প্রত্যেকের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর। ইহার পর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সামরিক শিক্ষা কলেজে উচ্চতর শিক্ষালাভ করে।

প্রতিরক্ষা বাহিনী কলেজ (Defence Services Staff College) : এই প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ ভারতের ওয়েলিংটন সহরে অবস্থিত। ইহা প্রতি বৎসর ১০০ জন করিয়া তিন বাহিনীর দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারগণকে উচ্চতর পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষাপ্রদান করে। এখানকার শিক্ষাকাল ১০ মাস মাত্র।

সৈনিক বিদ্যালয় (Army Schools) : নিম্নপদস্থ সভ্য ও অফিসারগণকে শিক্ষাপ্রদান করিবার জন্য আমেদনগর, মৌ, বেরিলি, আগ্রা, ফয়জাবাদ প্রভৃতি স্থানে সৈন্যবাহিনীর কয়েকটি বিদ্যালয় আছে।

নৌবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র (Naval Training Centres) : নৌবাহিনীর প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বোম্বাই, কোচিন এবং বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত। উচ্চতর শিক্ষার জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থিগণকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়।

বিমানশক্তির শিক্ষাকেন্দ্র (Air Force Training Centres) : বৈমানিকের কার্যে শিক্ষাপ্রদানের জন্য বিমানবাহিনীর বেগমপেট ও যোধপুরে দুইটি কলেজ আছে। কয়মবাটুরের কলেজে অফিসারদের শিক্ষাদান করা হয়। ইহা ছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয়ও আছে।

স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা সংগঠন (Voluntary Defence Organisation) : স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিকগণ যাহাতে এই কর্তব্য উপযুক্তভাবে পালন করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা

প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতে চারিটি সংগঠন আছে: (ক) আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী, (খ) লোকসহায়ক সেনা, (গ) জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী এবং (ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী। চৈনিক আক্রমণের দরুন বর্তমানে এই সকল স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত ও সুসংগঠিত করা হইতেছে।

(ক) আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী (Territorial Army): দেশের যুবকগণকে অবসর সময়ে সামরিক শিক্ষার সুযোগপ্রদানের জন্য ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী সংগঠন করা হয়। জরুরী অবস্থায় নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে (regular army) সহায়তা করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা এই আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর কার্য। এই সেনাবাহিনীর কোন সদস্যকে ভারত সরকারের বিশেষ আদেশ ব্যতীত বিদেশে যুদ্ধ বা অনুরূপ কার্য করিতে পাঠানো যায় না। ১৮ বৎসর হইতে ৩৬ বৎসর বয়স্ক যে-কোন সুস্থদেহ ভারতীয় এই আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। এই সৈন্যবাহিনী হইতে কিছুসংখ্যক সদস্যকে প্রতি বৎসর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীভুক্ত করা হয়।

(খ) লোকসহায়ক সেনা (Lok Sahayak Sena): আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীর সহায়ক হিসাবে ১৯৫৪ সালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সেনাদলের (National Volunteer Force) সৃষ্টি করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবক সেনাদল বর্তমানে 'লোকসহায়ক সেনা' নামে পরিচিত। এই সংগঠনের লক্ষ্য হইল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

রক্ষিবাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্যগণ এবং জাতীয় শিক্ষাবাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্যগণ (Ex-NCC Cadets) ব্যতীত ১৮ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সকল ভারতীয়ই লোকসহায়ক সেনায় যোগদান করিতে পারে। বর্তমানে বিশেষ করিয়া ভারতের সীমান্ত অঞ্চলেই এই সেনাদল গঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

(গ) জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী (National Cadet Corps): জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া গঠিত। ইহা হইতে তাহারা নিয়মানুবর্তিতা, নায়কত্ব (leadership) এবং সাধারণ সামরিক শিক্ষালাভ করে। শিক্ষার্থিবাহিনীর তিনটি বিভাগ আছে—(ক) উচ্চতর (Senior), (খ) নিম্নতর (Junior), এবং (গ) ছাত্রীদের (Girls') উচ্চতর ও নিম্নতর বিভাগের প্রত্যেকটির সৈন্য, নৌ ও বিমান এই তিনটি করিয়া শাখা আছে।

প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থিগণকে অনেক সময় বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি বালিকাদের জন্য আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কিছুদিন পূর্বেও সমগ্র ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষের কিছু উপর। বর্তমানে (ডিসেম্বর, ১৯৬২) উহা ৫ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ঘোষণা করা হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীন সকল ছাত্রছাত্রীকে আবশ্যিকভাবে জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীর অধীন হইয়া সামরিক শিক্ষা লইতে হইবে। এই প্রস্তাব পূর্ণভাবে কার্যকর হইলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

বর্তমান সংখ্যা ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা

(ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী (Auxiliary Cadet Corps)ঃ স্কুলের যে-সকল ছাত্রছাত্রী জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীতে প্রবেশের সুযোগ পায় না তাহাদের লইয়া সহায়ক শিক্ষাথিবাহিনী গঠন করা হইয়াছে। এই সংগঠন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্য, নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বর্তমানে সমগ্র ভারতে এই সংগঠনের অধীনে ১০ লক্ষের অধিক ছাত্রছাত্রী আছে।

বর্তমানে এই সকল স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা সংগঠনের প্রসারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতার পর ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। রক্ষিবাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব বর্তমানে রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। অবশ্য সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব হইল প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তরের (Ministry of Defence)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রিদপ্তর সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদর কার্যালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াই দায়িত্ব পালন করে। রক্ষিবাহিনীর তিন জন অধ্যক্ষ বর্তমানে যথাক্রমে সৈন্যবাহিনীর প্রধান (Chief of the Army Staff), নৌবাহিনীর প্রধান (Chief of the Naval Staff) এবং বিমানবাহিনীর প্রধান (Chief of the Air Staff) নামে পরিচিত।

সৈন্যবাহিনী: সদর কার্যালয় নয়াদিল্লী হইতে সৈন্যবাহিনী উহার প্রধানের অধীনে পরিচালিত হয়। সদর কার্যালয় ছয়টি শাখায় বিভক্ত।

নৌবাহিনী: সদর কার্যালয় হইতে নৌবাহিনীর প্রধান চারিজন সহকারীর সহায়তায় ভারতীয় নৌবাহিনী পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া চারিজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারও আছেন। নৌবাহিনীর একটি বিমান শাখাও আছে।

বিমানবাহিনী: ভারতের বিমানবাহিনী তিন অংশে বিভক্ত—(ক) সংরক্ষণ সংগঠন, (খ) পরিচালনা সংগঠন এবং (গ) শিক্ষা সংগঠন। বিমান শক্তিকে প্রয়োজনমত সহায়তা করিবার জন্য একটি সহায়ক বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা: শিক্ষা ব্যাপারে সৈন্যবাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ; অন্য দুইটি বাহিনীও দ্রুত এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষার জন্য যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মধ্যে ১। জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, ২। জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩। প্রতিরক্ষাবাহিনী কলেজ, ৪। সৈনিক বিদ্যালয়, ৫। নৌবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র, এবং ৬। বিমানবাহিনীর কলেজ—এই কয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান: বর্তমান ও ভাবী নাগরিকগণকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সংগঠনগুলি আছে—(ক) আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী, (খ) লোকসহায়ক সেনা, (গ) জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনী, এবং (ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী। বর্তমানে এগুলিকে সম্প্রসারিত করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Briefly describe the Defence Organisation of India.**

সংক্ষেপে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [১১৪-১১৮ পৃষ্ঠা]

2. **Give an idea of the Voluntary Defence Organisations of India.**

ভারতের স্বেচ্ছামূলক প্রতিরক্ষা সংগঠনের একটি বিবরণ দাও। [১১৬-১১৮ পৃষ্ঠা]

॥ জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীর সভ্যগণ কর্তৃক সমাজোন্নয়ন কার্য ॥
[১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা]

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ সহায়ক শিক্ষার্থিবাহিনী কর্তৃক সমাজোন্নয়ন কার্য ॥

ভাঃ

[১১৮ পৃষ্ঠা]

জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীর কয়েকজন সভ্যা (Girl Cadets) সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে কাজ করিতেছেন ॥

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে। ভাঃ

[১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা]

॥ শ্রীনেহরু নূতন দিল্লী প্যারেডে পশ্চিমবংগের জাতীয় শিক্ষার্থিবাহিনীর মহিলা শাখা পরিদর্শন করিতেছেন ॥

[১১৭ ১১৮ পৃষ্ঠা]

॥ প্রেস ইন্‌ফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ রাঁচির নিকটে একটি সমাজোন্নয়ন ব্লকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাদান ॥

ভাঃ

[ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৯৯ এবং অর্থবিদ্যার ১০৭ পৃষ্ঠা]

পরিশিষ্ট (ক)

আইন পাসের পদ্ধতি

(The Process of Legislation)

(ক) পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in Parliament) : পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে ইহাদের বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) : অর্থবিল ভিন্ন অন্যান্য বিল পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করা যায়। যে-সকল বিল মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে সরকারী বিল (Government Bills) বলা হয়, আর যে-সকল বিল পার্লামেণ্টের সাধারণ সদস্যরা উত্থাপন করেন তাহাদিগকে বেসরকারী বিল (Private Members' Bills) বলা হয়। উভয় ধরনের বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে এক প্রকার। তবে কতকগুলি বিষয়ে বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, বেসরকারী বিল উত্থাপনের জন্য সাধারণত এক মাসের নোটিস দিতে হয় এবং বিলের গুরুত্ব ও প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য লোকসভায় বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত একটি কমিটি (a Committee on Private Members' Bills and Resolutions) আছে। যাহা হউক, কোন বিল উত্থাপনের জন্য প্রথমে পরিষদের অনুমতি চাহিয়া প্রস্তাব করিতে হয়। অনুমতি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সদস্য বিলকে উত্থাপন করেন। উত্থাপনের পর বিলকে অবিলম্বে জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে প্রকাশিত করা হয়। বিল উত্থাপনের পূর্বেও বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইতে পারে।

বিল উত্থাপনের পদ্ধতি

(২) বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading of a Bill) : বিল উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত সদস্য প্রস্তাব করিতে পারেন যে, (ক) পরিষদ বিলটির বিচারবিবেচনা করুক; অথবা (খ) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির (a Select Committee) নিকট প্রেরণ করা হউক; অথবা (গ) বিলটি সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জানিবার জন্য উহাকে প্রচার করা হউক; অথবা (ঘ) বিলকে দুই পরিষদের যুক্ত কমিটির (a Joint Committee of the two Houses) নিকট প্রেরণ করা হউক। ইহার পর বিলটির নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লইয়া বিতর্ক চলে। যখন 'বিলটি বিচারবিবেচনা করা হউক' এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন বিলের সংশোধন এবং বিভিন্ন ধারার বিচারবিবেচনা চলে।

দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের নীতির আলোচনা

(৩) কমিটি পর্যায় (Committee Stage) : পরিষদে সরাসরি বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে, কমিটিতে প্রথমে বিলটির সাধারণ ধারার আলোচনা করা হয় এবং পরে বিলের প্রত্যেকটি ধারার পুংখানুপুংখভাবে বিচারবিবেচনা চলে।

কমিটিতে বিলের বিচারবিবেচনা

(৪) রিপোর্ট পর্যায় (Report Stage) : বিচারবিবেচনার পর কমিটি উহার রিপোর্ট রচনা করে এবং কমিটির চেয়ারম্যান ঐ রিপোর্টকে সংশ্লিষ্ট পরিষদের নিকট উপস্থিত করেন।

(৫) বিচারবিবেচনা পর্যায় এবং বিলের ধারার আলোচনা (Consideration Stage and Clause by Clause Discussion) : কমিটি কর্তৃক প্রেরিত কোন বিল সম্পর্কে বিচারবিবেচনার প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হওয়ার পর বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে পরিষদে আলোচনা চলে এবং ভোট গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে সংশোধন প্রস্তাবও করা যায়।

(৬) বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading) : যখন বিলের সকল ধারা সম্পর্কে বিচারবিবেচনা এবং ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হয় তখন বিলের তৃতীয় পাঠ হয়। প্রস্তাব করা হয় যে বিলটিকে পাস করা হউক। এই পর্যায়ে বিলকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখানের প্রশ্ন লইয়া বিতর্ক চলে।

বিলটি এইভাবে এক পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর অপর পরিষদের নিকট প্রেরিত হয়। বিলটি অপর পরিষদ কর্তৃক অনুরূপ পদ্ধতিতে গৃহীত হইলে উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু দুই পরিষদই যে সকল সময় বিলকে গ্রহণ করিবে এমন কোন কথা নাই। এক পরিষদে পাস হওয়ার পর অপর পরিষদ কোন বিলকে প্রত্যাখান করিতে পারে অথবা ছয় মাস ধরিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া বিলকে ফেলিয়া রাখিতে পারে, অথবা এমনভাবে বিলের সংশোধন করিতে পারে যে, উহাতে উত্থাপনকারী পরিষদের সম্মতি থাকে না। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দুই পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত অধিবেশনে সদস্যদের ভোটে বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দুই পরিষদের মধ্যে বিবাদ ও যুক্ত অধিবেশন

অর্থবিল (Money Bills) : অর্থবিল সম্পর্কে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে উহা রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না, লোকসভাতেই উত্থাপন করিতে হয়। লোকসভায় অর্থবিল পাস হওয়ার পর উহাকে রাজ্যসভার নিকট সুপারিশের (recommendations) জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে সুপারিশসহ উহাকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। লোকসভা ঐ সুপারিশসমূহ গ্রহণ বা প্রত্যাখান করিতে পারে। আর যদি রাজ্যসভা ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত না পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস হইয়াছে ; এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্তির পর বিল আইনে পরিণত হয়।

অর্থবিল সম্পর্কে লোকসভাই সর্বেসর্বা

(খ) রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in the State Legislature): রাজ্যের আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে আইন পাসের পদ্ধতির অনুরূপ। তবে কয়েকটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পশ্চিমবংগের মত কোন কোন রাজ্যের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত আবার আসামের মত কোন কোন রাজ্যের আইনসভা এক-পরিষদসম্পন্ন। যে-রাজ্যের আইনসভা এক-পরিষদসম্পন্ন সেখানে বিল মাত্র বিধানসভাতেই পাস হইয়া রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়।

এক-পরিষদসম্পন্ন আইনসভায় বিল পাস

যে-রাজ্যে আইনসভা দ্বি-পরিষদসম্পন্ন সেখানে পার্লামেণ্টের ব্যবস্থার মত অর্থবিল শুধু বিধানসভাতেই উত্থাপন করা যায়; বিধান পরিষদে উহা উত্থাপিত হইতে পারে না। বিধানসভায় অর্থবিল পাস হওয়ার পর উহাকে বিধান পরিষদের নিকট সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিল পাইবার ১৪ দিনের মধ্যে বিধান পরিষদকে সুপারিশসহ বিলটিকে বিধানসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। বিধানসভা ঐ সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। আর যদি বিধান পরিষদ ১৪ দিনের ভিতর বিলকে ফেরত না পাঠায় তাহা হইলেও ধরিয়া লওয়া হয় যে বিলটি উভয় পরিষদেই পাস হইয়াছে, এবং রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্তির পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। অবশ্য রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য বিলকে ধরিয়া রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে সম্মতি দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।

অর্থবিল সম্পর্কে বিধানসভার ক্ষমতা

অর্থবিল ভিন্ন অন্যান্য বিল পাস সম্পর্কে পার্লামেণ্টের দুই পরিষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে যেমন যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করা যায়, রাজ্যের আইনসভার ক্ষেত্রে সেইরূপ যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা নাই। রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধানের ব্যবস্থা হইল যে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বিলকে বিধান পরিষদ যদি তিন মাসের মধ্যে ফেরত না পাঠায়, অথবা যদি প্রত্যাখ্যান করে, অথবা যদি এরূপভাবে সংশোধন করে যে, বিধানসভা ঐ পরিবর্তন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাকে—তবে বিধানসভা দ্বিতীয় বার বিলটিকে পাস করিয়া বিধান পরিষদে প্রেরণ করিলে এক মাস পরে উহা উভয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। বিধান পরিষদ উহাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিলেও কোন ফল হইবে না।

অর্থবিল ভিন্ন অন্যান্য বিল সম্পর্কে দুই পরিষদের ক্ষমতা

রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক এইভাবে পাস হইবার পর বিলকে রাজ্যপালের নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। রাজ্যপাল বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন অথবা নিজে কিছু না করিয়া বিলটিকে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত অর্থবিল ভিন্ন অন্য বিলকে রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন। দ্বিতীয় বার ঐ বিল আইনসভা কর্তৃক

রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলেই বিল আইনে পরিণত হয়

গৃহীত হইলে রাজ্যপাল উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। যে-বিল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয় তাহাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। যখন আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় তখন ঐ বিল বিধিবদ্ধ আইনে (Act) পরিণত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

(ক) পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি: পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত:

১। বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ: অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। মন্ত্রিগণ ছাড়া অন্যান্য সদস্যেরও বিল (অর্থবিল ছাড়া) উত্থাপনের ক্ষমতা রহিয়াছে। তবে উভয় প্রকার বিল পাসের পদ্ধতি মোটামুটি এক প্রকার। উত্থাপনের পর বা পূর্বে বিলটি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২। বিলের দ্বিতীয় পাঠ: এই পর্যায়ে বিলের নীতিগুলির আলোচনা করা হয়।

৩। কমিটি পর্যায়: অনেক সময় বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটিতে বিলটির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়।

৪। রিপোর্ট পর্যায়: ইহার পর কমিটির রিপোর্ট পরিষদে উপস্থাপিত করা হয়।

৫। বিচারবিবেচনা পর্যায় ও বিলের ধারার আলোচনা: কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিলটির বিভিন্ন ধারার আলাপআলোচনা চলে এবং সংশোধন ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৬। বিলের তৃতীয় পাঠ: এই পর্যায়ে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। এক পরিষদে বিলটি গৃহীত হইলে উহা অপর পরিষদে প্রেরিত হয়। সেখানেও অনুরূপ পদ্ধতিতে বিলটি পাস হইলে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়। কিন্তু অপর পরিষদ বিলটিকে পাস না করিলে বা উহার বিশেষ সংশোধন করিলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত করিতে পারেন।

অর্থবিল: অর্থবিল পাস ব্যাপারে লোকসভাই সর্বেসর্বা। এ-বিষয়ে রাজ্যসভার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে।

(খ) রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি: রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি কেন্দ্রে আইন পাসেরই অনুরূপ। তবে যেখানে বিধানমণ্ডল এক-পরিষদসম্পন্ন সেখানে বিধানসভায় বিল পাসের পর উহা স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যপালের নিকট প্রেরিত হয়। কয়েক ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিলে নিজে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন কোন কিছু না করিয়া উহাকে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

প্রশ্নোত্তর

1. **Give a brief account of the process of legislation in Parliament.**

পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [১১৯-১২০ পৃষ্ঠা]

2. **Describe in brief the legislative procedure in a State Legislature.**

রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১২১-১২২ পৃষ্ঠা]

পরিশিষ্ট (খ)

জিলার শাসন-ব্যবস্থা

(District Administration)

সাধারণত রাজ্যের পটভূমিকাতেই, কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের নহে, জিলার শাসন-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হয়।

বিভাগ (Division): শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি রাজ্য কতকগুলি জিলায় বিভক্ত। জিলাকে কেন্দ্র করিয়াই রাজ্যের শাসন পরিচালিত হয়। পশ্চিমবংগ বিহার আসাম প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যে একাধিক জিলা লইয়া গঠিত বিভাগও আছে। বিভাগের শাসনভার যাঁহার উপর ন্যস্ত তাঁহাকে বিভাগীয় কমিশনার বা ভুক্তিপতি বলা হয়। কেন্দ্রীয় কৃত্যকের (All-India Services) প্রবীণ সভ্যগণের মধ্য হইতে কমিশনার বা ভুক্তিপতি নিযুক্ত করা হয়।

ভুক্তিপতির প্রধান কার্য হইল বিভাগের রাজস্ব পরিচালনা। ইহা ছাড়াও তাঁহাকে বিভাগের অন্তর্গত জিলা শাসকদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান করাও তাঁহার অন্যতম কর্তব্য।

জিলা (District): জিলার শাসনভার যাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে তাহাকে জিলা শাসক (District Officer) বা ম্যাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত করা হয়। কয়েক জায়গায় তাঁহাকে ডেপুটি কমিশনার বা উপভুক্তিপতিও বলা হয়। জিলাই রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্র বলিয়া জিলা শাসকের পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পদ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া কেন্দ্রীয় কৃত্যকের সদস্যগণের মধ্য হইতেই সাধারণত জিলা শাসক নিযুক্ত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য রাজ্য কৃত্যকের (State Services) প্রবীণ সভ্যগণকেও জিলা শাসকের ভার দেওয়া হয়।

জিলা শাসক একাধারে জিলার রাজস্ব-সংগ্রাহক ও শাসক। এইজন্য তাহাকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সমাহর্তা (District Magistrate and Collector) বলা হয়। রাজস্ব-সংগ্রাহক হিসাবে তাঁহার কার্য হইল জিলার ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর সংগ্রহকার্য পরিচালনা করা। রাজস্ব ও কর সংক্রান্ত তথ্যাদিও তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। খাসমহল পরিচালনার ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। তিনি প্রপন্নাধিকারের (Court of Wards) পরিচালনাও করেন। জিলার সরকারী কোষাগারও তাঁহার পরিচালনাধীন থাকে।

জিলা শাসকের কার্যাবলী

জিলা শাসক হিসাবে সমগ্র জিলার শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য তিনি দায়ী।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জিলার পুলিশ-বাহিনী বা আরক্ষার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। জিলার আরক্ষাধ্যক্ষ (Superintendent of Police) তাঁহারই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে থাকিয়া কার্য করেন।

জিলার শান্তিশৃংখলা রক্ষা করা ছাড়াও জিলার শাসককে অন্যান্য বহুবিধ কর্তব্য পালন করিতে হয়। জিলায় রাজ্য সরকারের সকল বিভাগ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা তাঁহার কর্তব্য, নির্বাহী বাস্তুকার (Executive Engineer), পৌর চিকিৎসক (Civil Surgeon), বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রভৃতির কার্যের তত্ত্বাবধান তাঁহাকে করিতে হয়; মহকুমা শাসকগণ সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিয়া কার্য করেন। তাঁহাকে জিলার স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হয়।

জিলার সরকারী আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাবও তিনি প্রস্তুত করেন। প্রধানত জিলা শাসকগণের আয়-ব্যয়ের হিসাবকে ভিত্তি করিয়াই রাজ্য সরকারের বাজেট প্রস্তুত হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে জিলা শাসককে বিচারের কার্যও করিতে হয়। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটগণের আদালতসমূহ হইতে ফৌজদারী মামলার আপিলও শুনিয়া থাকেন।

এইরূপে তাঁহার হস্তে শাসন ও বিচার উভয় সংক্রান্ত ক্ষমতাই রহিয়াছে। এই পদ্ধতি অবাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার নির্দেশ দিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই নির্দেশ অনুসারে জিলা শাসকের হস্ত হইতে বিচারের ক্ষমতা শীঘ্রই অপসারিত করা হইবে। পশ্চিমবংগ সহ কয়েকটি রাজ্য এই কার্য ইতিমধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছে।

এই সকল নির্ধারিত কর্তব্য ছাড়াও অনেক সময় জিলা শাসককে অনিশ্চিত প্রকৃতির অনেক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়—যেমন, জিলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য সংগঠনের ভার তাঁহারই উপর পড়ে; দুর্ভিক্ষে সকল সরকারী ও অনেক বেসরকারী সাহায্য তাঁহারই মারফত বন্টিত হয়। বর্তমানে জিলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অন্যান্য কার্যের ব্যবস্থা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

জিলা শাসককে জিলায় সরকারের 'চক্ষু কর্ণ হস্ত ও মুখ' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ, জিলায় সরকারের যাহা কিছু দেখিবার, যাহা কিছু শুনিবার, যাহা কিছু করিবার এবং বলিবার—সকলই জিলা শাসকের মারফত হয়। তিনি জিলার সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া জিলার অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে জ্ঞাত করান; সরকারী নীতি জিলায় প্রচার করেন এবং সেই অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পরিভ্রমণ করা ছাড়াও জিলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করিতে হয়, বিভিন্ন

শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে হয়, নানা স্থানে বক্তৃতা দিতে হয় এবং জিলার সমস্ত শাসন বিভাগের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার একজন সমালোচকের মতে, জিলা শাসকের উপর যে-সকল কর্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে তাহা পালন করার জন্য তাঁহাকে নানা গুণসম্পন্ন ও নানা বিদ্যায় বিশারদ হইতে হইবে—"তাঁহাকে উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে, সুবক্তা হইতে হইবে, অর্থবিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইবে, কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ হইতে হইবে, মনোবিদ্যাবিদ্ হইতে হইবে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রনীতিতে গভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে।" অপর একজনের মতে, "জিলায় সরকারী শাসনের চক্র জিলা শাসককে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে বলিয়া তাঁহাকে সর্বদাই জিলায় হৃদ্স্পন্দন অনুভব করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।"

জিলা শাসকের পদের গুরুত্ব

মহকুমা (Sub-division) : শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি জিলাকে আবার কয়েকটি মহকুমাতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মহকুমাতে একজন মহকুমা শাসক (Sub-divisional Officer) এবং তাঁহার অধীনে কয়েকজন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। মহকুমাতে মহকুমা শাসকের কার্য জিলায় জিলা শাসকের কার্যের অনুরূপ।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি রাজ্য কতকগুলি জিলায় বিভক্ত। জিলার শাসনভার জিলা শাসক বা ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে ন্যস্ত। জিলা শাসক একাধারে রাজস্ব-সংগ্রাহক ও শাসক। ইহা ব্যতীত জিলা শাসক বিচার বিভাগের অংগ। তিনি নিম্নতর ম্যাজিস্ট্রেটগণের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জিলা শাসকের পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে তাঁহাকে নানা গুণসম্পন্ন হইতে হয়।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি জিলাকে আবার কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক মহকুমাতে একজন করিয়া মহকুমা শাসক (Sub-divisional Officer) আছেন।

প্রশ্নোত্তর

1. "The District Officer is the pivot of the Indian Administration." Elucidate.

"জিলা শাসক ভারতের শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্র।" ব্যাখ্যা কর। [১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা]

2. Describe the administration of a District. (S. F. 1955)

জিলার শাসন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা]

3. Explain the position and powers of the District Magistrate in the Indian Administrative System. (C. U. 1960)

ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা ব্যাখ্যা কর। [১২৩-১২৫ পৃষ্ঠা]

অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি

(Subject Matter and Scope of Economics)

ভূমিকা : অল্প কথায় বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, বাঁচিয়া থাকার সমস্যা লইয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। জীবনধারণের জন্য আমরা অনেক কিছুরই অভাববোধ করি। আমরা চাই খাদ্যবস্ত্র আশ্রয় ইত্যাদি। কিন্তু কেবলমাত্র জীবনধারণ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা চাই ভালভাবে বাঁচিতে, উন্নততর জীবন উপভোগ করিতে। তাই আমরা সাধারণ খাদ্যবস্ত্র আশ্রয় ছাড়াও নানাপ্রকার আরাম ও বিলাসের সামগ্রীও কামনা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে এই সকল কাম্য দ্রব্যাদি সকলের অভাব মিটাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই অপ্রাচুর্যের দরুন দেখা দেয় নানাবিধ অর্থ নৈতিক সমস্যা। অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্যজনিত এই সকল অর্থ নৈতিক সমস্যারই পর্যালোচনা করে।

অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্য সংক্রান্ত সমস্যার পর্যালোচনা করে

আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প আমরা প্রায় সকলেই জানি। আলাদিন প্রদীপটিকে একটু ঘষিলেই এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। দৈত্যটিকে আলাদিন যাহা আদেশ করিত তাহাই সে সংগ্রহ করিয়া আনিত। ফলে আলাদিনের অভাব বলিয়া কিছু ছিল না।

এইরূপ আমাদের যদি প্রত্যেকের একটি করিয়া আশ্চর্য প্রদীপ থাকিত তবে আমাদের অভাবমোচনের কোন সমস্যাই থাকিত না, এবং ফলে আমাদের পক্ষে অর্থবিদ্যা চর্চারও কোন প্রয়োজন হইত না।

মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু। অভাববোধের ফলে মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাহার অভাব পরিতৃপ্ত হয়। পরিতৃপ্তির পর আবার দেখা দেয় অভাব। এইভাবে অভাব, কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটি বৃত্তাকার সম্বন্ধ রহিয়াছে :

মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা শুরু
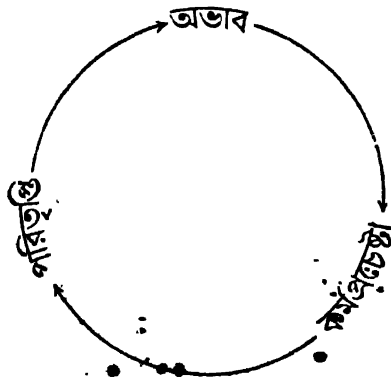
আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী মৎস্য শিকার করিয়া, স্বয়ং গৃহনির্মাণ করিয়া, জীবজন্তুর চামড়া হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিয়া সরাসরি অভাবমোচন করিত। তখন তাহার অভাবও ছিল সংখ্যায় অত্যল্প এবং বিশেষ সরল প্রকৃতির। সামান্য খাদ্য, সামান্য পরিচ্ছদ এবং কোনমতে বসবাস করিবার একটু স্থান হইলেই তাহার চলিয়া যাইত।

কিন্তু ক্রমে তাহার অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে সে অভাবমোচনের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল, এবং সুরু হইল দ্রব্য-বিনিময় (barter)। যাহার বেশী ধান্য ছিল সে ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র লইতে লাগিল, ইত্যাদি। তারপর একদিন বিনিময়কার্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রবর্তন করা হইল টাকাকড়ির। এখন হইতে মানুষ আর সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমে বেচাকেনা করিতে লাগিল। যেমন, কৃষক অর্থের বিনিময়ে ধান্য বেচিয়া ঐ অর্থ দিয়া দ্রব্যাদি কিনিতে লাগিল।

এইভাবে অর্থ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে যে বিনিময়কার্য সুরু হইল ক্রমশ তাহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিল বর্তমান দিনের অর্থ নৈতিক জীবন। এই জীবনে মানুষকে অভাবমোচনের জন্য সরাসরি দ্রব্যাদি সংগ্রহের পরিবর্তে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাতেই লিপ্ত থাকিতে হয় এবং অর্জিত অর্থ অধিকাংশ সময়ই সকল অভাব মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট হয় না বলিয়া বিচার-বিবেচনার সহিত ব্যয় করিতে হয়।

অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়

এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, কারণ বর্তমান দিনে মানুষ ইহাদের মাধ্যমেই অভাবমোচনের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করে।

বিষয়বস্তুর বিস্তৃততর আলোচনা (Detailed Study of the Subject Matter) : বর্তমান দিনে মানুষ যে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় সর্বদাই রত থাকে তাহা যে-কোন সভ্য দেশের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। ভারতের কথাই ধরা যাউক। এখানে নগরাঞ্চলে প্রতিদিন প্রত্যূষে কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠে যাহার আহ্বানে শ্রমিকগণ দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে। পথে বাহির হইয়া তাহারা দেখে যে করপোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারগণ ইতিমধ্যেই পথঘাট পরিষ্কারের কার্য সুরু করিয়াছে, ট্রাম-বাস-লরী চালক ট্রাম-বাস-লরী চালাইতেছে, দোকানদার দোকান খুলিতেছে। ক্রমশ বেলা বাড়িলে দেখা যায় যে আরও অনেক লোক পথে বাহির হইয়াছে—কেরানী ডাক্তার উকীল মোক্তার শিক্ষক ধনী-ব্যবসায়ী কেহই বাদ নাই। সকলেই চলিয়াছেন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের অভিমুখে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায়।

অর্থোপার্জন সংক্রান্ত কাজকর্ম

গ্রামাঞ্চলেও অনুরূপ কর্মব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানেও অর্থোপার্জনের [illegible] হইয়াই কৃষক শস্যক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করে. পশুপালক পশু চরাইতে

এবং কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে বাহির হয়, খেয়াঘাটের মাঝি খেয়াঘাটের দিকে চলে, দোকানদার দোকান খুলিবার উদ্যোগ করে।

অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় অনেক সময় মানুষকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম বিসর্জন দিয়াও কর্মে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। গভীর রাত্রে যে ইঞ্জিন-চালক রেলগাড়ি চালায়, পুলিস-চৌকিদার পাহারা দেয়, হাসপাতালের নার্স রোগী পরিচর্যা করে, ইত্যাদি ইহারই উদাহরণ।

কিন্তু সুযোগ ও সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াও মানুষের অভাব মিটে না। দিন-মজুর দেখে যে দৈনিক মজুরিতে তাহার কুলায় না ; কলকারখানার শ্রমিক সাপ্তাহিক মজুরি পাওয়ার পরের দিন হইতেই পরবর্তী সপ্তাহের দিকে তাকাইয়া থাকে ; মাস-মাহিনার লোক দেখে যে মাস শেষ হইবার বহু পূর্বেই টাকা ফুরাইয়া গেল। সুতরাং সকলকেই ব্যয়সংক্ষেপ (economise) করিতে হয়—বুঝিয়া-সুজিয়া হিসাব করিয়া তবে অর্থব্যয় করিতে হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, অর্থোপার্জনের ন্যায় অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মেও মানুষকে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহাকে দেখিতে হয় যে কিভাবে অর্থব্যয় করিলে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায়।

অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্ম

অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মকে দৈনন্দিন কাজকর্ম (ordinary business of life) বলা হয়। এই দৈনন্দিন কাজকর্মই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। এইজন্য অর্থবিদ্যার এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে : অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রায় অর্থ বা টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে।

অর্থবিদ্যার একটি সংজ্ঞা

কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অর্থবিদ্যা টাকাকড়ি অপেক্ষা টাকাকড়ির ব্যবহারজনিত তিনটি বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ইহারা হইল বিনিময় (exchange), অপ্রাচুর্য (scarcity) এবং নির্বাচন (choice)।

টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত তিনটি বিষয় :

লোকে টাকাকড়ির আকাংক্ষা করে বিনিময়কার্য সম্পাদন করিবার জন্য। পূর্বে যখন মানুষ সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় করিত তখন টাকাকড়ির কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং অর্থোপার্জন মানুষের প্রাথমিক লক্ষ্য মাত্র, মূল উদ্দেশ্য হইল টাকাকড়ির পরিবর্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া অভাবমোচন করা।

১। বিনিময়

মানুষ টাকাকড়ির বিনিময়ে সেই সকল দ্রব্যই সংগ্রহ করে যাহাদের যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প। নদীতীরে জলের বা বনে জ্বালানি কাঠের বিনিময়ে লোকে অর্থপ্রদান করে না। সহজ ভাষায় বলিতে পারা যায়, মানুষ টাকাকড়ির বিনিময়ে অপ্রচুর দ্রব্যই (scarce goods) সংগ্রহ করে।

২। অপ্রাচুর্য

অপ্রাচুর্যের জন্য আমাদিগকে ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে আমরা অর্থব্যয় সংক্ষেপ করি ; কিন্তু আসলে টাকাকড়ির বিনিময়ে অভাবমোচনের যে-সকল

উপকরণ ক্রয় করা যায় তাহাদেরই ব্যয়সংকোচ করি। আমাদের সীমাবদ্ধ উপার্জনের বিনিময়ে ভোগ্যদ্রব্য এরূপভাবে সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি যাহাতে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হয়। শুধু অর্থব্যয় নহে, অর্থোপার্জনের বেলাতেও আমাদিগকে এইরূপ বিচার-বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়। আমরা আমাদের সময় ও সামর্থ্যকে এইরূপভাবে নিয়োগ করিতে চেষ্টা করি যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাধিক হয়।

মাত্র ব্যক্তি নহে, জাতির পক্ষেও এইভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য সর্বাধিক করিয়া তুলিবার সমস্যা রহিয়াছে। ব্যক্তির মত জাতির বেলাতেও অভাবমোচনের উপকরণগুলি সীমাবদ্ধ। কোন দেশই উহার নাগরিকদের ইচ্ছামত খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান যানবাহন ইত্যাদি যোগাইতে পারে না; ইচ্ছামত বোমারু-বিমান রণতরী এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করিতে পারে না। তাই জাতিকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে অভাবমোচনের উপকরণগুলি কিভাবে ব্যবহার করিলে সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে।

৩। নির্বাচন

এইরূপ বিচারের অর্থ হইল নির্বাচন করা, যাহা ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই করিতে হয়। দরিদ্র ছাত্রের পিতা হয়ত' একই সংগে পুস্তক ও পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে পুস্তক ও পরিচ্ছদের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়—দেখিতে হয় যে ঐ মাসে কোনটি অধিক প্রয়োজনীয়। জাতিকে বিচার করিতে হয় যে আরও একটি রণতরী সংগ্রহ করা হইবে, না নূতন রেলপথ খোলা হইবে; সার তৈয়ারির কারখানা নির্মাণ করা হইবে, না শ্রমিকদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে; প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করা হইবে, না অধিক সংখ্যক হাসপাতাল স্থাপন করা হইবে।
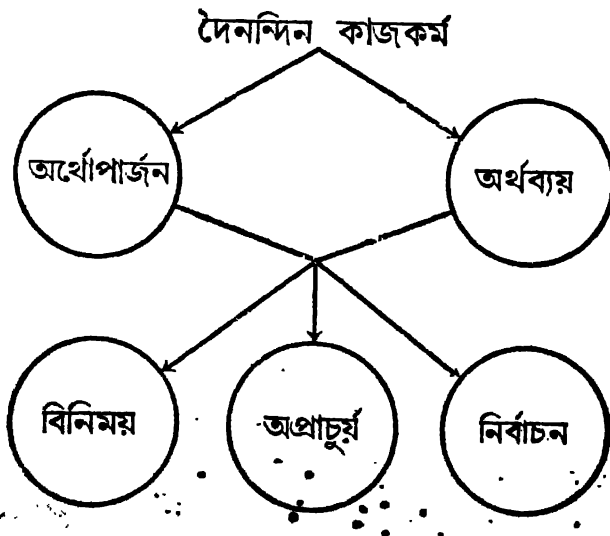
উপরি-উক্ত আলোচনার পর 'অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে'—এইরূপ সংজ্ঞা আর দেওয়া যায় না। কারণ, দেখা গেল যে টাকাকড়ি নহে—বিনিময়, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন লইয়াই মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ইহারাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। সুতরাং প্রয়োজন হইল অর্থবিদ্যার নূতন করিয়া সংজ্ঞা দেওয়ার।

অর্থবিদ্যা টাকাকড়ি অপেক্ষা উক্ত তিনটি বিষয়ের সহিতই অধিকতর সম্পর্কিত

এই নূতন সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে : অপ্রচুর উপকরণ দ্বারা সীমাহীন অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ যে-সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে তাহাদের পর্যালোচনাকেই অর্থবিদ্যা বলে।

এই সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার নূতন সংজ্ঞা

অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of Economics) :

বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। দেখা যায় যে অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি বিভিন্ন দিক দিয়া সীমাবদ্ধ। প্রথমত, অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইহা মাত্র সমাজভুক্ত লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে। সমাজের বাহিরে যাহারা বাস করে তাহাদের কাজকর্ম অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ, তাহাদের কাজকর্মের ফলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় না। সমাজে যদি কিছু লোক খাদ্য মজুত করে তবে খাদ্যের দাম চড়িয়া গিয়া খাদ্য-সমস্যার উদ্ভব হয়; বিপরীত দিকে সমাজভুক্ত কিছু কৃষক যদি অধিক উৎপাদন করে তবে যোগান বাড়িয়া খাদ্যশস্যের দাম কমিয়া যায়। কিন্তু রবিনসন ক্রুসোর মত কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যদি খাদ্য মজুত করে তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না; আবার রবিনসন ক্রুসো অধিক খাদ্য উৎপাদন করিলে সমাজের কোন লাভও হয় না। যে-সকল কাজকর্মের ফলাফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ করে, যাহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি হয় না তাহা সামাজিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। এই কারণে সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির কাজকর্ম অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু-ভুক্ত হয় নাই।

পরিধির সীমাবদ্ধতা :

১। অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে

দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। আমাদের অনেক অভাব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সেবাযত্নের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে—কারণ, ইহাদের পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। পরিমাপ করিবার উপায় নাই বলিয়া শৃংখলিতভাবে ইহাদের আলোচনা করা যায় না। শৃংখলিতভাবে যাহার আলোচনা করা যায় না তাহা কোন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না।

২। অর্থবিদ্যা টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মেরই আলোচনা করে

সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞান অর্থবিদ্যায় অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় রত মানুষের সেই সকল কাজকর্মেরই আলোচনা করা হয় যাহা পরিমেয়। এই পরিমাপ করা

হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। অতএব, যে-সকল কাজকর্মের সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক আছে অর্থবিদ্যায় মাত্র তাহাদেরই আলোচনা করা হয়।

৩। অর্থবিদ্যা অভাব-মোচনের সমস্যার পর্যালোচনা করে

তৃতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে অর্থবিদ্যায় টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মের আলোচনা করা হইলেও মূলত করা হয় সমস্যার পর্যালোচনা।

এই সমস্যা হইল অপ্রচুর উপকরণগুলির সাহায্যে সীমাহীন অভাবমোচনের সমস্যা। সংক্ষেপে ইহাকে অর্থ নৈতিক সমস্যা (economic problem) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অপ্রাচুর্যের দিক হইতে অর্থ নৈতিক সমস্যার পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

অপরদিকে কিন্তু সমস্যার পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়; সমস্যার সমাধানকল্পেও অর্থবিদ্যার আলোচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যবহারিক শাস্ত্র (applied science) হিসাবে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু হইয়াছিল। এই প্রসংগে একজন লেখক বলিয়াছেন যে অর্থবিদ্যাবিদ শুধু রোগ নির্ণয় করেন না, রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থাও করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থবিদ্যাবিদ শুধু জিনিসপত্রের দাম কেন বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিভাবে দামবৃদ্ধি রোধ করা যায় তাহারও নির্দেশ দিয়া থাকেন। অতএব, অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক (light-bearing) এবং ফলপ্রদায়ী (fruit-bearing) উভয় প্রকার শাস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। উহা অর্থ নৈতিক সমস্যার প্রকৃতি কি তাহা ব্যাখ্যা করে, আবার কিভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করা যায় তাহারও নির্দেশ দেয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ-গণের মতে, এই নির্দেশ প্রদানের কার্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবিদ্যা অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিয়া মানুষের কল্যাণবৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। এইখানেই অর্থবিদ্যা আলোচনার সার্থকতা এবং এই কারণেই অর্থবিদ্যার আলোচনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

পরিধির বিস্তৃতি

কল্যাণের পথনির্দেশই অর্থবিদ্যা আলোচনার উদ্দেশ্য

অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী (Economic System and its Functions): বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই রাষ্ট্রশক্তি মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ, এই দেশে আমরা ইচ্ছামত মদের দোকান খুলিয়া, বাস-ট্যাক্সি চালাইয়া, বিদেশ হইতে মালপত্র আমদানি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারি না। ইহাদের জন্য সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। উপরন্তু, সমাজবদ্ধ লোক সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। যেমন, কৃষক দেখে যে দেশে গম না চাউলের চাহিদা বেশী। যাহার চাহিদা বেশী সাধারণত সে সেই শস্য উৎপাদনেই মনোযোগী [illegible]ভাবে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে একটা শৃংখলা

অর্থ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে

দেখা যায়। এইরূপ শৃংখলিত অর্থনৈতিক কাজকর্মকেই সংক্ষেপে 'অর্থ-ব্যবস্থা' (economic system) বলা হয়।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাঁচটি :

অর্থ-ব্যবস্থার পাঁচটি কার্য

(১) অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রথমেই নির্ধারণ করিতে হয় যে, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে।

(২) উহাকে দেখিতে হয় যে উৎপাদনের উপাদানগুলি কিভাবে বণ্টন করিলে সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয়। যেমন, জমিতে গৃহনির্মাণ ও শস্য উৎপাদন উভয়ই করা যাইতে পারে। কোন্‌টি করা যাইবে তাহা সমাজকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

(৩) কোন ভোগ্যদ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে সমাজকে উহার ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দেশে খাদ্যে ঘাটতি পড়িলে রেশনিং প্রথা চালু করিতে হয়, ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিতে হয়, ইত্যাদি।

(৪) ইহার পর আসে আয় (income) বণ্টনের সমস্যা। যে-কোন প্রকার উৎপাদনকার্যেই নানা শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করে। যেমন, কলকারখানায় উৎপাদনে ধনীরা যোগায় মূলধন এবং শ্রমিকরা যোগায় শ্রম। এখন কারখানায় যে আয় হইল তাহার মধ্যে মূলধন-মালিক কতটা পাইবে আর শ্রমিকরা কত পাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার ইহাও অন্যতম কার্য।

(৫) ইহা ছাড়াও আর একটি সমস্যা আছে। ইহা হইল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্যা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে (economic condition) বজায় রাখিতে হইবে এবং সকল সময় উহার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক কাজকর্মকে 'অল্পবিস্তর' নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা যদি 'অল্প' হয় তবে ঐ-রূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (unplanned economy) বলা যায়। অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্যকরূপে সম্পাদিত হয় না। দেখা যায়, অনেক অকাম্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, ঘাটতির সময় সকলে প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্য পাইতেছে না, শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও দুই বেলা অন্ন জুটাইতে পারিতেছে না, অর্থনৈতিক অবস্থাও ঠিকমত বজায় থাকিতেছে না বা উন্নয়নের পথে চলিতেছে না। এইজন্য বর্তমান দিনে ঝোঁক দেখা দিয়াছে 'অধিক' নিয়ন্ত্রণের প্রতি। অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (planned economy) বলে। ইহাতে পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারে লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়।

অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা

ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা অন্যতম পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। শিল্প-বাণিজ্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার পরিচালনাধীনে থাকে বলিয়া এই ধরনের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (mixed economy) বলা হয়। এ-সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রসংগে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

বিষয়বস্তু: মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু। অভাবমোচনের জন্য পূর্বে আমরা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতাম, এখন অর্থোপার্জন করি। আমাদের উপার্জন সকল অভাব মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় না বলিয়া আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিতে হয়। এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই যে মানুষ সারাক্ষণ অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মে লিপ্ত থাকে তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থের এই ভূমিকার জন্য মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম লইয়া আলোচনাকারী শাস্ত্র অর্থবিদ্যাকে 'টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনাকারী শাস্ত্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে অর্থবিদ্যা টাকাকড়ি অপেক্ষা বিনিময়, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন—এই তিনটি বিষয়ের সহিত অধিকতর সম্পর্কিত। এইজন্য 'অর্থবিদ্যা টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে' এইরূপ না বলিয়া 'অপ্রচুর উপকরণ লইয়া সীমাহীন অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় সম্পাদিত কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে' এইরূপ বর্ণনাই করা উচিত।

আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি: অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ—১। অর্থবিদ্যা মাত্র সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে; ২। ইহা টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে; এবং ৩। ইহা অভাবমোচনের অপ্রচুর উপকরণগুলি লইয়াই আলোচনা করে। সংক্ষেপে বলা যায়, অপ্রাচুর্যের দিক হইতে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অপরদিকে অর্থবিদ্যা শুধু সমস্যার পর্যালোচনাই করে না, সমস্যা সমাধানেরও ইংগিত দেয়। সুতরাং অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক ও ফলপ্রদায়ী উভয় শাস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে এইরূপ ফলপ্রদায়ী শাস্ত্র হিসাবেই, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথনির্দেশক হিসাবেই অর্থবিদ্যার চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী: রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া এবং সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজবদ্ধ লোক অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। এইরূপ শৃংখলিত কাজকর্মকে সংক্ষেপে অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাঁচটি: ১। কোন্ কোন্ দ্রব্য কত কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ধারণ করা; ২। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করা; ৩। অপ্রচুর ভোগ্যদ্রব্যের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা; ৪। আয়ের বণ্টন করা; ৫। অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও উহার উন্নয়ন সাধন করা।

অর্থ-ব্যবস্থা (ক) অপরিকল্পিত, এবং (খ) পরিকল্পিত—এই দুই রকমের হয়। ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এইরূপ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগে পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss the subject matter of Economics.**

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা কর। [১-৫ পৃষ্ঠা]

2. **How would you define Economics ? Give reasons for your answer.**

কিভাবে অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইঙ্গিত: 'অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রায় টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে'—এই সংজ্ঞাটি [illegible] নির্দেশ করিতে হইবে। পরে এই সংজ্ঞার ত্রুটি, যে অর্থবিদ্যা টাকাকড়ির সহিত ততটা সম্পর্কিত

নহে, যতটা সম্পর্কিত হইল—বিনিময়, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচনের সহিত ইহা দেখাইয়া ইহাদের ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার যে-সংজ্ঞা তাহা বির্‌...(২-৫ পৃষ্ঠা)]

3. Discuss the scope of Economics.

অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [৫-৬ পৃষ্ঠা]

4. What is an Economic System? What are its functions?

অর্থ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে? ইহার কার্যাবলী কি কি? [৬-৮ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতকগুলি মৌলিক ধারণা

(Some Fundamental Concepts)

বর্ণপরিচয় না করিয়া যেমন কোন ভাষা শিক্ষা করা চলে না, তেমনি মৌলিক ধারণাগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বুঝিয়া কোন বিজ্ঞান বা শাস্ত্রও চর্চা করা যায় না। অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান। সুতরাং অর্থবিদ্যা আলোচনার সুরুতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। উপরন্তু, সাধারণ কথাবার্তায় আমরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করি অর্থবিদ্যায় যাহাদের অর্থ একটু ভিন্ন ধরনের। এই কারণেও অর্থবিদ্যা আলোচনার সুরুতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়।

মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে আলোচ্য।

দ্রব্য (Goods): মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, এবং অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের এই কর্মপ্রচেষ্টা। এখন প্রশ্ন, 'দ্রব্য' বলিতে কি বুঝায়?

সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা 'বস্তুগত' (material) এবং 'অ-বস্তুগত' (non-material) উভয়ই হইতে পারে। চালডাল, তরিতরকারী, ঘরবাড়ী, বইপত্র, আলোবাতাস প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ। অপরপক্ষে ব্যবসায়ীর দক্ষতা, ডাক্তার গায়ক মিস্ত্রী প্রভৃতির পেশাগত কর্মকুশলতা, ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill) ইত্যাদি হইল অ-বস্তুগত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার যখন চিকিৎসা করেন, শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন, গায়ক যখন সুকণ্ঠ সংগীতের দ্বারা লোককে আনন্দ দান করেন তখন ঐরূপ কার্যকে অর্থবিদ্যার ভাষায় 'সেবা' (service) বলা হয়।

দ্রব্য কাহাকে বলে

বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য : ১। বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য

দ্রব্যাদিকে অন্যভাবে 'বাহ্যিক' (external) এবং 'আভ্যন্তরীণ' (internal) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, আলোবাতাস, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি হইল মানুষের বাহিরের জিনিস; কিন্তু ব্যবসায়ীর দক্ষতা, গায়কের গান গাহিবার কুশলতা, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা প্রভৃতি মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং ইহাদিগকে আভ্যন্তরীণ দ্রব্য বলা হয়।

২। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য

আবার দ্রব্যাদি 'হস্তান্তরযোগ্য' (transferable) অথবা 'অ-হস্তান্তরযোগ্য' (non-transferable) হইতে পারে। ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার, ধানচাল, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়। ইহাদের বলা হয় হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য। কিন্তু কোন লোকের ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন, গায়কের সুকণ্ঠ, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য, চিকিৎসকের দক্ষতা ইত্যাদি, একজন অপরকে দিতে অথবা বিক্রয় করিতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন স্থানের আলোবাতাস স্বাস্থ্যকে অন্য এক স্থানে লইয়া আসা যায় না।

৩। হস্তান্তরযোগ্য ও অ-হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য

'অবাধলভ্য' (free) ও 'অর্থনৈতিক' (economic) এইভাবেও দ্রব্যসমূহের আর এক শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলি প্রকৃতি এত প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে যে উহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারে কোন বাধা নাই। প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস, অরণ্যে কাষ্ঠ, মরুভূমিতে বালুকা, নদীতে জল প্রভৃতি অবাধলভ্য দ্রব্যের দৃষ্টান্ত। ইহাদের সম্পর্কে হিসাব করিয়া ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই অবাধলভ্য নয়। অধিকাংশ দ্রব্যেরই সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল অপ্রচুর (scarce) দ্রব্যকেই অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic goods) বলা হয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য অবাধলভ্য বা অর্থনৈতিক দ্রব্য কিনা তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে। নদীতীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য—কারণ, চাহিদার তুলনায় প্রচুর বলিয়া উহার জন্য কাহাকেও দাম দিতে হয় না; কিন্তু যখন কলিকাতার মত সহরাঞ্চলে নদী হইতে গৃহে গৃহে ঐ জল সরবরাহ করা হয় তখন উহা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের প্রচেষ্টা (human effort) বা পরিশ্রম। অর্থাৎ, পরিশ্রমই অবাধলভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্যে পরিণত করে।

৪। অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সংক্ষেপে 'সম্পদ' (wealth) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সম্পদ

৫। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আবার দ্রব্যসমূহকে 'ভোগ্যদ্রব্য' (consumers' or consumption goods) এবং 'মূলধন-দ্রব্য' (producers' or production or capital goods) এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যে-সকল দ্রব্য সরাসরি

আমাদের অভাব বা আকাংক্ষা মিটায় তাহাদের বলা হয় ভোগ্যদ্রব্য। যেমন, চালডাল জামাকাপড় ঘরবাড়ী ইত্যাদি। মূলধন-দ্রব্য হইল সেগুলি যাহা অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের চাহিদা মিটায়। যেমন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যক্ষ ভোগের দ্রব্য হইল ভোগ্যদ্রব্য আর উৎপাদনের জন্য উৎপাদকের হাতে যে-দ্রব্য থাকে তাহা হইল মূলধন-দ্রব্য। তবে একই দ্রব্য এক অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য এবং অন্য অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য হইতে পারে। যখন আমরা বাড়ীর রান্নাবান্নার জন্য কয়লা ব্যবহার করি তখন কয়লা ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু কারখানায় যে-কয়লা ব্যবহার করা হয় তাহা মূলধন-দ্রব্য—কারণ, উহাকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। সুতরাং কোন দ্রব্য মূলধন-দ্রব্য না ভোগ্যদ্রব্য তাহা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

৫। ভোগ্য ও মূলধন দ্রব্য

স্থায়িত্ব অনুসারেও দ্রব্যাদিকে 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' (single-use goods) এবং 'স্থায়ী দ্রব্য' (durable goods) এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। যে-সকল দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাদিগকে একবার ব্যবহার্য দ্রব্য বলা হয়। যেমন, যে-কয়লা একবার পোড়ানো হইল তাহাকে দ্বিতীয়বার আর পোড়ানো চলে না, যে-লেবুটি একবার খাওয়া হইল তাহা আর দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না। অপরদিকে এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের একাধিকবার ব্যবহার করা চলে—যেমন, যে-কলমটি দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা দিয়া একবার লিখিলেই তাহার ব্যবহার শেষ হয় না—একই কলম দ্বারা বেশ কিছুদিন লেখা চলে। কারখানায় যে-সকল যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদন করা হয় তাহা একাধিকবাব ব্যবহারযোগ্য। এই ধরনের একাধিকবার ব্যবহার্য দ্রব্যকে স্থায়ী দ্রব্য বলা হয়।

৬। 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' এবং 'স্থায়ী দ্রব্য'

উপযোগ (Utility): অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' বলিতে অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতাই উপযোগ, দ্রব্যটি উপযোগ নহে। যে কলম দিয়া আমি লিখি সেই কলমটি উপযোগ নহে, আমার লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ। লেখায় সহায়তা করে বলিয়াই আমি কলমের আকাংক্ষা করি। এইজন্য উপযোগকে আকাংক্ষা বা কাম্যতা (desiredness) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অভাব মিটাইবার ক্ষমতাই উপযোগ

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করিবার সময় দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, উপযোগ শব্দটির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। নীতির দিক দিয়া ভাল হউক বা মন্দ হউক কোন দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাংক্ষা থাকিলেই ঐ দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আকাংক্ষা উঁচুদরের না নীচুদরের তাহা আমাদের দেখিবার কথা নয়। মদ্যপায়ী মদের আকাংক্ষা করে, চোর সিঁদকাঠি খুঁজিয়া বেড়ায়

উপযোগ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য দুইটি বিষয়:

গঞ্জিকাসেবী গঞ্জিকার খোঁজ করে, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি বিষের সন্ধান করে। সুনীতিমূলক না হইলেও এই সকল ব্যক্তির নিকট মদ্য, সিঁদকাঠি, গঞ্জিকা ও বিষের উপযোগ রহিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন দ্রব্য উপকারী বা ক্ষতিকারক এই প্রশ্ন উপযোগ বিচারে মোটেই আসে না—জিনিসটির জন্য আকাংক্ষা থাকিলেই উহার উপযোগ থাকে। দুগ্ধ উপকারী এবং মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু দুগ্ধের যেমন আমাদের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, মাতালের নিকট মদেরও সে-ক্ষমতা আছে। সুতরাং উভয়েরই উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে।

১। উপযোগের সহিত নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই

দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) ও মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্য হয়ত' একজনের আকাংক্ষা তৃপ্তি করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। যেমন, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একজনের জল হইলেই চলিতে পারে, অপর একজনের কিন্তু লেমনেডের প্রয়োজন হয়; অথবা আহারের জন্য কেহ কেহ ভাত, আবার কেহ কেহ রুটি পছন্দ করে। এইভাবে একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির আকাংক্ষা সমান-ভাবে পূরণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া সময়ের ব্যবধানে কোন জিনিসের জন্য একই ব্যক্তির আকাংক্ষার তারতম্য দেখা যায়। যেমন, তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা খুব তীব্র থাকে, কিন্তু জলপানের পর তৃষ্ণা মিটিলে সাময়িকভাবে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা আর থাকে না। সুতরাং দ্রব্যের উপযোগ বা পরিতৃপ্তিদানের ক্ষমতা সকল সময় সকল অবস্থায় সকলের নিকট সমান নহে।

২। উপযোগ অন্যতম আপেক্ষিক ও মানসিক ধারণা

উপযোগের প্রকারভেদ (Different Kinds of Utility): মোটামুটিভাবে উপযোগ পাঁচ প্রকারের হইতে পারে :

(১) স্বাভাবিক উপযোগ (Elementary or Natural Utility): প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের যে-উপযোগ থাকে তাহাকে 'স্বাভাবিক' উপযোগ বলা হয়। যেমন, আমাদের কাছে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস-জলের যে-উপযোগ আছে তাহা স্বাভাবিক উপযোগ।

(২) রূপগত উপযোগ (Form Utility): কোন দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রকারের উপযোগকে 'রূপগত' উপযোগ বলা হয়। কাঠ হইতে ছুতার-মিস্ত্রী যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র তৈয়ারি করে তখন সে কাঠকে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার যখন তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারি করা হয় তখন তুলাকে নূতন রূপ দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে নূতন রূপ দেওয়ার ফলে যে-উপযোগ সৃষ্টি হয় তাহাই রূপগত উপযোগ।

(৩) স্থানগত উপযোগ (Place Utility): একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া কোন দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করা যায়। যেমন, খনি হইতে

কয়লা নগরাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিয়া কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়; অথবা দার্জিলিং হইতে কমলালেবু কলিকাতায় চালান দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়।

(৪) সময়গত উপযোগ (Time Utility): এক সময় হয়ত' কোন জিনিসের জন্য মানুষের আকাংক্ষা কম, অন্য সময় উহার জন্য আকাংক্ষা অধিক। সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যের উপযোগ বাড়িয়া যাইতে পারে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের নূতন জামাকাপড়ের যে-আকাংক্ষা থাকে, অন্য সময় তাহা থাকে না। অর্থাৎ, পূজার সময় জামাকাপড়ের উপযোগ বাড়িয়া যায়। সুতরাং যে-সময় যে-দ্রব্য আকাংক্ষিত হয় সে-সময় সেই দ্রব্যের যোগান দিয়া সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই দিক হইতে দোকানদারেরা সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে—তাহারা দোকানে জিনিসপত্র রাখিয়া আমাদের যখন যে-দ্রব্য প্রয়োজন হয় তখনই তাহা সরবরাহ করে। ইহার জন্য কারখানায় অর্ডার দিয়া দ্রব্য পাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

(৫) সেবাগত উপযোগ (Service Utility): কতকগুলি দ্রব্য বস্তুর আকার ধারণ না করিয়া সরাসরি আমাদের আকাংক্ষা পরিতৃপ্ত করে। ইহাদের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা বা উপযোগকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, চিকিৎসকের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাদান, ভৃত্যের পরিচর্যা ইত্যাদি।

সম্পদ (Wealth): অর্থবিদ্যায় সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্পদ বলিতে সেই সকল বস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায় যাহাদের বিনিময়-মূল্য আছে—অর্থাৎ, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়। এখন কোন বস্তুগত দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য থাকিতে হইলে উহাকে নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে:

সম্পদ কাহাকে বলে

(১) উহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে; (২) উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর (scarce) হইবে; এবং (৩) উহা বিক্রয়যোগ্য (marketable) হইবে। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য:

প্রথমত, ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, উপযোগ না থাকিলে কোন জিনিসের বিনিময়-মূল্য থাকিতে পারে না। যাহার অভাবমোচন বা আকাংক্ষা-পূরণের ক্ষমতা নাই তাহা কেহই চাহিবে না, টাকা দিয়া ক্রয় করা ত' দূরের কথা। সুতরাং সম্পদ হইতে হইলে প্রথমেই বস্তুটির পক্ষে উপযোগ থাকা প্রয়োজন।

১। উপযোগ

দ্বিতীয়ত, মাত্র উপযোগ থাকিলেই কোন জিনিস সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল দ্রব্য অবাধলভ্য, যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় তাহাদের বিনিময়ে কেহ কোন মূল্য দেয় না। আমরা নিত্য যে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস ভোগ করি, তাহা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের যোগান এতই প্রচুর যে ইহাদের জন্য

২। অপ্রাচুর্য

বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। বিনামূল্যেই ইহাদের আমরা ভোগ করিয়া থাকি। অনুরূপভাবে নদীতীরে চাহিদার তুলনায় জলের যোগান এতই প্রচুর যে জল বেচাকেনার কথা কেহ চিন্তাই করে না। সুতরাং অবাধলভ্য দ্রব্যাদি সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে যাহা এক অবস্থায় অবাধলভ্য তাহা অন্য অবস্থায় চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইতে পারে; ফলে উহার জন্য দাম দিতে হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নদীর তীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্তু সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে করপোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি যে-জল সরবরাহ করে তাহা অবাধলভ্য নয়; ইহার জন্য নগরবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। এই অবস্থায় জল সম্পদের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বলিয়া উহার জন্য আমাদের দাম দিতে হয়। বায়ুর বেলায় অনুরূপ উক্তি খাটে। প্রকৃতিদত্ত বায়ু আমরা অবাধে ও বিনামূল্যে শ্বাসপ্রশ্বাসে লই; কিন্তু সিনেমা-গৃহে যখন কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তখন উহার জন্য সিনেমা-মালিককে অর্থব্যয় করিতে হয় এবং ঐ খরচ দর্শকদের নিকট হইতে সিনেমা-টিকিটের

এক অবস্থায় যে-দ্রব্য সুপ্রচুর অন্য অবস্থায় তাহা অপ্রচুর হইতে পারে
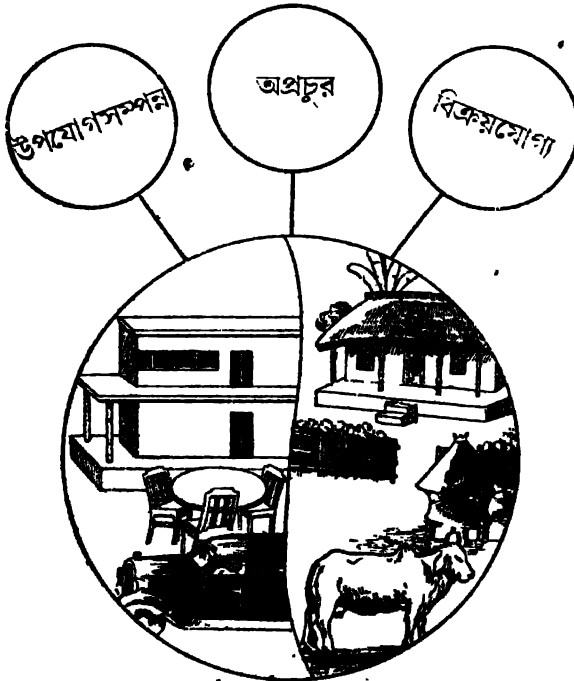
দামের মধ্য দিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে বায়ুও অপ্রচুর সামগ্রী এবং সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কোন দ্রব্য সম্পদ কিনা তাহা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ কিনা। সীমাবদ্ধ না হইলে উহা সম্পদের পর্যায়ে পড়িবে না।

তৃতীয়ত, আবার উপযোগ থাকিলে এবং সীমাবদ্ধ হইলেই কোন দ্রব্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। উপযোগ ও সীমাবদ্ধতা ছাড়াও দ্রব্যটির আর একটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। দ্রব্যটিকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে—অর্থাৎ, দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয়ের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

৩। বিক্রয়যোগ্যতা

বিক্রয়যোগ্য হইতে হইলে দ্রব্যের পক্ষে আবার হস্তান্তরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। যেমন, ঘরবাড়ী চালডাল পোশাক-পরিচ্ছদ বইপত্র ইত্যাদি একজন আর একজনের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং ইহারা বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য। 'হস্তান্তর' শব্দটির দ্বারা মালিকানার হস্তান্তরই বুঝায়, স্থানান্তর বুঝায় না। যেমন, যখন জমি বা বাড়ী বিক্রয় করা হয় তখন উহা একস্থান হইতে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত হয় না। জমি বা বাড়ীর মালিকানা একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র। হস্তান্তর করা যায় না বলিয়াই বি. এ. পরীক্ষার ডিপ্লোমা বা চিকিৎসকের পারদর্শিতা সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না।

বিক্রয়যোগ্য হওয়ার জন্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন

হস্তান্তর বলিতে মালিকানার হস্তান্তর বুঝায়

অতএব, যে-সকল দ্রব্য হস্তান্তর করা যায় না এবং বিক্রয়যোগ্য নয় সে-সকল দ্রব্যকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় না। যেমন, মানুষের স্বাস্থ্য, গায়ক-গায়িকার সংগীত-নৈপুণ্য, চিকিৎসকের পারদর্শিতা, শিল্পীর শিল্পকৌশল প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপযোগ আছে এবং উহাদের যোগানও অপ্রচুর; কিন্তু এই জিনিসগুলি একজন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না বলিয়া উহারা সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, চলতি কথায় আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্যকে অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না; সুতরাং অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়

দেখা গেল, কোন দ্রব্য সম্পদ হইতে হইলে উহাকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। কিন্তু বিক্রয়যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে উহাকে বাস্তবিকপক্ষে বিক্রয় করিতে হইবে। সমাজের এমন সকল সাধারণ সম্পদ আছে—যথা, রাস্তাঘাট পুল রেলপথ উদ্যান স্কুল-কলেজ চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি যাহা বেচাকেনা করা হয় না। তবুও এগুলি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

পরিশেষে, 'সম্পদ' শব্দটি বস্তুগত দ্রব্যকে (material goods) বুঝাইতেই ব্যবহার করা হয়। অনেকে অবশ্য অ-বস্তুগত দ্রব্যকেও সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এইরূপ করায় অসুবিধা আছে।

সম্পদ বলিতে বস্তুগত দ্রব্যই বুঝায়

পূর্বেই বলিয়াছি যে সম্পদ হইতে গেলে দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। অ-বস্তুগত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া উহারা সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না। উপরন্তু অ-বস্তুগত দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করিলে সম্পদ পরিমাপ করিবার ব্যাপারেও অসুবিধা দেখা যায়। সম্পদ হইল কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে (at a certain point in time) অবস্থিত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টি (a stock of marketable goods)। ডাক্তারের সেবা, উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, বাসের কণ্ডাক্টরের কার্য, সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতার কার্য (services) আমাদের অভাবপূরণ করে সত্য। ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং বাজারে ইহাদের বিনিময়-মূল্যও আছে। কিন্তু ইহাদের উৎপাদন ও ভোগ একই সময় সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করিতেছে না। অতএব কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাদের পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণে আমরা অ-বস্তুগত সেবাকে সম্পদের পর্যায়ে ফেলিব না ; সম্পদ বলিতে মাত্র নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই বুঝিব।

নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wealth): মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে 'ব্যক্তিগত সম্পদ' (individually owned wealth) এবং 'সমষ্টিগত সম্পদ' (collectively owned wealth) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

যে-সকল সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব থাকে তাহাদিগকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলা হয়। যেমন, ব্যক্তিবিশেষের ঘরবাড়ী, ধনসম্পত্তি, আসবাবপত্র, বই, কাপড় ইত্যাদি। অপরদিকে সাধারণে যে-সকল সম্পদের মালিক তাহাদিগকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা হয়। যেমন, রাস্তাঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, জাতীয় লাইব্রেরী, সরকারী ঘরবাড়ী ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বর্তমান সময়ে সরকার অনেক ব্যবসায় ও শিল্প নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে—যেমন, রেলপথ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, সরকারী পরিবহণ ইত্যাদি। এগুলিও সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ।

ব্যক্তিগত সম্পদ

সমষ্টিগত সম্পদ

আবার 'জাতীয়' (national) বা 'সামাজিক' সম্পদ কথাটিও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা কোন সমাজ বা দেশের সমগ্র সম্পদকে বুঝায়। সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ লইয়াই এই জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ। উদাহরণস্বরূপ, সকল ভারতবাসীর ব্যক্তিগত সম্পদ ও ভারত-রাষ্ট্রের সমষ্টিগত সম্পদ—উভয়ে মিলিয়াই হইল ভারতের জাতীয় সম্পদ।

জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ

জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যখন তাহার নিজস্ব সম্পদের হিসাব করে তখন সে তাহার ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, গহনা, বই ইত্যাদি ছাড়াও কোম্পানীর শেয়ার, বণ্ড, ডিবেঞ্চার, সরকারী

ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিফিকেট), টাকাকড়ি (নোট ও মুদ্রা), অপরকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদিও তাহার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে। শেয়ার বণ্ড ঋণপত্রকে ব্যক্তি যে তাহার সম্পদ বলিয়া মনে করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই সকল কাগজপত্র বিক্রয় করিয়া সে যে-কোন সময় অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। সম্পদের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই কাগজপত্রের আছে। অর্থাৎ, ইহাদের উপযোগ আছে, ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য ও বিক্রয়যোগ্য এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্য। কিন্তু এই সকল কাগজপত্রের নিজস্ব কোন মূল্য নাই— ইহারা 'প্রকৃত সম্পদে'র মালিকানার নির্দেশক বলিয়াই মানুষ ইহাদের আকাংক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) শেয়ার ক্রয় করে তখন তাহার ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির আংশিক মালিকানা জন্মায়। তাহার শেয়ারপত্র ঐ কোম্পানীর উপর তাহার আংশিক মালিকানা নির্দেশ করে বলিয়াই ব্যক্তির নিকট উহা মূল্যবান। কিন্তু সমাজের নিকট উহার কোন মূল্য নাই; এই শেয়ারপত্রের পিছনে কোম্পানীর যে-সম্পত্তি থাকে তাহাই আসলে সম্পদ। এই কারণে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার বণ্ড প্রভৃতি সম্পদ বলিয়া গণ্য নহে; সম্পদ হইল ঐ প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি মালমসলা ইত্যাদি দ্রব্য।

জাতীয় সম্পদের হিসাব কিভাবে করিতে হইবে

সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার ইত্যাদি সম্পদ নহে

অনুরূপভাবে ব্যক্তির দিক হইতে সরকারী ঋণপত্র সম্পদ বিবেচিত হইলেও সমাজের দিক হইতে উহা সম্পদ নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার কর সংগ্রহের দ্বারা ঋণ পরিশোধ বা ঋণের উপর সুদ প্রদান করে। ইহার অর্থ হইল দেশের একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত করা। আবার এক ব্যক্তি যখন অপর আর এক ব্যক্তিকে ঋণদান করে তখন ঐ ঋণপত্র সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নয়—তবে ঐ ঋণের সাহায্যে প্রকৃত সম্পত্তি সৃষ্ট হইলে ঐ সম্পত্তি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়।

টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও একই রকম যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত টাকাকড়ির মধ্যে নোট ও ধাতব মুদ্রা আছে। এইগুলি যে উপযোগসম্পন্ন, অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য এবং বস্তুগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজস্ব মূল্যের জন্য ইহাদের কেহ চাহে না; চাহে উহাদের দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলিয়া। অতএব টাকাকড়ি সম্পদের প্রতীক মাত্র, সম্পদ নহে। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধাতুটুকু মাত্র সম্পদ, তাহার বেশী নহে। টাকাকড়ি যদি দেশের বা সমাজের সম্পদ হইত তাহা হইলে যে-কোন দেশ মাত্র নোট ছাপাইয়াই সম্পদশালী হইতে পারিত; খাদ্যের উৎপাদন, শিল্পের প্রসার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির কোন প্রয়োজনই হইত না।

সামাজিক দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ নহে

জাতীয় সম্পদের হিসাবের সময় আমাদের আর এক বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে। কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। আমাদের

দেনাপাওনার সূত্রে এক দেশ অন্যান্য দেশের সাহিত সম্পর্কিত। জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় দেশের নিকট বিদেশের পাওনাকে সমগ্র সম্পদ হইতে বাদ দিতে হইবে, আবার বিদেশের নিকট দেশের কোন পাওনা থাকিলে উহাকে দেশের সম্পদের সংগে যোগ করিতে হইবে।

জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় বিদেশের নিকট দেনাপাওনার হিসাব ধরিতে হইবে

আয় (Income): আয়কে সম্পদ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। সম্পদ হইল মানুষের অভাবমোচনের জন্য কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টি বা মানুষের অভাবপূরণের সঞ্চিত উপযোগ; অপরপক্ষে আয় বলিতে বুঝায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পদ ও ব্যক্তি দ্বারা উৎপাদিত উপযোগ বা তৃপ্তিপ্রবাহ। সুতরাং সম্পদ হইল 'উপযোগের তহবিল' (store of utility); আর আয় হইল 'উপযোগের স্রোত' (flow of utility)। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আমরা যে-বাড়ীতে বসবাস করি সেই বাড়ীটি হইল 'সম্পদ', কিন্তু মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর ঐ বাড়ী যে-আশ্রয়দান করে তাহা হইল ঐ বাড়ী হইতে প্রবাহিত 'আয়'। আবার কাহারও মোটরগাড়ি থাকিলে উহা হইল তাহার সম্পদ; কিন্তু ইহার পরিবহণকার্য—অর্থাৎ, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইয়া তাহার স্থানান্তরগমনের যে-প্রয়োজন মিটায় তাহা হইল আয়। কেবলমাত্র সম্পদ হইতেই আয় আসে না। চিকিৎসক শিক্ষক উকিল চিত্র-তারকা প্রভৃতিও আমাদের অভাবপূরণ করেন; সুতরাং ইঁহাদের সেবামূলক কাযকেও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অতএব একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন লোক যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ করিতে সমর্থ তাহাই হইল ঐ ব্যক্তির প্রকৃত আয়। ঐ সময়ের মধ্যে সে যদি তাহার পূর্বেকার সম্পদের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে তবে তাহাও আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। যেমন, সে যদি ঐ সময়ের মধ্যে একখানি নূতন বাড়ী করিয়া থাকে তাহা আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আবার সে যদি ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ব-সম্পদের কোন অংশ ভাঙিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহা আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। যেমন, সে যদি পূর্বেকার কোন বাড়ী বিক্রয় করিয়া বা জমা টাকা ভাঙিয়া খাইয়া থাকে তাহা আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না।

আয় কাহাকে বলে

সম্পদের ভাণ্ডার হইতেই আয়ের স্রোত প্রবাহিত হয়

সেবামূলক কার্যাদি হইতেও আয় সৃষ্ট হয়

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোগ্য উপযোগই আয়

উপরি-উক্ত আলোচনা একটু জটিল মনে হইতে পারে, কারণ সাধারণত অর্থের হিসাবেই আমরা সম্পদ ও আয়কে দেখিয়া থাকি। কাহারও যদি কলিকাতায় একখানা বাড়ী থাকে এবং উহার দাম যদি বিশ হাজার টাকা হয় তাহা হইলে ঐ বিশ হাজার টাকাকে আমরা তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া থাকি। আবার ঐ বাড়ী হইতে যদি সে ৩০০ টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া পায় তবে উহা তাহার বাড়ী হইতে মোট আয় [illegible] ধরি। আবার কোন লোক অফিসে বা কারখানায় কাজ করিয়া যদি মাসে [illegible] টাকা করিয়া পায় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি লোকটির মাসিক

আয় হইল ৩০০ টাকা। এইভাবে টাকার অংকে আয়কে হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় আর্থিক আয় (money income)। কিন্তু টাকার অংকে আয়কে হিসাব করা হইলেও আসলে ঐ টাকার সাহায্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ করিতে পারা যায় তাহাই হইল প্রকৃত আয় (real income)।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়

এই প্রসংগে আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আর্থিক আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে সকল সময় প্রকৃত আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি এবং লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির আর্থিক আয় দ্বিগুণ হইতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দামও চতুর্গুণ হইয়া যাইতে পারে। ফলে ঐ ব্যক্তির আর্থিক আয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রকৃত আয় অর্ধেক হইয়া যাইবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটিবে। সুতরাং প্রকৃত আয় একদিকে যেমন আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে, অপরদিকে তেমনি দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় আমাদের অনেকেরই আর্থিক আয় কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বহুগুণ বর্ধিত হওয়ায় প্রকৃত আয় মোটেই বাড়ে নাই ; বরং কমিয়াছে।

প্রকৃত আয় আর্থিক আয় ও দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভরশীল

আয়কে আবার দুইভাবে দেখা যাইতে পারে—যথা, মোট আয় (gross income) এবং নীট আয় (net income)। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আয়-উপার্জনের জন্য ব্যয় বহন করিতে হয়। এই ব্যয় বাদ না দিয়া যদি আয় হিসাব করা হয় তাহা হইলে উহাকে বলা হয় মোট আয়। আর এই ব্যয় বাদ দিয়া আয় হিসাব করা হইলে তাহাকে নীট আয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া দিয়া বৎসরে মোট ৫০০ টাকা পায় ; কিন্তু তাহাকে বাড়ী মেরামত, মিউনিসিপ্যাল-ট্যাক্স, ভাড়া আদায় প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতে হয়। ইহা ব্যতীত বাড়ী যত পুরাতন হইতে থাকে উহা তত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষয়ও এক-প্রকার ব্যয়। তাই ক্ষয়পূরণের জন্যও বাড়ীর মালিককে বাৎসরিক একটা টাকা বাদ দিয়া রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে এই সকল খাতে উপরি-উক্ত বাড়ীর মালিকের ২৫০ টাকার মত খরচ হয়, তাহা হইলে ঐ মালিকের মোট আয় ৫০০ টাকা হইলেও তাহার নীট আয় হইল ২৫০ টাকা। প্রকৃতপক্ষে 'আয়' বলিতে এই নীট আয়কেই বুঝায়।

মোট আয় ও নীট আয়

জাতীয় আয় (National Income) : জাতীয় আয় নির্ধারণের বেলাতেও ঐ একই পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। উৎপাদনের দিক হইতে দেখিলে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে) দেশে উৎপাদিত সমগ্র দ্রব্য ও সেবার নীট অর্থমূল্য ধরিয়া জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। জাতীয় আয়কে আয়ের দিক হইতেও দেখা যায়। আয়ের দিক হইতে জাতীয় আয় হইল নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফার আকারে দেশের সমুদয় ব্যক্তি যে-আয় করে তাহার সমষ্টি। আবার দেশের সকল ব্যক্তির ব্যয় এবং সঞ্চয় যোগ করিলেও জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া

যায়। (একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল। তাহারা কত সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকানে এবং আমওয়ালার নিকট হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত কত সন্দেশ, কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে কয়টি করিয়া সন্দেশ, আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা কে কয়টি আম, সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয়টি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিয়াছে।) এই তিন প্রকার অনুসন্ধানের ফলই এক হইবে। একটু পরেই আমরা জাতীয় আয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিব।

উৎপাদন (Production): মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে তাহার অভাবমোচনের তাগিদ। প্রকৃতি আমাদের অনেক জিনিস দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাবপূরণ করে। যেমন, প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস আমরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দান সরাসরি আমাদের অভাবমোচন করিতে পারে না। আমাদের অন্নবস্ত্র আসবাবপত্র বাড়ীঘর যানবাহন বইপত্র প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্যের অভাব আছে। প্রকৃতি এইগুলি সরাসরি মানুষের হাতে তুলিয়া দেয় না। এইজন্যই প্রয়োজন হয় উৎপাদনের। মানুষ প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অভাব-আকাংক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপযোগী করিয়া তুলে। যেমন, প্রকৃতি বনজংগলে গাছপালা দিয়াছে।

তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা উপযোগ সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলে

মানুষ নিজে পরিশ্রম করিয়া গাছপালা কাটিয়া কাঠ হইতে আসবাবপত্র তৈয়ারি করে। আবার প্রকৃতি অসংখ্য নদনদী দিয়াছে। মানুষ তাহার পরিশ্রম ও কলাকৌশলের সাহায্যে নদনদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে। প্রকৃতি জমি দিয়াছে। মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় ঐ জমি হইতে খাদ্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎপাদনের অর্থ হইল তৃপ্তিদান-ক্ষমতা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, উপযোগ-সৃষ্টিকেই (the creation of utility) অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলা হয়।

অনেক সময় উৎপাদনকে পদার্থ-সৃষ্টির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ-ধারণা কিন্তু

উৎপাদন বলিতে পদার্থ-সৃষ্টি বুঝায় না

ভুল। মানুষ কোন নূতন পদার্থ সৃজন করিতে পারে না। সে প্রকৃতিদত্ত পদার্থের কাম্যতা সৃষ্টি করিয়া আকাংক্ষা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে। যেমন, গাছ কাটিয়া তাহার কাঠ হইতে মানুষ যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করে তখন সে গাছের ও কাঠের কাম্যতা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতাই বৃদ্ধি করে।

আবার অনেকে আছেন যাঁহাদের মতে, উপযোগ-সৃষ্টি বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ না [illegible] তাহাকে উৎপাদন বলা যায় না। এই মতানুসারে যাহারা খাদ্য বস্ত্র ঘরবাড়ী

প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের শ্রম উৎপাদনশীল; কিন্তু শিক্ষক গায়ক বাদক ডাক্তার উকিল বিচারক অভিনেতা প্রভৃতির কার্য অনুৎপাদনশীল। কারণ, ইঁহাদের শ্রমের ফল কোন বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে না এবং উহা উৎপাদনের সংগে সংগেই ধ্বংস বা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি হারমোনিয়াম তৈয়ারি করে সে যেমন মানুষের আকাংক্ষা মিটায় তেমনি যে-গায়ক ঐ হারমোনিয়ামের সাহায্যে গান করিয়া অর্থোপার্জন করে সে-ও মানুষকে পরিতৃপ্তি দান করে। সুতরাং হারমোনিয়াম-বাদকের শ্রমও উৎপাদনশীল।

উৎপাদনশীল শ্রম ও অনুৎপাদনশীল শ্রম

মোটকথা উপযোগ-সৃষ্টি মাত্রই উৎপাদন—তাহা এই উপযোগ সেবা বা বস্তুগত দ্রব্য যে-কোন আকারেই সৃষ্ট হউক না কেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে—যেমন, রূপগত উপযোগ, স্থানগত উপযোগ, সময়গত উপযোগ ও সেবাগত উপযোগ। ইহার যে-কোনটির সৃজনকেই আমরা উৎপাদন বলিব।

উপযোগ-সৃষ্টি মাত্রই উৎপাদন

ভোগ (Consumption): উৎপাদন বলিতে যেমন উপযোগের সৃষ্টি বুঝায়, তেমনি আকাংক্ষার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করিয়া উপযোগকে নিঃশেষ করাই হইল ভোগ। আমরা যেমন কোন পদার্থ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারি না তেমনি পদার্থকে ধ্বংস করিতে পারি না; যাহা পারি তাহা হইল কোন দ্রব্যকে ব্যবহার করিয়া তাহার অভাবমোচনের ক্ষমতাকে শেষ করিয়া ফেলিতে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। যখন আমরা চেয়ার ক্রয় করি বা তৈয়ারি করাই তখন উহা বসিবার সুবিধার জন্যই করি। তারপর উহাকে ব্যবহার করিতে থাকি। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এক সময়ে ঐ চেয়ার ভাঙিয়া গিয়া কতকগুলি পুরাতন কাষ্ঠ-খণ্ডে পরিণত হয়। তখন আর উহা আমাদের বসিবার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না—অর্থাৎ, উহার উপযোগ ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া যায়। তেমনি আবার জামাকাপড় ব্যবহার করিতে করিতে একসময় উহা অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল জিনিসের উপযোগই ধীরে ধীরে শেষ হয় না। অনেক দ্রব্য আছে যাহার উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হইয়া যায়; উহা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহারযোগ্য থাকে না। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন একটি কমলালেবু খায়, তখন কমলালেবুটির উপযোগ একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সেবামূলক কার্যের উপযোগ উৎপাদনের সংগে সংগেই শেষ হইয়া যায়।

আকাংক্ষা তৃপ্তির জন্য উপযোগের ধ্বংসই ভোগ

মূল্য ও দাম (Value and Price): 'মূল্য' শব্দটি সাধারণত দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কোন কোন সময় জিনিসের 'ব্যবহার-মূল্য' (value-in-use) বুঝাইবার জন্য মূল্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, আমরা বলিয়া থাকি যে জল মানুষের জীবনের পক্ষে অতি মূল্যবান। ইহার অর্থ হইল জলের ব্যবহার-মূল্য বা অভাবপূরণের ক্ষমতা অপরিসীম।

ব্যবহার-মূল্য

দ্বিতীয়ত, মূল্য শব্দটি 'বিনিময়-মূল্য' (value-in-exchange) বুঝাইবার জন্যও ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্য বলিতে এক দ্রব্যের পরিবর্তে যে-পরিমাণ অপর একটি দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। যেমন, এক কুইণ্টাল চাউলের বদলে যদি দুই কুইণ্টাল আটা বিনিময় করা যায়, তাহা হইলে এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য হইল দুই কুইণ্টাল আটা, আর এক কুইণ্টাল আটার মূল্য হইল আধ কুইণ্টাল চাউল। আবার চারিটি কুমড়ার বদলে যদি এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি কুমড়ার মূল্য হইল ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল, আর এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের মূল্য হইল চারিটি কুমড়া। দ্রব্যের সংগে দ্রব্যের বিনিময়-হারকেই বিনিময়-মূল্য বলা হয়। অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থেই ব্যবহার করা হয় এবং 'ব্যবহার-মূল্য' বা পরিতৃপ্তিদানের ক্ষমতা 'উপযোগ' শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিনিময়-মূল্য

কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অধিক হইলেই যে উহার বিনিময়-মূল্য অধিক হইবে এমন কোন কথা নাই। জলের ব্যবহার-মূল্য অত্যধিক হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। বিনিময়-মূল্যের জন্য ব্যবহার-মূল্যের সহিত থাকা চাই অপ্রাচুর্য এবং হস্তান্তরযোগ্যতা।

বিনিময়-মূল্য একমাত্র ব্যবহার-মূল্যের উপর নির্ভর করে না

বিনিময়-মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলা হয়—যেমন, এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা। দামের সহিত মূল্যের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না। মূল্য হইল বিনিময়-হার—যথা, কুমড়া ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময়-হার। পূর্বে চারিটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইত; এখন যদি তিনটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তবে কুমড়ার মূল্য বাড়িল এবং সরিষার তৈলের মূল্য কমিল। কিন্তু কুমড়া ও সরিষার তৈল উভয়েরই দাম একসংগে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দাম কাহাকে বলে

সকল দাম একই সংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য পারে না

সংক্ষিপ্তসার

কোন ভাষা শিক্ষার জন্য যেরূপ বর্ণপরিচয় প্রয়োজন, তেমনি কোন শাস্ত্রচর্চা করিবার জন্যও কতকগুলি মৌলিক ধারণা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহের মধ্যে দ্রব্য (goods), উপযোগ (utility), সম্পদ (wealth), আয় (income), উৎপাদন (production), ভোগ (consumption) এবং মূল্য ও দাম (value and price)—এই কয়টিই প্রধান।

দ্রব্য : যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হয়—যথা, (ক) বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য, (খ) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য, (গ) হস্তান্তরযোগ্য ও অ-হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য, (ঘ) অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য, (ঙ) ভোগ্য ও মূলধন দ্রব্য, (চ) একবার [illegible] দ্রব্য, ইত্যাদি।

উপযোগ : উপযোগ বলিতে বুঝায় মানুষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা ; যাহাই অভাবমোচন করে তাহারই উপযোগ আছে ধরিতে হইবে। উপযোগের সহিত কোন নীতির প্রশ্ন জড়িত নাই। দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক ও মানসিক ধারণা। সুতরাং একই দ্রব্যের উপযোগ সকলের নিকট এক নহে।

উপযোগ মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়—(১) স্বাভাবিক উপযোগ, (২) রূপগত উপযোগ, (৩) স্থানগত উপযোগ, (৪) সময়গত উপযোগ এবং (৫) সেবাগত উপযোগ।

সম্পদ : বস্তুগত অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়। বস্তুগত হওয়া ছাড়া সম্পদের আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য এবং (৩) বিক্রয়যোগ্যতা। বিক্রয়যোগ্য হইবার জন্য দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে।

সম্পদের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়—যথা, (১) ব্যক্তিগত সম্পদ, (২) সমষ্টিগত সম্পদ এবং (৩) জাতীয় সম্পদ।

আয় : আয় বলিতে বুঝায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযোগপ্রবাহ। সম্পদ ও সেবামূলক কার্যাদি হইতে আয় সৃষ্ট হয়। টাকাকড়ির মাধ্যমে যে-আয়ের হিসাব করা হয় তাহাকে 'আর্থিক আয়' বলে। আর্থিক আয়ের বিনিময়ে যে-সকল ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় তাহাকেই প্রকৃত আয় বলা হয়।

আয় 'মোট' ও 'নীট' উভয়ই হয়। ব্যক্তির আয়কে ব্যক্তিগত আয় এবং দেশের ব্যক্তিসমুদয়ের আয়কে জাতীয় আয় বলা হয়। আয় ছাড়াও উৎপাদন এবং ভোগ ও সঞ্চয়—এই দুই দিক হইতে জাতীয় আয়ের হিসাব করা যাইতে পারে।

উৎপাদন : তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা উপযোগ-সৃষ্টিকেই অর্থবিজ্ঞায় উৎপাদন বলে।

ভোগ : অভাবমোচনের জন্য উপযোগের ধ্বংসই হইল ভোগ।

মূল্য ও দাম : মূল্য বলিতে ব্যবহার-মূল্য বা বিনিময়-মূল্য যে-কোনটি বুঝাইতে পারে। অর্থবিজ্ঞায় অবশ্য 'মূল্য' বলিতে বিনিময়-মূল্যই বুঝায় এবং ব্যবহার-মূল্য বুঝাইবার জন্য উপযোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্যকে টাকার অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলে।

মূল্য ও দামের মধ্যে একটি পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define Wealth ? Illustrate your answer.

(C. U. 1943, '46)

কিভাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? উদাহরণের সাহায্যে উত্তর দাও। [১৩-১৬ পৃষ্ঠা]

2. Define Income. Distinguish between (a) Money Income and Real Income ; (S. F. 1959) and (b) Gross Income and Net Income.

আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে (ক) আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয় ; এবং (খ) মোট আয় ও নীট আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবে ? [১৮-১৯ পৃষ্ঠা]

3. Define National Wealth. How would you measure National Wealth ?

জাতীয় সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে জাতীয় সম্পদের পরিমাপ করিবে ? [১৬-১৮ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between (a) Value-in-use and Value-in-exchange ; and (b) Value and Price. (H. S. (H) Comp. 1960)

(ক) ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য, এবং (খ) মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [২১-২২

5. **Define Wealth. Are the following Wealth ?—(a) a ten-rupee note, (b) a School Final Examination Certificate, (c) a motor car, (d) a beggar's bowl, and (e) service of a teacher. Give reasons for your answer.**

সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নিম্নলিখিতগুলি কি সম্পদ?—(ক) একটি দশ-টাকার নোট, (খ) একখানা স্কুল ফাইন্যাল পাসের সার্টিফিকেট, (গ) একখানি মোটরগাড়ি, (ঘ) ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র এবং (ঙ) শিক্ষকের শিক্ষাদানকার্য। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [১৩-১৬ পৃষ্ঠা]

6. **What do you understand by Utility ? Distinguish between different kinds of Utility.**

উপযোগ বলিতে কি বুঝ ? বিভিন্ন প্রকারের উপযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [১১-১৩ পৃষ্ঠা]

7. **Discuss the relation between production and consumption. (S. F. 1961)**

উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সম্বন্ধের পর্যালোচনা কর।

[উত্তরের কাঠামো : উৎপাদন বলিতে উপযোগ সৃষ্টি এবং ভোগ বলিতে অভাবমোচনের জন্য উপযোগের ধ্বংস বুঝায়। ভোগ বা অভাবমোচনের জন্যই উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদনের ফলেই ভোগ সম্ভব হয়। অতএব, উৎপাদন বা ভোগ পরস্পরের সহিত অংগাংগি সম্পর্কে জড়িত।...এবং (২০-২১ পৃষ্ঠা)]

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

ব্যক্তিগত জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রধানত নির্ভর করে ব্যক্তিগত আয়ের উপর। আয় অনুসারেই সে ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। যাহার আয় যথেষ্ট তাহাকে অন্নবস্ত্র-আশ্রয়ের জন্য চিন্তা করিতে হয় না; ইহাদের পূরণ করিয়াও সে আরাম ও বিলাসের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে। আর যাহার আয় সামান্য তাহার পক্ষে কোনমতে খাওয়াপরার ব্যবস্থা করিতেই কষ্ট হয়, আরাম-ভোগ করা ত' দূরের কথা।

জাতীয় আয়ের গুরুত্ব

দেশ বা জাতির জীবন সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করা যায়। যে-কোন দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশকে আমরা যে ধনী বলিয়া থাকি ইহার কারণ হইল ইহাদের জাতীয় আয় অধিক। অপরদিকে ভারতের মত দেশগুলি দরিদ্র দেশ বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ ইহাদের জাতীয় আয় অতি সামান্য। এই কারণেই স্বাধীন ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করিয়া দেশের আয় না বাড়াইতে পারিলে ভারতের দুঃখদৈন্য দূর করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং জাতীয় আয় কাহাকে বলে, জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পদ্ধতি কি, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জাতীয় আয়

ইহা জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দেশক

জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়

নির্ভরশীল, জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে লোকের মাথাপিছু আয় কত?—ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? (What is National Income?): জাতীয় আয় সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদনকার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। জমিতে কৃষিকার্য হইতেছে, কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য তৈয়ারি হইতেছে, খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে, শিক্ষক শিক্ষাদান করিতেছেন, চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন, উকিল-মোক্তার মামলা লড়িতেছেন, পুলিস শান্তিশৃংখলা রক্ষা করিতেছে, ইত্যাদি। এইরূপ বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষের অভাবপূরণের অনেক রকমের উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তুগত সেবা। ইহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়।

বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্য হইতেই আয় হয়

দ্বিতীয়ত, যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় হিসাবে গিয়া পৌঁছায়। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলিকে সাধারণত চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যথা, শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠন। কোন কারখানার কথা ধরিলে দেখা যায় যে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়, কারখানার জন্য জায়গার প্রয়োজন হয়, ব্যয়-বহনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়, এবং পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা বা সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এই কারখানায় উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় হয় তাহার একাংশ শ্রমিকরা পায় মজুরি হিসাবে, একাংশ পায় জায়গার মালিক খাজনা হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন সরবরাহকারীদের নিকট সুদ হিসাবে এবং বাকিটা সংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। এইভাবে কলকারখানা ক্ষেতখামার খনি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিয়া দেশের লোক মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা অর্জন করিতেছে। এইভাবে উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত দেশের সমস্ত লোকের আয়কে যোগ দেওয়া হইলে দেশের সামগ্রিক বা জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে।

আয় চারি প্রকারের ১। মজুরি, ২। খাজনা, ৩। সুদ, ৪। মুনাফা

দেশের সকলের মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা যোগ দিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়

তৃতীয়ত, দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহার একাংশ দেশের লোক ভোগ করে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। যেমন, পিকনিকের ছাত্ররা সন্দেশ, কেক ও আমের কিছুটা খাইতে পারে এবং কিছুটা পকেটে পুরিয়া বাড়ী লইয়া আসিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সহজেই বলা যায় যে, দেশের বা জাতীয় আয়কে

---

* ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে—যথা, (১) জাতীয় উৎপাদন বা দেশের সকলের উৎপন্নের সমষ্টি (National Product) হিসাবে, (২) দেশের সকলের আয়ের সমষ্টি (Incomes Received) হিসাবে, এবং (৩) জাতীয় ব্যয় বা দেশের সকলের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি (National Outlay) হিসাবে। এই তিন দিক দিয়াই জাতীয় আয়ের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে করা হয়।

তিনটি দিক হইতে জাতীয় আয়কে দেখা যাইতে পারে

(১) জাতীয় উৎপাদন : উৎপাদনের উপাদানগুলির—অর্থাৎ, শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠনের সাহায্যে এক বৎসরে দেশে মোট যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপাদন করা হয় তাহাকেই জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের নামান্তর মাত্র। টাকার অংকে ছাড়া এই উৎপাদন হিসাব করা যায় না। এক বৎসরে উৎপন্ন চালডাল, তরিতরকারি, কাপড়চোপড়, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, ডাক্তারের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাকার্য ইত্যাদি দ্রব্যকে সরাসরি যোগ করিয়া বলা যায় না যে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ এত। কিন্তু ইহাদের নীট অর্থমূল্য যোগ করিয়া আমরা সহজেই বলিতে পারি যে কোন বৎসরে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ এত টাকা। অর্থাৎ, মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার অর্থ-মূল্যই জাতীয় উৎপাদন। ইহা আমাদের পূর্ববর্তী উদাহরণের মোট সন্দেশ, কেক ও আমের দামের মত।*

বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্যই জাতীয় উৎপাদন

(২) আয়ের সমষ্টি : জাতীয় উৎপাদন মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফার আকারে শ্রমিক জমির মালিক মূলধন-মালিক ও সংগঠকের মধ্যে বণ্টিত হয়। এক বৎসরে দেশের সকল লোক শ্রমিক মূলধন-মালিক ইত্যাদি হিসাবে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহার **সমষ্টিই** হইল জাতীয় আয়।

উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন লোকের বাৎসরিক আয়ের সমষ্টিই জাতীয় আয়

(৩) জাতীয় ব্যয় : কোন নির্দিষ্ট বৎসরে যে-পরিমাণ আয় হয় তাহা দেশের লোক দুইভাবে ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা আয়ের সম্পূর্ণটা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে, অথবা আয়ের একাংশ দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া অপরাংশ সঞ্চয় বা বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যে দেশের সকলের ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের সহিত তাহাদের সঞ্চয় বা বিনিয়োগকে (investment) যোগ করিলেই জাতীয় ব্যয় পাওয়া যায়। এইভাবে জাতীয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্য দিয়াও জাতীয় আয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

সকল ব্যক্তির ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমষ্টিই জাতীয় ব্যয়

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income) : উপরি-উক্ত তিনটি দিক হইতে জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। এইজন্য জাতীয় আয় গণনা করিবার তিনটি

* ২০ পৃষ্ঠা।

পদ্ধতি সম্পর্কে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা বিদেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বাদ দিয়া এই আলোচনা করিব। কারণ, তাহা না হইলে আলোচনা জটিল হইয়া পড়িবে।

(১) উৎপাদন-পদ্ধতি (The Output Method): উৎপাদন-পদ্ধতিতে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার হিসাব করা হয়। ইহাতে প্রথমে নির্দিষ্ট বৎসরে কোন দেশে কৃষি শিল্প খনি প্রভৃতিতে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদিত হয়, তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টি পরিমাপ করা হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (Gross National Product)।

এই পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য যোগ দেওয়া হয়

এখন উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থমূল্য গণনা করিবার সময় দেখা যায় যে অর্থের বিনিময়ে অনেক দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের কেনাবেচা হয় না। এখন প্রশ্ন হইল যে, ইহাদের জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিনা, যদি করা হয় ইহাদের মূল্য স্থির করার উপায় কি? অনেক সময় দেখা যায় যে, উৎপাদক বিক্রয় না করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য নিজেই ভোগ করে—যেমন, আমাদের দেশে কৃষকেরা ক্ষেতখামারে যে-শস্য উৎপাদন করে তাহার একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেরাই ভোগ করে। এ-ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ যে-সকল দ্রব্য নিজেরা ভোগ করে বাজার-দামের হিসাবে তাহাদের অর্থমূল্য জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আবার অনেকেই নিজের বাড়ীতে বসবাস করে। ইহারা বাড়ীভাড়া না দিলেও বাড়ীর আশ্রয় ভোগ করিতেছে বলিয়া প্রচলিত ভাড়ার হিসাবে তাহাদের বাড়ীর আশ্রয়দানের অর্থমূল্য ঠিক করিতে হইবে এবং উহাকে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরিতে হইবে। সরকারও বিনামূল্যে বহুপ্রকারের সেবামূলক কার্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে—যথা, পথঘাট সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রেও সেবামূলক কার্যাদি সরবরাহ করার জন্য সরকারের যে-ব্যয় হয় তাহা জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরিতে হইবে।

অর্থমূল্য যোগ দেওয়ার সময় যে-সকল দ্রব্য ও সেবা বাজারে বিক্রীত হয় না তাহাদেরও ধরিতে হইবে

ইহা ব্যতীত, আমরা নিজেরাই আমাদের অনেক কাজ করিয়া লই—যেমন, মুচি না ডাকিয়া আমরা নিজের জুতায় নিজেরাই কালি দিতে পারি। আবার মা-বোনেরা আমাদের অনেক সেবাযত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ-সকল কার্যের অর্থমূল্য ঠিক করা কঠিন বলিয়া ইহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

কিন্তু নিজেরা যে-সকল কাজ করিয়া লই তাহাদের বাদ দিতে হইবে

জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের আর একটি স্মরণীয় বিষয় হইল যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার গণনা (double counting) না করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় উৎপাদনের হিসাবের সময় চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের (final products) অর্থমূল্যই ধরা হয়। অর্ধসমাপ্ত বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ দ্রব্যের

জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য বিষয়

মধ্যেই উহা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, কাপড়ের দামের মধ্যেই কাপড় তৈয়ারির সুতার দাম রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাপড়ের দামের সহিত আবার সুতার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া হইলে সুতার দাম দুইবার করিয়া গণনা করা হইবে। আবার একখানি পাঁউরুটির দামের সহিত যদি উহা তৈয়ারি করিবার জন্য যে-ময়দা লাগিয়াছে তাহার দামও পৃথকভাবে ধরা হয় তাহা হইলে ময়দার দাম দুইবার করিয়া ধরা হইবে। কারণ, পাঁউরুটির দামের মধ্যেই ময়দার দাম রহিয়া গিয়াছে। অতএব জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্য পরিমাপ করিবার সময় যাহাতে একই জিনিসের মূল্য একাধিকবার গণনা করা না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। একই দ্রব্য দুইবার গণনা করা চলিবে না

দ্বিতীয়বার গণনার সমস্যা ছাড়াও জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের অন্য একটি প্রশ্ন রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন নির্দিষ্ট বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা-মূলক কার্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্যের সমষ্টি 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP) বলা হয়। কিন্তু উৎপাদনকার্য সম্পাদনের সময় যেমন কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তেমনি আবার কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কোন দর্জির দোকানে জামা তৈয়ারির জন্য যেমন কাপড় ব্যবহার হইতেছে তেমনি ব্যবহারের ফলে সেলাই-কলও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এইভাবে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবস্থা না করা হইলে উৎপাদন একদিন কমিয়া যাইবে।* তাই মূলধন-দ্রব্যকে অটুট রাখিয়াই বৎসরের উৎপন্নের হিসাব করিতে হইবে। এইজন্য দেখা যায়, কারখানার মালিক প্রভৃতি প্রত্যেক বৎসর ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আলাদাভাবে আয়ের একাংশ 'অবপূর্তি তহবিলে' (depreciation fund) জমা রাখে। একটি সেলাই-কলের দাম যদি ২৭০ টাকা হয় এবং কলটি যদি ১০ বৎসর চলে তবে দর্জির দোকানের মালিকের পক্ষে বৎসরে ২৭ টাকা করিয়া জমা রাখা উচিত। নচেৎ ১০ বৎসর পরে তাহাকে সেলাই-কলের অভাবে দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে বৎসরে মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে ঐ সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিয়া জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় 'নীট জাতীয় উৎপাদন' (Net National Product বা সংক্ষেপে NNP)। সংক্ষেপে নীট জাতীয় উৎপাদনকে পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার চিত্রের ন্যায় দেখানো যায়।

২। মোট জাতীয় উৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বাদ দিতে হইবে

জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাব আবার বাজার-দামে (at market prices) অথবা উৎপাদন-উপাদানের দামে (at factor prices) করা যাইতে পারে। যখন বাজার-দামে জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হয় তখন উহার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ কর থাকে—যেমন, চিনির বাজার-দামের মধ্যে উৎপাদন-শুল্কও

* একটি সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। বাড়ীর মালিক যদি ভাড়াটে-বাড়ী একেবারে না সারাইয়া কেবল ভাড়াটাই ভোগ করিতে থাকে, তবে এমন একদিন আসিবে যে ঐ বাড়ী কেহ ভাড়া লইতে চাহিবে না, কারণ উহা বাসোপযোগী থাকিবে না।

মোট জাতীয় উৎপাদন GROSS NATIONAL PRODUCT বা GNP

↓

হইতে মূলধনের অবপূর্তি বা বিনাশ বাদ দিলে পাওয়া যায়

↓

নীট জাতীয় উৎপাদন NET NATIONAL PRODUCT বা NNP

থাকে।* এই অপ্রত্যক্ষ কর সরকারের হাতেই যায়, উৎপাদন-উপাদানের মধ্যে আয় হিসাবে বণ্টিত হয় না। অপ্রত্যক্ষ কর বাদ দিয়া জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় উৎপাদন-উপাদানের দামের হিসাবে জাতীয় উৎপাদন। ধরা যাউক, ১ কিলোগ্রাম চিনির বাজার-দাম ১ টাকা। ইহার মধ্যে ২৫ নয়া পয়সা উৎপাদন-শুল্ক রহিয়াছে যাহা সরকারের প্রাপ্য। সুতরাং মাত্র ৭৫ নয়া পয়সা বা ১২ আনা ইক্ষু-উৎপাদনকারী, চিনির কারখানার শ্রমিক, চিনির কারখানার মালিক প্রভৃতির মধ্যে বণ্টিত হইবে। অতএব, এই ৭৫ নয়া পয়সাই উৎপাদন-উপাদানের দামে উৎপাদন।

জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের হিসাব বাজার-দামে অথবা উৎপাদন উপাদানের দামে করা যাইতে পারে

(২) আয়-পদ্ধতি (The Incomes Received Method): এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বৎসরে দেশের লোকে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহারই সমষ্টি গণনা দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইহাতে উৎপাদনের সকল উপাদানের—অর্থাৎ, শ্রম জমি মূলধন ও সংগঠনের বার্ষিক অর্থ-আয় যোগ দিয়া জাতীয় আয় গণনা করা হয়।

এই পদ্ধতিতে দেশের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণকারী সকলের আয় যোগ দেওয়া হয়

উৎপাদন-উপাদানের আয় বলিতে বুঝায়—(১) মজুরি বেতন ও ভাতা; (২) নীট খাজনা; (৩) নীট সুদ; এবং (৪) নীট মুনাফা। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাফার কোন অংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া জমা রাখা হইলে, উহাকেও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের যে-মুনাফা

কোন্ কোন্ আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে

* উৎপাদনের উপর করকে উৎপাদন-শুল্ক বা অন্তঃশুল্ক (Excise Duties) বলা হয় (ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ১০ম অধ্যায় দেখ।)।

অথবা রাষ্ট্রাধীন সম্পত্তি হইতে যে-আয় হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালিক নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করিলে উহার যে-ভাড়া হইতে পারে তাহাও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। উৎপাদক তাহার উৎপন্নের একাংশ নিজে ভোগ করিলে উহার অর্থমূল্য জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিজ উৎপন্নের একটা মোটা অংশ কৃষকেরা সরাসরি নিজেরাই ভোগ করে। অতএব ইহাকে বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সরকারী কর্মচারীদের বেতন জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয়। কারণ, ইহারা উৎপাদনশীল কার্য সম্পাদন করিয়াই অর্থোপার্জন করে।

কোন্ কোন্ আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না

যাহার সহিত উৎপাদন-কার্যের সম্পর্ক নাই সে-আয়কে ধরা হইবে না

অপরদিকে অর্থ-আয়ের হিসাব করিবার সময় কতকগুলি আয়কে ধরা হয় না। হস্তান্তর-পাওনাকে (transfer payments) জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ধরা যাউক, কোন ব্যক্তি বৎসরে ২০০০ টাকা করিয়া উপার্জন করে এবং ঐ অর্থ হইতে বার্ষিক ১০০ টাকা এক আত্মীয়কে সাহায্য করে। এ-ক্ষেত্রে আত্মীয়ের সাহায্য-স্বরূপ প্রাপ্তি ১০০ টাকাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। কারণ, উহা কোন উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত হয় নাই, মাত্র একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে সরকার আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের যে-অর্থসাহায্য করে তাহাকেও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। কারণ, উদ্বাস্তুরা উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিয়া ঐ অর্থ-আয় করে না। পূর্বেকার কোন সম্পত্তি—যেমন, পূর্বেকার কোন বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর হয় মাত্র, জাতীয় উৎপাদন উহার দ্বারা বৃদ্ধি পায় না। জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে কোন অর্থ উপার্জিত হইলে তাহাকেও জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারকে ঋণ করিতে হয় এবং ঐ ঋণ বাবদ ঋণদাতাদের সুদ দিতে হয়। এই সুদকেও জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরা হয় না। কারণ, কোন উৎপাদনশীল কার্যের ফলে উহা উৎপন্ন হয় না; সরকার মাত্র কর ধার্য করিয়া এক দল লোকের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া ঋণদাতাদের প্রদান করে। মোটকথা, উৎপাদনকার্য সম্পাদন না করিয়া কোন অর্থ-আয় করা হইলে তাহাকে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে না।

(৩) ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি (The Consumption and Savings Method): প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় সৃষ্টি হয় তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয় এবং অংশত সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় হইতেই মূলধন সংগঠিত হইয়া থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তির ৬০০০ টাকা আয় হইলে সে ৪০০০ টাকা চালডাল, তরিতরকারি, জামাকাপড়, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতে এবং বাকী ২০০০ টাকা জমাইতে পারে। এই জমা টাকা সে সরকারকে

নির্দিষ্ট সুদে ঋণ দিতে পারে। সরকার আবার এই ঋণের টাকা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যে নিয়োগ করিতে পারে। এইভাবে দেশের সর্বক্ষেত্রে যে বার্ষিক আয় হয় তাহার একাংশ ভোগ এবং একাংশ সঞ্চয়কার্যে নিয়োগ করা হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্য ক্রয় করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে তাহাদের যোগ দিলেই জাতীয় ব্যয়ের (National Outlay) হিসাব পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাকে ব্যয়-পদ্ধতিও (Outlay Method) বলা যাইতে পারে।

বৎসরে মোট ব্যয়িত ও সঞ্চিত অর্থ ই জাতীয় ব্যয়

এখন আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জাতীয় আয়কে যে-পদ্ধতিতেই পরিমাপ করা যাউক না কেন ফল আমরা একই পাইব—কারণ, একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা হইবে। বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই ঠিক করিয়া দেয় দেশের ব্যক্তিসমুদয় কতটা ভোগ ও সঞ্চয় করিতে পারিবে। যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্য—শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের মধ্যে মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে বন্টিত হইয়া যায়। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান। আবার দেশের ব্যক্তিসমুদয় যাহা মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে আয় করে তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় এবং অংশত সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান। দেশের উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝাইবার জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল :

উৎপাদন, আয় বা ব্যয়—যেদিক হইতেই জাতীয় আয়কে দেখা হউক না কেন, ফল একই পাওয়া যাইবে
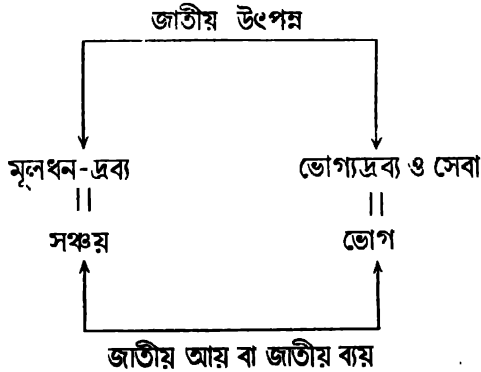
উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় উৎপাদন বা উৎপন্ন দুইভাগে বিভক্ত—(ক) মূলধন-দ্রব্য, (খ) ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা। মূলধন-দ্রব্য সঞ্চিত হয় এবং ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়। অপরদিকে জাতীয় আয়ের একাংশ সঞ্চয় ও একাংশ ভোগ করা হয়। এই সঞ্চয় ও ভোগ উভয়ে মিলিয়াই হইল জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় যে পরস্পরের সমান তাহা বুঝাইবার জন্য আরও একটি সহজ উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।* ধরা যাউক, একটি নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচজন মাত্র লোক বাস করে এবং উহারা কেবলমাত্র ধান্য উৎপাদন করে। এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বীপের সমস্ত জমি ক-এর দখলে এবং একমাত্র খ-এরই গরু-লাঙল (মূলধন-দ্রব্য) আছে। কিন্তু খ নিজে চাষ করে না; গ ক-এর নিকট হইতে জমি এবং খ-এর নিকট হইতে গরু-লাঙল ভাড়া লইয়া সমস্ত জমিই চাষ করে। ঘ এবং ঙ দিন-মজুর হিসাবে গ-এর কাছে কাজ করে। ঐ দ্বীপে টাকাকড়িরও প্রচলন আছে।

একটি সহজ উদাহরণ

এখন দ্বীপের সমস্ত জমি হইতে যদি ১০০ কুইণ্টাল ধান্য উৎপন্ন হয় এবং প্রতি কুইণ্টাল ধান্যের দাম যদি ৬ টাকা হয় তবে ঐ দ্বীপের 'মোট' (gross) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৬০০ টাকা। ইহা হইতে বীজধানের জন্য এবং ভবিষ্যতে নূতন গরু-লাঙল কিনিবার জন্য ১০০ টাকা বাদ দিয়া রাখা হইলে 'নীট' (net) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৫০০ টাকা।

এই ৫০০ টাকাই ক খ গ ঘ ঙ-র মধ্যে জমির মালিকানা, মূলধন-সরবরাহ, সংগঠন এবং শ্রমের জন্য বণ্টিত হইবে। অর্থাৎ, এই টাকা দ্বীপবাসী পাঁচজন খাজনা, সুদ, মুনাফা ও মজুরি হিসাবে পাইবে। সুতরাং ৫০০ টাকা হইল ঐ দ্বীপের জাতীয় আয় (National Income)।

আবার ক খ গ ঘ ঙ এই ৫০০ টাকার একাংশ ব্যয় ও একাংশ সঞ্চয় করিবে।** সুতরাং ৫০০ টাকাই হইবে ঐ দ্বীপের জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় (International Trade and National Income): আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা লেনদেনের কথা বাদ দিয়া জাতীয় আয়ের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অল্পবিস্তর প্রত্যেক দেশই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাউক। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মানী, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া থাকি। জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় এই বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা ধরিতে হইবে। আমরা বিদেশের নিকট যে দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকি তাহার জন্য অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আমাদের পাওনা হয়; অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আমরা যে দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি ক্রয় করিয়া থাকি তাহার দরুন আমাদের নিকট বিদেশের পাওনা হয়। যখন বিদেশের নিকট

বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওনা দেখিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে

---

* প্রথম উদাহরণের জন্য ২০ পৃষ্ঠা দেখ।

** এই সঞ্চয় হইল নীট সঞ্চয় (net saving)। অর্থাৎ, গরু লাঙল ইত্যাদি মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি [illegible] টাকা রাখা হইয়াছে তাহার উপর যে অতিরিক্ত সঞ্চয় হইয়াছে তাহা।

আমাদের প্রাপ্যের তুলনায় আমাদের নিকট বিদেশের প্রাপ্য অধিক হয় তখন আমাদের জাতীয় আয় হইতে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে বাদ দিতে হইবে। আবার বিদেশের প্রাপ্যের তুলনায় আমাদের প্রাপ্য অধিক হইলে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে আমাদের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

আর্থিক এবং প্রকৃত জাতীয় আয় (Money and Real National Income): অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। ইহাতে কোন বৎসরে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় বাড়িল না কমিল তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ অর্থের নিজস্ব মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ধরা যাউক, কোন বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হইল, কিন্তু দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ সমান রহিল। এ-ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্য যোগ করিলে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু টাকার অংকে বাড়িলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় বা উৎপাদন বাড়ে নাই এবং দেশের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। আমরা যদি অনুমান করিয়া লই যে প্রথম বৎসরে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ছিল ১০ কোটি টাকা, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সমান থাকিলেও টাকার অংকে জাতীয় আয় ২০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। কিন্তু কার্যত দুই বৎসরে দেশের প্রকৃত আয়—অর্থাৎ, উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ সমানই রহিয়াছে। আবার উৎপন্ন দ্রব্য দুই বৎসরে সমান থাকিয়া দ্বিতীয় বৎসরে জিনিসপত্রের দাম যদি অর্ধেক হইয়া যায় তাহা হইলে টাকার অংকে প্রথম বৎসরের জাতীয় আয় ১০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় আমরা যদি দেশের উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা জানিতে চাই—অর্থাৎ, প্রকৃত জাতীয় আয়ের (Real National Income) হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে কিনা তাহার সন্ধান করিতে চাই, তাহা হইলে অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হিসাব করিয়া জাতীয় আয়ের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। যেমন, এক বৎসরের তুলনায় অন্য বৎসরে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে অর্ধেক করিয়া লইতে হইবে; আবার জিনিসপত্রের দাম কমিয়া অর্ধেক হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বাড়াইয়া দ্বিগুণ করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে সংশোধিত জাতীয় আয়ই দেশের প্রকৃত আয়; এবং ইহা হইতেই দেশের উন্নতি-অবনতির ইংগিত পাওয়া যায়।

অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের হিসাবে দেশের উন্নতি-অবনতি বুঝা যায় না

ইহার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত বা আসল জাতীয় আয়ের হিসাবের

টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হইলে সংশোধন করিয়া আসল জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে

জাতীয় আয়ের বণ্টন (Distribution of National Income): কোন দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ কি তাহা জানাই যথেষ্ট নয়; জাতীয় আয়ের

বণ্টন কিভাবে হয় এবং উহার প্রকৃতি কি তাহাও জানা প্রয়োজন। ইহা না জানিলে দেশের অর্থ নৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ও কল্যাণের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে কোন দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে প্রধানত জাতীয় আয়ের পরিমাণের উপর। সুতরাং প্রথম সমস্যা হইল জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যায় কি করিয়া? কিন্তু জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার উপরও দেশের সামগ্রিক কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে। এমনও হইতে পারে যে দেশের জাতীয় আয়ের বেশী অংশই মাত্র কয়েকজন লোক ভোগ করে আর সামান্য অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে সকলের অবস্থার একই প্রকার উন্নতি হয় না। সুতরাং জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত সমস্যা অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা।

জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহা জানা প্রয়োজন

জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত সমস্যাকে দুইটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তিগত আয় হিসাবে দেশের লোকের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এইরূপ আলোচনার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিসমুদয়ের মধ্যে আয়ের তারতম্য কতটা এবং উহার কারণ কি, তাহা দেখা। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণকারী শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠন এই উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথম ধরনের বণ্টনকে বলা হয় ব্যক্তিগত বণ্টন (personal distribution), এবং দ্বিতীয় প্রকারের বণ্টনকে বলা হয় কর্মগত বণ্টন (functional distribution)। কর্মগত বণ্টনের কতকটা ইংগিত ইতিপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। উৎপাদনের ফলেই জাতীয় আয় সৃষ্ট হয়। সুতরাং যাহারা কোন-না-কোন ভাবে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করে তাহাদের মধ্যে মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে সমস্ত জাতীয় আয় ভাগাভাগি হইয়া যায়। কোন্ নিয়ম অনুসারে এই ভাগাভাগি হয় তাহা আমরা পরে মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা আলোচনার সময় দেখিব। এখন ব্যক্তিগত বণ্টনের কিছুটা আলোচনা করা যাউক।

জাতীয় আয় বণ্টনের সমস্যার দুইটি দিক :

১। ব্যক্তিগত বণ্টন এবং ২। কর্মগত বণ্টন

ব্যক্তিগত দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের আয় কত, বিভিন্ন লোকের মধ্যে আয়ের পার্থক্য হয় কেন ইত্যাদি প্রশ্ন ব্যক্তিগত বণ্টনের আলোচনায় আসে। কিন্তু দেশের প্রত্যেক লোকের আয়ের হিসাব করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার বলিলেও চলে। আমাদের দেশে ৪৫·৫ কোটির উপর লোক বাস করে।* ইহাদের প্রত্যেকের আয়ের হিসাব করা অসম্ভব। তবে দেশের লোকের আয়ের মধ্যে তারতম্য আছে কি না, উহার কারণ কি এবং আয়-বৈষম্য অধিক হইলে উহাকে দূর করিবার পন্থা কি?—এই সকল প্রশ্নের সাধারণ আলোচনা করা যায়।

ব্যক্তিগত বণ্টন

* [illegible]১ সালের জনগণনার হিসাবের ভিত্তিতে ১৯৬৩ সালে আনুমানিক জনসংখ্যা।

বিভিন্ন লোকের মধ্যে যে আয়ের বেশ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা আমাদের দেশের দিকে তাকাইলে বুঝা যায়। একদিকে আছে অসংখ্য সাধারণ লোক যাহাদের আয় এত সামান্য যে তাহাদের পক্ষে দুই বেলা অন্ন জুটানোই কঠিন; অপরদিকে আছে কিছুসংখ্যক লক্ষপতি ও কোটিপতি যাহারা গাড়ির পর গাড়ি কিনিতেছে, বাড়ীর পর বাড়ী নির্মাণ করিতেছে। সহরের লোকের তুলনায় গ্রামের লোকের আয় অত্যন্ত কম, অথচ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮২ ভাগের উপর লোক গ্রামাঞ্চলেই বাস করে। আবার সহরবাসীদের নিজেদের মধ্যেও আয়ের ব্যবধান বিরাট। এ-সম্পর্কে যে-সকল তথ্য ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই প্রকট আয়-বৈষম্যেরই পরিচয় প্রদান করে। রিজার্ভ ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক হিসাব অনুসারে নগরাঞ্চলে শতকরা ৮৯টি পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ১২০০ টাকার মত এবং শতকরা ১১টি পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৬০০০ টাকার কাছাকাছি। গ্রামাঞ্চলেও যে অনুরূপ বৈষম্য রহিয়াছে রিজার্ভ ব্যাংকের উক্ত হিসাবে তাহাও দেখানো হইয়াছে।*

ভারতের জাতীয় আয়ের ব্যক্তিগত বণ্টন

প্রশ্ন হইল যে জাতীয় আয়ের ব্যক্তিগত বণ্টনের এইরূপ বৈষম্য দেখা যায় কেন? উত্তরে দুইটি প্রধান কারণের নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমত, মানুষে মানুষে যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পার্থক্য রহিয়াছে। যাহাদের সামর্থ্য বা যোগ্যতা অধিক তাহাদের উৎপাদনও বেশী; সুতরাং আয়ও অধিক। অবশ্য মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থ্য নির্ভর করে বংশগত গুণাবলী ব্যতীত পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগসুবিধার অভাবে অনেকেই তাহাদের শক্তিসামর্থ্যকে বিকশিত করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উত্তরাধিকার ও একচেটিয়া সুযোগসুবিধা প্রভৃতি সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ফলে মানুষে মানুষে আয়ের ব্যবধান ঘটে। কেহ হয়ত' বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কেহ হয়ত' কলকারখানার মালিক, কাহারও হয়ত' কলিকাতার মত সহরে দশ-বিশখানা বড় বড় বাড়ী রহিয়াছে। স্বভাবতই এই সকল লোকের আয় অন্যান্য লোকের আয় হইতে অধিক হয়। কারণ, সাধারণ লোকের এই ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিতে বিশেষ কিছুই থাকে না।

ব্যক্তিগত বণ্টনের বৈষম্যের কারণ:

১। মানুষে মানুষে যোগ্যতার পার্থক্য

২। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য—অর্থাৎ, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কারণ, মানুষ দেখিয়াছে যে বৈষম্য সমাজের অকল্যাণই টানিয়া আনে। সমাজজীবন সকলেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মাত্র ধনীর উপভোগের জন্য নহে। কিন্তু সমাজে বৈষম্য বর্তমান থাকিলে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ ঘটে না। দেখা যায়, দরিদ্র পিতা যখন মেধাবী পুত্রকে বিদ্যালয়েই

* এ-সম্বন্ধে আরও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছুদিন পূর্বে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের নেতৃত্বে একটি কমিটি (Committee on the Distribution of National Income) নিযুক্ত করা হইয়াছে। মুদ্রণের সময় (অক্টোবর, ১৯৬২) পর্যন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই।

পাঠাইতে পারিতেছেন না তখন ধনীর মেধাহীন পুত্রের শিক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন হইতেছে। পরবর্তী জীবনে হয়ত' ধনীর ঐ মেধাহীন পুত্রই সমাজের মাথা হইয়া বসিবে এবং দরিদ্রের মেধাবী পুত্রকে কোনমতে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং বৈষম্যের ফলে মানবশক্তির অপচয় ঘটে এবং সমাজজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা ব্যতীত আর্থিক বৈষম্যের জন্য হিংসা-দ্বেষ, বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতি সর্বদাই সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকে। ধনিক সম্প্রদায় আর্থিক ক্ষমতার জোরে আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া, শাসকবর্গের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাকে নিজ প্রয়োজনে নিয়োজিত করিবার সুযোগ পায়। যে-আইনে তাহাদের অসুবিধা অথচ দরিদ্রের সুবিধা হয় সেরূপ আইন পাস হইতে দেয় না; পাস হইলেও তাহা ঠিকমত কার্যকর হইবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। আইনকানুন এবং বিচারের ক্ষেত্রেও তাহাদের সুবিধা হয়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ বাধিলে দরিদ্রের পক্ষে মামলার ব্যয় চালাইয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে, রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের মত দরিদ্রকে ধনীর বাগানের জন্য ভিটামাটি ছাড়িতে হয়। পরিশেষে বলা হয় যে, ধনীর আয় কমাইয়া দরিদ্রের আয় বাড়ানো সম্ভব হইলে সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে ছাড়া কমিবে না। কারণ, ধনীর আয় কমিলে বিলাসব্যসনের ব্যয় কমিতে পারে, কিন্তু দরিদ্রের আয় বাড়িলে অন্নবস্ত্র প্রভৃতি জীবনের অপরিহার্য দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পাইবে।

বৈষম্যের কুফল

তাই বর্তমানে সকল দেশেই আয়গত বৈষম্যকে হ্রাস করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য আয় বণ্টনে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা। ইহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন, কতকগুলিকে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, জমিদারির বিলোপসাধন, সমবায় ও সমাজসেবার প্রসার, ধনীদের উপর সম্পদকর (wealth tax), ব্যয়কর (*expenditure tax*), দানকর (gift tax) প্রভৃতির ন্যায় নূতন নূতন করধার্য ও করহার বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। তবুও বৈষম্য মোটেই হ্রাস পায় নাই। বরং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময়ে বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই রিজার্ভ ব্যাংক অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

কুফলের জন্য আয়গত বৈষম্যকে হ্রাসের প্রচেষ্টা: ভারতের উদাহরণ

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income): জাতীয় আয়ের বণ্টনজনিত বৈষম্য দূর করিলেই দেশের লোকের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। আমাদের দেখিতে হইবে, জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত এবং জনসংখ্যার মধ্যে এই আয় সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে কত পড়ে। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট বৎসরের জাতীয় আয়কে একেবারে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু যতটা করিয়া পড়ে তাহাকেই ঐ বৎসরের মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per Capita National Income) বলা হয়। এই মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়ের হিসাব

মাথাপিছু আয় কাহাকে বলে ও ইহার গুরুত্ব

হইতেই ইংগিত পাওয়া যায় দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা কিরূপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইতেছে কিনা এবং কতটা হইতেছে, বিভিন্ন বৎসরের মাথাপিছু আয় তুলনা করিয়া তাহাও কতকটা বুঝা যায়। আবার এক দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনাও এই মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে করা হয়।

এই সকল ব্যাপারে মাত্র দেশের জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণের দিকে লক্ষ্য দিলে ভুল হইবে। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের জাতীয় আয় ছিল ১২৬৯০ কোটি টাকা। টাকাটা বিশেষ অল্প নয়; কিন্তু দেশের লোকসংখ্যাও ছিল ৪৩ কোটির উপর। সুতরাং মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ২৯২ টাকার কিছু উপর—অর্থাৎ, মাসিক আয় ২৪ টাকা ৩৩ নয়া পয়সার মত।* আজকালকার দিনে মাসিক এই ২৪·৩৩ টাকাতে যে কোনমতে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা যায় না, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ধরা যাউক কোন দেশের জাতীয় আয় বাড়িয়া দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইল। ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও বাড়িয়া দ্বিগুণে দাঁড়াইল। এইরূপ অবস্থায় লোকের অর্থ নৈতিক অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে, কারণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় সমানই রহিয়া গিয়াছে।

মাথাপিছু আয় হইতেই দেশের অবস্থার ইংগিত পাওয়া যায়

আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৩০ ভাগ কিন্তু জনসংখ্যা ৩৬ কোটি হইতে ৪৩·৫ কোটির উপর পৌছানোর জন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল উহার অর্ধেক বা শতকরা ১৫ ভাগ।** আবার এক দেশের তুলনায় অন্য আর এক দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ হয়ত' দ্বিগুণ। ইহা হইতে মনে হইতে পারে, দ্বিতীয় দেশটির লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় দেশের জনসংখ্যা যদি প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে উভয় দেশের মাথাপিছু আয় সমান হইবে। সুতরাং মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়ের হিসাবই অর্থনৈতিক অবস্থার ইংগিত দিয়া থাকে।

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ টাকাকড়ির অংকে করা হয়। কিন্তু টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি অনবরত পরিবর্তিত হয়—যেমন, যুদ্ধের পূর্বে আমাদের দেশে এক টাকায় যাহা পাওয়া যাইত তাহা এখন

প্রকৃত মাথাপিছু আয়—ইহাই দেশের অবস্থার নির্দেশ করে

আর পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন বৎসরে টাকাকড়ির অংকে মাথাপিছু আয় অধিক হইলেই প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন বৎসরের তুলনায় অন্য আর এক বৎসরে টাকাকড়ির অংকে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইতে পারে; কিন্তু ইতিমধ্যে যদি জিনিসপত্রের দামও দ্বিগুণ হইয়া থাকে তবে জনসংখ্যার প্রকৃত মাথাপিছু আয় মোটেই বাড়িবে না। আমাদের কাছে এই প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় আয়ের

* ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব করা হইলে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩২৭ টাকা এবং মাসিক আয় ২৭·২৫ টাকা দাঁড়ায়।

** ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব। ৩৯ পৃষ্ঠার ছকটি দেখ।

(Real Per Capita National Income) হিসাবই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য এক বৎসরের তুলনায় অন্য বৎসরে জিনিসপত্রের দাম কতটা বাড়িয়াছে তাহার হিসাব করিয়া প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়িল কি কমিল তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। এই কারণে কোন বিশেষ বৎসরের দামের ভিত্তিতেই পরবর্তী বৎসরসমূহের জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতেই জাতীয় আয়ের গণনা করা হয়; কোন কোন সময় অবশ্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সুরুর ঠিক পূর্বে (১৯৫০-৫১ সাল) অথবা অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দশম বৎসরে (১৯৬০-৬১ সাল) যে দাম ছিল তাহার ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে সাধারণ রীতিকে অনুসরণ করিয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতেই জাতীয় আয়ের হিসাব দেখানো হইয়াছে।

মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় সম্পর্কে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা মোটামুটি-ভাবে দেশের অবস্থার ইংগিত দিলেও জনসাধারণের অবস্থার সঠিক খবর দেয় না, কারণ মোট জাতীয় আয়কে সমানভাবে ভাগ করিয়াই মাথাপিছু আয়ের হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, জাতীয় আয় সমানভাবে বণ্টিত হইলে জনসংখ্যার প্রত্যেকে বৎসরে যাহা পাইত তাহাই মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়। কিন্তু দেশে আয়গত বৈষম্য রহিয়াছে এবং বেশীর ভাগ লোকের আয় মাথাপিছু আয় হইতে অনেক কম হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মাথাপিছু আয় ২৯২ টাকা। ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকে বৎসরে ২৯২ টাকা করিয়া পায়। অনেকের আয় ইহা অপেক্ষা অনেক কম। বৎসরে ৫০ টাকা করিয়াও আয় করিতে পারে না এরূপ লোকও সংখ্যায় অল্প নহে।

কিন্তু ইহা জন-সাধারণের অবস্থার নির্দেশ করে না

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India) : ভারতের জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় ছকটি দেওয়া হইল।

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের জাতীয় আয় প্রধানত চারিটি সূত্র হইতে অর্জিত হয়—যথা, (১) কৃষি ও অনুরূপ কার্য, (২) খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, (৩) ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ, এবং (৪) অন্যান্য সেবামূলক কার্য। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয় ধনাত্মক (positive) নহে, ঋণাত্মক (negative)। সুতরাং ইহাকে জাতীয় আয়ের অন্যতম সূত্র বলিয়া গণ্য করা চলে না। এখন সূত্রগুলির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ভারতের জাতীয় আয়ের চারিটি প্রধান সূত্র :

কৃষি ও অনুরূপ কার্য বলিতে বুঝায় কৃষিকার্য, পশুপালন, মৎস্যের চাষ, অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি। এগুলিই সামগ্রিকভাবে ভারতের জাতীয় আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র। মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এই সূত্র হইতেই অর্জিত হয়। ভারত যে কৃষি-[illegible] দেশ ইহা তাহারই পরিচায়ক।

১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য—ইহাই [illegible]

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৬১) ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

(হিসাব কোটি টাকায়—১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল (ভিত্তি বৎসর)	১৯৬০-৬১ সাল*	শতকরা বৃদ্ধি
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৪৩৪০	৫৮৬০	
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৪৮০	২১১০	
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৬৬০	২৪৫০	
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৩৯০	২৩১০	
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	—২০	—৪০	
মোট	৮৮৫০	১২৬৯০	৩০.২৬
মাথাপিছু আয় (টাকা)	২৪৭.৫	২৯২.৫	১৫.৩৮

২। খনিজ ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন

জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় প্রধান সূত্র হইল খনিজ দ্রব্য উৎপাদন এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প। এই সূত্র হইতে মোট শতকরা ১৮-১৯ ভাগের মত জাতীয় আয় অর্জিত হয়। ভারত যে শিল্পে অনুন্নত দেশ তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়। তবে শিল্পপ্রসারের ফলে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ

জাতীয় আয়ের তৃতীয় সূত্র হইল ব্যবসাবাণিজ্য (Commerce), পরিবহণ ও সংসরণ (Transport and Communications)। ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ আরও কম—মোট শতকরা ১৬-১৭ ভাগের মত।

৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য

অন্যান্য সেবামূলক কার্য বলিতে বুঝায় ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা এবং সকল প্রকারের চাকরি ইত্যাদি। এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ ঐ তৃতীয় সূত্রেরই মত শতকরা ১৬-১৭ ভাগ।

পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটিতে ভারতের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন সূত্রের অংশ একসংগে দেখানো হইল।

ভারতের জাতীয় আয় হইতে কি জানা যায় :
১। দেশে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে
২। তবুও কৃষির প্রাধান্য রহিয়াছে

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, মোট জাতীয় আয় কৃষি ও অনুরূপ কার্যের অংশ হ্রাস পাইয়া খনি ও শিল্পের অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে যে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে ইহা তাহাই নির্দেশ করে। তবুও মোট জাতীয় আয় অর্জনে কৃষি ও অনুরূপ কার্যেরই প্রাধান্য রহিয়াছে, এবং শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতির অংশ অতি সামান্য। ইহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানেরই লক্ষণ।

* ১৯৬০-৬১ সালের হিসাব প্রাথমিক হিসাব (preliminary estimates)।

নিম্নে মোট জাতীয় আয়ে বিভিন্ন সূত্রের অংশ (শতকরা ভাগ) একসংগে দেখানো হইল :

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৫১.৩	৪৮.৩
২। খনি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৬.০	১৮.৬
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৭.৭	১৬.৫
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৫.০	১৬.৬
	১০০.০	১০০.০
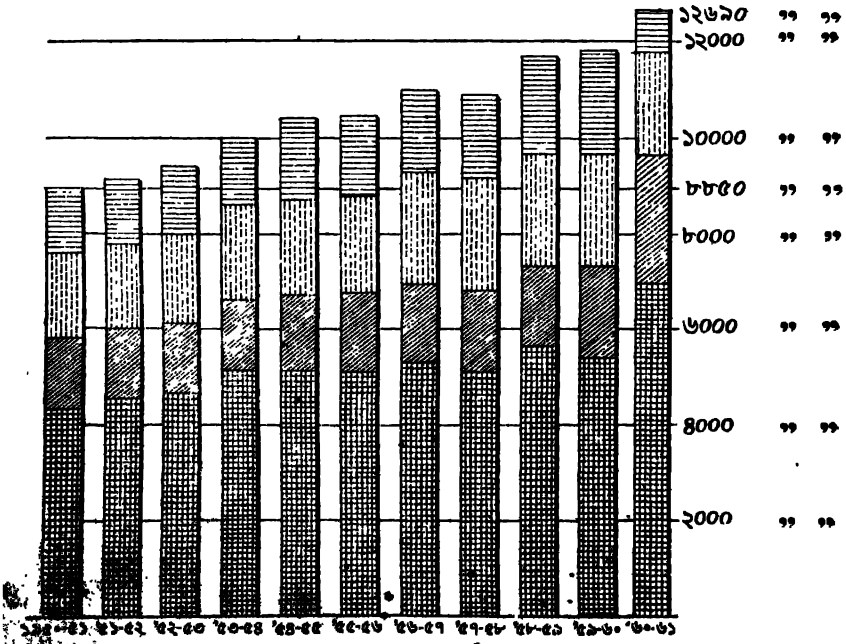
৩। ভারতে জীবনযাত্রার স্তর অতি নিম্ন
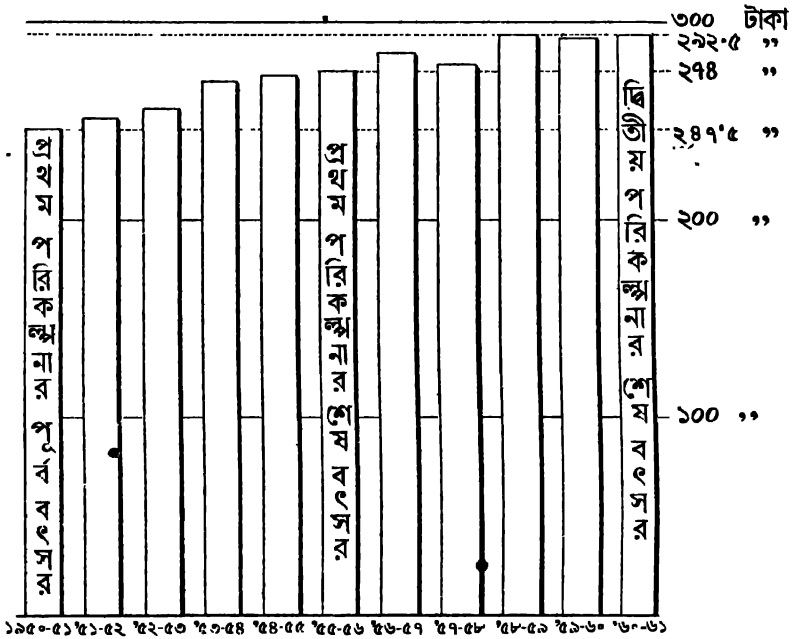
ভারতে জীবনযাত্রার মান বা স্তর যে বিশেষ নিম্ন এবং উহার উন্নয়নের গতি যে অতি মন্থর তাহা মাথাপিছু আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় ছিল মাত্র ২৯২ টাকা। তুলনায় ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৯৮০০ টাকা ও ৪৩০০ টাকার মত। উপরন্তু, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময় হইতে জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মাথাপিছু আয়ের সম্প্রসারণ ততটা দ্রুত হারে হইতেছে না। প্রথম ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল শতকরা ৩০ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ। অতএব, মাথাপিছু আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি

৪। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি জাতীয় আয়বৃদ্ধি অপেক্ষা কম

দৃষ্টি দিতে হইবে—(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে আরও বাড়াইতে হইবে, এবং

৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অতি প্রয়োজনীয়

(২) সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বর্ধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যাকে খাওয়াইতে পরাইতেই ব্যয় হইয়া যাইবে; লোকের জীবনযাত্রার মানে কোন উন্নতি দেখা দিবে না।

এখন জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

জীবনযাত্রার মান (Standard of Living): জাতীয় আয়ের আলোচনা প্রসংগে লোকের জীবনযাত্রার মানের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া

জীবনযাত্রার মান মোট জাতীয় আয় ও উহার বণ্টনের উপর নির্ভর করে

পড়ে। মানুষ উৎপাদন করে অভাবমোচন বা আকাংক্ষাপূরণের জন্য। কিন্তু কতটা আকাংক্ষাপূরণ করা সম্ভব তাহা বলিয়া দেয় জাতীয় আয়। বার্ষিক উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতেই দেশের লোকের জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ আসে। অতএব, লোকের জীবনযাত্রার মান জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন-ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে।

এখন প্রশ্ন, জীবনযাত্রার মান বলিতে সঠিক কি বুঝায়? সংক্ষেপে 'জীবনযাত্রার মান' বলিতে আমাদের ভোগের লক্ষ্যকে বুঝায়। আমরা সকলেই উপভোগের উৎকৃষ্টতর উপকরণ অধিক পরিমাণে চাহিয়া থাকি। ভাল ঘরবাড়ী, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, পুত্রকন্যার শিক্ষার সুব্যবস্থা, অধিকতর আমোদপ্রমোদ প্রভৃতির আকাংক্ষা করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে সকল সময় সকল জিনিস আমরা পাই না। কিন্তু যেগুলিকে না পাইলে মনে বেদনা অনুভব করি, যেগুলির ভোগ আমাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি এবং যাহাদের আকাংক্ষা করি সামগ্রিকভাবে সেগুলিকেই অর্থবিদ্যায়

'জীবনযাত্রার মান' বলিতে কি বুঝায়

'জীবনযাত্রার মান' (standard of living) বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন সমাজের লোকে যে-সকল ধরনের দ্রব্যাদির ভোগ কাম্য বলিয়া মনে করে সেই সকল দ্রব্যকেই বুঝাইবার জন্য 'জীবনযাত্রার মান' কথাটি ব্যবহার করা হয়। দৈনন্দিন জীবনে এই সকল দ্রব্য ভোগ করা ঐ সমাজের লোকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে।

সকলের জীবনযাত্রার মান এক নহে

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জিনিস-পত্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকে, এবং কাম্য ভোগ্যদ্রব্য সম্পর্কে ইহাদের ধারণাও বিভিন্ন হয়। অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-ব্যবস্থা প্রভৃতির পার্থক্যই ইহার কারণ। আবার এক দেশের লোকের সংগে অন্য আর এক দেশের লোকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা ভিন্ন হয়, কারণ বিভিন্ন দেশের

জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিতও হয়

লোক বিভিন্ন-প্রকার জিনিসপত্র ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত থাকে। যেমন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদপ্রমোদ সম্পর্কে একজন মার্কিন শ্রমিকের যে মান ও লক্ষ্য, একজন ভারতীয় [illegible]কের সে মান ও লক্ষ্য নয়। অবশ্য আর্থিক অবস্থার তারতম্য ইহার অন্যতম [illegible]। আবার একই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মান সকল সময় সমান থাকে না।

আজ যে দ্রব্যাদিকে ভোগ করা পর্যাপ্ত মনে করা হয় কিছুদিন পরে তাহা হয়ত' পর্যাপ্ত মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সহরাঞ্চলে আজ বিজলী বাতি জীবনযাত্রার পক্ষে একপ্রকার অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়; অথচ এমন এক সময় ছিল যখন কেরোসিনের বাতিকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত।

জীবনযাত্রার মান বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া লেখকগণ তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের মানের কথা উল্লেখ করেন—(১) ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান ('minimum-health-and-decency' standard), (২) ন্যূনতম আরামের মান ('minimum-comfort' standard) এবং (৩) ন্যূনতম জীবনধারণের মান ('minimum-subsistence' standard)। ভদ্রোচিত বাসস্থান, পুষ্টিকর অথচ ব্যয়বহুল নয় এমন খাদ্য, পর্যাপ্ত জামাকাপড়, কিছুটা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা 'ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মানে'র মধ্যে পড়ে। যখন এই সকল দ্রব্যের ভোগের ব্যবস্থা অধিকমাত্রায় থাকে এবং শিক্ষা, জীবনবীমা ও চিকিৎসাদির সুযোগসুবিধাও বর্তমান থাকে তখন উহাকে 'ন্যূনতম আরামের মান' বলা হয়। যখন ভোগ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ প্রকৃত স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান বজায় রাখিবার পক্ষে পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় না—অর্থাৎ, যখন উহা মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার মত হয়—তখন উহাকে 'ন্যূনতম জীবনধারণের মান' আখ্যা দেওয়া হয়। দ্রব্যাদি ন্যূনতম জীবনধারণের পক্ষেও অপ্রচুর হইলে উহাকে চরম দারিদ্র্য বলিয়াই অভিহিত করা হয়।

জীবনযাত্রার মানের তিনটি পর্যায়

এই প্রসংগে 'জীবনযাত্রার মান' (standard of living) ও 'জীবনযাত্রার স্তর' (level of living) কথা দুইটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'জীবনযাত্রার স্তর' বলিতে সেই সকল দ্রব্যকেই বুঝায় যাহা সংশ্লিষ্ট সমাজের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে ভোগ করিয়া থাকে। অপরপক্ষে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ যে-সকল ভোগ্যদ্রব্য কাম্য বলিয়া মনে করে তাহাদিগকে 'জীবনযাত্রার মান' বলা হয়। যাহা কাম্য তাহাই সকল সময় পাওয়া যায় না বলিয়া জীবনযাত্রার স্তর ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের নিম্নে থাকিতে পারে। এ-বিষয়ে আমাদের দেশই অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জীবনযাত্রার মান ও জীবনযাত্রার স্তরের মধ্যে পার্থক্য

ভারতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার স্তর (level of living) যে অতি নিম্ন তাহা আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। কয়েকজন ভাগ্যবান থাকিলেও অধিকাংশের জীবনযাত্রা দারিদ্র্যের পর্যায়ে পড়ে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের মাথাপিছু আয় অতি অল্প—মাসিক ২৪ টাকার মত। নগরাঞ্চলে মাথাপিছু আয় কিছু অধিক বলিয়া মাথাপিছু ব্যয়ও বেশী। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। তাহাদের মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ মাসিক ১৭ টাকার মত। ইহার মধ্যে আবার খাদ্যের জন্য ব্যয়িত হয় দুই-তৃতীয়াংশের উপর। নগরাঞ্চলে খাদ্যের জন্য ব্যয়ের অনুপাত প্রায় উহার কাছাকাছি। তৎসত্ত্বেও লোকে পুষ্টিকর খাদ্য জুটাইতে পারে না। ন্যূনতম পুষ্টির জন্য একজন বয়স্ক

আমাদের দেশে জীবনযাত্রার স্তর

ব্যক্তির পক্ষে অন্তত দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরি-মূল্যের (caloric value) খাদ্য-গ্রহণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও আমাদের দেশে খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্যের গড় ছিল মাত্র ২১০০। অধিকাংশ লোক আবার ইহাও পাইত না। তাহাদের খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য ছিল ১২০০-১৫০০। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল ভারতে জনপ্রতি প্রাত্যহিক ক্যালোরি ভোগের পরিমাণ বাড়াইয়া ২৩০০-তে লইয়া যাওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে জনপ্রতি প্রাত্যহিক ক্যালোরি ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে ৩১০০ এবং ৩২৯০। ইহা ছাড়া সাধারণ ভারতীয়ের খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অপেক্ষাকৃত কম; সুতরাং উৎকর্ষের দিক হইতেও জনসাধারণের খাদ্য নিকৃষ্ট ধরনের। হিসাব করা হইয়াছে প্রতি ৫ জন ভারতবাসীর মধ্যে ৪ জন যাহাকে সুষম খাদ্য (balanced diet) বলে তাহা পায় না। জামাকাপড়ের উপর ব্যয় অতি সামান্য। ইহা মোট ব্যয়ের শতকরা ৮ ভাগের মত। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরও (মার্চ, ১৯৬১ সাল) মাথাপিছু কাপড়ের ব্যবহার ছিল বৎসরে মাত্র ১৫.৫ গজ। ইহা কিন্তু গড়পড়তা হিসাব। বেশীর ভাগ লোক ঐ পরিমাণ বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পায় না। অনেকে আবার অর্ধনগ্ন হইয়া থাকিতেই বাধ্য হয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু তুলাবস্ত্রের ব্যবহার হইল ৫০ গজ এবং জাপানে উহার পরিমাণ ৩৫ গজ। আশা করা হইয়াছে, আমাদের দেশে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহার জাপানের প্রায় অর্ধেকে বা ১৭.২ গজে দাঁড়াইবে এবং তখন উহা মিশর প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের সমান হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অধিকাংশ শিশু শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। বাসগৃহাদিও অনুন্নত ও অপ্রচুর। সহরে বহুসংখ্যক লোক রাস্তায় ঘাটে ফুটপাতে রাত্রি কাটায় অথবা কোনমতে খুপরিতে মাথা গুঁজিয়া জন্তু-জানোয়ারের মত বাস করে। গ্রামাঞ্চলে অনেকের বাসস্থান গোয়ালঘর অপেক্ষাও অধম। চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। গ্রামাঞ্চলে প্রতি ৩০ হাজার লোকের জন্যও একজন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার আছেন কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যের দ্বারা এত পেষীড়িত যে তাহাদের পক্ষে জীবনরক্ষার জন্য খাদ্যসংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়ে; সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ত' দূরের কথা। এই কারণেই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক বৈষম্যকে হ্রাস করিয়া জীবনযাত্রার স্তর উন্নত করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে। আশা করা হইয়াছে যে আগামী পনর বৎসরে—অর্থাৎ, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাধীন সময়ে জাতীয় আয় গড়ে বাৎসরিক শতকরা ৬ ভাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ফলে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটিবে শতকরা ৬০ ভাগের উপর।

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তির ন্যায় জাতীয় আয়ও জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দেশক। এই কারণেই জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়—যথা, জাতীয় আয়ের অর্থ, জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পদ্ধতি, জাতীয় আয়ের উৎপাদন-ব্যবস্থা, মাথাপিছু আয় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয় আয় কাহাকে বলে? দেশে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন হইতেই জাতীয় আয় হয়। মোট উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশের লোকের মধ্যে মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়। সুতরাং মজুরি খাজনা ইত্যাদি যোগ দিলেই জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়কে তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে—(ক) ব্যক্তিসমুদয়ের উৎপন্নের সমষ্টি হিসাবে, (খ) ব্যক্তিসমুদয়ের আয়ের সমষ্টি হিসাবে, এবং (গ) ব্যক্তিসমুদয়ের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে।

(ক) ব্যক্তিসমুদয়ের উৎপন্নের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয়: ইহা হইল বৎসরে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্যের সমষ্টি।

(খ) ব্যক্তিসমুদয়ের আয়ের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয়: ইহা হইল উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী সকল লোকের বাৎসরিক আয়ের সমষ্টি।

(গ) ব্যক্তিসমুদয়ের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয়: ইহা হইল বৎসরে সকল ব্যক্তির ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমষ্টি।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ: উপরি-উক্ত তিনটি দিকের যে-কোনটি হইতেই দেখা যাউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে—কারণ, একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা হয়। যাহা হউক, জাতীয় আয়ের পরিমাপের সময় তিনটি পদ্ধতির যে-কোনটি অবলম্বনে সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

(ক) উৎপাদন-পদ্ধতি: উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বনের সময়—অর্থাৎ, সকলের উৎপাদনের সমষ্টি হিসাব করিবার সময় এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে:

১। যে জিনিস বাজারে বিক্রয় হয় না তাহাদেরও ধরিতে হইবে; কিন্তু নিজেরা যে-সকল কাজকর্ম করিয়া লই বা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ যে স্নেহযত্ন করেন, তাহা ধরা হইবে না;

২। একই দ্রব্যের দুইবার গণনা করা চলিবে না;

৩। মোট উৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা বাদ দিতে হইবে।

মোট উৎপাদনের অর্থমূল্যের হিসাবে বাজার-দামে (at market prices) অথবা উৎপাদন-উপাদানের দামে (at factor prices) করা যাইতে পারে। উৎপাদন-উপাদানের দামে হিসাবের সময় উহা হইতে উৎপাদন-শুল্ক বাদ দিতে হইবে।

(খ) আয়-পদ্ধতি: আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময়—অর্থাৎ, মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা যোগ দিবার সময় যে আয় উৎপাদনশীল কার্য হইতে অর্জিত হয় না তাহা ধরা চলিবে না; হস্তান্তর-পাওনাকে বাদ দিতে হইবে।

(গ) ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে সকলের ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় যোগ দিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয়: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওনা দেখিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই তবে প্রকৃত জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়: উক্ত তিনটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিতেই অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে কিনা তাহা বুঝা যায় না। এইজন্য প্রয়োজন হইল প্রকৃত জাতীয় আয়ের হিসাবের। টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হইয়া থাকিলে তাহা ধরিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিলে তবেই প্রকৃত জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

জাতীয় আয়ের বণ্টন ও মাথাপিছু আয়: দেশের সামগ্রিক কল্যাণ শুধু জাতীয় আয়ের উপরই নির্ভর করে না, উহার বণ্টনের উপরও করে। জাতীয় আয়ের ব্যক্তিগত বণ্টনে বিশেষ বৈষম্য দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ হইল সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা। যাহা হউক, এইরূপ বৈষম্যে নানা কুফল পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য ইহা হ্রাস করা প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতে নানাদিক দিয়া এই বৈষম্য হ্রাসের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মাথাপিছু আয় হইতেই দেশের অবস্থা বুঝা যায়। কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিরাট হইলেও জনসংখ্যাও বিরাট বলিয়া প্রত্যেকের ভাগে অতি সামান্য পরিমাণ জুটিতে পারে। কিন্তু মাথাপিছু আয় হইতে জানিতে পারা যায় না যে প্রত্যেকে ঠিক কতটা করিয়া পায়।

ভারতে মাথাপিছু আয় অত্যন্ত অল্প, তবে ইহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের জাতীয় আয়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য হইল যে জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ কৃষি ও অনুরূপ কার্য হইতেই অর্জিত হয়। ইহা দেশের জীবনযাত্রার নিম্ন মানই নির্দেশ করে।

জীবনযাত্রার মান : জীবনযাত্রার মান বলিতে ভোগের লক্ষ্যকে বুঝায়। সুতরাং সকলের জীবনযাত্রার মান এক হইতে পারে না। আবার জীবনযাত্রার মান পরিবর্তিতও হয়। জীবনযাত্রার মানের তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—(১) ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার মান, (২) ন্যূনতম আরামের মান, এবং (৩) ন্যূনতম জীবনধারণের মান। জীবনযাত্রার মান ও জীবনযাত্রার স্তর এক নহে।

ভারতের জীবনযাত্রার স্তর অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানে—অর্থাৎ, ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও শালীনতার পর্যায়েও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain the concept of National Income. How is such income calculated ? [En. 1961]

জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। কিভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় ?

[ইংগিত : বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময় যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহাদেরও উল্লেখ করিতে হইবে।...(২৫-৩২ পৃষ্ঠা)]

2. "The best way to get a general picture of the economic life of a country is to study detailed estimates of its National Income." Elucidate.

"কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ চিত্র পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল উহার জাতীয় আয়ের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা করা।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : আয়ের বিভিন্ন দিক বলিতে মোট আয়, উহার বণ্টন-পদ্ধতি, উহার হ্রাসবৃদ্ধি, মাথাপিছু জাতীয় আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় প্রভৃতি সকলই বুঝায়। এইগুলি পর্যালোচনা দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে।...(২৪-২৫ এবং ৩৩-৩৮ পৃষ্ঠা)]

3. What is meant by National Income ? Give a brief account of the principal sources of India's National Income. (S. F. 1959)

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায় ? ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[২৫-২৬ এবং ৩৮-৪০ পৃষ্ঠা]

4. What is National Income ? What picture of the Indian economy do you get by studying India's National Income ?

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ? ভারতের জাতীয় আয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের যে চিত্র পাও তাহা বর্ণনা কর।

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত : ভারতের জাতীয় আয়ের আলোচনা হইতে দেখা যায়—১। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ২। কিন্তু ভারতে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে, ৩। তবে জীবনযাত্রার স্তর এখনও অতি নিম্ন, ৪। জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে শুধু উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইলেই চলিবে না—সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।...(২৫-২৬ এবং ৩৮-৪২ পৃষ্ঠা)]

5. What do you understand by Standard of Living? How is related to National Income? Give an idea of the Standard of Living in India.

জীবনযাত্রার মান বলিতে কি বুঝায়? জাতীয় আয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? ভারতে জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে ধারণা বিবৃত কর। [৪২-৪৪ পৃষ্ঠা]

6. Write notes on: (a) National Income (H. S. (H) 1962); (b) Per Capita National Income; (c) Real National Income.

টীকা রচনা কর: (ক) জাতীয় আয় (খ) মাথাপিছু জাতীয় আয়; (গ) প্রকৃত জাতীয় আয়।

[২৫-২৬, ৩৬-৩৭ এবং ৩৩ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উপাদান

(Main Factors determining National Income)

জাতীয় আয়ের দুইটি মূল উপাদান

জাতীয় উৎপাদন হইতেই দেশের আয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয় জাতীয় উৎপাদনেরই নামান্তর মাত্র। এই জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে একদিকে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং অপরদিকে দেশ ঐ ঐশ্বর্যকে কতদূর পরিমাণে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তাহার উপর।

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উপাদান:

১। প্রাকৃতিক সম্পদ

এই দুইটি মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া জাতীয় আয়ের উপাদানগুলিকে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে: প্রথমত, জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের উপর। প্রকৃতির দানকেই শ্রমের সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার আকাংক্ষা তৃপ্তির উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকে। জমি, খনিজ সম্পদ, বন, নদনদী, জলবায়ু, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতির দান। দেশে দেশে ইহাদের পরিমাণ ও গুণের পার্থক্য দেখা যায়। কোন দেশের জমি হয়ত' অপেক্ষাকৃত অনুর্বর; এমনকি কোন অঞ্চল মরুভূমিও হইতে পারে। এই ধরনের দেশে কৃষিজ উৎপাদন সাধারণতই কম হইবে। আবার উৎপাদন বৃষ্টিপাতের উপরও নির্ভরশীল। বর্তমানে অবশ্য মানুষ নানা উপায়ে জলসেচ ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছে। কৃষিকার্য উন্নত ধরনের হইলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা সহজেই পাওয়া যায়। আবার কয়লা লৌহ তৈল প্রভৃতি খনিজ সম্পদে কোন দেশ সমৃদ্ধ হইলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হয়। নদনদীও দেশের মধ্যে গমনাগমন ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়তা করিয়া ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের

উন্নতিতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে বনসম্পদ, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতিও দেশের উৎপাদনের অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

উপরি-উক্ত সকল দিক হইতেই আমাদের দেশ অন্যান্য অনেক দেশ হইতেই অধিকতর সুবিধা ভোগ করে। ভারতে কয়লা, লৌহ-আকর (iron-ore), অভ্র, ম্যাংগানীজ-আকর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ পদার্থও খুব কম সঞ্চিত নাই। ভারতে অসংখ্য নদনদী রহিয়াছে; বনসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ। ইহার কারণ, সেদিন পর্যন্ত এইগুলিকে দেশের উন্নতিসাধনের কাজে লাগাইবার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা করা হইবে।

ভারত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সাহায্যে অভাবপূরণের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজন হইল—জনবল অর্থাৎ জনসম্পদ। কিন্তু লোকসংখ্যা যথেষ্ট হইলেই যে উৎপাদন অধিক হইবে এরূপ মনে করা ভুল। লোকের কর্মদক্ষতা ও কর্মস্পৃহার উপরই জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে। যে দেশের লোক সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিল্পগত নিপুণতার অধিকারী সে দেশের লোক স্বভাবতই অধিকমাত্রায় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তবে কর্মদক্ষতার সহিত থাকা চাই কর্মস্পৃহা। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আকাংক্ষা থাকিলে তবেই দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয়। ভারতের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনি প্রচুর, জনসংখ্যাও তেমনি পর্যাপ্ত। কিন্তু ইহাদিগকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি বা শিল্প শিক্ষার অভাব। এই কারণে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র এই সকল লোককে শিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাই চলিয়াছে।

২। জনসম্পদ

ভারতে জনসংখ্যা প্রচুর হইলেও জনসম্পদ পর্যাপ্ত নহে

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও জনবল ব্যতীত জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে দেশের মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদন-পদ্ধতির কলাকৌশলের উপর। যে দেশের যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, যানবাহন প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্যের সংগতি অধিক সে দেশের উৎপাদনও বেশী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে উৎপাদনের কলাকৌশলের নিত্যনূতন উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের প্রয়োগ দ্বারা যত অধিক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব, পুরাতন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে তত পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নহে। সুতরাং উৎপাদনের কলাকৌশলের উপরও জাতীয় আয় নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে [illegible] অন্যতম সমস্যা হইল, কিভাবে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতিসাধন করা যায়? সরকার দেশের লোকের সঞ্চয়

৩। মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদনের কলাকৌশল

সংগ্রহ করিয়া, কর প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী আয় বৃদ্ধি করিয়া এবং বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেশের মূলধনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছে।

চতুর্থত, সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরও জাতীয় আয়ের পরিমাণ অনেকখানি নির্ভরশীল। সংগঠকই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, শ্রম ও যন্ত্রপাতিকে একত্রিত করিয়া উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সংগঠক যেভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যবহার করে তাহার উপরই উৎপাদন অধিক হইবে কি অল্প হইবে, তাহা নির্ভর করে। সংগঠক যদি সুদক্ষ হয় তবেই উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্যক ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদনও অধিক হয়। আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্য অংশত বেসরকারী এবং অংশত সরকারী পরিচালনাধীন। এই দুই ক্ষেত্রের পরিচালনা ও সংগঠন-দক্ষতার উপরই আমাদের দেশের জাতীয় আয় নির্ভরশীল।

৪। সংগঠন-নৈপুণ্য

পঞ্চমত, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রথা জাতীয় উৎপাদনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সমাজ-ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক হইতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদারশ্রেণী ক্ষেত-খামারে চাষীদের খাটাইয়া তাহাদের শোষণ করিতে থাকে। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ইহার বিলোপসাধন করা হইয়াছে। এইরূপ জমিদারী বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষি কিংবা শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় না। এই অবস্থায় জাতীয় উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি বণ্টন-ব্যবস্থাও হয় অত্যন্ত বৈষম্যমূলক।

৫। সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

ধনতান্ত্রিক (capitalistic) সমাজ-ব্যবস্থায় কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি সকলই ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে এবং এই মালিকশ্রেণী একমাত্র মুনাফা লাভের জন্যই উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। ইহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে কি অকল্যাণ হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। মানুষ দেখিয়াছে যে ধনতন্ত্রের যত প্রসার ঘটিয়াছে মালিকের সংখ্যা ততই কমিয়া যাইয়া ক্রমশ একচেটিয়া কারবারের (monopolies) উদ্ভব হইয়াছে। একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া জিনিসপত্রের দাম চড়া করিয়া রাখে, মানুষকে বেকার অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখে এবং দেশের সম্পদের অপচয় করিয়া মুনাফার লোভে অপ্রয়োজনীয় এমনকি অহিতকর দ্রব্যাদিও উৎপাদন করে। কেবলমাত্র মুনাফার জন্য উৎপাদন করে বলিয়া শিল্পের সুষম উন্নয়ন (balanced development) সম্ভব হয় না; এবং এই কারণে দেশে সর্বাধিক পরিমাণে জাতীয় আয় সৃষ্ট হয় না। ভারতের মত অনগ্রসর দেশে জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের বিশেষ ক্রয়ক্ষমতা নাই। তাই শিল্পপ্রসারের দিকে ধনী মূলধন-মালিকদের বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। কতকটা এইজন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারত শিল্পে অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে।

সমাজ-ব্যবস্থা কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

ভারতের ন্যায় যে-দেশে এইভাবে মূলধন-মালিকদের উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাবে

শিল্পবাণিজ্য অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে সেখানে সরকারকেই উদ্যোগী হইয়া অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ভার গ্রহণ করিতে হয়। দেখা যায়, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকল্পে অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে; পূর্বের ন্যায় আর নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্তভাবে ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে জাতীয় উৎপাদনের ভার ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া নাই। সুতরাং জাতীয় উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষ অধিক। শাসন-ব্যবস্থা শক্তিশালী, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত না হইলে জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয় না; চোরাকারবার, বিশৃংখলা ও জনসাধারণের অবিশ্বাস উৎপাদনকার্যকে ব্যাহত করিতে থাকে। ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে ইহা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

সামাজিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানও জাতীয় উৎপাদনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, অদৃষ্টবাদিতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা কোন-না-কোন ভাবে জাতীয় উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করিয়াছে। যেমন, জাতিভেদ প্রথা শ্রমের যোগান হ্রাস করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধিকে ব্যাহত করিয়াছে। উন্নত দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন স্থানে যে-কোন কার্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে। আমি ব্রাহ্মণ—অতএব আমি জুতা তৈয়ারির কাজ করিব না; আমি ভদ্রলোক—অতএব আমি কলকারখানায় হাতের কাজ লইব না; অমুক মুচি বা মেথরের সন্তান—অতএব সে অন্য কোন উচ্চতর পেশায় নিয়োজিত হইতে পারিবে না—এইরূপ মনোভাব ও প্রথা অর্থ নৈতিক উন্নতি ও জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। আবার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে এবং যৌথ পরিবারে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে বলিয়া উদ্যোগহীন ও অলসভাবে জীবনযাপন করিলেও উৎপাদন-কার্য ব্যাহত হয়। ফলে জাতীয় আয়ও কম হয়। সুখের কথা যে বর্তমানে আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা, অদৃষ্টবাদ, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি সামাজিক বাধাগুলি ক্রমশ দূরীভূত হইতেছে।

সামাজিক প্রথা কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উৎপাদনের উপাদান কি কি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হইলে কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই উপকরণগুলিকেই অর্থবিদ্যায় 'উৎপাদনের উপাদান' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়।

উৎপাদনের উপাদান কাহাকে বলে

আমরা ইহাও জানি যে প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্যকে মানুষ নিজের চেষ্টায় অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তুলে। [illegible] কোন উৎপাদনই প্রকৃতির দান ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতির দানই হইল উৎপাদনের প্রথম উপাদান। অর্থবিদ্যাবিদগণ প্রকৃতির দানকে জমি (Land) বলিয়া অভিহিত করেন। জমি বলিতে কেবলমাত্র ভূখণ্ডকেই বুঝায় না;

উৎপাদনের বিভিন্ন [illegible] প্রকৃতির [illegible] জমি

কৃষি ও ঘরবাড়ীর জন্য জমি ছাড়াও খনি, বন, মৎস্যধৃতকরণের উপযোগী নদী, সমুদ্র, জলবিদ্যুতের উৎস ইত্যাদি সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই বুঝায়।)

কিন্তু উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দানই যথেষ্ট নহে। মানুষের শ্রম ব্যতীত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারোপযোগী হয় না। এমনকি সুদূর অতীতে মানুষ যখন বনজংগলে বসবাস করিত তখনও তাহাকে পরিশ্রম করিয়া ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। বর্তমান যুগে মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে আকাংক্ষা মিটাইবার নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শ্রম (Labour) হইল উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান। শ্রম বলিতে শুধু দৈহিক শ্রমই বুঝায় না, মানসিক শ্রমও বুঝায়।

২। শ্রম

(কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন উপাদানের সাহায্য না লইয়া মাত্র জমি ও শ্রমের সহযোগে উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও সেই উৎপাদন অতি সাধারণ ও সামান্য হইতে বাধ্য। তাই মানুষ উৎপাদনের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখনও সে তীর ধনুক বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার সংগ্রহ করিত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রই ছিল তখনকার দিনে মূলধন। বর্তমান যুগে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অসংখ্য রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা উৎপাদনকার্য চলিতেছে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন আশাতীতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং মানুষের শ্রমেরও লাঘব হইয়াছে। বাটা কোম্পানীর ন্যায় জুতার কারখানায় গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে দৈনিক শত শত জুতা তৈয়ারি হইতেছে; কোন কাপড়ের কলে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সেখানে প্রত্যহ শত শত মিটার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দান বা জমি ও শ্রম ব্যতীত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামেরও প্রয়োজন। অর্থবিদ্যায় এই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন (Capital) বলা হয়; ইহা উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। মূলধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা মানুষের অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কৃষক যে-লাঙল ব্যবহার করে তাহা অতীতে মানুষ তাহার শ্রমের দ্বারা তৈয়ারি করিয়া বর্তমানে শস্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য উহাকে ব্যবহার করিতেছে। মূলধনের সহিত জমির পার্থক্য এইখানেই। জমি প্রকৃতির দান আর মূলধন মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা গড়িয়া তুলে।

৩। যন্ত্রপাতি বা মূলধন

জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

আবার জমি, শ্রম ও মূলধন থাকিলেই চলে না; ভালভাবে উৎপাদনের জন্য এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদন করে উদ্যোক্তা (Entrepreneur) বা সংগঠক (Organiser)। সংগঠক বা উদ্যোক্তার সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরই উৎপাদনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। বর্তমান যুগে এই কর্মকর্তা বা সংগঠকের গুরুত্ব বিশেষভাবে

৪। সংগঠন

বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেক অর্থবিদ্যাবিদ্ উদ্যোগ বা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইঁহাদের মতে, সংগঠনকার্য এক-প্রকার শ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু-না-কিছু সংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে, সংগঠক বা উদ্যোক্তার কার্য বিশেষ ধরনের এবং বর্তমানের জটিল উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। এইজন্যই সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়।

সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Entrepreneur or Business Organiser): উদ্যোক্তা বা সংগঠকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্ন-লিখিতগুলিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ: (১) তাহাকে প্রথমেই স্থির করিতে হয় যে কোন্ শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এই উৎপাদনের জন্য তাহাকে স্থান নির্বাচন করিতে এবং মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। (২) সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য কি হারে জমি, শ্রম ও মূলধন উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা হইবে সেই সম্পর্কেও উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি ও শ্রমবিভাগ নির্ধারণ করাও তাহার দায়িত্ব। (৩) যাহাতে পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজকর্ম চলে তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়। অবশ্য এই কার্য মাহিনা-করা ম্যানেজারের হাতে কতকটা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। (৪) উদ্যোক্তার প্রধান দায়িত্ব হইল ঝুঁকি (risk) বহন করা। বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। কিন্তু বাজার বড় অনিশ্চিত এবং চাহিদাও অনবরত পরিবর্তিত হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদনের আরম্ভ হইতে উৎপাদন সমাপ্ত হইয়া উহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে। উদ্যোক্তাকে এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উৎপাদন করিতে হয়।

সংগঠকের কার্যাবলী
১। উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২। অন্যান্য উপাদানকে যথোপযুক্ত নিযুক্ত করা
৩। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা
৪। ঝুঁকি বহন করা

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এই ঝুঁকি লইতে হয় না, কারণ চুক্তি অনুসারে শ্রমিক নির্দিষ্ট হারে মজুরি, জমির মালিক খাজনা এবং বিনিয়োগকারী সুদ পাইয়াই থাকে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলে তবে তাহাই উদ্যোক্তা মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। যে-সকল অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে রাজী নহেন তাঁহারা অবশ্য বলেন যে, উদ্যোক্তার যেমন ঝুঁকি রহিয়াছে, অন্যান্য উপাদানেরও তেমন ঝুঁকি রহিয়াছে। যেমন, শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতে পারে, কলকারখানার মধ্যে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আবার জমির মালিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইয়া এক কাজ (use) হইতে জমিকে ছাড়াইয়া লইয়া অন্য কাজে ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি বহনের জন্য যদি মুনাফা পাওয়া যায় তাহা হইলে সুদ, খাজনা ও মজুরির একাংশকেও মুনাফা বলিয়াই ধরিতে হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, অন্যান্য উপাদানের পক্ষে কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হইলেও উদ্যোক্তার ঝুঁকির পরিমাণ অধিক এবং প্রকৃতিও ভিন্ন। যাহা হউক, উদ্যোক্তার কার্য বিশেষীকৃত (specialised) হওয়ায় আমরা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে ধরিয়াই আলোচনা করিব।

সংগঠক ঝুঁকি বহন করে বলিয়াই সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয়ের মূল উপাদান দুইটি—(ক) দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, এবং (খ) ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাইবার জন্য দেশের লোকের ইচ্ছা ও ক্ষমতা। এই দুইটি মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় আয়ের নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়: (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) জনসম্পদ, (৩) মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদনের কলাকৌশল, (৪) সংগঠন-নৈপুণ্য এবং (৫) সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রথা।

উৎপাদনের উপাদান: উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—যথা, (১) প্রকৃতির দান বা জমি, (২) শ্রম, (৩) মূলধন এবং (৪) সংগঠন। অনেকে সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। কিন্তু সংগঠকের কায শ্রমিকদের কার্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া ইহাকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত।

•

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the main factors that determine the National Income of a country. Illustrate your answer with reference to India.

যে যে উপাদান জাতীয় আয় নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের বর্ণনা কর। ভারতের উদাহরণ লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও।

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত: ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনবলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় আয় অতি অল্প। ইহার কারণ ভারতে শিল্প-শিক্ষা, মূলধন, উৎপাদনের কলাকৌশল এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের অভাব। ইহা ছাড়া ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রথাও উৎপাদন প্রসারের সহায়ক ছিল না। সম্প্রতি অবশ্য এই প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।...(৪৭-৫০ পৃষ্ঠা)]

2. What is meant by Production? Describe the different Factors of Production. **(C. U. 1953)**

উৎপাদন বলিতে কি বুঝায়? উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা কর। [২০-২১ এবং ৫০-৫২ পৃষ্ঠা]

3. Explain the nature of services performed by the entrepreneur in modern business organisation. **(H. S. (H) Comp. 1960)**

বর্তমান যুগে ব্যবসায় সংগঠনে সংগঠক যে যে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। [৫২-৫৩ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য

(Natural Resources)

জমির সংজ্ঞা (Definition of Land) : সাধারণ ভাষায় জমি বলিতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকাকে বুঝায়—যেমন, চাষবাস ও কলকারখানার জমি। অর্থবিদ্যায় কিন্তু 'জমি' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুকুই বুঝায় না—খনি, বন, জীবজন্তু, আলোবাতাস, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকেই বুঝায়।* প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ মার্শালের (Alfred Marshall) ভাষায় বলা যায়, "জমি হইল সেই সকল শক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে।" অবশ্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় নাই এরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে 'জমি'র সংজ্ঞার মধ্যে ধরিতে চাহেন না। উদাহরণস্বরূপ সূর্যালোক বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জমি বলিতে কি বুঝায়

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের গুরুত্ব—ভারতের উদাহরণ (Importance of Natural Resources—the Indian Example) : প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের গুরুত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় সকল দিকের উপরই প্রাকৃতিক পরিবেশের (natural environment) প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও প্রকৃতির প্রভাবকে সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া চলিতে পারে নাই। দেশের প্রাকৃতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূগর্ভস্থিত খনিজ সম্পদ, উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদ ঐ দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। আমাদের দেশের কথা ধরিয়া বিষয়টির আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, দেশের প্রাকৃতিক গঠন নানাভাবে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল। কৃষির দিক হইতে সিন্ধু-গাংগেয় অঞ্চল বিশেষভাবে [illegible]। কারণ, এই অঞ্চল সমতল এবং নদনদীগুলির পলিমাটি দ্বারা পুষ্ট বলিয়া

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের গুরুত্ব

১। প্রাকৃতিক গঠন অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে

* [illegible] পৃষ্ঠা দেখ।

॥ স্টেটসম্যান পত্রিকার সৌজন্যে ॥

॥ ভারতের প্রধান তৈল উৎপাদন-কেন্দ্র ডিগবয়ের তৈল কারখানা ॥

[৫৬ পৃষ্ঠা]

II

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ একটি শিক্ষা-সহ উৎপাদন-কেন্দ্র। এইরূপ কেন্দ্রে অন্তর্নিয়োগ শিক্ষা প্রদান করা হয় ॥

[১০৫ পৃষ্ঠা]

বিশেষ উর্বর। অপরদিকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল জীবজন্তু ও বনসম্পদে সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া হিমালয় ভারতের জলবায়ুর নিয়ামক হিসাবে কার্য করে। নদনদীগুলি হিমালয়ের তুষারগলা জলে পরিপুষ্ট হয়। হিমালয় মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে অসংখ্য পর্বতমালা আছে এবং বহু নদনদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বংগোপসাগরে কিংবা আরবসাগরে পড়িয়াছে। খনিজ সম্পদের দিক দিয়া এই অঞ্চলের স্থান সিন্ধু-গাংগেয় সমভূমি অঞ্চলের পরই। নানাপ্রকার শস্যও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

ভারতের উদাহরণ

দ্বিতীয়ত, দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের অর্থনৈতিক গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নহে। ভারত পূর্ব-গোলার্ধের মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ায় জল ও বিমানপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে গমনাগমনের ঠিক মধ্যস্থলে পড়ে। ইহার ফলে, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের দিক হইতে ভারতের প্রচুর সুযোগসুবিধা রহিয়াছে। ভারতের উপকূল-রেখাও বিশেষ দীর্ঘ; পরিমাণে উহা প্রায় ৩৫০০ মাইল। কিন্তু অভগ্ন বলিয়া স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা বিশেষ কম।* এইজন্য কলিকাতার ন্যায় নদীমুখে বহু ব্যয়ে বন্দর নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতে হয়।

২। ভৌগোলিক অবস্থানও অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করে

ভারতের উদাহরণ

তৃতীয়ত, কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন গঠনে জলবায়ু বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। জনগণের কর্মদক্ষতা, জীবজন্তু, বনসম্পদ, কৃষিকার্য প্রভৃতি আবহাওয়ার উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও গতির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতের জলবায়ু প্রধানত উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী ধরনের (monsoon tropical), যদিও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ইহার তারতম্য দেখা যায়। বলা হয় যে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতেই শ্রমদক্ষতা অধিক হয় বলিয়া ভারতের মত উষ্ণপ্রধান দেশের জলবায়ু শ্রমদক্ষতার অনুকূল নহে। ইহা সহজেই অবসাদ ও মন্থরতা আনিয়া দেয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলকারখানা-অফিসে তাপনিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন নহে। জীবজন্তু ও অরণ্যসম্পদের বেলাতেও ভারত গর্ব করিতে পারে। অরণ্যভূমি হইতে আমরা নানা উপকার পাইয়া থাকি। কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্য সরবরাহ ছাড়াও অরণ্য আবহাওয়াকে শীতল রাখে, বৃষ্টিপাত ঘটায়, মৃত্তিকার উর্বরতাক্ষয় রোধ করে, মরুভূমির প্রসার বন্ধ করে, ইত্যাদি। ভারতের মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গমাইলের উপর। ইহা মোট স্থলভূমির শতকরা ২২ ভাগের কাছাকাছি।** কিন্তু ইহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত

৩। অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুরও প্রভাব আছে

ভারতের জলবায়ু

বনভূমির উপযোগিতা

---

* ভারতের ৬টি প্রধান বন্দর—বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তনম, কান্দলা ও কলিকাতার মধ্যে প্রথম ৪টি স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলিয়া গণ্য হয়।

** India—A Reference Annual, 1962

হয় না। এই কারণে বর্তমানে অরণ্যভূমির পরিমাণবৃদ্ধির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

ভারতে বন্য ও গৃহপালিত উভয় প্রকার পশুই অসংখ্য আছে। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, পশুমড়ক নিবারণ, উন্নত ধরনের পশুপালন প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে জলবায়ুর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বৃষ্টিপাত। এই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। ভারতবর্ষে মৌসুমী বায়ু দুইটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হয়—যথা, (১) উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু, এবং (২) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত ঘটায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। কিন্তু মৌসুমী বায়ু সকল বৎসরে যথাসময়ে আসে না এবং সমপরিমাণ বৃষ্টিপাতও ঘটায় না। ইহার ফলে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির জন্য শস্যহানি ঘটে। তখন জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, কারণ ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক হইল কৃষির উপর নির্ভরশীল। ইহার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষতি হয়, সরকারের আয় কমিয়া যায় এবং দুর্ভিক্ষত্রাণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাতের উপর এই নির্ভরশীলতাকে হ্রাস করিবার জন্য আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ছোট বড় নানা ধরনের সেচ-ব্যবস্থা চালু করা হইতেছে।

মৌসুমী বায়ু ভারতের জলবায়ুর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক

চতুর্থত, মৃত্তিকার উর্বরতা ও ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যাদি দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। ইহাদের উপরই কৃষি ও শিল্প অনেকখানি নির্ভরশীল। ভারতের মৃত্তিকার উর্বরতার তারতম্য রহিয়াছে। একদিকে যেমন সিন্ধু-গাংগেয় সমতলভূমির মত অতি উর্বর পলিমৃত্তিকা রহিয়াছে, অপরদিকে দাক্ষিণাত্যে তেমনি কম উর্বর প্রস্তরীভূত বা গৈরিক মৃত্তিকার সন্ধানও পাওয়া যায়। ভারতের খনিজ সম্পদকে কোনক্রমেই নগণ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। কয়লা, লৌহ ও ম্যাংগানীজ আকর, চুনা-পাথর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদ যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতে ২২০০ কোটি টনের মত লৌহ-আকর (iron ore) সঞ্চিত আছে। ইহার মধ্যে ৬০০ কোটি টন সম্বন্ধে নিশ্চিত বিবরণ এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ভারতে সঞ্চিত লৌহ-আকরের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন গুণেরও অধিক। ভূগর্ভে সঞ্চিত মোট কয়লার পরিমাণ প্রায় ৫০০০ কোটি টন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।* ইহার সবটাই অবশ্য উৎকৃষ্ট কয়লা নহে। খনিজ তৈলসম্পদ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ এক-প্রকার সীমাহীন বলিলেও চলে। যতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাহার মোটামুটি এক-দশমাংশ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য উৎপাদনকে দ্বিগুণের অধিকে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে।

৪। মৃত্তিকার উর্বরতা ও খনিজ সম্পদের প্রভাবও দেখা যায়

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land): উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়:

(১) জমির যোগান অপরিবর্তনশীল (Supply of land is fixed): প্রকৃতিদত্ত বলিয়া জমির যোগান বা পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য রহিয়াছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই বাড়াইয়া লইতে পারি না। তবে এ-কথা বলা ঠিক নয় যে জমির পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। উপকূল ভংগ অথবা জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর স্থলভাগ হ্রাস পাইতে পারে; আবার বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহের ফলে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে। অপরপক্ষে, মানুষ আবার বাঁধ দিয়া, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া জমির যোগান কতক পরিমাণে বাড়াইতে পারে। কিন্তু এইভাবে কৃষি-জমির কতকটা হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও আমরা জলবায়ু, আলো-বাতাস, বৃষ্টিপাত, অবস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন করিতে পারি না। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় জমির সরবরাহ অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল।

জমির বৈশিষ্ট্য:

১। ইহার যোগান অপরিবর্তনশীল

(২) জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই (Land has no cost of production): জমি প্রকৃতির দান। কেহ ব্যয় করিয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে নাই। বলিতে পারা যায়, উহা মানুষের কাজে নিয়োজিত হইবার জন্যই পড়িয়া আছে। শ্রম কিংবা মূলধনের বেলায় একথা খাটে না। লালন-পালন, শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া শ্রমিক কর্মক্ষম হইয়া উঠে; বিনা আয়াসে শ্রমিক তৈয়ারি হয় না। মূলধনও সম্পদের সঞ্চয় হইতে আসে; অতএব উহার জন্যও মানুষকে পরিশ্রম করিতে ও বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু জমির প্রকৃতিদত্ত উর্বরতা, জলবায়ু, অবস্থান প্রভৃতির পিছনে মানুষের কোন ব্যয় বা শ্রম নাই।

২। ইহার উৎপাদন-ব্যয় নাই

(৩) জমি বিভিন্ন জাতীয় (Land is heterogeneous): উর্বরতার দিক হইতে বিভিন্ন জমির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন জমি হয়ত' অতি উর্বর আবার কোন জমির উর্বরাশক্তি অতি সামান্যই। আমাদের দেশে একদিকে অতি উর্বর সিন্ধু-গাংগেয় সমতলভূমি রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে রাজস্থানের অনুর্বর মরুভূমি অঞ্চল। কোন কোন জমির অবস্থান ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, আবার কোন জমি হয়ত' ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত, কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদনকার্য সকল সময়েই লাভজনক হয়, কারণ উহাতে উৎপাদন খুব বেশী হয়; অপরদিকে কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন কোন সময়েই লাভজনক হয় না। সুতরাং আমরা উৎপাদনক্ষমতা অনুসারে জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। অবশ্য মূলধন ও শ্রমিকের বেলায়ও জমির এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

৩। জমি একই প্রকারের হয় না

পরিলক্ষিত হয়। জমির মত শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনক্ষমতাতেও তারতম্য দেখা যায়।

(৪) জমি স্থানান্তর করা যায় না (Land is immovable) : যতই উপযোগী হউক না কেন অথবা যতই উর্বর হউক না কেন জমিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান করা যায় না। এইজন্যই কলিকাতার ন্যায় সহরে জমির দাম এত বেশী এবং পল্লীগ্রামে জমির দাম এত কম।

৪। জমি স্থানান্তরযোগ্য নহে

(৫) জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মাধীন (Production from Land is subject to the Law of Diminishing Returns) : পরিশেষে, বলা হয় যে জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে। ইহার অর্থ হইল, একই জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে উৎপাদনের হার ক্রমশ কমিতে থাকে। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে এই নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায়, এই নিয়ম অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ নিয়ম এবং অবস্থা বিশেষে ইহা শিল্পের ক্ষেত্রেও কার্যকর। সুতরাং এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে হয়

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (The Law of Diminishing Productivity or Returns) :

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উদ্ভূত হয় কৃষকের অভিজ্ঞতার ফলে।* অভিজ্ঞতা হইতে কৃষক দেখিয়াছে যে একই জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে ফসলের উৎপাদন সমপরিমাণে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই সমহারে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশে খাদ্যাভাবের সমস্যাই থাকিত না—এক বিঘা জমিতে শত শত কৃষক নিযুক্ত করিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাইত। ওয়েষ্ট ও রিকার্ডোর ন্যায় প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি নাম দিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রে পরিণত করেন। কৃষির ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত সূত্রকে মার্শাল (Marshall) এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : "জমিতে কৃষিকার্যের জন্য শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে 'সাধারণত' উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাত অপেক্ষা কম হইবে—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।"

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির মূল বক্তব্য

বিধিটির সংজ্ঞা

* [illegible]৭৭ খৃষ্টাব্দে জেমস্ এণ্ডারসন নামে একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী কৃষি-খামারের মালিক এই তথ্যটি [illegible] করেন বলিয়া কথিত আছে।

উক্ত সংজ্ঞাটি সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইহাতে জমির মোট উৎপন্নের কথা বলা হইতেছে না, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগের ফলে যতটুকু অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অর্থ হইল—শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। যেমন, যদি এক বিঘা জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনসহ ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে ৯ কুইণ্টাল (১ কুইণ্টাল =১০০ কিলোগ্রাম) ধান্য, ৪ জন শ্রমিক নিয়োগে ১৩ কুইণ্টাল ধান্য এবং ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে ১৫ কুইণ্টাল ধান্য পাওয়া যায় তাহা হইলে ৩ জনের স্থলে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৪ কুইণ্টাল এবং ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ২ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য পাওয়া যাইতেছে। অতএব, অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে।

বিধিটির ব্যাখ্যা

অতিরিক্ত উৎপাদন হ্রাস পায়, মোট উৎপাদন নহে

অনেক সময় অবশ্য প্রথম প্রথম শ্রম ও মূলধনবৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন ফসলবৃদ্ধির হার সমানুপাতের অধিকও হইতে পারে—অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিতে পারে। ইহার কারণ, কৃষক হয়ত' প্রথমদিকে জমিতে কম মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে এবং উপযুক্তভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিলেও একসময় না একসময় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইবেই। সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি যে কার্য নাও করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই মার্শাল উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটি কারণেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিতে পারে। মার্শালের উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যের পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর নাও হইতে পারে। 'উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে থাকিলে আবার ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিবে।' সুতরাং সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি স্থগিত রাখা সম্ভব হইলেও স্থায়ীভাবে উহাকে বন্ধ করিয়া রাখা যায় না।

দুইটি কারণে প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে

কিন্তু একসময় না একসময় ইহা কার্যকর হইবেই

উপরি-উক্ত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বিঘা প্রতি জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন (বীজ সার লাঙল প্রভৃতি) লইয়া কাজ করে। তাহা হইলে এই জমিতে ক্রমাগত মূলধনসহ শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হারে হ্রাস পাইতে পারে।

উদাহরণ

বিঘা প্রতি শ্রমিকসংখ্যা (মূলধনসহ)	মোট উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ (কুইণ্টাল হিসাবে)	অতিরিক্ত উৎপাদন বা প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন
১	১	১
২	৪	৩
৩	৯	৫
৪	১৩	৪
৫	১৫	২
৬	১৬	১
৭	১৪	—২

ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন এবং ২ জনের স্থলে ৩ জন নিয়োগ করা পর্যন্ত প্রান্তিক (marginal) বা অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। একজন শ্রমিক বাড়াইলে মোট উৎপাদনের যতটা বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদন বলা হয়। প্রদত্ত হিসাবে ১ জনের স্থলে ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করার ফলে মোট উৎপাদন ১ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ৪ কুইণ্টাল হয়। সুতরাং, অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩ কুইণ্টাল ধান্য। আবার শ্রমিকসংখ্যা ২ জন হইতে ৩ জন করা হইলে মোট উৎপাদন ৪ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ৯ কুইণ্টাল হয়; অতএব অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৫ কুইণ্টাল। ইহার পর শ্রমিকসংখ্যা যত বাড়ানো হইয়াছে প্রান্তিক উৎপাদন তত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে; এবং যখন শ্রমিকসংখ্যা ৭ জন তখন অতিরিক্ত উৎপাদন ত' কিছুই হয় নাই, বরং পূর্বের তুলনায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২ কুইণ্টাল কমিয়া গিয়াছে। যখন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে সুরু করে তখন হইতেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে ৪ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তর হইতেই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিয়াছে এবং ৩ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। মোট উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ৬ জন শ্রমিক নিয়োগ পর্যন্ত উহা বাড়িয়াই চলিয়াছে; কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রমাগত কার্য করিতে থাকায় সপ্তম শ্রমিকের নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনও কমিয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার চিত্রটি হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সহজেই ধরা পড়িবে।

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা

চিত্রটির প্রত্যেক স্তম্ভের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে—একজন করিয়া শ্রমিক বাড়াইলে কত পরিমাণ অতিরিক্ত ধান্য পাওয়া যায়—অর্থাৎ, প্রত্যেকটি স্তম্ভ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাপ করিতেছে। সকল স্তম্ভ একসংগে যোগ করিলে মোট উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায়। সর্বশেষ স্তম্ভটি নীচের দিকে [illegible] হইয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে সপ্তম শ্রমিক নিয়োগের ফলে [illegible] পূর্বের তুলনায় বাড়ে নাই, বরং কমিয়া গিয়াছে।
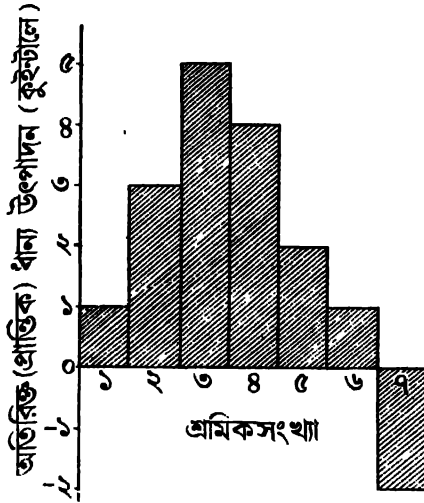
এতক্ষণ আমরা একই জমিতে ক্রমাগত অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগের কথা বলিয়াছি। ইহাকে বলা হয় গভীর বা আত্যন্তিক চাষ (intensive cultivation)। আত্যন্তিক চাষ ছাড়া ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চাষের দ্বারাও যখন অভাব পূরণ করা যায় না, তখন নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি চাষের অধীনে আনয়ন করিতে হয়। ইহাকে 'ব্যাপক চাষ' বলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে থাকিলে যেমন উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়, তেমনি যতই নিকৃষ্টতর জমিতে কৃষিকার্য প্রসারিত করা হয় ততই এই বিধি কার্যকর হইতে থাকে।

বিধিটি আত্যন্তিক ও ব্যাপক—উভয়প্রকার কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (Where does the Law of Diminishing Returns apply?): কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি প্রযোজ্য। গৃহনির্মাণের বেলায় দেখা যায় যে, বাড়ীর তলার পর তলা নির্মাণ করিয়া চলিলে এমন একসময় আসে যখন উচ্চতর তলা নির্মাণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বসবাসের অসুবিধা হয়। তাহা না হইলে কলিকাতার মত সহরে বাড়ীগুলির তলা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া বাসগৃহের অভাব সহজেই মিটানো যাইত। খনির ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য। খনি হইতে যত কয়লা তোলা হইবে খনি ততই গভীর হইবে। ফলে কয়লা তুলিবার ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, খাদ গভীর হইলে কয়লা উত্তোলনের জন্য উন্নত ধরনের সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতি টন কয়লা উত্তোলনে শ্রমিকদের অধিক

ইহা উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

সময় লাগিবে। মাছ ধরার ক্ষেত্রে বলা হয় যে, নদীতে মাছ ধরিবার জন্য যত বেশী শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় (অতিরিক্ত) মাছের পরিমাণ তত কমিতে থাকে এবং অধিক সময় ব্যয় করিয়া অনেক দূরে যাইয়া মাছ ধরিতে হয়। সুতরাং শ্রম ও মূলধন নিয়োগের তুলনায় ক্রমশ কম মাছ ধরা পড়িতে থাকে।

ক্রমহ্রাসমান বিধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা যায়

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির জন্য সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (increasing cost of production) দেখা দেয়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্রমশ কম হারে উৎপাদন হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলে। ধরা যাউক, চাষের জন্য মজুরি ও মূলধন বাবদ শ্রমিকপিছু খরচ হইল ৪০ টাকা। আমাদের পূর্বের ছকটিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চতুর্থ শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ৪ কুইণ্টাল ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ৪ কুইণ্টাল ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল ৪০ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপাদন করিতে ১০ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে। পঞ্চম শ্রমিক নিয়োগের ফলে ২ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। এই ২ কুইণ্টাল ধান্যের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪০ টাকা। অর্থাৎ, কুইণ্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ২০ টাকা। এইভাবে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়াই চলে।

বিধিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে কৃষি, খনি, গৃহনির্মাণ, মৎস্যভূমি প্রভৃতি যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে প্রযোজ্য; অপরপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে যেখানে মূলধনের প্রাধান্য অধিক সেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ-গণ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কৃষি ও শিল্পে ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান—উভয় নিয়মই কার্যকর হইতে পারে। ইঁহাদের মতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মের একটি বিশেষ দিক। কৃষি হউক আর শিল্পই হউক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোনরূপে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ করিলেই কাম্যভাবে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হয় না। উপযুক্ত অনুপাতে শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠন সংযুক্ত করা হইলে তবেই উৎপাদন সন্তোষজনক হয়।

উৎপাদন-উপাদানের কাম্য অনুপাতই উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করে

বিভিন্ন উপাদানের সংযোগের উপযুক্ত অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও বা শ্রম বাড়াইয়া, কখনও বা মূলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি বাড়াইয়া সংগঠক 'কাম্য অনুপাত' (optimum proportion) ঠিক করিয়া লন। যখন কোন একটি উপাদানের পরিমাণ কাম্য অনুপাতের তুলনায় কম থাকে তখন উক্ত উপাদান বৃদ্ধি করিয়া চলিলে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না

কাম্য অনুপাতে পৌঁছানো যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন হইতে থাকিবে। কিন্তু এই কাম্য অনুপাতে পৌঁছিবার পরও যদি ঐ উপাদানটি অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিকমাত্রায় নিয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে।

ধরা যাউক, কোন কারখানায় কাম্য উৎপাদনের জন্য ৪ কাঠা জমি, ৫০০ টাকার মূলধন, ২০ জন শ্রমিক ও একজন দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এখন অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। এই অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে—কারণ, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে দেখা যায় যে উৎপাদনের সকল উপাদানকে সমানভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে অধিক উৎপাদনের জন্য সংগে সংগেই কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন এবং সংগঠন বাড়ানো সম্ভব হয় না। তখন সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত অধিকমাত্রায় শ্রম জুড়িয়া দিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করে এবং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের যে-কোনটিকে অন্যান্যগুলির অনুপাতে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কম হইবে। যেমন, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিতে থাকিবে। তবে অধিকাংশ দেশেই জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অপ্রচুর। অতএব খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যখন সীমাবদ্ধ জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে এবং ইহা অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র।

উপসংহার : ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

সাধারণ সূত্র হিসাবে আমরা ইহার সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারি : উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে একটা সময়ের পর হইতে অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া চলিবে। অর্থাৎ, প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) ক্রমশ কমিতে থাকিবে।

জমির উৎপাদিকাশক্তি—ভারতের উদাহরণ (Productivity of Land—the Indian Example):

জমি প্রকৃতির দান হইলেও মানুষ ইহার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির পর জমির উৎপাদিকাশক্তি সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। জমির উৎপাদিকাশক্তি (productivity) একদিকে যেমন প্রকৃতির দান, অপরদিকে আবার তেমনি মানুষের চেষ্টার উপরও নির্ভর করে। মানুষ নিজের চেষ্টায় নূতন

উদ্ভাবন ও কৃষি-পদ্ধতির উন্নয়নের সাহায্যে জমি হইতে উৎপাদন বহু পরিমাণে বাড়াইয়া লইতে এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের গতিকে বাধা দিতে পারে। ভারতের কৃষির দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বিষয়টির আলোচনা করিতে পারি।

কিভাবে উৎপাদিকা-শক্তির বৃদ্ধিসাধন করা যাইতে পারে: ভারতের উদাহরণ

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশে শস্যের উৎপাদনের হার যে অত্যন্ত কম তাহার ধারণা নিম্নলিখিত চিত্রটি হইতে পাওয়া যাইবে। তবে উৎপাদনবৃদ্ধির যে যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমত, ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উর্বরতা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পাইয়াছে। উপযুক্তভাবে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইলে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এইজন্যই সিন্ধ্রি প্রভৃতি সার তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করিয়া সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। দ্বিতীয়ত, জমিতে একাধিক শস্য ফলানো এবং পালটি শস্য উৎপাদনের (rotation of crops) পদ্ধতির দ্বারা ফসলের পরিমাণকে বর্ধিত করা যায়।

প্রতি একরে গম উৎপাদন

প্রতি একরে ধান্য উৎপাদন
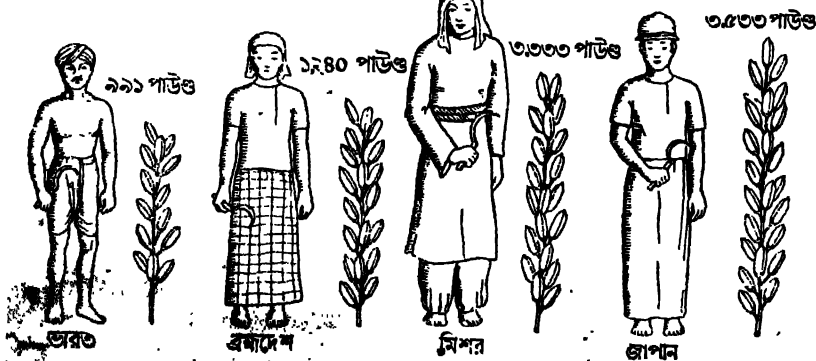
বর্তমানে আমাদের দেশে কতক পরিমাণে এ-পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করা হইলেও ইহার আরও উন্নতি করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলেও জমির উৎপাদন বাড়িয়া যায়। আমাদের দেশে জলের অভাবে অনেক স্থানে সম্যকভাবে চাষ করা যায় না। বড় বড় সেচ-পরিকল্পনা ছাড়াও ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার প্রসার করিতে পারিলে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি একরে দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাকে আরও বৃদ্ধি করিয়া ৯ কোটি একরে লইয়া যাইবার প্রস্তাব আছে। চতুর্থত, ভারতীয় কৃষক চিরাচরিত প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সাধারণ লাঙল ও বলদই তাহার সম্বল। ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিতে পারিলে উৎপাদনবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিতে গেলে কৃষকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা ব্যাপকতর হইয়া পড়িবে। পঞ্চমত, উন্নত ধরনের বীজের অভাবেও জমিতে উৎপাদন কম হয়। এইজন্য যাহাতে কৃষকরা উৎকৃষ্ট শস্যবীজ সহজে পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ষষ্ঠত, জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক; এখানে শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং একই কৃষকের জমি বিচ্ছিন্নভাবে নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ফলে উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। সমবায় প্রথার প্রসার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-জমির একত্রিকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা বৃহদায়তনে কৃষিকার্য সম্পাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ক্ষুদ্রায়তন, গ্রামীণ ও বৃহৎ শিল্পের প্রসারের দ্বারাও জমির উপর হইতে জনসংখ্যার চাপহ্রাসের ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করা হইয়াছে যে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৬ সাল) কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ কমিয়া শতকরা ৬০ ভাগে দাঁড়াইবে। সপ্তমত, কৃষককে জমির মালিকানা না দিলে সে কৃষির উন্নয়নের জন্য আগ্রহান্বিত হয় না। এইজন্যই জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন করা হইয়াছে এবং কৃষককে জমিতে মালিকানা-অধিকার প্রদান, খাজনাহ্রাস প্রভৃতির দ্বারা ভূমি-সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তবে এখনও ভূমি-সংস্কারকে যথোপযুক্তভাবে কার্যকর না করার ফলে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তেমন দেখা দেয় নাই এবং উৎপাদনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। অষ্টমত, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে উত্তর-প্রদেশের তরাই অঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কতিপয় অংশে এবং পশ্চিম-বংগে কলিকাতার নিকটস্থ আরাপাঁচে পতিত জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

উপরি-উক্ত পন্থাগুলি ছাড়া গমনাগমনের উন্নতিসাধন, গুদামঘর নির্মাণ, স্বল্প সুদে কৃষি-ঋণ প্রভৃতি ব্যবস্থা ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। এ-সকল বিষয়ে আমাদের সরকার ক্রমশই অধিক মনোযোগ দিতেছে।*

---

* এ-সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত অধ্যায় দেখ।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থবিদ্যায় মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসিতে পারে এরূপ সকল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে সংক্ষেপে 'জমি' বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকার উর্বরতা, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সকলই অর্থনৈতিক জীবনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে।

জমির বৈশিষ্ট্য : জমি বা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য উৎপাদনের অন্যতম অবদান। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হইতে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : ১। জমির যোগান অপরিবর্তনশীল, ২। জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই, ৩। জমি বিভিন্ন জাতীয়, ৪। জমি স্থানান্তরিত করা যায় না, ৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি : দেখা যায় যে একই জমিতে ক্রমাগত শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিয়া গেলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বলা হয়। দুইটি কারণে অবশ্য প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধিও পাইতে পারে—যথা, (ক) যদি পূর্বে ঠিকমত কৃষিকার্য পরিচালনা করা না হইয়া থাকে, এবং (খ) যদি কৃষিকার্যে উন্নত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তবে বলা যায় যে একসময়-না-একসময় বিধিটি কার্যকর হইবেই।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি গৃহনির্মাণ, খনিজ শিল্প, মাছ ধরার ব্যবসায় প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সাধারণত ক্রমহ্রাসমান বিধির ফলে ক্রমবর্ধমান ব্যয় দেখা যায়। প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য নহে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, ইহা কৃষি ও শিল্প উভয় ব্যাপারেই কার্যকর হইতে পারে। ইঁহারা বলেন, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতই উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করে। যতক্ষণ না কাম্য অনুপাতে পৌঁছানো যায় ততক্ষণ কোন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারেই উৎপাদন দেখা দিবে। কিন্তু কাম্য অনুপাতে পৌঁছানোর পরও যদি ঐ উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিবে।

সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র। ইহা সকল প্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

জমির উৎপাদিকাশক্তি : জমি প্রকৃতির দান হইলেও মানুষ ইহার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রধান প্রধান উপায় হইল সার প্রয়োগ, একাধিক শস্য উৎপাদন, সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত ধরনের বীজ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহার, বৃহদায়তনে কৃষিকার্য, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংগঠন, কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান, পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং ঋণ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ভারতে বর্তমানে এই সকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the extent to which the economic life of a people is affected by geographical features. Illustrate your answer with reference to India.

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রাকৃতিক বিষয়গুলি দ্বারা কতদূর প্রভাবান্বিত হয় তাহা দেখাও। ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও।

[illegible]গত : প্রাকৃতিক গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকার উর্বরতা প্রভৃতি বিষয় অর্থনৈতিক [illegible]নকে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বও দিন দিন [illegible]দ্ধি পাইতেছে। মানুষ [illegible] জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে, জলসেচ-ব্যবস্থার দ্বারা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতার

পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে, ইত্যাদি। সুতরাং প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক বিষয়গুলিই অর্থনৈতিক জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক নয়। যে দেশ যত উন্নত, অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাবও সেই দেশে তত কম।...(৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা)]

2. What is meant by Land in Economics ? In what respects does it differ from other factors of production ? (H. S. (H) Comp. 1962)

অর্থবিদ্যায় জমি বলিতে কি বুঝায় ? কোন্ কোন্ দিক দিয়া জমি উৎপাদনের অপর উপাদানসমূহ হইতে পৃথক ? [৫০-৫১, ৫৪ এবং ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা]

3. Explain with illustration the Law of Diminishing Returns. Does the Law apply to (a) mines, (b) fisheries and (c) manufacture ?

(C. U. 1951, '57 ; H. S. (C) 1961)

উদাহরণসহ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা কর। বিধিটি কি (ক) খনিজ শিল্প, (খ) মাছ ধরা এবং (গ) যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর ? [৫৮-৬৩ পৃষ্ঠা]

4. Give an idea of the Natural Resources of India.

ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের একটি বিবরণ দাও। [৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা]

5. Define 'land' and show how its productivity can be increased. Illustrate your answer by a reference to Indian conditions. (H. S. (H) Comp. 1961)

জমির সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং যে-যে পদ্ধতিতে জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করা যায় তাহা বর্ণনা কর। ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও। [৫৪ এবং ৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা]

6. Explain the causes of low agricultural yield in India. What measures may be adopted for the improvement of agricultural productivity ?

(S. F. 1959)

ভারতে শস্য উৎপাদনের হার কম কেন ব্যাখ্যা কর। শস্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে ? [৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

জনসংখ্যা
(Population)

মাত্র প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকিলেই চলে না ; প্রকৃতির দানকে সম্পদে রূপান্তরিত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বা শ্রমের। এই শ্রমের পরিমাণ ও দক্ষতাই হইল দেশের অগ্রগতির অন্যতম সর্ত। দেশের শ্রমিকসংখ্যা প্রধানত নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার উপর। মোট জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমিকসংখ্যাও সাধারণত অধিক হইবে ; জনসংখ্যা বাড়িতে কিংবা কমিতে থাকিলে শ্রমিকসংখ্যাও বাড়িবার কিংবা কমিবার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

জনসংখ্যার গুরুত্ব

জনসংখ্যাতত্ত্ব (Theories of Population) : দেশের পক্ষে জনসংখ্যার গুরুত্ব অনুভব করিয়া বহুদিন হইতেই পণ্ডিতদের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা

চলিয়া আসিতেছে। দেড়শত বৎসরের উপর হইল টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Malthus) নামক একজন ইংরাজ ধর্মযাজক 'জনসংখ্যা নীতির উপর রচনা' নামক পুস্তকে জনসংখ্যা সম্পর্কে এক তত্ত্ব প্রচার করেন। সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য হইল এইরূপ : প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়ে যে ২৫-৩০ বৎসরের মধ্যেই উহা দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometric progression)—অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২,···· এই হারে বাড়িতে থাকে। অপর-দিকে দেশের খাদ্যের উৎপাদন এতটা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় না। উহা বৃদ্ধি পায় পাটীগাণিতিক প্রগতিতে (arithmetical progression)—যথা, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি হারে। মন্থরগতিতে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবার হেতু হইল কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। সুতরাং দেখা যায় যে খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে না। ফলে জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য-সরবরাহ কম হইয়া পড়ে।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে ম্যালথাসের তত্ত্ব
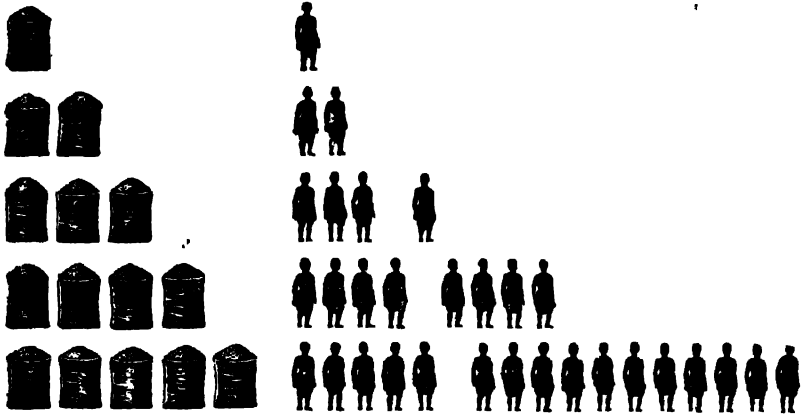
জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য কম হইয়া পড়িলে তাহাকে জনাধিক্যের অবস্থা (over-population) বলা হয়। খাদ্যাভাবের জন্য তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শিশুমৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং জনসংখ্যার একাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; মৃত্যুর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এখন আবার খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার কাছে পর্যাপ্ত হয়। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান হয় না। জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় অধিকমাত্রায় বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং আবার রোগ, মহামারী প্রভৃতি আসিয়া জনসংখ্যা কমাইয়া উহাকে খাদ্য-সরবরাহের সমান

জনাধিক্যের অবস্থা

মহামারী, অনাহার, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক

উপায় (positive checks) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে—অর্থাৎ, মহামারী, অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃখদুর্দশা এড়াইতে হইলে—মানুষকে স্বেচ্ছায় বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে বিবাহ একেবারে না করিয়া সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম রাখিতে হইবে। এই সকল স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ (preventive checks) বলা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়

প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে মহামারী, অনাহার প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকে রোধ করা সম্ভব। অন্যথায় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ নির্মমভাবে কার্য করিতে থাকিবে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ম্যালথাসের তত্ত্বকে একটি চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। এইরূপ চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian Cycle) নামে অভিহিত :

চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহ কার্য করিতে থাকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে। কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার জনাধিক্য দেখা দেয়।

নানাভাবে ম্যালথাসের এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। ম্যালথাস তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার পর দেখা যায় যে ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব, উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি, যানবাহনের উন্নতি ও নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলেই এই উন্নতি সাধিত হয়। অতএব বলা হয়, ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্পর্কে যে হতাশাব্যঞ্জক অভিমত করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত।

ম্যালথাসের মতবাদের সমালোচনা

ম্যালথাসের মতবাদের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনার বিচার করেন নাই

(১) জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে কৃষিকার্যের কলাকৌশলে সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল কলাকৌশল প্রয়োগের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে স্থগিত রাখিয়া খাদ্যোৎপাদন বহুগুণে বর্ধিত করা সম্ভব। অতএব, খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির সম্ভাবনা কম।

তিনি মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন

(২) ম্যালথাস মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত তুলনা করিয়া জনসংখ্যার সমস্যাকে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু লোকের জীবনযাত্রার মান শুধু খাদ্যদ্রব্যের যোগানের উপরই নির্ভর করে না। ভোগের অন্যান্য দ্রব্য—যথা, শিল্পজাত দ্রব্য, সেবা প্রভৃতির সরবরাহের উপরও নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত, সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদন অধিক হইলে অন্যান্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি করিয়া দেশের খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। ইংলণ্ড প্রধানত তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিয়াই দেশের লোকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে। সুতরাং, মোট জাতীয় উৎপাদন ও উহার বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসংখ্যার সমস্যার বিচার করিতে হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় উৎপাদন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া উহাকে উপযুক্তভাবে সকলের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে লোকের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবে।

জনসংখ্যার সমস্যা প্রধানত জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও বণ্টনের সমস্যা

শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সংগে সংগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারও কমিয়া যায়

(৩) মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে জন্মের হার কমিতে থাকে। মানুষ তখন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারকে ছোট রাখিতে চায়। আমাদের দেশে পূর্বে লোকে বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ করিত। এখন শিক্ষিত যুবকগণ সংসার প্রতিপালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিতে চাহে না। এই কারণে ইংলণ্ড ও অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা জনসংখ্যাহ্রাসের আশংকা দেখা দিয়াছে। অতএব জনসংখ্যা সকল সময়েই জ্যামিতিক প্রগতিতে দ্রুত বাড়িয়া চলিবে—ম্যালথাসের এই মতবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

তবুও বলা যায়, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন কম বৃদ্ধি পায়

ম্যালথাসের মতবাদের উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে খাদ্যাভাব দেখা দিতে বাধ্য। এমনকি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংগঠন (FAO)* ঘোষণা করিয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্তমানে কমিয়া গিয়াছে। [illegible]ক, তর্কবিতর্কের ভিতর না যাইয়াও আমরা বলিতে পারি যে ভারতের ন্যায়

* পৌরবিজ্ঞানের ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

অনেক স্বল্পোন্নত দেশেই জনাধিক্য রহিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য-যোগানের ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-বিষয় সম্পর্কে একটু পরেই বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় (Population and National Income) : আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ জনসংখ্যার সমস্যাকে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, কোন দেশের যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধনের সংগতি থাকে তাহা সুষ্ঠু-ভাবে কাজে লাগাইতে হইলে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। এই জনসংখ্যাকে ঐ দেশের পক্ষে 'কাম্য জনসংখ্যা' (optimum population) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ, ইহার ফলে দেশের উৎপাদনের হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় (per capita national income) সর্বাধিক হয়। জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধন যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে আবার জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অধিক হইলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যায়—কারণ, উৎপাদন যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে। একমাত্র জনসংখ্যা কাম্যাবস্থায় থাকিলেই দেশের উৎপাদন সর্বাধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে এবং মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনও সর্বাধিক হয়। বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে :

বর্তমানে জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় জনসংখ্যার বিচার করা হয়

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

চিত্রে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে-পর্যন্ত-না ক থ পরিমাণ হয় সে-পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জনসংখ্যা ক থ পরিমাণের অধিক হইলে মাথা-পিছু উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। যখন জনসংখ্যা ক থ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ক থ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা।
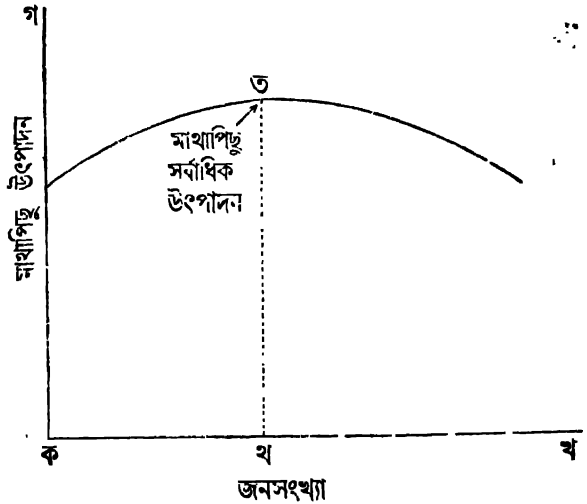
এই মতবাদ অনুসারে যখন কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম

থাকে তখন ঐ দেশটিকে জনবিরল (underpopulated) বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া। যে-পর্যন্ত-না জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে ততক্ষণ মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলেই মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে। তখন দেশে জনাধিক্য (over-populated) ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।*

কাম্য জনসংখ্যার বিচারে জনাধিক্য ও জনবিরলতা

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ইহা একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র, বাস্তবে ইহাকে প্রয়োগ করা কঠিন। কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যা কি, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। ইহা ছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন প্রভৃতিও পরিবর্তনশীল। এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে কাম্য জনসংখ্যাও পরিবর্তিত হয়। যেমন, দেশের মধ্যে যদি নূতন খনির সন্ধান পাওয়া যায় তবে পূর্বের কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকে না। কারণ, এখন জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়ে।

সমালোচনা

তবে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব শিখাইয়াছে যে দেশের জনসংখ্যাকে সামগ্রিক উৎপাদনের সহিত তুলনা করিয়াই জনসংখ্যার সমস্যা বিচার করিতে হইবে। দেশের উৎপাদনের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ করিতে পারিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আশংকার কারণ থাকে না। উপরন্তু, দেশের উন্নতি হইতেছে কিনা তাহা আমরা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে কতকটা বুঝিতে পারি।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের উপযোগিতা

ভারতের জনসংখ্যা-সমস্যা (Population Problem of India) :

এখন খাদ্যের যোগান ও জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার আলোচনা করা যাইতে পারে। জনসংখ্যার আয়তনের দিক হইতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; প্রথম স্থানাধিকারী হইল চীনদেশ। ভারতের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের মাত্র শতকরা ২.৫ ভাগ হইলেও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার

---

* একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কাম্য জনসংখ্যার এই ধারণাকে বুঝানো যাইতে পারে। আমাদের পূর্বের উদাহরণে (৩২ পৃষ্ঠা) নবাবিষ্কৃত দ্বীপে মাত্র পাঁচজন লোক আছে, এবং উৎপাদন হইল ১০০ কুইণ্টাল ধান্য। এখানে ধরা যাউক যে, ঐ ৫ জনই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। সুতরাং মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় হইল ২০ কুইণ্টাল ধান্য। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়া যদি ৬ জন হয় এবং মোট উৎপাদন যদি ১১৪ কুইণ্টাল হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় (১১৪ ÷ ৬ = ১৯ কুইণ্টাল) হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা কাম্য স্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ৫ হইতে কমিয়া যদি ৪-এ দাঁড়ায় তবে মোট উৎপাদন কমিয়া ৭৬ কুইণ্টালে পরিণত হইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় [illegible] (২০ কুইণ্টাল) অপেক্ষা কম (৭৬ ÷ ৪ = ১৯ কুইণ্টাল) হইতেছে। মোট উৎপাদন [illegible] কুইণ্টাল হইতে ৭৬ কুইণ্টালে কমিবার কারণ হইল যে ৪ জন লোক ঐ দ্বীপের সমস্ত জমি ভালভাবে চাষ করিতে পারে না। ইহার জন্য ঠিক ৫ জন লোকই দরকার। সুতরাং ৫ জনই ঐ দ্বীপের কাম্য জনসংখ্যা। ইহাতেই মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (আমাদের উদাহরণে ২০ কুইণ্টাল) হয়।

শতকরা ১৪ ভাগের মত ভারতেই বাস করে। ১৯৬১ সালের জনগণনার চূড়ান্ত হিসাবে (final census figures) দেখা গিয়াছে যে দেশের জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩ কোটি ৯২ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ। সুতরাং বিগত দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ হইল ৮ কোটির মত বা শতকরা প্রায় ২১.৫ ভাগ। পূর্ববর্তী দশ বৎসরে—অর্থাৎ, ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়াছিল মাত্র ৪ কোটি ৪১ লক্ষ বা শতকরা ১৩.৩ ভাগ। তখন জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৪৪ লক্ষ; বর্তমানে উহা ৮০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার এইরূপ বৃদ্ধিকে বিশেষ ভীতির চক্ষেই দেখা হয়।

ভারতের জনসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়
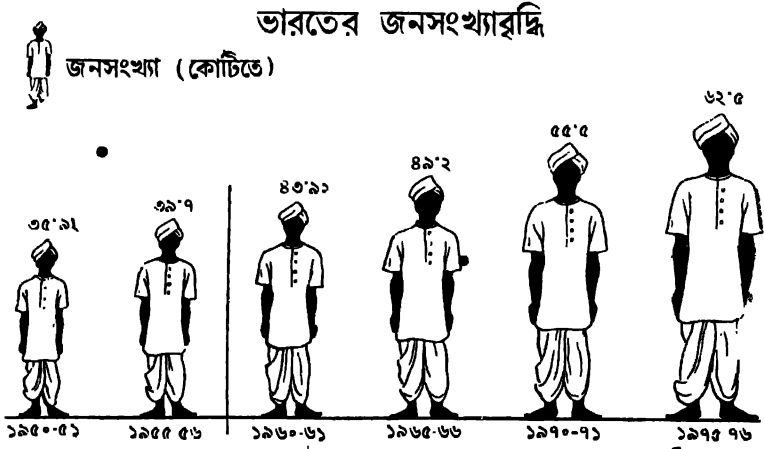
জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে জন্ম ও মৃত্যুর হারের উপর। ভারতে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হারই অতি উচ্চ। ১৯৫১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে ১৯৪১-৫১—এই দশকে প্রতি বৎসরে হাজার লোকপিছু গড়পড়তা প্রায় ৪০ জন জন্মগ্রহণ করিত এবং ২৭ জনের মৃত্যু হইত। ফলে বৎসরে প্রতি হাজার লোকের সংগে ১৩ জন করিয়া যুক্ত হইত। কিন্তু বিগত দশ বৎসরে গড়ে ১৩ জনের পরিবর্তে ২১.৫ জন করিয়া যুক্ত হইয়াছে।* ইহার মূলে আছে অবশ্য জন্মহার বৃদ্ধি অপেক্ষা স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির দরুন মৃত্যুহারের হ্রাস। মৃত্যুহারের হ্রাস অবশ্যই কাম্য; কিন্তু জন্মহারও সংগে সংগে হ্রাস পাইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ফলে জনসংখ্যা অকল্পিত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। অনুমান করা

ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান

* এই হিসাব অনুসারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বাৎসরিক হার হইল শতকরা ২.২-এর মত। কিন্তু অনুমান করা হইতেছে যে বর্তমানে (১৯৬৫ সালে) উহা শতকরা ২.৫-এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

হইতেছে যে জনসংখ্যা তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৪৯ কোটিতে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে যথাক্রমে ৫৫'৫ কোটি ও ৬২'৫ কোটিতে পৌঁছিবে।

জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের খাদ্যের যোগান কম

এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য যোগানো ভারতের একটি কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতেই ভারতে খাদ্য-সমস্যা থাকিলেও বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই ভারতকে বাহির হইতে খাদ্য আনিয়া কোন রকমে লোকের অন্নের সংস্থান করিতে হইতেছে। ১৯৩৮ সালে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেন যে স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরেও মাত্র শতকরা ৮৮ জনের জন্য দেশের ভিতর হইতে খাদ্য-সরবরাহ করা সম্ভব। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ অনেকটা ব্রিটিশের শাসননীতির ফল হইলেও উহা একরূপ দেখাইয়া দেয় যে ভারতে খাদ্যের সংস্থান জনসংখ্যার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। ১৯৪২-৪৪ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

খাদ্য-যোগানের ব্যবস্থা —উৎপাদন ও আমদানি

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতে পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করে যে স্বাভাবিক শস্যোৎপাদনের বৎসরে খাদ্যশস্যের যোগানে শতকরা ৬-৭ ভাগ ঘাটতি থাকে। প্রথম পরিকল্পনায় তাই কৃষি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য দেশের ভিতর হইতে খাদ্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না; এবং বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া দেশে খাদ্যাভাব কোন রকমে মিটানো হইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে গড়ে বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকার অধিক খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে—অর্থাৎ, ১৯৬১-৬২ সালেই খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৯৭ কোটি টাকা। এই ১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি টনের মত। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনকে বৃদ্ধি করিয়া ১০ কোটি টনে লইয়া যাইবার আশা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ভারত খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, ১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাব বাহির হইবার পূর্বেই যে মার্কিন কৃষি বিশেষজ্ঞ দল (American Team of Agricultural Specialists) ভারতে আসিয়াছিল তাহারা অনুমান করিয়াছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতার জন্য ভারতকে অন্তত ১১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। অতএব, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০ কোটি টন উৎপাদন সম্ভব হইলেও খাদ্য-ঘাটতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমাদের খাদ্য [illegible] করও বটে

খাদ্যের অপ্রতুলতা শুধু পরিমাণগতই নয়, পুষ্টিকারিতার দিক হইতেও ইহার অভাব রহিয়াছে। ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের দৈনিক অন্তত ৩০০০ ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য হইল প্রায় [illegible]। ইহা আবার গড়পড়তা হিসাব মাত্র; অধিকাংশ লোকের খাদ্যের ক্যালোরি-

মূল্য ইহা অপেক্ষাও অনেক কম—১২০০ হইতে ১৫০০ ক্যালোরি মাত্র।* উপরন্তু, এই খাদ্য নিকৃষ্ট ধরনের—ইহাতে ভিটামিন, স্নেহজাতীয় ও আমিষজাতীয় পদার্থের অভাব রহিয়াছে। ফলে অপুষ্টিজনিত নানাজাতীয় ব্যাধি দেখা যায় এবং শিশুমৃত্যুর হারও অধিক হয়।

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে

সুতরাং, যে-কোন দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন, দেখা যায় যে বর্তমান অবস্থায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যের যোগান তাল রাখিয়া চলিতে পরিতেছে না এবং ম্যালথ্যাস-বর্ণিত জনাধিক্যের সকল লক্ষণই—যথা, অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা যাইতেছে।

মাথাপিছু আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে অবশ্য ভারতে এখনও জনাধিক্য ঘটে নাই। এ-দিক হইতে ডাঃ পি. জে. টমাসের (Dr. P. J. Thomas) মত অনেক অর্থবিদ্যাবিদ দেখাইয়াছেন যে, দেশের উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষাও দ্রুতহারে সম্প্রসারিত হইতেছে। ফলে মাথাপিছু আয়ও উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে; ঐগুলিকে কাজে লাগাইয়া দেশের উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি এবং জাতীয় আয়ের যথোপযুক্ত বণ্টন-ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে আশংকা প্রকাশের কোন কারণ নাই। বর্তমানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধির এইরূপ প্রচেষ্টাই করা হইতেছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে হ্রাস করিতে না পারিলে উৎপাদনবৃদ্ধি করিয়াও জীবনযাত্রার মানের বিশেষ কোন উন্নতি করা সম্ভব হইবে না। কারণ, বর্ধিত জনসংখ্যাকে কোন রকমে খাওয়াইয়া-পরাইয়া রাখিতেই বর্ধিত জাতীয় আয় ব্যয়িত হইয়া যাইবে। সুতরাং সংগে সংগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই কারণে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

শ্রমের যোগান (Supply of Labour): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কোন দেশের শ্রমের যোগান তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—(১) জনসংখ্যা, (২) শ্রমিকের কার্যের সময়, এবং (৩) শ্রমিকের দক্ষতা।

১। জনসংখ্যার আয়তন

(১) জনসংখ্যা: জনসংখ্যা যত অধিক হইবে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। জনসংখ্যা কম বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় নূতন দেশে শ্রমিকসংখ্যাও অল্প। অপরদিকে ভারতের জনসংখ্যা অধিক বলিয়া শ্রমের যোগানও অধিক। জনসংখ্যার আয়তন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার, এবং (খ) স্থানান্তরগমন

---

* ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(migration)। স্থানান্তরগমন বলিতে বুঝায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিদেশীয়দের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে; সুতরাং স্থানান্তর-গমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। অতএব বলা যায়, জনসংখ্যার আয়তন প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যার আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

শ্রমের যোগান পরিমাপ করিবার সময় মোট জনসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে ধরিলে ভুল হইবে। জনসংখ্যার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল কার্যে ব্যাপৃত থাকে না। একেবারে শিশু এবং অত্যধিক বৃদ্ধদের শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে ১৫ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্কদের শ্রমকারী জনসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়। বিগত দুই জনগণনার হিসাব অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের কিছু বেশী লোক এই পর্যায়ে পড়িত। অবশ্য শ্রমের যোগান হিসাবের সময় যে-সকল স্ত্রীলোক গৃহে পরিবারের সেবাযত্ন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বাদ দেওয়া হয়।

জনসংখ্যার সকলেই শ্রমের যোগান দেয় না

(২) কার্যের সময়: শ্রমশীল লোক সপ্তাহে বা দৈনিক কত ঘণ্টা খাটে তাহার উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা যদি এক হয় কিন্তু যদি প্রথম দেশে সাপ্তাহিক ৪০ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় দেশে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেশের শ্রমের মোট যোগান প্রথম দেশ অপেক্ষা অধিক হইবে। বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই শ্রমের সময় ও ছুটির দিন আইন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হয়। শ্রমের সময় অত্যধিক হইলে পরিশ্রান্ত শ্রমিকের কার্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। আমাদের দেশে কারখানায় প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের সপ্তাহে কার্য করিবার সময় ৪৮ ঘণ্টা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদের কারখানায় দৈনিক ৪½ ঘণ্টার বেশী খাটানো যায় না।

২। কার্যের সময়

(৩) শ্রমিকের দক্ষতা: শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে বুঝায় শ্রমিকের উৎপাদন-শীলতা বা কাজ করিবার ক্ষমতা। যেমন বলা হয় যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলে নিযুক্ত একজন শ্রমিক ভারতের কলে নিযুক্ত ছয়জন শ্রমিকের সমান কাজ করিতে পারে। অর্থাৎ, ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের ছয় গুণ। আবার বলা হয়, মার্কিন কয়লাখনি-শ্রমিক ভারতীয় কয়লাখনি-শ্রমিকের পাঁচ গুণ অধিক কয়লা উত্তোলন করিতে সমর্থ। অর্থাৎ, ঐ শ্রেণীর মার্কিন শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের পাঁচ গুণ। তবে এইভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে যন্ত্রপাতি, পরিচালনা ইত্যাদি [illegible] কিনা। যাহা হউক, ইহা সত্য যে কোন বিশেষ দেশে শ্রমের [illegible] শ্রমিকের দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের

৩। শ্রমিকের দক্ষতা

শ্রমিকসংখ্যা এক হইতে পারে কিন্তু প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির শ্রমিকদের দক্ষতা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তবে দ্বিতীয় দেশটির শ্রমের যোগান অধিক হইবে। কারণ, দক্ষতা অধিক হওয়ায় দ্বিতীয় দেশে উৎপাদন অধিক হইবে।

শ্রমিকের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

শ্রমিকের দক্ষতা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(ক) জাতিগত বৈশিষ্ট্য (Racial Qualities) : অনেক সময় বলা হয় যে দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষ হইল সম্পূর্ণভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক জাতির লোক অপর এক জাতির লোক হইতে স্বাভাবিক কারণেই অধিক দক্ষ হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে সকল জাতির লোকই দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

(খ) জলবায়ু (Climate) : শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুরও বিশেষ প্রভাব থাকে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া শ্রম করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। অতিশয় গ্রীষ্মতাপ এবং স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া সহজেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয়। এ-দিক হইতে ভারতের জলবায়ু শ্রমদক্ষতাকে অনেকটা ব্যাহত করে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই অসুবিধা আর একেবারে দুরপনেয় নয়। যেমন, তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানাগুলিতে গ্রীষ্মতাপের অসহনীয় অবস্থার অবসান করা যাইতে পারে।

জলবায়ুর প্রভাব দুরপনেয় নয়

(গ) আয় ও জীবনযাত্রার মান (Income and Standard of Living) : শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার আয়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আয়ের পরিমাণ দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়। অন্নবস্ত্র, আশ্রয় এবং কিছুটা আমোদপ্রমোদের জন্য আয় পর্যাপ্ত না হইলে মানুষের কর্মশক্তি ও উৎপাদনক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের আয় সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে সম্প্রতি এ-বিষয়ের প্রতি কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে এবং সমাজসেবামূলক কার্যাদি (social services) প্রসারের জন্য সরকার অধিক ব্যয় করিতেছে।

ভারতে শ্রমিকের আয়

(ঘ) কার্যের সর্তাবলী (Working Conditions) : যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ও সর্তাধীনে শ্রমিক কার্য করে তাহা দ্বারাও শ্রমিকের দক্ষতা প্রভাবান্বিত হয়। কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভাল হইলে, কার্যের সময় অতিরিক্ত না হইলে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হইলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এইজন্যই কলকারখানায় প্রচুর আলোবাতাস, পানীয় জল, স্নানাগার, স্বল্প দামে পুষ্টিকর খাদ্য-সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংগে সংগে শ্রমের সময় যাহাতে

কার্যের সর্তাবলী বলিতে কি বুঝায়

অত্যধিক না[illegible] শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যাহাতে বিরোধ লাগিয়াই না থাকে তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতে এই সকল দিক হইতে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইলেও অনেক কলকারখানাতেই এখনও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমদক্ষতার পক্ষে অনুকূল নহে।
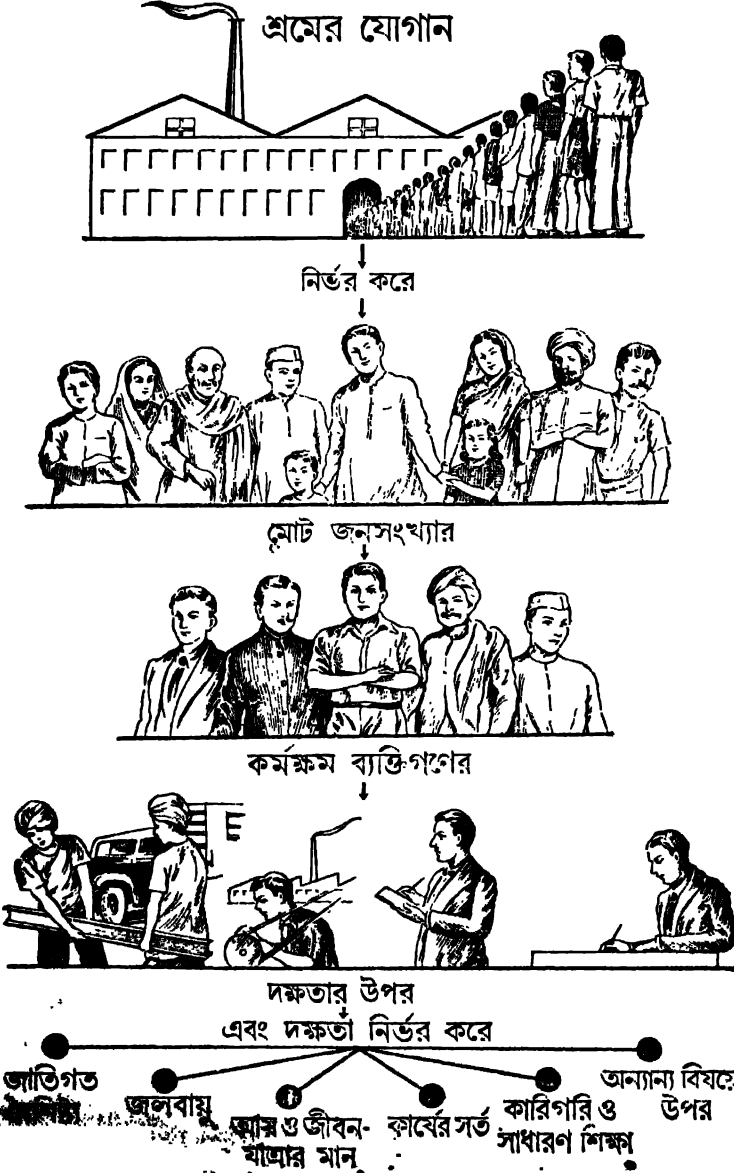
(ঙ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (General and Technical Education): শিক্ষার উপর শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণ শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভংগি প্রসারিত হয়। এই সাধারণ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কারিগরি দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। বস্তুত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প প্রসারের অপরিহার্য সর্ত হইল কারিগরি শিক্ষার প্রসার। এ-বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব

(চ) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ (Efficiency of Other Factors): উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান উৎকৃষ্ট ধরনের হইলেও শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষির ক্ষেত্রে জমি যদি উর্বর হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন অধিক হইবে। অনুরূপভাবে, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎকৃষ্ট ধরনের হইলে শ্রমিকের উৎপাদনও অধিক এবং উৎকৃষ্ট হইবে। এ-দিক হইতে ভারতীয় শ্রমিককে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিচালক বা কর্মকর্তার দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল। পরিচালকের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও উদার দৃষ্টিভংগি থাকিলে শ্রমিকের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে যে স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন হয় তাহার মূলে রহিয়াছে এই সুদক্ষ পরিচালনা। আমাদের দেশে শিল্প-পরিচালনার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্রমবিভাগের ফলেও শ্রমিকের দক্ষতা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ধারণ করে

(ছ) পরিশেষে, শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা যোগাইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ভারতীয় শ্রমিক (Indian Labour): ভারতীয় শ্রমিকদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) কৃষি-শ্রমিক, এবং (খ) শিল্প-শ্রমিক। কৃষির উপর জনসংখ্যার ৭০ ভাগ এখনও নির্ভরশীল বলিয়া কৃষি-শ্রমিকরাও সংখ্যায় শিল্প-শ্রমিক অপেক্ষা অনেক অধিক। কৃষি-শ্রমিক বলিতে কৃষকদের নিকট মজুরি বা মাহিনাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে বুঝায়। ইহাদের সংখ্যা মোট কৃষিজীবীদের শতকরা ২০ ভাগের মত।

কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিক

কৃষি-শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালী অতি কঠোর। তাহাদের মধ্যে অর্ধেকের কোন প্রকার জমিজমা নাই, এমনকি বাসস্থানের জমিও অন্যের। দ্বিতীয়ত, কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি অত্যল্প; সাধারণত উহা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের অর্ধেক মাত্র। আবার অনেক সময় সমস্ত মজুরিটাই নগদ টাকায় দেওয়া হয় না; কিছুটা নগদে এবং উৎপন্ন শস্যে প্রদান করা হয়। তৃতীয়ত, ভারতের কৃষি-শ্রমিকের নিয়োগকালও সাময়িক। তাহাদিগকে বৎসরে কয়েক মাস

কৃষি-শ্রমিকের বৈশিষ্ট্য

হয় বসিয়া থা[illegible] উপার্জনের আশায় শিল্পাঞ্চলে গমন করিতে হয়। পরিশেষে আবার কয়েক স্থানে একপ্রকার ভূমিদাস প্রথা (agricultural serfdom) প্রচলিত আছে যাহার ফলে কৃষি-শ্রমিক মালিকের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে পারে না; নির্দিষ্ট মালিকেরই অধীনে জমিজমা চাষ করিয়া কোনমতে দিন গুজরান করিতে হয়।

কৃষি-শ্রমিকের উন্নতি-কল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা

সম্প্রতি কৃষি-শ্রমিকদিগকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। তাহাদিগকে জমির দখলিকার স্বত্ব প্রদান করা হইতেছে, ভূমিহীন শ্রমিককে ভূমিদানের ব্যবস্থাও করা হইতেছে। ইহা ছাড়া শ্রমিক-সমবায় সমিতি (labour co-operatives) গঠন, নানাপ্রকার বৃত্তি প্রদান, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদির দ্বারাও তাহার জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

শিল্প-শ্রমিকের ত্রুটি

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকেরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং দেখা যায় যে বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি হইল ত্রুটি। প্রথমত, এখনও ভারতে ঠিকমত স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক দল (industrial labour force) গড়িয়া উঠে নাই, এখনও অধিকাংশ শিল্প-শ্রমিক গ্রামাঞ্চল হইতেই আসে। ফলে গ্রামের সংগে তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না; সুযোগসুবিধা পাইলেই তাহারা আপনাপন গ্রামে ফিরিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে অনুপস্থিতির হারও অধিক। কারখানাগুলির আবহাওয়া ও কার্যের সর্তাদি অসন্তোষজনক হওয়ার ফলেই এরূপ ঘটে। তৃতীয়ত, ভাষা আচার-ব্যবহার ইত্যাদির বিভিন্নতার জন্য ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে শ্রমিক-আন্দোলন দানা বাঁধিতে পারে না, উৎপাদনও ব্যাহত হয়। চতুর্থত, জনসংখ্যা বিপুল হইলেও এ-দেশে দক্ষ শ্রমিকের যোগান পর্যাপ্ত নহে। পরিশেষে, ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম।

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের উপরি-উক্ত ত্রুটিসমূহের প্রতিবিধানকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-গুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন:

ত্রুটির প্রতিবিধান

প্রথমত, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুস্থ ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে হইবে। কারখানা আইনে আলোবাতাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। ঐগুলি যাহাতে মানিয়া চলা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত, চিকিৎসার সুযোগসুবিধা অধিকমাত্রায় প্রদান করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যাপকভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন। চতুর্থত, শ্রমিকদের খাদ্যপুষ্টির প্রতি যত্ন লইতে হইবে। অবশ্য খাদ্যপুষ্টির প্রশ্ন দেশের খাদ্য-সমস্যার সহিত জড়িত। কিন্তু শ্রমিকদের জন্য 'ক্যান্টিনে'র ব্যবস্থা করিয়া স্বল্প দামে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা যাইতে পারে। পঞ্চমত, শ্রমিকদের [illegible] করিতে হইবে; যাহাতে তাহারা পরিবার-পরিজন লইয়া [illegible]জাবিক ও সুস্থ পরিবেশে বাস করিতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ষষ্ঠত,

নিম্নতম মজুরি ধার্য ও ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করিয়া শ্রমিকদের আবাসিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। সপ্তমত, শ্রমিককে কারখানা-পরিচালনাতেও উত্তরোত্তর অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। ইহার ফলে তাহারা কারখানাকে আপন বলিয়া মনে করিতে শিখিবে এবং তাহাদের গ্রামের প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যাইবে। পরিশেষে, শ্রমিক-সংঘকেও শক্তিশালী করিতে হইবে। শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হইলে শ্রমিকের দোষত্রুটি দূরীভূত হইবে। এ-সম্পর্কে ভারতের শ্রমিক-সংঘের আলোচনা প্রসংগে আরও আলোচনা করা হইবে।

বেকার-সমস্যা (Unemployment) : নিজের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য প্রত্যেকের জীবিকার্জনের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। জীবিকার্জনের সুযোগ থাকিলে তবেই মানুষ তাহার সাধ্যানুযায়ী সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করিতে এবং সুস্থ ও সবল জীবনযাপন করিতে পারে। কিন্তু ভারতে ও অন্যান্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে বহু লোক কাজকর্ম খুঁজিয়া না পাইয়া বেকারাবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি এই বেকার-সমস্যা অন্যতম সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ আজ বেকারত্ব, অর্ধ-নিয়োগ ও আর্থিক দুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সর্বজনীন মানব অধিকারের ঘোষণায়* কর্মের অধিকার, পছন্দানুযায়ী চাকরি গ্রহণের অধিকার, নিয়োগের ন্যায্য ও অনুকূল সর্তের অধিকার, বেকারাবস্থার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের অধিকার, প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রও আজ আর নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া নাই। ইহারা বেকার-সমস্যার সমাধান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার (Planned Economy) দিকে ঝুঁকিয়াছে। আমাদের সরকারও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, মানুষ কর্মের সুযোগের অভাবে বেকার থাকে কেন, এবং ভারতের বেকার-সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিবিধান কি ?

বেকার-সমস্যার গুরুত্ব

ইহার সমাধানের প্রচেষ্টা

বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব (Types of Unemployment) : বর্তমান যুগের বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা প্রয়োজন যে বেকারত্ব (unemployment) বলিতে ঠিক কি বুঝায়। বেকারত্ব মানুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হইতে পারে। সমাজে সকল সময়ই একশ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কর্মবিমুখ এবং পরনির্ভরশীল। তাহারা কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চাহে না; অপরের উপার্জনে ভাগ বসাইয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়াই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। অনেক ক্ষেত্রে বহুদিন ধরিয়া বেকারাবস্থায় থাকার ফলে তাহারা কাজ করিবার মনোভাব হারাইয়া ফেলে; ফলে কাজ জুটিলেও বেশী দিন উহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই ধরনের বেকারত্বকে **ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব (voluntary**

বেকারত্ব বলিতে কি বুঝায়

ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব

* পৌরবিজ্ঞানের ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

unemployment) বলা হয়। ইহা খুব ব্যাপক নয় বলিয়া ইহার সমস্যাও খুব গুরুতর নয়।

আবার অনেকের বাহিরে কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা ঘরকন্নার কাজ পরিচালনা করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকরি করিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ কোনটাই তাহাদের নাই। সুতরাং উপার্জনে সমর্থ হইয়াও তাহারা যখন উপার্জনে বাহির হয় না তখন তাহাদের বেকার বলিয়া গণ্য করা চলে না; এবং তাহাদের জন্য কোন সমস্যারও উদ্ভব হয় না।

অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব

সুতরাং আসল সমস্যা হইল অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব (involuntary unemployment) লইয়া—যাহারা কাজ খুঁজিয়া বেড়ায় অথচ পায় না তাহাদের লইয়া। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বেকারত্ব বলিতে এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বুঝেন।

যে বিভিন্ন ধরনের অনিচ্ছাকৃত বেকাবত্ব বর্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্ব

(১) শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্ব (Cyclical Unemployment) : শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলিতে দেখা যায় যে ব্যবসাবাণিজ্য একই রকম ভাবে চলে না। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পে কোন সময় আসে তেজীভাব (boom) আবার কোন সময় আসে মন্দা (depression)। এই তেজী-মন্দার ফলে দেখা যায় নিয়োগের তারতম্য। মন্দার সময় সহস্র সহস্র লোক কর্মহীন হইয়া পড়ে।

শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্বের প্রধান কারণ হইল ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন অর্থ-ব্যবস্থা। এইরূপ অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীশ্রেণী ঠিক করে যে কতটা উৎপন্ন হইবে। তাহারা যদি অধিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তবে জাতীয় আয় ও নিয়োগ (employment) বাড়িয়া যায়; অপরদিকে আবার যদি কম উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করে তবে জাতীয় আয় ও নিয়োগ কমিয়া যায়, এবং লোকে কর্মহীন হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন, ব্যবসায়ীদের

এইরূপ বেকারত্বের কারণ

কমবেশী উৎপাদনের সিদ্ধান্ত কিসের উপর নির্ভর করে? সংক্ষেপে, ইহা নির্ভর করে মুনাফার আশার উপর। সুতরাং যদি অধিক উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করিলে লাভের অধিক সম্ভাবনা থাকে তবে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন বাড়াইবে। ফলে নিয়োগও বাড়িবে। আর যদি অধিক দ্রব্য লাভজনক দামে বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে তাহারা উৎপাদন ও নিয়োগ কমাইয়া দিবে; এবং ফলে দেশের সর্বত্র বেকার-সমস্যা দেখা দিবে।

[illegible]

এইরূপ মন্দাজনিত বেকারত্বের প্রতিকার করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বনের কথা বলা হয়—যেমন, যাহাতে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য উৎসাহ প্রদান করা, [illegible] চাহিদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা এবং সরকার কর্তৃক [illegible]ঘাট ও বাড়ীঘর নির্মাণ প্রভৃতি সমাজকল্যাণকর কাজকর্মের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

ইহার ফলে বেকার শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং লোকের হাতে টাকাপয়সা আসায় জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। ফলে শিল্পবাণিজ্যে আবার উন্নতি দেখা দেয়।

(২) সংঘাতজনিত বেকারত্ব (Frictional Unemployment) : অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চাহিদার অস্থায়িত্ব বা সাময়িক পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা কিছু সময়ের জন্য বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডক-শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডকে যখন জাহাজের ভিড় হয় তখন মাল-বোঝাই বা মাল-খালাসের জন্য বহু শ্রমিক কাজ পায়। ইহার পর আবার নূতন করিয়া জাহাজ আনাগোনা না-করা পর্যন্ত শ্রমিকদের সাময়িকভাবে বসিয়া থাকিতে হয়, অথবা কোন সাময়িক কাজের সন্ধান করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, কার্যের সংগঠনের ত্রুটি, যন্ত্রপাতি বিকল হওয়া অথবা মালমসলার অভাবের দরুনও শ্রমিকরা সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়িতে পারে। যেমন, বাড়ীঘর নির্মাণের সময় যদি সিমেণ্টের অভাব দেখা দেয় তাহা হইলে রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়ে। এমন অনেক কাজ আছে—যেমন, কণ্ট্রাক্টরের কাজ—যাহা একবার শেষ হইলে নূতন কাজ না পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা বেকার হইয়া থাকে। অনেক সময় আবার নিয়োগের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে শ্রমিকরা খবরাখবর রাখে না, অথবা অন্যত্র কর্মের সুযোগসুবিধা থাকিলেও শ্রমিকরা স্থান পরিবর্তন করিতে চাহে না। ইহাও তাহাদের সাময়িকভাবে বেকার থাকিবার অন্যতম কারণ।

সংঘাতজনিত বেকারত্বের বিভিন্ন রূপ ও কারণ

কোন কোন লেখক যখন সংঘাতজনিত বেকারত্বের (frictional unemployment) উল্লেখ করেন তখন এই সকল বেকারত্বেরই নির্দেশ করিয়া থাকেন।

এই ধরনের সাময়িক বেকারত্বের প্রতিবিধান হিসাবে বলা হয় যে নিয়োগ-সংস্থার (employment exchanges) মাধ্যমে চাকরির সুযোগসুবিধার সন্ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে; যাহাতে শ্রমের গতিশীলতা (mobility of labour) বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ, শ্রমিক যাহাতে অন্যত্র কাজ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়—তাহার জন্য শিক্ষাপ্রদান, অর্থসাহায্য প্রভৃতি করিতে হইবে; যেখানে সাময়িক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে সেখানে স্থায়ী নিয়োগ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে; ইত্যাদি।

ইহার প্রতিবিধান

(৩) সংগঠনজনিত বেকারত্ব (Structural Unemployment) : শিল্পের গঠন বা কাঠামো পরিবর্তনের ফলেও বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। এই ধরনের বেকারত্বকে সংগঠনজনিত বেকারত্ব (structural unemployment) বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিল্পের গঠন পরিবর্তিত হওয়ার মূলে দুইটি প্রধান কারণ বর্তমান—(ক) চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন, এবং (খ) শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়ন (technical progress)।

সংগঠনজনিত বেকারত্বের কারণ :

সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে অনেক দ্রব্যের চাহিদা স্থায়ীভাবে হ্রাস পাইতে পারে। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে। চাহিদা হ্রাস পাইবার

মূলে একাধিক কারণ বর্তমান থাকিতে পারে। লোকের রুচি ফ্যাসান প্রভৃতি পরিবর্তিত হইতে পারে; অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামের দ্রব্য আমদানি বা উৎপন্ন হইতে পারে; ইত্যাদি। যেমন, বর্তমানে আমাদের দেশে তাঁতের কাপড়ের চাহিদা কমিয়া গিয়া মিলের কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁতীরা বেকার হইয়া পড়িতেছে। নূতন শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তাহারা মিলের কাজ জুটাইতে পারিতেছে না। আবার রেয়ন ও নাইলনের (rayon and nylon) প্রচলনের ফলে আসল সিল্কের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় যাহারা সিল্কের কাপড় তৈয়ারি করিত তাহারা বহু পরিমাণে কর্মহীন হইয়া পড়িতেছে। বিদেশী প্রতিযোগিতা, বিদেশের বাজারে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসের ফলেও নিয়োগ কমিয়া যাইতে পারে। বিদেশের বাজারে আমাদের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে আমাদের পাটকল-শ্রমিকরা কিছু কিছু বেকার হইয়া পড়িতেছে।

ক। চাহিদার পরিবর্তন

আবার শিল্পের কলাকৌশলের পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা সাময়িকভাবে বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ইহাকে কলাকৌশলজনিত পরিবর্তন (Technological Unemployment) বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, আমাদের দেশে বলদ ও লাঙলের পরিবর্তে যদি ট্রাক্টর প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে অনেক কৃষি-শ্রমিকই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদন অধিক হয়, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিচার করিলে শিল্পের কলাকৌশলের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে ঐ যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত করিবার শিল্পও গড়িয়া উঠে। তাহাতেও কিছু বেকার শ্রমিক কাজ পায়। তবে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সাময়িকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব দেখা দেয়। শ্রমিকদের গতিশীলতা বাড়াইয়া, শিল্পগত শিক্ষা ও পুনঃশিক্ষার (training and retraining) ব্যবস্থা করিয়া, বাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য নিয়োগ-সংস্থা (employment exchanges) স্থাপন করিয়া পরিবর্তনজনিত বেকারত্বের বেশ খানিকটা প্রতিকার করা সম্ভব।

খ। শিল্পের কলা-কৌশলের পরিবর্তন

(৪) ঋতুগত বেকারত্ব (Seasonal Unemployment): অনেক কাজ আছে যাহা বৎসরের কয়েকমাস মাত্র চলে, অন্য সময় চলে না—যেমন, আমাদের দেশের কৃষিকার্য। কৃষক বৎসরে কয়েকমাস মাত্র কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকে, অন্য সময়ে তাহার কোন কাজ থাকে না। আবার গ্রীষ্মকালে অনেকে আইসক্রীম বরফ বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জন করে, কিন্তু শীতকালে তাহাদের [illegible] থাকে না। ছুটির সময়ে আমাদের দেশে পুরী দার্জিলিং নৈনিতাল প্রভৃতি [illegible] খুব ভিড় হয় বলিয়া অনেক লোকের নিয়োগ বাড়ে। কিন্তু যাত্রীদের ভিড় [illegible] গেলেই আবার নিয়োগ কমিয়া যায়।

ঋতুগত বেকারত্ব

এইরূপ বেকারত্বের প্রতিবিধানের জন্য অন্যান্য উপজীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন, গ্রামাঞ্চলে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার করা হইলে যখন ক্ষেতে কাজ থাকে না তখন কৃষকরা এই সকল কাজে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। সময় বুঝিয়া সরকারী কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়াও ঋতুগত বেকারদের নিয়োগ করা যায়। এই কারণে কৃষকদের যখন ক্ষেতখামারে কাজ থাকে না তখন জিলাবোর্ড প্রভৃতি পথঘাট নির্মাণের কার্য সুরু করে।

ইহার প্রতিকার

ভারতে বেকার-সমস্যা (Unemployment Problem in India) :

ভারতে বেকার-সমস্যার বৈশিষ্ট্য :

অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশে বেকার-সমস্যার কিছুটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য জনসংখ্যার একাংশকে সর্বদাই বেকারাবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত ব্যাপক অর্ধ-নিয়োগ (under-employment) বা ছদ্ম বেকারত্ব (disguised unemployment) ভারতের বেকার-সমস্যার একটি প্রধান দিক। শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং কুটির ও গ্রামীণ শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিতে ভিড় জমাইয়াছে। জমিতে যত লোক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন তাহার অধিক লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। এই অতিরিক্ত লোকদিগকে জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির উৎপাদন হ্রাস পায় না। এই অবস্থাকেই অর্ধ-নিয়োগ বা ছদ্ম বেকারত্ব বলা হয়। ইহা ব্যতীত কৃষিতে বারমাস কাজ থাকে না। সুতরাং বৎসরের কয়েক মাস কৃষককে বেকার অবস্থায় কাটাইতে হয়।

১। এ-দেশে বেকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক

২। ছদ্ম বেকারত্ব—সমস্যার একটি দিক

কৃষিতে অর্ধ-নিয়োগ ও সাময়িক বেকারত্ব নগরাঞ্চলের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। কর্মহীন জনসংখ্যা আসিয়া শিল্পাঞ্চলে ভিড় করে এবং শিল্পাঞ্চলের বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে শিল্প-শ্রমিকদের মজুরির হারও হ্রাস পায়। কৃষিগত ও শিল্পগত বেকার-সমস্যা ছাড়াও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতে মোটামুটিভাবে তিন ধরনের বেকার-সমস্যা রহিয়াছে: (১) কৃষিগত বেকার-সমস্যা, (২) শিল্পগত বেকার-সমস্যা, এবং (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা।

৩। ভারতে তিন ধরনের বেকার-সমস্যা :

কৃষি-বেকার ও অর্ধ-নিয়োগের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইল কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ, সেচের উন্নতিসাধন, উন্নত ধরনের বীজ ও সারের ব্যবহার, পালটি শস্য উৎপাদন (rotation of crops), জোতের সংহতি-সাধন ও আয়তনবৃদ্ধি, বিক্রয়করণের উন্নতিসাধন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারসাধন, ইত্যাদি। সংগে সংগে জমির উপর চাপ কমাইতে হইলে শিল্পের প্রসারসাধন করিয়া অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগ করিতে হইবে।

ক। কৃষিগত বেকার-সমস্যা ও ইহার সমাধান

শিল্পাঞ্চলের বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্যও প্রয়োজন দ্রুত শিল্পপ্রসারের। ই

জন্য সরকার ও শিল্পপতিগণ উভয়কেই মূলধন-গঠন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পথঘাট ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি সমাজসেবামূলক কার্যাদি সুরু করিলে সাময়িকভাবে বেকারের সংখ্যা কমানো সম্ভব। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত বেকার-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা যায় না।

খ। শিল্পাঞ্চলের বেকার-সমস্যা ও ইহার সমাধান

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার আসল কারণ দেশের অনগ্রসরতা। সুতরাং দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের ব্যাপক প্রসারের দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সংগে সংগে পেশাগত কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, পাঠ্যবস্তুর বিভিন্নতা প্রভৃতি শিক্ষা-সংস্কারও করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৫৫ সালে একটি অনুসন্ধান দল (Study Group) নিযুক্ত করা হয়। এই দল ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠা, শিক্ষিতদের মধ্যে হাতের কাজ করিবার অনিচ্ছা অপসারণ এবং সমবায়িক দ্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থার (cooperative goods transport) প্রবর্তন প্রভৃতি পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছে।

গ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা ও ইহার সমাধান

সকল প্রকার বেকার-সমস্যার সহিত জড়িত আর একটি সমস্যা রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করিলে বেকারের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিবে।

ঘ। জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত বেকার-সমস্যা

আমাদের সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য উপরি-উক্ত পন্থাগুলি অবলম্বন করিয়াছে। তবে পরিকল্পনা কমিশন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে যে বেকার-সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধানের জন্য বেশ সময় লাগিবে। মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হিসাব করা হইয়াছিল যে পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১ কোটি লোক নূতন নিয়োগপ্রার্থী হইবে। ইহা ব্যতীত ৫৩ লক্ষের মত পুরাতন নিয়োগপ্রার্থী বা বেকার রহিয়াছে। সুতরাং, মোট নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে ১ কোটির বেশী নূতন নিয়োগের ব্যবস্থার আশা করা হয় নাই। অতএব, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনানুযায়ীই পরিকল্পনার শেষে ৫৩ লক্ষ বেকার থাকিয়া যাইবার কথা। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থা ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি পরিকল্পনা কার্যকর হইলে অর্ধ-নিয়োগের সমস্যা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইবে, এইরূপ আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছাঁটকাট এবং শ্রমিকের অকল্পিত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে দেখা গেল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫৩ লক্ষের স্থলে ৯০ লক্ষ লোক বেকারাবস্থায় রহিয়াছে। ইহার সহিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ৭০ লক্ষের মত নূতন কর্মপ্রার্থী যুক্ত [illegible] এইরূপ অনুমান করা হইতেছে। এই নূতন কর্মপ্রার্থীর এক-তৃতীয়াংশের মত [illegible]ঞ্চলে হইবে। সুতরাং, বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট

পরিকল্পনার সাহায্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

২ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় যে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা হয় যে ১ কোটি ৪০ লক্ষের অধিক নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। ইহার মধ্যে কৃষির বাহিরে নূতন কর্মসংস্থান হইবে ১ কোটি ৫ লক্ষ আর কৃষিতে নূতন কর্মসংস্থান হইবে ৩৫ লক্ষের মত। সুতরাং অবস্থা যাহাতে অবনতির দিকে না যায় তাহার জন্য আরও ৩০ লক্ষ লোকের জন্য নূতন কর্মসংস্থান করা প্রয়োজন। কারণ, তাহা হইলেই তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে নূতন কর্মপ্রার্থী ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। দেখা যাইতেছে, নিয়োগের সংস্থানের কতকটা আশা করা হইলেও বেকার সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিপুল সংখ্যক লোক (১.৫ কোটি হইতে ১.৮ কোটি) অর্ধ-বেকার অবস্থায় দিনযাপন করে। ইহাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাই তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে করা সম্ভব হইবে না। অতএব অদূর ভবিষ্যতে কোন দিক দিয়াই বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। বরং সমস্যা ব্যাপকতর আকার ধারণ করিবে। এ-সম্বন্ধে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রসংগে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের পরিমাণ

সংক্ষিপ্তসার

সম্পদ সৃষ্টি দ্বারা জাতীয় আয়বৃদ্ধি শ্রমিকসংখ্যার উপর নির্ভর করে, এবং শ্রমিকসংখ্যা নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর। সুতরাং যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব: জনসংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে—(ক) ম্যালথাসের তত্ত্ব, এবং (খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।

ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে যে-কোন দেশের জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিন দেশে খাদ্য-সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়ে। তখন মহামারী, অনাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য ম্যালথাসের মতে বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে আদৌ বিবাহ না করিয়া ইত্যাদি পন্থার দ্বারা দেশের জনসংখ্যাকে কম রাখিতে হইবে।

নানাদিক দিয়া ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে—যথা, ১। তিনি বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনার কথা বিচার করেন নাই; ২। তিনি মাত্র খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন; ৩। শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যে কমিয়া আসে সে-ধারণা তাঁহার ছিল না; ইত্যাদি।

তবুও বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন কম বৃদ্ধি পায়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা হয়। ইহাতে যদি দেখা যায় যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তবে বুঝিতে হইবে দেশে জনাধিক্য ঘটে নাই। মাথাপিছু আয় যখন কমিতে আরম্ভ করিবে তখন হইতেই জনাধিক্যের অবস্থা সুরু হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা: ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন কম; ভারতকে নিয়মিত খাদ্য আমদানি করিয়া [illegible]

লোককে খাওয়াইতে হয়। খাদ্য শুধু আবার অপ্রচুর নহে, অপুষ্টিকরও বটে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে কিন্তু ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই—কারণ, মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে মানিয়া লইলেও বলা যায় যে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এইজন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

শ্রমের যোগান: শ্রমের যোগান নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার কর্মক্ষম ব্যক্তিগণের দক্ষতা ও কাযের সময়ের উপর। শ্রমিকের দক্ষতা আবার (১) জাতিগত বৈশিষ্ট্য, (২) জলবায়ু, (৩) শ্রমিকের আয় ও জীবনযাত্রার মান, (৪) কার্যের সর্তাবলী, (৫) শিক্ষা, (৬) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় শ্রমিক: ভারতীয় শ্রমিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—কৃষি-শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিক। কৃষি-শ্রমিকদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি কঠোর। বর্তমানে ইহার উন্নতিকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকেরও নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যথা, ১। ভারতে স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক দল এখনও গড়িয়া উঠে নাই, ২। শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা নাই, ৩। অনুপস্থিতির হার অতি অধিক, ৪। দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে, ৫। উৎপাদনক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম। এই সকল ত্রুটির প্রতিবিধানকল্পে শিল্পের প্রসার, বাসগৃহের সুবন্দোবস্ত, মজুরির হার বৃদ্ধি, কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতিসাধন, শ্রমিক-সংঘকে শক্তিশালিকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যা: বেকার-সমস্যা বর্তমান দিনের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা। সাধারণত চারি প্রকারের বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায়: (১) শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্ব, (২) সংঘাতজনিত বেকারত্ব, (৩) সংগঠনজনিত বেকারত্ব, এবং (৪) ঋতুগত বেকারত্ব।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

ভারতের বেকার-সমস্যা: ভারতের বেকার-সমস্যার দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়: ১। এ-দেশে বেকারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, ২। বহু পরিমাণে ছদ্ম বেকারত্ব রহিয়াছে।

ভারতের বেকার-সমস্যা তিন ধরনের: ১। কৃষিগত বেকার-সমস্যা, ২। শিল্পগত বেকার-সমস্যা, এবং ৩। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা। ইহার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত বেকার-সমস্যাও রহিয়াছে।

কৃষিগত বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষির উন্নয়ন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারসাধন এবং বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

শিল্পাঞ্চলের বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য শিল্প ও সেবামূলক কার্যাদির প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন, হাতের কাজ করিবার অনিচ্ছা দূরিকরণ ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিয়োগ সম্প্রসারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। তবুও পরিকল্পনার শেষে ৫৩ লক্ষের মত বেকার থাকিয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে পরিকল্পনান্তে ৫৩ লক্ষ নহে, ৯০ লক্ষ নিয়োগপ্রার্থী রহিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত তৃতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি ৭০ লক্ষের মত নূতন কর্মপ্রার্থী যুক্ত হইবে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় ২ কোটি ৬০ লক্ষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বভাবতই তৃতীয় পরিকল্পনান্তে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাধীনে ভারতে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। [illegible] অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য বেকার-সমস্যার সমাধানে সমর্থ

প্রশ্নোত্তর

1. What are the signs of overpopulation in a country? Is India overpopulated? (C. U. 1951).

কোন দেশের জনাধিক্যের লক্ষণ কি কি? ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে?

[ইংগিত: ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে খাদ্যাভাবই জনাধিক্যের লক্ষণ। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যাওয়া।

ম্যালথাসের তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে; কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের দিক হইতে ঘটে নাই। যাহা হউক, ভারতের দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন আছে।...... (৬৭-৬৯ এবং ৭১-৭৫ পৃষ্ঠা)]

2. Discuss the problem of India's population and food supply. (H. S. (H) 1961)

ভারতের জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগান সম্পর্কিত সমস্যার আলোচনা কর। [৭২-৭৫ পৃষ্ঠা]

3. Examine the connection between population and food supply. (H. S. (H) Comp. 1962)

জনসংখ্যা ও খাদ্য যোগানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [৬৭-৭১ পৃষ্ঠা]

4. Analyse the factors that determine the supply of Labour in a country. (C. U. 1948)

কোন দেশে যে-যে বিষয় শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর। [৭৫-৭৯ পৃষ্ঠা]

5. What do you mean by Efficiency of Labour? Describe the various factors upon which the Efficiency of Labour depends. (H. S. (C) Comp. 1960)

শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে কি বুঝ? যে-যে বিষয়ের উপর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে তাহাদের বর্ণনা কর। [৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা]

6. What are the chief defects of Indian Industrial Labour and what, in your opinion, are remedies of these? (H. S. (H) Comp. 1960)

ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের প্রধান ত্রুটিগুলি কি কি? কিভাবে উহাদের দূর করা যাইতে পারে? [৮০-৮১ পৃষ্ঠা]

7. Discuss the principal types of Unemployment in modern society and indicate the remedies that are adopted for the mitigation of Unemployment.

বর্তমান সমাজের প্রধান প্রধান ধরনের বেকারত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর, এবং বেকারত্ব হ্রাসের জন্য যে-যে প্রতিবিধান অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা বিবৃত কর। [৮১-৮৫ পৃষ্ঠা]

8. Discuss the Unemployment Problem in India. What measures have been adopted to tackle it?

ভারতের বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ইহার প্রতিবিধানকল্পে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে? [৮৫-৮৭ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন বলা হয়। ইহাও বলা হইয়াছে যে মূলধন অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।* এইজন্য মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ('produced means of production') বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায়—যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় তাহাকেই মূলধন বলে—যেমন, যন্ত্রপাতি, গরু-লাঙল, বীজ-সার ইত্যাদি।

মূলধন—উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একই দ্রব্য ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে মূলধন কিংবা ভোগ্যদ্রব্য হইতে পারে। যেমন, ডাক্তার যখন তাঁহার মোটরগাড়ী চড়িয়া রোগী দেখিবার জন্য বাহির হন তখন উহা মূলধন; কিন্তু তিনি যখন ঐ গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হন তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য। কয়লা যখন কারখানায় ব্যবহৃত হয় তখন উহা মূলধন; কিন্তু বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য।** মূলধন তিন প্রকারের হইতে পারে —(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন, এবং (৩) ঋণ মূলধন।

তবে ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে

তিন প্রকারের মূলধন

বাস্তব মূলধন (Concrete or Real Capital) : কারখানার বাড়ীঘর, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ব্যবসায়ীর মজুত মাল প্রভৃতি হইল বাস্তব মূলধন। ইহারা উৎপাদন বা ব্যবসায়ে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যবসায়ীর মূলধনও (Trade Capital) বলা হয়।

সমাজের দিক হইতে উপরি-উক্ত দ্রব্যাদি ছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতিকেও বাস্তব মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ ইহারাও সমাজের উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে।

আর্থিক মূলধন (Money Capital) : টাকাকড়িকেই আর্থিক মূলধন বলা হয়। এই মূলধন ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন মাত্র, সমাজের দিক হইতে নহে। টাকাকড়ি যদি সমাজের দিক হইতে মূলধন হইত তবে মাত্র নোট ছাপাইয়াই যে-কোন দেশ ধনী হইতে পারিত, উৎপাদনবৃদ্ধির কোন প্রয়োজনই হইত না। জিনিসপত্রের

---

* [illegible]

** [illegible]১ পৃষ্ঠা দেখ।

উৎপাদন না বাড়াইয়া শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইয়া গেলে মাত্র দামই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আর্থিক মূলধন বা টাকাকড়িকে প্রকৃত মূলধনে পরিণত করিতে হইবে। ইহা করিতে পারা যায় বলিয়াই ব্যবসায়ী টাকাকড়িকে মূলধন বলিয়া গণ্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা থাকিলে সে ঐ টাকা দিয়া যে-কোন সময় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি কিনিতে পারে।

ঋণ মূলধন (Loan Capital): শেয়ার, বণ্ড, সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিফিকেট) ইত্যাদিকে ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন বলিয়া গণ্য করা যায়—কারণ, এগুলি হইতে তাহার আয় হয়। এগুলি বিক্রয় করিয়া সে প্রকৃত মূলধন-দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে পারে। সমাজের দিক হইতে এই সকল শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি কিন্তু মূলধন নহে—কারণ, এগুলি দ্বারা সমাজের কোন উৎপাদনকার্য চলে না।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

অতএব, ব্যক্তির দিক হইতে প্রকৃত মূলধন, টাকাকড়ি এবং ঋণপত্র সকলই মূলধন বলিয়া গণ্য হইলেও, সমাজের দিক হইতে বাস্তব মূলধনই একমাত্র মূলধন।

সম্পদ ও মূলধন (Wealth and Capital): এখন আমরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই দুইটি দিক হইতে মূলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করিতে পারি। সমাজের দিক হইতে সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদই মূলধন নয়। যখন কোন সম্পদ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন ঐ সম্পদ মূলধন নয়। যেমন, পূর্বের উদাহরণ অনুসারে বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ 'সম্পদ' ভোগ্যদ্রব্য, মূলধন নয়; কিন্তু কারখানায় যখন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা মূলধন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন সম্পদ মূলধন পর্যায়ে পড়িবে কিনা তাহা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর। সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হইলেও ঐ সম্পদকে মূলধন বলিয়া ধরা হয় না; পুনরায় অন্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে তবেই ঐ সম্পদ মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

এখানে আরও বলা যাইতে পারে, ব্যক্তির দিক হইতে এরূপ সকল জিনিসই মূলধন যাহা দ্বারা কোন-না-কোন ভাবে তাহার আয় হয়। যেমন, টাকাকড়ি ধার দিয়া কোন ব্যক্তি আয় করিতে পারে। সুতরাং টাকাকড়ি তাহার নিকট সম্পদ এবং মূলধন উভয়ই; কিন্তু সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ কিংবা মূলধন কোনটাই নয়।*

মূলধন ও জমি (Capital and Land): মূলধন ও জমির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহার আলোচনাও করা যাইতে পারে। মূলধনের সহিত জমির

জমির সহিত মূলধনের পার্থক্য

অনেক সাদৃশ্য আছে। মূলধন যেমন সম্পদ জমিও তেমনি সম্পদ; মূলধন যেমন অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় জমিও তেমনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা মূলধন সৃষ্টি

---

* ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

করে। জমির বেলা[illegible] এ কথা খাটে না। জমি প্রকৃতির দান; মানুষের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহা ছাড়া জমির যোগানও অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা যায় না। অপরপক্ষে, মূলধনের পরিমাণ মানুষ নিজের চেষ্টায় বাড়াইয়া লইতে পারে। এই সকল পার্থক্যের জন্যই জমিকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা না গেলেও উহার উৎপাদিকাশক্তিকে সেচ-ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ানো যাইতে পারে। জমির এই বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তিকে মূলধন এবং উহার আয়কে সুদ বা মূলধনের আয় হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে।

জমিতে মূলধন নিবদ্ধ থাকিতে পারে

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital) : দেখা গেল যে মূলধন—(ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আর্থিক মূলধন, এবং (গ) ঋণ মূলধন এই তিন প্রকারের হইতে পারে। নিম্নলিখিত কয়েকভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়:

(১) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন (Private, Collective and National Capital): ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-মূলধন থাকে এবং যাহা হইতে ব্যক্তি আয় ভোগ করে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে; অপরদিকে সমাজের বা সাধারণের যে-মূলধন থাকে তাহাকে সামগ্রিক মূলধন বলা হয়। সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক মূলধন মিলিয়া হইল জাতীয় মূলধন।

১। ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন

(২) স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital): যে-মূলধন উৎপাদনকার্যে একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় না তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে—যেমন, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অপরদিকে কাঁচামাল জ্বালানি বীজ সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মূলধনের কার্য একবার ব্যবহারেই শেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন পৌনঃপুনিক মূলধন (recurring capital) নামেও অভিহিত হয়, কারণ ইহা বারবার আবর্তন করিতে থাকে। যেমন, বীজ হইতে ধান্য উৎপাদন করা হইল; এখন এই উৎপন্ন ধান্য হইতে কিছু অংশ আবার বীজ বা মূলধন হিসাবে রাখিয়া দিতে হইবে। উৎপাদনকার্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি মূলধন একেবারেই ফেরত পাওয়া যায়; কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁতী কাপড় বুনিবার জন্য যখন সুতা ক্রয় করে তখন সে আশা করে যে একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই উহার দাম ফেরত পাইবে। কিন্তু যে-অর্থ ব্যয় করিয়া সে তাঁত বসায় তাহা ফেরত পাইবার আশা করে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে।

২। স্থায়ী ও চলতি মূলধন

(৩) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন (Sunk or Specific and Floating or Non-Specific Capital): নিবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা বিশেষ একপ্রকার [illegible] নিবদ্ধ থাকে—যাহাকে অন্য কোনপ্রকার উৎপাদনকার্যে সহজে

লাগানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, রেল-ইঞ্জিনের [illegible] যাইতে পারে; ইহা মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্যেই ব্যবহার্য। আবার ক্যামেরা দিয়া শুধু ছবি তোলাই যায়। কিন্তু কয়লা বা আর্থিক মূলধন বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহারা হইল অনিবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ।

৩। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital): মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করিলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদির উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, ২০ মাইল দূরে ১০০ কুইণ্টাল দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে। একজন মোটরলরী-চালক লরী চালাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু মোটরলরী ব্যবহার না করিয়া শুধু শ্রমিকের সাহায্যে এই কার্য করিতে গেলে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে এবং সময়ও অধিক লাগিবে। সুতরাং শ্রমের সহিত মূলধন—অর্থাৎ, মোটরলরী জুড়িয়া দেওয়ায় কাজ অতি দ্রুত ও অল্প পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতেছে। আবার একজন লোক সেলাই-এর কলের দ্বারা যত সেলাই করিতে পারে খালি হাতে ততটা পারে না। সুতরাং দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ও তত বাড়িয়া যাইবে। বর্তমানে ভারতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও যে উৎপাদন কম তাহার অন্যতম কারণ হইল মূলধনের অপ্রাচুর্য।

কার্যাবলী:
১। শ্রমিকের দক্ষতা-বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন-বৃদ্ধি করা

মোট উৎপাদন আর একটি কারণেও বৃদ্ধি পায়। ইহা হইল সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। বিভিন্ন অংশের কাজের জন্য যতই যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয় ততই উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, বাটার কারখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে জুতা তৈয়ারির কাজ অনেকগুলি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে স্বল্প ব্যয়ে জুতার উৎপাদনও অধিক হয়। মূলধনের ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ বা বিশেষিকরণ (specialisation) ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়।

২। শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা

মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। কোন দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জীবন-ধারণের জন্য মজুরি না দেওয়া হইলে উৎপাদনকার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে না। উৎপাদক উৎপাদনের সময় মূলধনের সাহায্যে শ্রমিকদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং পরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উহা পূরণ করিয়া লয়।

৩। উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখা

পরিশেষে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকেও মূলধনের অন্যতম কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল এই মূলধনের সাহায্যেই ক্রয় করা হইয়া থাকে।

৪। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করা

মূলধনবৃদ্ধির উপায় (Factors governing Accumulation of Capital) : আমরা দেখিয়াছি যে মূলধন প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যে-দেশে মূলধনের পরিমাণ অধিক সে-দেশের জাতীয় উৎপাদনও অধিক। আমাদের দেশ যে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনগ্রসর তাহার অন্যতম কারণ আমাদের মূলধনের সংগতি বিশেষ কম। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা, যানবাহন প্রভৃতি বাস্তব মূলধন গড়িয়া না তুলিতে পারিলে দেশের উৎপাদন বাড়িবে না। এই সকল বাস্তব মূলধন সৃজনকেই 'মূলধন-গঠন' (capital formation) বলা হয়।

মূলধন-গঠন কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন হইল, মূলধন সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার উপায় কি ? প্রথমেই বলিতে হয় যে মূলধন সৃষ্টি নির্ভর করে সঞ্চয়েব উপর। মানুষ যখন ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখে তখনই সঞ্চয় সম্ভব হয়। অতএব বলা যায়, কোন দেশ মূলধনবৃদ্ধি করিতে চাহিলে ঐ দেশের অধিবাসীদিগকে বর্তমান ভোগকে সংকুচিত করিতে হইবে। বিষয়টিকে একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একটি দ্বীপে একদল লোক মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা দেখিল যে বেশী নৌকা তৈয়ারি করিতে না পারিলে অধিক পরিমাণে মাছ ধরা যাইতেছে না। সুতরাং ইহারা নৌকা তৈয়ারি করিবার সিদ্ধান্ত করিল। এখন তাহারা সকল সময় মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যয় না করিয়া কিছুটা সময় নৌকা তৈয়ারিতে নিয়োগ করিল। অথবা একদল লোক নৌকা তৈয়ারি করিতে থাকিল, আর অপর দল মৎস্য শিকারে নিযুক্ত রহিল। নৌকা তৈয়ারি না হওয়া পর্যন্ত সকল লোক মৎস্য ধরার কার্যে সকল সময়ই নিযুক্ত থাকিতে পারিতেছে না ; ফলে ঐ সময় অল্প মৎস্যের দ্বারা তাহাদের জীবিকানির্বাহ করিতে হইতেছে। কিন্তু যখন নৌকা তৈয়ারি হইয়া গেল তখন অনেক বেশী মৎস্য ধরা পড়িতে লাগিল ; ফলে পূর্বের তুলনায় ভোগের পরিমাণ অধিক হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্বীপের লোক সাময়িকভাবে ভোগ কমাইয়াছিল বলিয়াই তাহারা মূলধন হিসাবে নৌকা তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর

সঞ্চয় বলিতে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা বুঝায়

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন কৃষক তাহার জমিতে উৎপন্ন সমস্ত শস্য খাইয়া ফেলিতে পারে অথবা সবটা না খাইয়া একাংশ জমাইয়া যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি মূলধন ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করিতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা যে গ্রহণ করিবে [illegible] তাহার উৎপাদন অধিক হইবে।

সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিতে দেখা যায়। দেশের উৎপাদনের উপকরণের সমস্তটাই যদি বর্তমান ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মূলধন-দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান ভোগ হইতে কতকটা বিরত থাকিলেই উৎপাদনের উপকরণের একাংশকে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। বর্তমান সমাজে প্রায় সমস্ত কাজ-কারবারই টাকাকড়ি বা অর্থের মাধ্যমে চলে। কাজেই মূলধন-বৃদ্ধির উপরি-উক্ত পদ্ধতিটি সহজে ধরা পড়ে না। তাহা না হইলেও মূলধন-গঠনের প্রণালী একই। লোকে যখন তাহাদের আয়ের একাংশ সঞ্চয় করে তখন তাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় হইতে বিরত থাকে। ইহার ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান এই সকল ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহাদের চাহিদা ও নিয়োগ কমিয়া যায়। অপরদিকে লোকে তাহাদের সঞ্চয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সরকারী ঋণপত্র, ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করে। ইহারা লোকের সঞ্চয় লইয়া মূলধন বাড়াইবার কাজে লাগায়। ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান পূর্বে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহার একাংশ মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, এবং দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে:

ব্যক্তির মত দেশকেও সঞ্চয় দ্বারা মূলধনবৃদ্ধি করিতে হয়

সঞ্চয় বিনিয়োজিত হইয়া মূলধনবৃদ্ধি করে

মোট আয়

ব্যয়ের পরিমাণ	সঞ্চয়ের পরিমাণ
ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন	মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন (মূলধন-গঠন)

দেখা যাইতেছে, মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয় (savings) এবং ঐ সঞ্চয়ের বিনিয়োগের (investment) উপর নির্ভর করে।

সঞ্চয় নির্ধারক দুইটি বিষয়:
১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা,
২। সঞ্চয়ের ক্ষমতা

সঞ্চয় আবার নির্ভর করে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (will to save) এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতার (power to save) উপর।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়:

১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি

২। সমাজে প্রতিপত্তি-লাভের ইচ্ছা

(ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (Will to Save): লোকে নানা কারণে বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয়। ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা, পুত্রকন্যার শিক্ষাদীক্ষা, বিবাহাদির ব্যয়নির্বাহ, নিজের হঠাৎ মৃত্যু হইলে পরিবারের ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্য মানুষ দূরদৃষ্টিবশত সঞ্চয় করে। আবার বসতবাটি নির্মাণ, মোটরগাড়ী ক্রয় প্রভৃতি ভোগের ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অর্থশালী হইয়া সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অথবা ব্যবসায়ে সফলতালাভের উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিতে মনোযোগী হয়। আবার কৃপণ ব্যক্তিরা স্বভাববশতই সঞ্চয় করিয়া চলে।

ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয়কার্য সম্পাদিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। সঞ্চয়ের এই সকল প্রেরণা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। দেশে শান্তিশৃংখলা বজায় এবং জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে সঞ্চয় করিতে চাহে না। কারণ, ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন সঞ্চয় করা নিরর্থক মনে হয়।

৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

টাকাকড়ি বিনিয়োগ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, ডাক-বিভাগের সেভিংস্ ব্যাংক প্রভৃতি যত গড়িয়া উঠে দেশের লোকের সঞ্চয়ও তত বাড়িয়া যায়।

৪। বিনিয়োগের সুব্যবস্থা
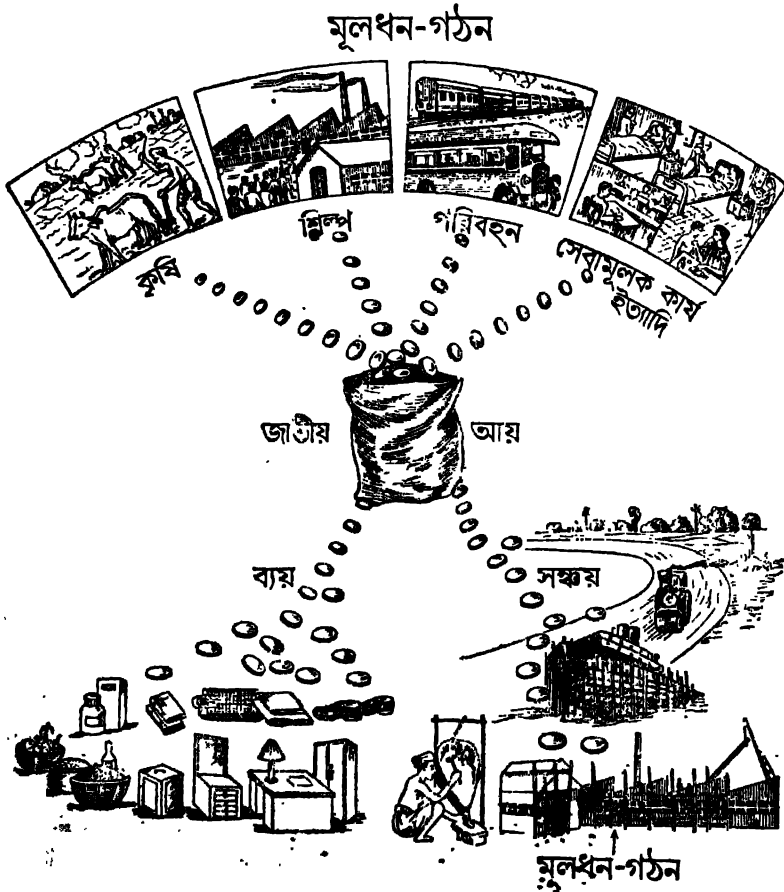
সঞ্চয় শিক্ষাবিস্তারের সহিত সম্পর্কিত। দেশে যতই শিক্ষার বিস্তার ঘটিবে লোকে ততই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হইবে; তাহাদের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে; এবং ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

শিক্ষাবিস্তার

পরিশেষে বলা হয় যে, সুদের হারের উপরও সঞ্চয় নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে লোকে অধিক আয়বৃদ্ধির আশায় অধিক সঞ্চয় করে।

৬। সুদের হার

(খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Power to Save): সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় করিবার জন্য লোকের আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট হওয়া চাই। যে দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় সামান্য এবং অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় যোগানই কষ্টকর সেখানে লোকের সঞ্চয় করার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং আয় যত বাড়িবে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বাড়িবে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

মূলধনবৃদ্ধি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে
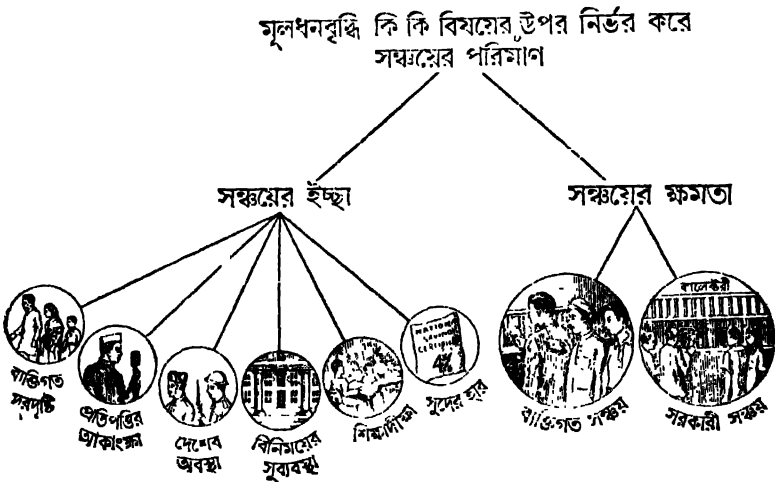
উপরি-উক্ত স্বেচ্ছামূলক ব্যক্তিগত সঞ্চয় (voluntary personal savings) ছাড়া বর্তমানে সরকারও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করিয়া থাকে। যখন সরকারী রাজস্ব সাধারণ সরকারী ব্যয় হইতে অধিক হয়, তখন এই উদ্বৃত্তকে বাজেট-উদ্বৃত্ত (budget surplus) বলা হয়। ইহা আবশ্যিক সামাজিক সঞ্চয় (compulsory community savings) বলিয়াও অভিহিত হয়, কারণ সরকার সমাজকে এই সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে। সরকার এই সঞ্চয়কে মূলধন-গঠনে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সরকার ঋণ করিয়া অথবা মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে মূলধন-গঠনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এ-ক্ষেত্রেও সঞ্চয় আসে সমাজের নিকট হইতে। তবে ঋণের বেলায় সঞ্চয় হইল স্বেচ্ছামূলক; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির বেলায় সঞ্চয়

সরকারী সঞ্চয়

হইল অনিচ্ছামূলক (involuntary)। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় এবং লোকের ভোগ হ্রাস পায়।

ভারতে মূলধনবৃদ্ধি (Capital Accumulation in India): প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও জনবলে সমৃদ্ধ হইলেও ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠিত হয় নাই। কৃষির ক্ষেত্রে এখনও চাষীরা মান্ধাতা আমলের নিকৃষ্ট ধরনের বলদ ও লাঙল লইয়াই কোনরকমে চাষবাস করিয়া থাকে। বর্তমানে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও কৃষককে আকাশের দিকে বৃষ্টিপাতের জন্য চাহিয়া থাকিতে হয়। ভারত গ্রামময় হইলেও গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট অনুন্নত এবং বর্ষার সময় একপ্রকার অগম্য হইয়া পড়ে। রেল ষ্টীমার বিমান মোটরবাস প্রভৃতি যানবাহনের উন্নতিবিধানের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। শিল্পক্ষেত্রেও আমরা যথেষ্ট বাস্তব মূলধন গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। কলকারখানা যথেষ্ট পরিমাণে গড়িয়া উঠে নাই এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করাও সম্ভব হয় নাই। বাসগৃহেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাস্তব মূলধনের সংগতি আমাদের অত্যল্প।

যথেষ্ট প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সত্ত্বেও মূলধন-গঠনে ভারত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে

এখন প্রশ্ন, মূলধন-গঠনের পথে প্রতিবন্ধক কি কি এবং কিভাবে ইহাদের দূর করা যায়? পূর্বেই বলিয়াছি যে মূলধন-গঠন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। ভারতে লোকের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা অতি সামান্য। সঞ্চয় হইল আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য। অধিকাংশ লোকের আয় এতই সামান্য যে তাহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানের পক্ষেও পর্যাপ্ত নহে।* যেখানে অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান জোটানো অধিকাংশের পক্ষে কষ্টকর সেখানে কাম্য হারে সঞ্চয়ের আশা করিতে পারা যায় না।

কেন পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে
১। প্রথম কারণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা

মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। শিল্পপতিগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা থাকিলেও সরকার শীঘ্রই ব্যবসাবাণিজ্য কাড়িয়া লইবে এই ভয়ে তাহাদের বিনিয়োগের ইচ্ছা কমিয়া গিয়াছে।** আবার ধনিক ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আড়ম্বর-পূর্ণ ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সঞ্চয়যোগ্য অর্থের অপব্যয় ঘটিতেছে। সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবেও সাধারণ লোকের মধ্যে কতকটা অপচয়জনক ব্যয়বাহুল্য দেখা যায়। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় এইরূপ ব্যয় করা হইয়া থাকে। ইহার পর আছে ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। দেশের মোট আয় বৃদ্ধি পাইলেও বর্ধিত জনসংখ্যাকে

সঞ্চয়-স্বল্পতার বিভিন্ন কারণ—আয়ের স্বল্পতা, সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস ইত্যাদি

---

* ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

** এই ভয়কে জাতীয়করণের ভয় (fear of nationalisation) বলা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে [illegible] পরিকল্পনা গ্রহণের পর হইতে এই ভয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক, জীবনবীমা [illegible] জাতীয়করণ এই ভয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

খাওয়াইয়া-পরাইয়া রাখিতে ইহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং মূলধন-গঠনের জন্য বর্ধিত আয়ের প্রয়োগ বিশেষ সম্ভব হয় না।

২। দ্বিতীয় কারণ সঞ্চয়ের অপপ্রয়োগ

ভারতে যে শুধু সঞ্চয়ের পরিমাণই অপ্রচুর তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের ব্যবহারও জাতীয় কল্যাণের অনুকূল নহে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যবসাদারেরা মালমজুত, চোরাকারবার, ফটকাবাজার প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতেছে। ইহা ব্যতীত সোনারূপা, গহনা-পত্রাদিতে লোকের সঞ্চয় অকাম্যভাবে আটকাইয়া রহিয়াছে।*

বর্তমানে মূলধন-গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে

বিনিয়োজিত অর্থে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের দিকেও সেদিন পর্যন্ত এ-দেশে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। শিল্পপতিগণ ভোগ্যদ্রব্যই উৎপাদন করিয়াছে; আর বিদেশী সরকার এ-বিষয়ে একপ্রকার উদাসীনই ছিল। সম্প্রতি অবশ্য জাতীয় সরকার পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধন গড়িয়া তুলিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে।

বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার সঞ্চয়সংগ্রহ ও মূলধন-গঠনের নানা চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যে প্রথম হইল জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ।

কিভাবে এই কার্য করা হইতেছে

১। ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগ্রহের প্রচেষ্টা

সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্ল্যান সার্টিফিকেট, প্রাইজ বণ্ড ইত্যাদিতে টাকা বিনিয়োগ করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে; গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক, ডাকঘর প্রভৃতির মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও সংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমাকে মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োগ করিতেছে; জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিয়া (nationalisation) এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্যে দেশের অর্থকে মূলধন-গঠনে নিয়োজিত করিতেছে; রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্প ও রেলপথের আয়কে পরিকল্পনার কার্যে বিনিয়োগ করিতেছে।

২। কর-পদ্ধতির সংস্কার

৩। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

মূলধনের দ্বিতীয় সূত্র হইল কর। সম্প্রতি সরকার আয়কর, উৎপাদন-শুল্ক ছাড়াও মৃত্যুকর, মূলধন-লাভকর, সম্পদকর, দানকর প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করিয়া শিল্পোন্নয়নকার্যে বিনিয়োগ করিতেছে। ইহা ব্যতীত বিলাস-দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ভোগ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়াও যাহাতে যন্ত্রপাতি অধিক আমদানি করা যায় সে-চেষ্টাও করা হইতেছে।

৪। বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য

বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়াও মূলধন-গঠনের চেষ্টা করা হইতেছে।

অনেকের মতে, কৃষিতে যে অতিরিক্ত লোক আছে তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের মূলধন বাড়িয়া যাইবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার।

* অর্থমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুসারে ভারতে শুধু ব্যক্তিগত স্বর্ণসঞ্চয়ের পরিমাণই হইল ৪০০০ কোটি টাকা।

সাহায্যে ইহাদের পারস্পরিক সহায়তায় উৎপাদনশীল কার্যে উৎসাহিত করা হইতেছে। কিছু পরিমাণ নোট ছাপাইয়াও সরকার অর্থ নৈতিক উন্নয়নের ব্যয় নির্বাহ করিতেছে। ইহাকে 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয়' (forced savings) বলা হয়। কারণ, নোট ছাপানোর ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহাতে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ে বলিয়া লোকে পূর্বের তুলনায় কম জিনিসপত্র কিনিতে সমর্থ হয়। এইভাবে বর্তমান ভোগের হ্রাস সংঘটিত করিয়া সরকার মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

৫। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

দেশে মূলধন-গঠনের হার কত তাহা মোটামুটি বিনিয়োগের হার হইতে নির্ধারণ করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা শতকরা ১১ ভাগের মত দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা সম্ভব করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮·৫ ভাগের মত সঞ্চয় সম্ভব হয়; উহাকে বাড়াইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১·৫ ভাগে লইয়া যাইতে হইবে। ইহা ছাড়াও অবশ্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। অনেকে এই আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারকে অত্যধিক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা, ইহাতে লোকের দুর্দশা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ সঞ্চয় দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এইরূপ ক্ষেত্রে বলা হয় যে বিনিয়োগের হার অপরিবর্তিত রাখা হউক, কিন্তু কর, মুদ্রাস্ফীতি, ঋণ প্রভৃতির মাধ্যমে সঞ্চয়ের হার বিশেষ না বাড়াইয়া গহনাপত্র ইত্যাদিতে যে-সঞ্চয় অকাম্যভাবে আটকাইয়া আছে তাহা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হউক এবং সংগে সংগে মালমজুত, চোরাকারবার, ফটকাবাজার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিয়া ঐ টাকাও বিনিয়োগ করা হউক।

বিনিয়োগের হার মূলধন-গঠনের হারের নির্দেশক

ভারতে বিনিয়োগের হার

সংক্ষিপ্তসার

মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অর্থে জমি মূলধন নহে—কারণ, উহা উৎপাদিত উপাদান (produced means) নহে; ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন নহে—কারণ, উহা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে—যেমন, কয়লা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইলে উহা ভোগ্যদ্রব্য কিন্তু কলকারখানায় ব্যবহৃত হইলে উহা মূলধন। এই কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিতে অনেকে আপত্তি করেন। ইঁহাদের মতে, যাহা কিছু উপযোগ সৃষ্টি করে—অর্থাৎ, যাহা কিছু উৎপাদনশীল, সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাই মূলধন। এইরূপ মূলধনকে বাস্তব মূলধন বলা হয়। সমাজের দিক হইতে ঘরবাড়ী, যানবাহন, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, পোতাশ্রয় প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক হইতে বিচার করিলে তাহার কারখানাবাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি মূলধন নহে; কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক হইতে টাকাকড়ি মূলধন বলিয়া গণ্য। ইহাকে আর্থিক মূলধন বলা হয়।

আর্থিক মূলধন ছাড়াও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে আর একপ্রকার মূলধনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকে ঋণ মূলধন বলে। বণ্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ।

সুতরাং, ব্যক্তিগত মূলধন তিন প্রকারের—(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন এবং (৩) ঋণ মূলধন।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ: অন্যান্যভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এইরূপ অন্যতম শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধনের মধ্যে। ব্যক্তি যে-মূলধনের মালিক তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন, সাধারণের মূলধনকে সামগ্রিক মূলধন এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মূলধনের সমষ্টিকে জাতীয় মূলধন বলা হয়।

(খ) মূলধন স্থায়ী ও চলতি—এই দুই প্রকারেরও হয়। যে মূলধন-দ্রব্য বার বার ব্যবহৃত হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন এবং যাহা একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে চলতি মূলধন বলে।

(গ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এইভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যে মূলধন একটিমাত্র কার্যে নিবদ্ধ থাকে তাহাকে নিবদ্ধ এবং যাহা বহুপ্রকার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে অনিবদ্ধ মূলধন আখ্যা দেওয়া হয়।

মূলধনের কার্যাবলী: (১) মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে; (২) ইহা শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করে; (৩) ইহা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে; (৪) ইহা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করে।

মূলধনবৃদ্ধির উপায়: মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় হইতে মূলধন গঠিত হয়। সঞ্চয় বলিতে ভোগ হইতে বিরত থাকা বুঝায়। সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করিয়া তবেই মূলধন সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং মূলধন-গঠন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) সঞ্চয়, এবং (খ) বিনিয়োগ।

সঞ্চয় নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা, এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা—১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি, ২। সমাজে প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা, ৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, ৪। বিনিয়োগের সুব্যবস্থা, ৫। শিক্ষা, এবং ৬। সুদের হার—এই কয়টি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

(খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়াও সরকারী সঞ্চয় আছে। সরকার নানাভাবে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া মূলধন গঠন করিয়া থাকে।

ভারতে মূলধনবৃদ্ধি: প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও ভারত মূলধন-গঠনে অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ সঞ্চয়ের স্বল্পতা। সঞ্চয়-স্বল্পতার মূলে রহিয়াছে আয়ের স্বল্পতা, সঞ্চয়ের ইচ্ছাহ্রাস, ইত্যাদি। দ্বিতীয় কারণ সঞ্চয়ের অপপ্রয়োগ। বর্তমানে অবশ্য মূলধন-গঠনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে (১) অর্থসংগ্রহ করা হইতেছে, (২) কর-পদ্ধতির সংস্কার করা হইতেছে, (৩) অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে, (৪) বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের প্রচেষ্টা করা হইতেছে, (৫) বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

মূলধন-গঠনের হার মোটামুটি নির্ধারণ করিতে পারা যায় বিনিয়োগের হার হইতে। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে বিনিয়োগের হার ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ। বিনিয়োগের হার দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগে দাঁড়ায়, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪ ভাগে পৌছিবে আশা করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Capital and state the functions of Capital as a Factor of Production. (S. F. 1959)

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কার্যাবলী উল্লেখ কর।

ইংগিত: মূলধন 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'। ব্যক্তির দিক হইতে যাহা আয়-সৃষ্টি করে

তাহাই মূলধন ; সমাজের দিক হইতে যাহা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।... (৯০-৯১ এবং ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)]

2. How would you define Capital? Distinguish between (a) Concrete or Real Capital, (b) Money Capital and (c) Loan Capital.

কিভাবে মূলধনের সংজ্ঞা প্রদান করিবে ? (ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আর্থিক মূলধন এবং (গ) ঋণ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [৯০-৯১ পৃষ্ঠা]

3. Define Capital and point out how it helps production.

(C. U. 1954 ; H. S. (H) Comp. 1961)

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং মূলধন কিভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সাহায্য করে তাহা দেখাও।

[৯০ এবং ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা]

4. Indicate the factors that promote the growth of Capital in a country.

যে যে বিষয় দেশে মূলধনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে তাহা দেখাও।

[ইংগিত : মূলধনবৃদ্ধি (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া যে যে বিষয় ইহাদের বৃদ্ধিসাধন করে তাহাই মূলধনবৃদ্ধির সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, বিনিয়োগের সুব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, জাতীয় আয় প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।... ' ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা)]

5. Distinguish between (a) Fixed and Circulating Capital, (b) Sunk and Floating Capital. (C. U. 1943, '54)

(ক) স্থায়ী ও চলতি মূলধন, (খ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [৯২-৯৩ পৃষ্ঠা]

6. What are the factors that hinder the growth of Capital in India? What measures have been adopted to remove these hindrances?

ভারতে মূলধনবৃদ্ধির প্রতিবন্ধকগুলি কি কি ? ইহাদের দূরিকরণের জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ? [৯৮-১০০ পৃষ্ঠা]

7. What is Capital? What measures would you adopt to increase the accumulation of Capital in India? (H. S. (H) 1960)

মূলধন কাহাকে বলে ? ভারতে মূলধনবৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিবে ?

[৯০ এবং ৯৯-১০০ পৃষ্ঠা]

8. Explain the functions of Capital. What are the conditions favourable for the formation of Capital in a country? (H. S. (C) Comp. 1961)

মূলধনের কার্যাবলী বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ বিষয় দেশে মূলধনবৃদ্ধিতে সহায়তা করে ?

[৯৩-৯৪ এবং ৯৫-৯৮ পৃষ্ঠা]

9. What is Capital? What are the factors upon which the accumulation of Capital depends? (H. S. (H) Comp. 1962)

মূলধন কাহাকে বলে ? কি কি বিষয়ের উপর দেশের মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে ?

[৯০ এবং ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

কারিগরি দক্ষতা
(Technical Skill)

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধন থাকা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনকে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য প্রয়োজন নিপুণ কর্মীর। বর্তমান যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের কল্যাণে কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদনের কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন করিতে হইলে সুদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। যে-দেশের লোকের কর্মদক্ষতা ও শিল্পগত নৈপুণ্য যত উচ্চস্তরের সে-দেশের উৎপাদনের হারও তত অধিক এবং জীবনযাত্রার মানও তত উচ্চ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশে কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পগত নৈপুণ্য উন্নত স্তরের বলিয়া উঁহাদের জাতীয় উৎপাদন অধিক। সোবিয়েত ইউনিয়ন, জাপান প্রভৃতি দেশ বাস্তব মূলধন-গঠনের সংগে সংগে নানা উপায়ে পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াই অর্থনৈতিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম কঠিন সমস্যা হইল লোকের শিল্পনৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। যথেষ্ট প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে; জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ বেকার হইয়া রহিয়াছে; অনুন্নত কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং ফলে গ্রামাঞ্চলে অর্ধ-বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে এই সকল বেকার ও অর্ধ-বেকারকে উৎপাদনকার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেই আমাদের দেশ উন্নত হইয়া উঠিবে। কিন্তু সমস্যা এত সহজে সমাধান হইবার নয়। মূলধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাদের নিয়োগের প্রধান বাধা হইল কারিগরি কর্মকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্যের অভাব।

শিল্পনৈপুণ্য ও দক্ষতা-বৃদ্ধি ভারতের অন্যতম উন্নয়ন সমস্যা

মাটি কাটিবার, জল তুলিবার অথবা মোট বহিবার জন্য হয়ত' বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না—শারীরিক শক্তিসামর্থ্য থাকিলেই চলে। কিন্তু কলকারখানা স্থাপন, কলকারখানায় আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন, নদীতে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ, ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদন, চিকিৎসা, শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন। অন্যান্য অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মত আমাদের দেশেও এই দক্ষতার অভাব রহিয়াছে। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে-প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহাকে সফল করিয়া

তুলিতে হইলে এবং আমাদের জনবলকে দেশের সম্পদ সৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত করিতে হইলে মূলধন-গঠনের সহিত কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির সুব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। ইহা না করিতে পারিলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে অবিলম্বে কারিগরি দক্ষতার প্রসারের গুরুত্ব অনুভব করিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও উহার বিভিন্ন শাখা কারিগরি সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক কারিগরি সাহায্যদান

কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির উপায় (Factors governing Formation of Technical Skill) : স্বল্পোন্নত দেশে কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির সমস্যা মূলধন-গঠনের সমস্যারই অনুরূপ। মূলধন-গঠনের জন্য যেমন বর্তমান ভোগকে কতকাংশে কমাইয়া দিতে হয়, তেমনি কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের জন্যও দেশকে কতকটা বর্তমান ভোগকে ত্যাগ করিতে হয়—কারণ, জাতীয় আয়ের একাংশ কারিগরি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। জাতীয় আয়ের এই অংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে ঐ সকল দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য উহা ব্যয় করা হইতেছে বলিয়া লোকে কম ভোগ্যদ্রব্য পাইতেছে। এইভাবে ভবিষ্যতের জন্য কারিগরি দক্ষতার প্রসারের উদ্দেশ্যে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশকে সাময়িকভাবে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমাইয়া দিতে হয়। তবে হিসাব করিয়া চলা দরকার। কৃষি, শিল্পবাণিজ্য ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োজন বুঝিয়া উহাদের অভাবপূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয় এবং অপচয় না ঘটে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা না করা হইলে অপচয় ছাড়া কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত এক নূতন শ্রেণীর বেকার সৃষ্টি হইবে।

কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির সমস্যার প্রকৃতি

কারিগরি দক্ষতাবৃদ্ধির প্রধান প্রধান উপায় হইল : (১) সাধারণ শিক্ষা, (২) বিশেষ ধরনের কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান, (৩) শিক্ষানবীসী (apprenticeship), (৪) অন্তর্নিয়োগ শিক্ষা (training-on-job) এবং (৫) বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া অথবা (৬) বিদেশে লোক প্রেরণ করিয়া কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

দক্ষতাবৃদ্ধির প্রধান প্রধান উপায়

সাধারণ শিক্ষা : দক্ষ কর্মী হইতে হইলে কিছুটা পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন, কারণ এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদীক্ষা গড়িয়া উঠিতে পারে। জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন তাই সর্বপ্রথমেই সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমাদের দেশে এখনও শতকরা প্রায় ৭৬ জন লোক নিরক্ষর।* তাই সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। আর একটি কারণেও সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সাধারণ শিক্ষার ফলে মানুষের দৃষ্টিভংগি প্রসারতালাভ করে, তাহার দায়িত্ববোধ গড়িয়া উঠে এবং সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা ও দেশের গঠনমূলক কার্যে সে তাহার নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সহজেই সচেতন হয়।

১। সাধারণ শিক্ষা ও ইহার গুরুত্ব

---

* [illegible] সালের জনগণনার চূড়ান্ত হিসাব।

কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা: প্রত্যেক দেশেই কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল-কলেজের মত বিশেষ ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতের মত অনুন্নত দেশে এই ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

২। প্রকৃত কারিগরি বা বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা

শিক্ষানবীসী: এই পদ্ধতিতে কলকারখানায় শিক্ষার্থীদের হাতে ধরিয়া কারিগরি শিক্ষাপ্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা দক্ষ কারিগরের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন ধরিয়া শিক্ষানবীসী করিয়া ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত দেশে বর্তমানে এইরূপ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশেও কারিগরি দক্ষতা প্রসারের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশে সরকারী কারখানা, রেল-কারখানা এবং অন্যান্য কতিপয় ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক কারখানা, চাউলের কল, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই প্রসংগে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এখানে শিক্ষার্থীরা একদিকে কারখানায় হাতের কাজ শিক্ষা করে, অপর-দিকে কারখানার কারিগরি স্কুলে তত্ত্বগত শিক্ষালাভ করে। তবে দেশে এখনও শিক্ষানবীসী পদ্ধতিতে কারিগরি শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ব্যাপক ও সুসংগঠিত হইয়া উঠে নাই। ইহার জন্য প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। আইনের দ্বারা দেশী ও বিদেশী সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীসীদের গ্রহণ এবং ইহাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে।

৩। শিক্ষানবীসী

অন্তর্নিয়োগ: এই পদ্ধতিতে যাহারা চাকরি গ্রহণ করে তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট কাজের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য প্রথমে শিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিতে নবনিযুক্ত কারিগরকে শিক্ষাদান ব্যতীত পুরাতন শ্রমিকদেরও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়। ইহা ছাড়া শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী কারিগর সৃষ্টি সম্ভব হয়; ফলে বেকারত্ব ও অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

৪। অন্তর্নিয়োগ

উপরি-উক্ত আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়া উঁচুদরের কারিগরি শিক্ষার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার্থী প্রেরণ করিয়া অথবা ঐ দেশ হইতে অভিজ্ঞ শিক্ষক আনিয়া উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা দরকার হয়। ইহার জন্য অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রার (foreign exchange) প্রয়োজন। স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে ব্যাপকভাবে এই ব্যয়ভার বহন করা কঠিন। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলি বৃত্তি (stipend) প্রদানের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্তির সুযোগসুবিধা দেয়।

৫। বৈদেশিক সাহায্য ও শিক্ষা

কলম্বো পরিকল্পনা (Colombo Plan) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্পর্যায়ী

পরিকল্পনায় (Point-Four Programme) ভারতীয়দের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারিগরি শিক্ষার জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মেনী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও অল্পবিস্তর ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করিয়া কারিগরি শিক্ষায় কতকটা সহায়তা করিতেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন থাকিলেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইল সাধারণ কারিগরদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা। এদিক হইতে শিক্ষানবীসী পদ্ধতি ও অন্তর্নিয়োগ কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার করা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, কৃষি এবং ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য কৃষি-শ্রমিক ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।

ভারতে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা (Provision for Technical Education in India) : স্বাধীন ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ব্রিটিশ আমলেই কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও

সর্ব-ভারতীয় পরিষদ

সংহতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষাসংক্রান্ত একটি সর্ব-ভারতীয় পরিষদ (All-India Council for Technical Education) স্থাপন করা হয়। এই পরিষদ চারিটি আঞ্চলিক কমিটি (Regional Committees) এবং সাতটি শিক্ষাবোর্ড (Boards of Studies) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল কমিটি ও বোর্ড আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করে।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা ৪৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫-তে দাঁড়ায়, এবং প্রতি বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের সংখ্যাও ২২০০ জন হইতে বাড়িয়া ৪০২০ জন হয়। ঐ সময় ডিপ্লোমা প্রদানকারী শিক্ষায়তন পলিটেক্‌নিকগুলির সংখ্যা ৮৬টির স্থলে হয় ১১৪টি এবং প্রতি বৎসর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ২৪৮০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫০০-এ দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত স্নাতকোত্তর ও গবেষণামূলক শিক্ষা, মুদ্রণ-কৌশল (printing technology) শিক্ষা, পরিচালনা-কৌশল শিক্ষা (management studies) প্রভৃতির জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও দক্ষ কারিগরের চাহিদা মিটাইবার জন্য নূতন ৩৫টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং ৮২টি পলিটেক্‌নিক খোলা হয়। ইহার ফলে

ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা ও যোগান

বৎসরে এখন (১৯৬২ সাল) ১৭ হাজারের উপর গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বাহির হইয়া আসে।* কিন্তু এই সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৮২ হাজার গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা ছিল, কিন্তু দেশে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ছিল

* Third Five Year Plan

৫৮ হাজারের মত। ফলে অনেক সময় বিদেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়া কার্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। এই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেক্‌নিকগুলির সংখ্যা বাড়াইয়া যথাক্রমে ১১৭ ও ২৬৩-তে লইয়া যাওয়া হইবে। আশা করা হইয়াছে, এই সকল বিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর ৩১ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাপ্রদানের জন্য পশ্চিমবংগের খড়্গপুরে, বোম্বাই সহরের নিকটে পাওয়াই (Powai) নামক স্থানে, কানপুর ও মাদ্রাজে চারিটি আঞ্চলিক কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (Regional Institutes of Technology) স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এগুলিকে সম্প্রসারিত করা হইবে। যে চারিটি মুদ্রণ-কৌশল বিদ্যালয় (Schools of Printing Technology) এবং দিল্লীতে যে একটি নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা বিদ্যালয় (A School of Town and Country Planning) স্থাপিত হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহাদিগকেও সম্প্রসারিত করা হইবে। পরিকল্পনায় যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং (mechanical, electrical and chemical engineering) শিক্ষার প্রসার ও গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পরিশেষে দেশের সম্যক শিল্পপ্রসার সম্ভব হইবে না, যদি-না বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক বা কর্মী কুশলী হয়। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ-শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রিদপ্তরের অধীন 'শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান' (Industrial Training Institutes), রেল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সরকারী বিভাগ, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত শিক্ষণকেন্দ্র, বেসরকারী শিল্প শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য যথাক্রমে ২০ কোটি টাকা এবং ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ইহার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ১৪২ কোটি টাকা।

দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ করিয়া এবং বিদেশ হইতে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ আনিয়া কারিগরি শিক্ষার প্রসার করা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ যে বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে পূর্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। বস্তুত, ইহাই আমাদের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সমস্যা। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় হইল: (১) সাধারণ শিক্ষার প্রসার, (২) কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, (৩) শিক্ষানবীসী, (৪) অন্তর্নিয়োগ, (৫) বৈদেশিক শিক্ষা।

ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও সংহতিসাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। বিদেশেও

শিক্ষার্থী প্রেরণ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনা হইতে সুরু করিয়া ক্রমশ ব্যাপকতরভাবে কারিগরি শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Indicate the importance of technical skill and the factors governing its formation.

কারিগরি দক্ষতার গুরুত্ব এবং যে সে বিষয় ইহার গঠনে সহায়তা করে তাহা বর্ণনা কর।

[১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা]

2. Describe the steps that have been taken for the formation of technical skill in India.

ভারতে কারিগরি দক্ষতা প্রসারের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা কর।

[১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা]

3. Give an idea of provision for technical education under our Plans.

আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো

(Economic Structure)

অর্থনৈতিক কাঠামো বলিতে কি বুঝায়

কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে উহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, মাথাপিছু আয় ও লোকের জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি হইতেই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি বুঝা যায়।

বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যে এক ধরনের নয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কতকগুলি দেশে শিল্পবাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; ফলে সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান অতি উচ্চ। আবার কতকগুলি দেশ অর্থনৈতিক প্রসারের দিক হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে; স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার লোকের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন। অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে বিচার করিয়া সকল দেশকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি কতকগুলি দেশকে অতি উন্নত (highly developed) দেশ বলা হয়; এই সকল দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় অধিক। দ্বিতীয়ত, ইতালী, হাংগেরী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহাদের অর্থনৈতিক প্রসার অতি উচ্চ স্তরে না পৌছাইলেও অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান, মালয় প্রভৃতি কতকগুলি দেশ আছে যাহারা অনেক পিছনে

অর্থনৈতিক উন্নতির দিক হইতে দেশগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়

পড়িয়া আছে। এই সকল দেশে লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলিকে 'অনুন্নত দেশ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু 'অনুন্নত' শব্দটির ব্যবহারে অনেক দেশের আপত্তি থাকায় বর্তমানে অর্থবিত্যাবিদগণ এই সকল দেশকে 'স্বল্পোন্নত দেশ' (underdeveloped countries) বলিয়া অভিহিত করেন। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের উপর লোক এই স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বাস করে বলিয়া উহাদের উন্নয়ন অন্যতম আন্তর্জাতিক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারত স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম দৃষ্টান্ত

আমাদের দেশ অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ। সুতরাং আমাদের সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন যে স্বল্পোন্নত দেশের লক্ষণ কি কি? এই সকল দেশের কাঠামো কি প্রকার এবং ইহাদের উন্নতিসাধনেরই বা পন্থা কি? আমরা এই সকল আলোচনা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেই করিব।

স্বল্পোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝায়

বিভিন্ন লেখক স্বল্পোন্নত দেশের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই তর্কবিতর্কের ভিতর না যাইয়া সংক্ষেপে স্বল্পোন্নত দেশের বর্ণনা এইভাবে করিতে পারা যায়ঃ স্বল্পোন্নত দেশ হইল সেই দেশ যাহার বর্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অতি সামান্য এবং যাহার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা (potentiality) রহিয়াছে। ভারতের দৃষ্টান্ত লইলেই এই সংজ্ঞার অর্থ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২৯২ টাকা; তুলনায় ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৮০০ টাকা, ইংলণ্ডে ৪৩০০ টাকা এবং কানাডায় ৭০০০ টাকার উপর। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ভারত কত পিছনে পড়িয়া আছে। অথচ ভারতে

ভারতে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে লোকের দারিদ্র্য

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং জনবলের প্রাচুর্য রহিয়াছে। আমরা এই প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়াও অতি দরিদ্র রহিয়া গিয়াছি। উৎপাদনের উন্নতিসাধন করিয়া এই সকল সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলেই লোকের মাথাপিছু আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং ফলে জীবনযাত্রার মানও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে। প্রথম ও দ্বিতীয়

স্বল্পোন্নত দেশের দুইটি লক্ষণ

পরিকল্পনায় এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই মাথাপিছু আয় শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।* অতএব, বর্তমান মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা এবং আর্থিক উন্নয়নে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হইল স্বল্পোন্নত দেশের দুইটি প্রধান লক্ষণ।

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main Structural Features of an Underdeveloped Economy):

স্বল্পোন্নত দেশগুলির দিকে তাকাইলে উহাদের অর্থ-ব্যবস্থার কতকগুলি

---

* ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য পড়ে। ভারতের এই দৃষ্টান্ত লইয়া এই বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়।

(১) শিল্পের অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী এবং মাত্র ১০ ভাগ লোক শিল্পকার্যে নিযুক্ত। বাকী অংশ বাণিজ্য, পরিবহণ, চাকরি প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশে জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১২ ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত থাকে। আবার ভারতের মত দেশে সমগ্র জাতীয় আয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মত আসে কৃষি হইতে। সংগঠিত কারখানা-শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হয়, আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে আসে শতকরা ১০ ভাগ। বাকিটা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প প্রভৃতির তুলনায় কৃষির অবদান কমই হয়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে জাতীয় আয়ের মধ্যে কৃষির অংশ যথাক্রমে শতকরা ৯ ভাগ এবং ১৮ ভাগ।*

স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা

জাতীয় জীবনে কৃষির ভূমিকা প্রধান হইলেও এইরূপ দেশে কৃষি অনুন্নতই হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি অতি প্রাচীন, জমি অসম্বদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, সেচ-ব্যবস্থা অনুন্নত, সার ও বীজ নিকৃষ্ট ধরনের হইতে দেখা যায়। ফলে জমি হইতে ফসল উৎপন্নের হার অতি কম হয়।** ইহা ছাড়া দেখা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশে ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থায় জমির মালিকানা কৃষকের থাকে না; সকলের উপরে থাকে জমিদার এবং তাহার পরে থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। বর্তমানে আমাদের দেশে জমিদারি প্রথার বিলোপ করিয়া কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া হইয়াছে।

অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি

জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা

(২) স্বল্পোন্নত দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (disguised unemployment)। ভারতে শিল্পপ্রসারের অভাবে এবং বৈদেশিক যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অধিকাংশ জমিতে গিয়া ভিড় করিয়াছে। ফলে জমির উপর চাপ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র জমি চাষ করিতে পরিবারভুক্ত যত লোকের প্রয়োজন হয় তাহার অধিক লোক ঐ জমিতে খাটিতেছে। অনুমান করা হয় যে কৃষিতে নিযুক্ত লোকের মধ্যে শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ হইল প্রয়োজনাতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত লোকদের জমি হইতে সরাইয়া আনিলে জমির উৎপাদন কোনমতেই হ্রাস পায় না। সুতরাং এই সকল লোককে অনাবশ্যক বা বেকারের পর্যায়ে ফেলিতে

স্বল্পোন্নত দেশে ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের আধিক্য

* Towards A Self-Reliant Economy (Planning Commission)

** ... রিপোর্ট দেখ।

কারিগরি দক্ষতা

কারিগরি দক্ষতার অভাব

কারিগরি দক্ষতা

কারিগরি দক্ষতাসৃষ্টির উপায়
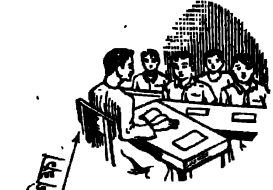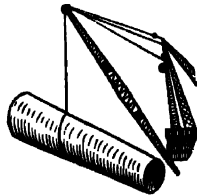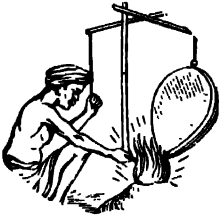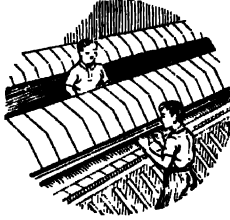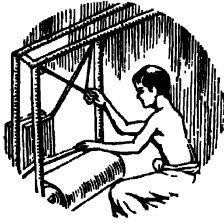
সাধারণ শিক্ষা

কারিগরি শিক্ষা

শিক্ষানবীসী

অন্তর্নিয়োগ

শিক্ষার্থী প্রেরণ

শিক্ষক আনয়ন

[১০৪-১০৬ পৃষ্ঠা]
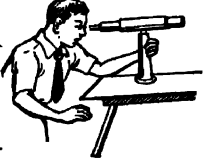
হয়। কৃষিতে এই ছদ্ম বেকারত্ব ছাড়াও এই দেশে শিল্পগত বেকার-সমস্যা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধরনের বেকারত্ব রহিয়াছে।

কারিগরি দক্ষতার অভাব

(৩) ভারতের মত দেশে লোকবলের অভাব নাই; বেকার, অর্ধ-বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যা বহু। ইহাদিগকে সম্পদ-সৃষ্টির কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের প্রকৃত মূলধন বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাদের উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিবার পথে একটি প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি দক্ষতার অভাব। ইহাকে স্বল্পোন্নত দেশগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয়।

মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা

(৪) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে স্বল্পোন্নত দেশের লোকের মাথাপিছু আয় অতি অল্প এবং জনসংখ্যার অধিকাংশকেই সারাজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়।

প্রকট ধনগত বৈষম্য

(৫) স্বল্পোন্নত দেশে ধনবৈষম্য অতি প্রকট। একদিকে অগণিত জনসাধারণ অর্ধাহার ও অনাহারের মধ্যে জীবন কাটায়, অপরদিকে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির মধ্যে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য দেখা যায়।

সঞ্চয় ক্ষমতা কম হওয়ায় মূলধন-গঠনের হারও কম

(৬) অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া লোকের সঞ্চয় ক্ষমতাও অতি সামান্য। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে দেশের সঞ্চয় হইতেই দেশে মূলধন গড়িয়া উঠে। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশের সঞ্চয়ের হার স্বল্প হওয়ায় মূলধন-গঠনের হারও স্বল্প হয়। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ মূলধন-গঠনকার্যে নিয়োজিত হয়। স্বল্পোন্নত দেশে জাতীয় আয়ের সামান্য অংশই বিনিয়োগ (invest) করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশে প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগের বেশী বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম দুই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে ১৯৬০-৬১ সালে উহা বাড়িয়া জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগের মত দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই বিনিয়োগের হিসাব বৈদেশিক সাহায্য ধরিয়া করা হইয়াছে, কারণ আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগের কিছু অধিক।*

সাধারণ লোকের আয়ের অধিকাংশই খাদ্য যোগাইতে ব্যয় হয়

(৭) ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্রকৃতি হইতে স্বল্পোন্নত দেশের অনগ্রসরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পরিবার যে-ব্যয় করে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগের উপর ব্যয় হয় খাদ্যের উপর এবং শতকরা ১০ ভাগের মত ব্যয় হয় জামাকাপড় ক্রয় করিতে। শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতিতে ব্যয় অতি নগণ্য বলিলেই হয়। নগরাঞ্চলেও সাধারণ লোকের ব্যয়ের মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগের অধিক ব্যয় হয় খাদ্যদ্রব্যের উপর। খাদ্যদ্রব্যের উপর আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা [illegible]

* ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য জোটাইতে পারে না। ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক অন্তত ৩০০০ ক্যালোরি-মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে গড় ক্যালোরি গ্রহণ ২১০০ হইলেও অধিকাংশ লোকে ১২০০—১৫০০-র ক্যালোরি-মূল্যের বেশী খাদ্য পায় বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ লোকে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় করিতে অক্ষম বলিয়া স্বল্পোন্নত দেশে অশিক্ষা ও ব্যাধি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৭৬ জন লোক নিরক্ষর।

সাধারণ লোকের খাদ্যগ্রহণ ন্যূনতম পুষ্টিকারিতার পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়

অশিক্ষা ও ব্যাধির ব্যাপকতা

(৮) ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অতি দ্রুতগতিতে হয়। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষের মত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্মমৃত্যুর উচ্চ হার, স্বল্পায়ু ও শিশু-মৃত্যুর আধিক্যও স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উন্নয়নের প্রথমদিকে বিভিন্ন ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইতে থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। ইহাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অধিক দ্রুত হয়। যেমন, ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির বাৎসরিক হার শতকরা ২·৫ ভাগের মত।

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং জন্মমৃত্যুর হারের আধিক্য

(৯) স্বল্পোন্নত দেশের মূলধনের সংগতি যে অতি অল্প তাহার আলোচনাও করা হইয়াছে। এই সামান্য মূলধনও সকল সময় জাতীয় স্বার্থে শিল্পপ্রসারের জন্য নিয়োজিত হয় না। ব্যক্তিগত মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সহজে অধিক মুনাফা শিকার করিতে চায় এবং সেইজন্যই ফটকাবাজার, চোরাকারবার, মালমজুত, দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতিতে টাকা খাটাইতে থাকে। কিছুটা সঞ্চয় গহনাপত্রাদিতেও ব্যয়িত হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত শিল্পপতিগণ যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা এবং লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে চাহে না; কারণ এগুলিতে আশু লাভের সম্ভাবনা কম অথবা অধিক ঝুঁকি থাকে। ফলে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদন অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে তাহারা টাকা বিনিয়োগ করে; এবং ফলে দেশের প্রকৃত মূলধন সামান্যই গড়িয়া উঠে।

স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের বিনিয়োগ কাম্যভাবে হয় না

মূলধন-দ্রব্য অপেক্ষা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে অধিক ঝোঁক

(১০) স্বল্পোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্য ঔপনিবেশিক (colonial) ধরনের হয়। এইরূপ বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য হইল দেশ হইতে স্বল্প দামে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে কাঁচামাল রপ্তানি করা এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত ভোগ্যদ্রব্য আমদানি করা। এরূপ হইবার প্রধান কারণ হইল বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ। ভারতের দৃষ্টান্ত হইতে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। ব্রিটিশ সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই ভারতের শিল্পপ্রসারে বাধা দিয়াছে এবং নিজের দেশের শিল্প সংরক্ষণ ও প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের জাতীয় সরকার ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই দুর্বলতা

বৈদেশিক বাণিজ্য ঔপনিবেশিক ধরনের

দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং দেশের শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে দেশের কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের বহির্বাণিজ্য দুর্বল; কারণ এখনও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য সীমাবদ্ধ। বস্তুতপক্ষে ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইল তিনটি— চা, পাটজাত দ্রব্য এবং তুলাজাত দ্রব্য।

স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় (Requirements for Economic Development of an Underdeveloped Country): ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের লক্ষ্য হইল মাথাপিছু আয় ও ভোগের পরিমাণ দ্রুত ও অব্যাহত গতিতে বাড়াইয়া যাওয়া। ইহাকেই সংক্ষেপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র অর্থ-ব্যবস্থাকে আত্মনির্ভরশীল (self-reliant) এবং স্বয়ং-পরিচালিত (self-generating) করিয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ, বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকা চলিবে না; দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগই ক্রমাগত বাড়াইয়া উত্তরোত্তর উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই কৃষির উন্নয়ন ও দ্রুত শিল্পপ্রসারের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বিশেষত, ভারতের মত দেশে জনসংখ্যা যখন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে তখন কৃষি-উৎপাদন ও শিল্প-প্রসারের গতি দ্রুততর না করিতে পারিলে জাতীয় আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও লোকের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান নিম্নই থাকিয়া যাইবে। কৃষির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের (যেমন, চা, তুলা, পাট ইত্যাদি) উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল-শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে, কারণ এগুলি ছাড়া ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশ আত্মনির্ভরশীল অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না। শিল্পের প্রসারসাধন করা হইলে কৃষি হইতেও অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে সরাইয়া আনিয়া অন্যত্র নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। সুতরাং কৃষির উন্নয়নের সংগে সংগে শিল্পেরও দ্রুত প্রসার করিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক। শিল্প যেমন কাঁচামাল ও খাদ্য সরবরাহ ছাড়া প্রসারলাভ করিতে পারে না, তেমনি কৃষির উন্নয়নও ব্যাহত হয় যদি-না শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসারিত হয়। শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রসারের ফলেই কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা বাড়িতে পারে এবং কৃষিজীবীদের বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা ছাড়া কৃষির উন্নয়নের জন্য যে-সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তাহাও শিল্পই যোগান দিয়া থাকে। এইভাবে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা অর্থ-ব্যবস্থাকে গতিশীল করিতে হইলে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগের অধিক সঞ্চয় এবং শতকরা ১৪ ভাগের উপর বিনিয়োগের লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকে বলে

এই উন্নয়ন কার্যক্রমে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন অংগাংগিভাবে জড়িত

এখন উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলির আলোচনা এইভাবে করা যাইতে পারে :

(১) **কৃষির উন্নয়ন :** সেচ-ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত ধরনের সার ও বীজ, পালটি শস্যোৎপাদন (rotation of crops) ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন অনেকখানি বৃদ্ধি করা সম্ভব। ব্যাপক-ভাবে যান্ত্রিক কৃষির (mechanised farming) প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, ইহার ফলে অনেক কৃষকই কর্মহীন হইয়া পড়িবে এবং শিল্প অনুন্নত থাকায় ইহাদের অন্যত্র নিয়োগের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হইবে না। উপরন্তু দেশের মূলধনের সংগতি কম। অতএব কৃষি-যন্ত্রপাতির ক্রয়ের জন্য অধিক ব্যয় করা হইলে শিল্পপ্রসারের জন্য মূলধনের অভাব দেখা দিবে। সুতরাং প্রথমদিকে ছোটখাট উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।

উন্নত ধরনের সার, বীজ ও সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে

প্রথম পর্যায়ে ব্যাপক যন্ত্রিকরণ সমীচীন নয়

ভূমি-সংস্কার করিয়া কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং জমির সংহতিসাধন (consolidation of holdings) করিয়া বা জমিকে একখণ্ডে আনিয়া উহার খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য যে-সকল ত্রুটি তাহা দূর করিতে হইবে। সমবায়িক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করিবার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করিতে হইবে। কৃষকরা যাহাতে স্বল্প সুদে ঋণ পাইতে পারে তাহার জন্য সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়করণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করাও প্রয়োজন। পরিশেষে, কৃষকদের মধ্যে কৃষির উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (Community Development Projects and National Extension Service)* মাধ্যমে ইহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভূমি-সংস্কার, কৃষি-ঋণ ও সমবায়ের প্রসার প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন

(২) **শিল্পের প্রসার :** কৃষির উন্নয়ন ও শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রথমে রাস্তাঘাট, পরিবহণ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ-পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহার পর দ্রুত শিল্পপ্রসারের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন শিল্পপ্রসারকে দ্রুত করিতে হইলে প্রথমে নানারূপ যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা আবশ্যক। অতএব লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলির (key and heavy industries) প্রসার অবিলম্বে করিতে হইবে। কিন্তু মূল শিল্পে বিনিয়োগ (investment) ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে না অথচ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ায়। ইহা ব্যতীত ভারী শিল্পগুলিতে শ্রম অপেক্ষা যন্ত্রপাতির ব্যবহার অধিক হয় ; সুতরাং লোকের জন্য খুব বেশী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করা যায় না। এই অবস্থায় চেষ্টা করিতে হইবে কি করিয়া কম মূলধন এবং অধিক শ্রম

মূল শিল্পগুলির প্রসারের উপর জোর দিতে হইবে

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে

* আলোচনার জন্য ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৯৬-১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

নিয়োগের সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বাড়ানো যায়। অর্থাৎ, প্রথম পর্যায়ে অধিক শ্রম নিয়োগকারী শিল্প-পদ্ধতির (labour-intensive techniques) মাধ্যমে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। এদিক হইতে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প বিশেষ উপযোগী। কারণ, এই সকল শিল্পে মূলধন অপেক্ষা শ্রম অধিক নিয়োজিত হয়।

(৩) মূলধন-গঠন: কৃষি ও শিল্পপ্রসারের জন্য প্রচুর মূলধনের আবশ্যক হইবে। ইহা স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, সরকারী সঞ্চয়, কতকটা মুদ্রাস্ফীতি এবং কতকটা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।*

বিভিন্নভাবে মূলধন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন

(৪) কারিগরি দক্ষতার প্রসার: স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের যেরূপ অপ্রাচুর্য থাকে তেমনি কারিগরি দক্ষতারও অভাব দেখা দেয়। কিভাবে কারিগরি দক্ষতার অভাব পূরণ করা যায় তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করিয়াছি। দেশের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত উচ্চস্তরের কারিগরি দক্ষতা সৃজনের জন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা প্রয়োজন হইতে পারে; আবার কারিগরি শিক্ষার জন্য বিদেশে লোক পাঠানো যাইতে পারে। কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-ব্যবস্থা।

কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা

(৫) অন্যান্য ব্যবস্থা: কৃষি ও শিল্পের প্রসারসাধন করিয়া দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিতে হইলে সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। ব্যক্তিগত মূলধন-মালিকেরা মুনাফার প্রেরণায় কার্য করে; আশু লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে ইহারা উদ্যোগী হয় না। এইজন্যই সরকারকে উদ্যোগী হইয়া সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিভিন্ন দিকের উন্নতিবিধান করিতে হইবে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে দেশের দ্রুতোন্নয়ন সম্ভব করিতে হইলে সরকারকে শক্তিশালী ও দুর্নীতিমুক্ত হইতে হইবে। ইহা না হইলে দেশের লোকের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যোগ সঞ্চারিত হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই সফল হইতে পারে না।

শক্তিশালী ও দুর্নীতি-মুক্ত সরকারের প্রয়োজনীয়তা

পরিশেষে বলা যাইতে পারে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি সম্যকভাবে অবলম্বিত হইতে পারে না। সুতরাং ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে।**

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অপরিহার্যতা

সংক্ষিপ্তসার

অর্থনৈতিক কাঠামো: জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, মূলধন ও উহার গঠনের হার, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, লোকের মাথাপিছু আয়, জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতির দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিভিন্ন ধরনের। মোটামুটিভাবে

* ভারতে মূলধন-গঠনের বিশদ আলোচনার জন্য ৯৮-১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

** ত্রয়োদশ অধ্যায় দেখ।

ইহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—যথা, অতি উন্নত দেশ, অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশ। ভারত স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায়ে পড়ে।

স্বল্পোন্নত দেশ: যে-সকল দেশের লোকের মাথাপিছু আয় বর্তমানে অত্যন্ত কম এবং যাহাদের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাহাদিগকেই স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও লোকের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম বলিয়া ইহাকে স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য: (১) কৃষির প্রাধান্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা; (২) ছদ্ম বেকারত্ব (disguised unemployment); (৩) কারিগরি দক্ষতার অভাব; (৪) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা; (৫) প্রকট ধনবৈষম্য; (৬) সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারের স্বল্পতা; (৭) লোকের আয়ের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় সত্ত্বেও পুষ্টিকারিতার অভাব; (৮) দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও জন্মমৃত্যুর আধিক্য; (৯) মূলধনের অপপ্রয়োগ; এবং (১০) ঔপনিবেশিক ধরনের বহির্বাণিজ্য।

অর্থনৈতিক প্রসারের উপায়: কৃষির উন্নয়ন ও দ্রুত শিল্পপ্রসারের সাহায্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব। কৃষি ও শিল্প একে অপরের অনুপূরক বলিয়া উভয়ের প্রসারই প্রয়োজন। কৃষির ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের সেচ, সার, বীজ ও যন্ত্রপাতির উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে। ব্যাপক যন্ত্রিকরণের নীতি গ্রহণ করা উচিত নয়—কারণ, দেশে মূলধনের স্বল্পতা ও বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য ভূমি-সংস্কার, জমির সংহতিসাধন, সুলভ ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবহণ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ পরিকল্পনা প্রভৃতি ছাড়া লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পকে নিয়োগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, সরকারী সঞ্চয়, কতকটা মুদ্রাস্ফীতি এবং কতকটা বিদেশ হইতে মূলধন আমদানি করিয়া মূলধন-গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লোকের কারিগরি দক্ষতা বাড়াইতে হইবে। পরিশেষে, উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে। তবে সরকার যাহাতে শক্তিশালী হয় এবং দুর্নীতি হইতে মুক্ত থাকে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the principal features of an underdeveloped economy? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions. (H. S. (H) 1960)

স্বল্পোন্নত দেশের অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি? বিশেষভাবে ভারতের উদাহরণ লইয়া বুঝাইয়া দাও। [১০৯-১১৩ পৃষ্ঠা]

2. What do you mean by an **undeveloped** economy? What are the main structural features of such an economy? Illustrate your answer by reference to Indian conditions. (H. S. (H) 1962)

'অনুন্নত' অর্থ-ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝায়? এইরূপ দেশের অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি? ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উদাহরণ লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও।

[**ইংগিত:** পূর্বে যে-দেশগুলিকে 'অনুন্নত' (undeveloped or backward) বলা হইত, বর্তমানে তাহাদিগকেই 'স্বল্পোন্নত' (underdeveloped) বলিয়াই অভিহিত করা হয়। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশসমূহেরই সংজ্ঞা দিতে ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে হইবে।... (১০৯–১১৩ পৃষ্ঠা)]

3. What is meant by 'economic development'? State the principal requirements for economic development of an underdeveloped country like India. (H. S. (H) 1961)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাহাকে বলে? ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানের উল্লেখ কর। [১১৩-১১৫ পৃষ্ঠা]

দশম শ্রেণী

দশম অধ্যায়

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Business Organisation)

ব্যবসায় সংগঠন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : এক-মালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন ব্যবসায়।

এক-মালিকী কারবার (Single-owner Firm) : একজন মালিকের কারবারই ব্যবসায় সংগঠনের আদি রূপ এবং বর্তমানেও অধিকাংশ ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাতে মালিক নিজের জায়গায় ব্যবসায় করে অথবা ব্যবসায়ের জন্য জায়গা ভাড়া লয়, শ্রমিক নিয়োগ করে, নিজেই মূলধন যোগান দেয় অথবা মূলধনের একাংশ ঋণ করিয়া সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি নিজে বহন করে। এই কারণে লাভলোকসানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মালিককে একাই বহন করিতে হয়। ব্যবসায়ের সকল দিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধান এই প্রকার কারবারেই সম্ভব। কারবার সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মালিক সর্বদা সতর্ক থাকে; মাত্র রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না।

কিভাবে গঠিত হয়

সুবিধা

কিন্তু এক-মালিকী কারবারের অনেক অসুবিধাও আছে। যাহার মূলধন যোগাইবার সামর্থ্য আছে তাহারই যে ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়ত, বর্তমান মালিকের হয়ত' পরিচালনার যোগ্যতা আছে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর নূতন মালিকেরও যে পরিচালনার যোগ্যতা থাকিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এই কারণে এক-মালিকী কারবার অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃতীয়ত, অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইলে একজনের পক্ষে তাহা যোগান দেওয়া বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই এক-মালিকী কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে।

অসুবিধা

অংশীদারী কারবার (Partnership Firm) : একাধিক ব্যক্তি লাভক্ষতির অংশীদার হইতে স্বীকৃত হইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে থাকিলে উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। অবশ্য সকলকে যে সমান অংশীদার হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অংশীদারদের মধ্যে কেহ হয়ত' লাভের এক-চতুর্থাংশ পাইয়া থাকে, কেহ হয়ত' অর্ধেক পাইয়া থাকে,

গঠন

ইত্যাদি। আমাদের দেশে ইহাদিগকে যথাক্রমে চার আনা অংশীদার, আট আনা অংশীদার প্রভৃতি বলিয়া এখনও অভিহিত করা হয়।

অংশীদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা একজনের ব্যবসায়ের ত্রুটিগুলি হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত। একজনের হয়ত' মূলধন যোগাইবার সংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা আছে। উভয়ে মিলিয়া কারবার করিলে উহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এক-মালিকী কারবার অপেক্ষা ইহা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, এবং ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিধির হইতে পারে। তৃতীয়ত, অডিটর, এটর্ণী প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক সময় কিছু লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কাজ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া সুবিধাজনক।

সুবিধা—ইহা একজনের ব্যবসায়ের ত্রুটিগুলি হইতে মুক্ত

অংশীদারী কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একজনের কুপরিচালনার ফল অপর সকলকে ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, অংশীদারগণ মিলিয়া যে-মূলধন সরবরাহ করে তাহা অধিকাংশ সময়ই যথেষ্ট হয় না। এইজন্য যে-সকল ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় অংশীদারী কারবার তাহাদের অনুকূল নহে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কারবার অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার ফলে কারবার নষ্ট হইলে উহার যদি কোন দেনা থাকে তাহা একজনের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে। ইহা অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা। এইজন্য লোকে অনেক সময় অংশীদারী কারবারে যোগদান করিতে সাহসী হয় না। তাহাদের সর্বদা ভয় হয় যে কি-জানি কারবারের দেনার দায়ে কখন বাড়ীঘর ধরিয়া টান পড়িবে। নিষ্ক্রিয় অংশীদারগণের (sleeping partners)—অর্থাৎ, যাহারা মূলধন যোগান দিয়াই ক্ষান্ত থাকে তাহাদের পক্ষে এই ভয় সর্বাধিক। আজকাল অবশ্য অনেক সময় অংশীদারী কারবারের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী (private limited company) গঠন করা হয়। ইহাতে অংশীদারগণের দায় নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, যে যে-পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করে সে সে-পরিমাণ দায়ই বহন করে। চতুর্থত, অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মনোমালিন্যের ফলে কারবার মন্দের দিকে যাইতে পারে। পরিশেষে, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংশীদারের স্থান শূন্য হইলে তাহা সহসা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, মৃত অংশীদারের পুত্র তাহার পিতার মত যোগ্যতাসম্পন্ন নাও হইতে পারে।

ইহার কয়েকটি অসুবিধাও আছে

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company): বর্তমানে ব্যবসায় সংগঠনের যে-রূপটি বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহা হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য

বহুসংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই সকল মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার (shareholders) বলা হয়। অংশীদারগণ সকলেই কোম্পানীর মালিক। সুতরাং কোম্পানীর মুনাফা সকলেই ভোগ করে এবং ক্ষতি সকলেই বহন করে।

কিভাবে গঠিত হয়

অবশ্য সকল অংশীদারেরই লাভক্ষতির পরিমাণ সমান হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানে সকলের সমান অংশ থাকে না। প্রত্যেকে তাহার মালিকানার অনুপাতে মুনাফার অংশ পাইয়া থাকে এবং ঐ মালিকানার অনুপাতেই ক্ষতি বহন করে।

কাহার কতটা মালিকানা থাকিবে তাহা নির্ভর করে কে কি পরিমাণ মূলধন প্রদান করিয়াছে তাহার উপর। যাহাতে লোকে সাধ্যমত মূলধন প্রদান করিয়া ইচ্ছামত কোম্পানীর মালিক হইতে পারে তাহার জন্য কোম্পানীর সমগ্র মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে (share) বিভক্ত করা হয়। যেমন, কোম্পানীর মোট মূলধন ১ লক্ষ টাকা হইলে ইহাকে ১০ হাজার অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অংশ বা 'শেয়ারে'র মূল্য হইবে ১০ টাকা। যাহার যত ইচ্ছা সে সে-পরিমাণ অংশই ক্রয় করিতে পারে। যে মোট অংশ বা 'শেয়ারে'র এক-শতাংশ ক্রয় করিল সে মোট বণ্টনযোগ্য লাভের একশত ভাগের এক ভাগ পাইবে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মালিক অসংখ্য বলিয়া সকলের পক্ষে উহা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এইজন্য অংশীদারগণ মিলিয়া একটি পরিচালক-মণ্ডলী (Board of Directors) গঠন করে। পরিচালক-মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারিত হয় এবং উহারই তত্ত্বাবধানে দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

পরিচালনার ভার থাকে পরিচালক-মণ্ডলীর উপর

পূর্বে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের দায় অসীম (unlimited) ছিল। ফলে কোম্পানীর সমগ্র দেনা একজনের নিকট হইতে আদায় করা হইত। যতদিন এই নীতি প্রচলিত ছিল ততদিন যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। কারণ, লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিষ্ঠানের সামান্য অংশীদার হইয়া উহার সমগ্র দায় বহন করিতে চাহিত না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সসীম দায়ের নীতি (principle of limited liability) প্রবর্তিত হইলে এই অসুবিধাটি দূর হয়। সসীম দায় বলিতে বুঝায় যে অংশীদারগণের দায় মাত্র তাহার অংশ বা শেয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, কোম্পানীর দেনার দায়ে অংশীদারকে তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ অর্থই হারাইতে হইতে পারে; কোন ক্ষেত্রেই তাহার অধিক নহে। উদাহরণস্বরূপ, একজনের যদি একশত টাকার অংশ ক্রয় করা থাকে তবে কোম্পানী ফেল হইলে বড়জোর তাহার ঐ একশত টাকাই নষ্ট হইতে পারে; পাওনাদারগণ তাহার বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি ধরিয়া টানাটানি করিতে পারে না।

সসীম দায়ের নীতি এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য

সসীম দায় বলিতে কি বুঝায়

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, অংশ বা শেয়ার

বিক্রয়ই যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের প্রধান পন্থা। ইহা ছাড়া এই সকল প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চারও (debenture) বিক্রয় করে। ডিবেঞ্চার হইল এক রকমের তমসুক (bond) যাহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সম্পত্তি জামিন থাকে। অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে কোম্পানীর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বেচিয়াও ডিবেঞ্চার-ক্রেতাগণের পাওনা শোধ করিতে হইবে। মুনাফার সহিত ডিবেঞ্চারের কোন সম্পর্ক নাই। মুনাফা হউক আর না-হউক ডিবেঞ্চারের উপর কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ডিবেঞ্চার-ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক নয়, মহাজন মাত্র।

এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের পন্থা :
১। শেয়ার বা অংশ বিক্রয়
২। ডিবেঞ্চার বিক্রয়

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার তিন রকমের হইতে পারে—যথা, (১) সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার (preference shares), (২) সাধারণ শেয়ার (ordinary shares) এবং (৩) প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ার (founders' shares)।* সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার যাহারা ক্রয় করে কোম্পানীর লাভ হইলে তাহারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে; লাভ না হইলে অবশ্য কিছুই পায় না। সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের দাবি ডিবেঞ্চারের পরই। প্রথমে ডিবেঞ্চারের উপর সুদ প্রদান করিতে হইবে। তারপর সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই সাধারণ অংশীদারদের (ordinary sharcholders) মধ্যে প্রত্যেকের অংশ অনুসারে বণ্টিত হইবে। কোম্পানী ফেল হইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। কোম্পানীর সম্পত্তি হইতে প্রথমেই ডিবেঞ্চারের দরুন পাওনা মিটাইতে হইবে। তারপর সর্বাগ্রগণ্য অংশের প্রাপ্য পূরণ হইয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা সাধারণ অংশীদারগণ পাইবে। সর্বাগ্রগণ্য অংশ আবার সঞ্চয়মূলক (cumulative) হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন বৎসরে লভ্যাংশ প্রেরণ করিতে না পারিলে পর বৎসর যদি সম্ভব হয় তবে দুই বৎসরের দরুন একই সংগে লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইবে।

বিভিন্ন রকমের অংশ

সাধারণ অংশের উপর লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে না। কোম্পানীর লাভ অনুসারে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ার থাকিলে ইহার দাবি সকলের পরে। কোম্পানীর আয় হইতে প্রথমে ডিবেঞ্চারের সুদ ও সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ মিটাইতে হইবে। তারপর সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহার পর যদি মুনাফার কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ারসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে।

সুবিধা-অসুবিধা : যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয়

---

* বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ যৌথ কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে 'প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ারে'র ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

যে ইহা ব্যতীত শিল্পবাণিজ্য বর্তমানে উন্নত রূপ ধারণ করিতে পারিত না। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসায়। যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বৃহদায়তনে ব্যবসায় গড়িয়া সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

সুবিধা :

কতকগুলি এরূপ ব্যবসাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এগুলি রাষ্ট্রকেই পরিচালনা করিতে হইত। সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা করিয়া উঠিতে পারিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপরন্তু, ব্যাংক-ব্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান যত বৃহদায়তন হয় উহার মর্যাদা এবং মুনাফাও তত বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আয়তনের প্রসার সম্ভব করিয়াছে। অপরদিকে আবার আয়তন প্রসারের জন্যই এই সকল প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তনে ব্যবসায়ের সকল সুযোগসুবিধা (advantages of large-scale production) ভোগ করিতে পারে।

১। ইহাতে প্রচুর মূলধন দ্বারা বৃহদায়তন ব্যবসায় সম্ভবপর হয়

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান লোকের বিনিয়োগ-অভ্যাস (investment habit) গড়িয়া তুলে। যাহাদের অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনা করিবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা কোনটাই নাই তাহারা যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার কিনিয়া ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিতে পারে। সামান্য সঞ্চয়ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাবাণিজ্যে নিয়োগ করা যায়। দায় সীমাবদ্ধ (limited liability) বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে আগ্রহ থাকে। কোম্পানী ফেল হইলে শুধু নিয়োজিত মূলধনটুকু নষ্ট হইতে পারে ; অন্যান্য সম্পত্তি হারাইবার আশংকা নাই। ইহা ছাড়া শেয়ার বা অংশ হস্তান্তরযোগ্য। ইহার ফলে কোম্পানীর ক্ষতি না করিয়াও বিনিয়োগকারী (investor) টাকা ফেরত পাইতে পারে। শেয়ার-বাজার থাকার দরুন তাহাকে ক্রেতাও খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। এক-মালিকী বা অংশীদারী কারবারে কিন্তু ইহা সম্ভব হয় না। উহা হইতে টাকা উঠাইয়া লইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানী নষ্ট হয়। যাহাদের সঞ্চয় অধিক তাহাদের পক্ষেও যৌথ মূলধনী কারবার সুবিধাজনক। কারণ, ইহার ফলে তাহাদের একই ব্যবসায়ে সমগ্র সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া সমগ্র ঝুঁকি একসংগে লইতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়া দিতে পারে।

২। ইহা বিনিয়োগ-অভ্যাস গড়িয়া তুলে

৩। দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া সুবিধা

৪। শেয়ার বা অংশ হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া সুবিধা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান বহুদিন বাঁচিয়া থাকে, একজন মালিকের ব্যবসায় বা অংশীদারী কারবারের মত একজনের মৃত্যু হইলেই প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায় না। এই কারণে ইহা দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করিতে পারে, ব্যবসায়

রি ব্যবস্থা করিতে পারে। পরিচালনার ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া পরিচালনা ব্যাপারে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

৫। য়িত্ব আর একটি সুবিধা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা বা ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। অংশীদারগণ সংখ্যায় অনেক বলিয়া কোম্পানীর কার্যপরিচালনার সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ দেখা যায় না। নিয়মিত লভ্যাংশ পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্তা পরিচালকগণ (directors) অংশীদারদের সন্তুষ্ট রাখিয়া নানা অসৎ উপায়ে নিজেদের স্বার্থসাধন করিবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে জমিদারী প্রথার আমলে নায়েবদের কুকীর্তির কথা যেমন সহরবাসী জমিদারগণের কর্ণে পৌঁছাইত না, তেমনি পরিচালকবৃন্দের অন্যায় ও অসদাচরণের কথাও অংশীদারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানিতে পারে না।

ত্রুটি :

১। অংশীদারদের সংগে পরিচালকমণ্ডলীর যোগাযোগের অভাব

অনেক সময় আবার পরিচালনার ভার বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ করা হয়। ইহার ফলে অংশীদারগণ ও পরিচালকগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়ে। বেতনভুক্ ম্যানেজারের মধ্যে উদ্যোগ ও উৎসাহ বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণত সে রুটিন-মাফিক কাজ করিয়াই চলে। সে হয়ত' বুঝিতেছে যে, একটি বিশেষ শাখা বন্ধ করা বা একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করা প্রয়োজন। নিজে মালিক হইলে সে অবিলম্বেই ইহা করিত, কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকগণকে ইহা বুঝানো কঠিন বলিয়া সে এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়ই থাকে। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতিতে যৌথ মূলধনী কারবার চলিতে থাকে। সুতরাং যে-সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান তাহাদের উপযোগী নয়।

২। গতানুগতিক পদ্ধতিতে কার্য-পরিচালনা

শেয়ার বা অংশের বিক্রয়যোগ্যতার যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বলিয়া লোকে শেয়ার বেচাকেনার কার্য—অর্থাৎ, ফটকাবাজারের কারবারে টাকা খাটাইতে উৎসাহী হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে সঞ্চয় প্রবাহিত হয় না। উপরন্তু দেখা যায় যে, লোকে ফটকাবাজারে লোকসান খাইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় আবার সঞ্চয়-কারীদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ইহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোকের বিনিয়োগ-ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়।

৩। শেয়ার হস্তান্তর-যোগ্যতার জন্য অসুবিধাও দেখা দেয়

প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ, অপচয়, প্রতিষ্ঠান অতি বৃহদায়তন হওয়ার ফলে একচেটিয়া (monopoly) কারবারের উদ্ভব প্রভৃতি হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ত্রুটি।

৪। অন্যান্য ত্রুটি

তবুও বলা যায়, ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই অধিক। এইজন্যই ইহা আশাতীত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমবায় (Cooperation) : এক-মালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (capitalistic form) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যে-কোন উপায়েই হউক সর্বাধিক মুনাফা লাভ (profit maximisation) করাই হইল ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল রূপের আসল

উদ্দেশ্য। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন, প্রচারকার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়, ধনীদের পছন্দ ও রুচিমত জিনিসপত্র তৈয়ারি হয় এবং দরিদ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি। একশ্রেণীর লেখকের মতে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়ের (cooperation) ভিত্তিতে ব্যবসাবাণিজ্য সংগঠন করা। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি (Cooperative Society) বলা হয়।

সমবায় ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করিতে চেষ্টা করে

সমবায় সমিতির নানা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এইরূপ : কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহারা সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে বলা হয়। আর একটি সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে, সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমুদয় ধনীদের ন্যায় অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে পারে। ফলে, তাহারা নিরবলম্ব হইয়াও নিজেদের বিকশিত করিতে সমর্থ হয়।

সমবায় সমিতির সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায় আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে দারিদ্র্যের পীড়ন। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণই সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে চায়। দরিদ্রের বিশেষ কোন মূলধন থাকিতে পারে না। মূলধন তাহাদের সংগঠনের ভিত্তিও হইতে পারে না। অতএব, সমবায় সমিতির সদস্যগণ মূলধন-মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেই সম্মিলিত হয়।

সমবায়ের নীতি
১। সমবায় দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠন

দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক। এখানে মালিক-শ্রমিকে কোন ভেদ নাই, ম্যানেজার ও সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই স্বার্থের ভিত্তিতে সদস্যগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই একাধারে শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী।

২। সভ্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কার্য করিবে—ইহাই সমবায়ের নীতি। সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি কার্যকর হয় না। জোর করিয়া লোককে সকলের জন্য কাজ করানো যায় না।

৩। ইহাতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে

পরিশেষে, সমবায় সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার করা। সুতরাং সদস্যগণ ছাড়া অন্য কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং সদস্যগণের বেলাতেও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনপ্রকার স্বার্থের প্রতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না।

৪। ইহার উদ্দেশ্য সদস্যগণের অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন করা

দেখা যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশ করে। সুতরাং যাহারা দরিদ্র, যাহাদের সম্বল অতি সামান্য, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কোম্পানী গঠন করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

যে-যে ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী :

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কৃষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। তাহার জোতের (holding) পরিমাণ এত কম যে কৃষিকার্য তাহার পক্ষে মোটেই লাভজনক হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজার দূরে অবস্থিত হওয়ায় উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত মূল্য সে পায় না, ফড়িয়া ব্যাপারী প্রভৃতির নিকট উহা স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ফলে তাহার উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিয়া তাহাকে প্রায়ই গ্রামীণ মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। মহাজনও তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইতে ছাড়ে না। অত্যধিক সুদে কর্জ দিয়া তাহাকে শোষণ করিতে থাকে এবং অবশেষে হয়ত' তাহাকে বাস্তুহীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই অবস্থায় কৃষির উন্নয়নের পন্থা হিসাবে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১। কৃষি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে, কারণ এইরূপ শিল্পে অধিক মূলধন বা বিশেষ পরিচালন-দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী। নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে দামে সুবিধা হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে সমিতির যে-লাভ হয় তাহাও সভ্যগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। অবশ্য সমবায়িক কার্যকলাপের মধ্যে সুবিধাজনক সর্তে ঋণদান করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র কৃষকের নহে, মধ্যবিত্তদেরও স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল।

২। ক্ষুদ্র শিল্প

৩। ভোগ্যপণ্য ক্রয়

৪। মধ্যবিত্তদের ঋণ-ব্যবস্থা

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি (Different Types of Co-operative Societies) : জার্মেনী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম ঐ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করা হয়—যথা, (ক) গ্রামীণ (rural), এবং (খ) পৌর (urban)। গ্রামীণ সমিতিগুলি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (Raiffeisen) নামক একজন সমাজ-সংস্কারক। রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের দুঃখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে সামান্য সুদে সহজলভ্য ঋণের অভাব এবং শোষণকারী মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে ঋণগ্রস্ততা। এই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি যে-প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 'রাইফিজেন ধরনের সমিতি' (Raiffeisen Type of Societies) বলিয়া অভিহিত করা

১। গ্রামীণ ও পৌর সমিতি

হয়। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের সমিতিগুলি এই রাইফিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল : (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকার ফলে সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়; (২) যাহাতে দরিদ্র কৃষক ও স্বল্পবিত্ত গ্রামীণ কারিগর সহজেই সদস্যপদ পাইতে পারে তাহার জন্য শেয়ারের মূল্য অতি অল্প রাখা হয়; (৩) মুনাফালাভই যাহাতে সমিতির লক্ষ্য হইয়া না পড়ে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়; (৪) সদস্যদের দায় বা দায়িত্ব অসীম (unlimited) হয়; (৫) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে (productive purposes) বা বিশেষ বিশেষ কারণে ঋণদান করা হয়—যথা, নূতন জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করেন।

গ্রামীণ সমিতিকে রাইফিজেন ধরনের সমিতি বলা হয়

ইহার বৈশিষ্ট্য

জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন করেন সমাজসেবী সুলজ-ডেলিতস্ (Schultze-Delitsch)। সুতরাং এই ধরনের সমিতি 'সুলজ-ডেলিতস্ ধরনের সমিতি' বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি এই সুলজ-ডেলিতস্ ধরনের। এই প্রকার সমিতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়: (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং ইহার কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না; (২) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়; (৩) সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ (limited) থাকে; (৪) সদস্য কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করিতেছে তাহার বিচার বিশেষ করা হয় না; (৫) বেতনভুক্ কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতির কার্য পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

পৌর সমিতি সুলজ-ডেলিতস্ ধরনের বলিয়া অভিহিত

ইহার বৈশিষ্ট্য

রাইফিজেন এবং সুলজ-ডেলিতস্ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই 'প্রধানত' ঋণদান সমিতি (credit society)।* কিন্তু ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের কার্যকারিতা রহিয়াছে। যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি বীজ সার ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি সরবরাহ, বীমাকার্য, বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি কার্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অতি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করিতে পারা যায়।

২। ঋণদান ও অন্যান্য প্রকার সমিতি

আমাদের দেশে এই সকল উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার সমিতি আছে। কৃষির জন্য আছে সমবায়িক কৃষি-সমিতি। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত একত্রিত করিয়া, সেচকার্যের সুব্যবস্থা করিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তন কৃষিকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে তন্তুবায় সমবায় সমিতি বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। চর্মশিল্প, তৈল উৎপাদন,

ভারতের সমবায় সমিতি

* ঋণদান ছাড়াও ইহারা অন্যান্য কার্য করিতে পারে; তবে সাধারণত ইহারা ঋণদানেই ইহাদের কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখে।

মৎস্য শিকার প্রভৃতিতে সমবায় সমিতি প্রসারলাভ করিতেছে। নগরাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য কিছু কিছু সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সংখ্যা হইল ঋণদান সমিতির পরই। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় সামান্য প্রসারলাভ করিলেও এই দিকে বর্তমানে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। পরিশেষে, বীমা ব্যবসায়ের জন্যও কয়েকটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৩ এক উদ্দেশ্যসাধক এবং বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি

উপরি-উক্ত সকল প্রকার সমবায় সমিতি মাত্র এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়—যথা, হয় তাহারা ঋণদান করে, না-হয় ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করে, অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। এই ধরনের সমিতিকে এক-উদ্দেশ্যসাধক (single-purpose) সমিতি বলা হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বহু-উদ্দেশ্যসাধকও (multi-purpose) হইতে পারে। অর্থাৎ, সমিতি একই সংগে ঋণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ, উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ভারতে উত্তরপ্রদেশ বিহার মহারাষ্ট্র পশ্চিমবংগ রাজস্থান এবং মহীশূরে এই ধরনের বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি অনেক আছে। উপরন্তু, বর্তমানে যে সকল সেবা সমবায় সমিতি (Service Cooperatives) স্থাপন করা হইতেছে তাহারাও মোটামুটি এইরূপ বহু-উদ্দেশ্যসাধক।

সমবায়ের সুবিধা-অসুবিধা : ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের সুবিধার কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে—যথা, ইহার মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, প্রচারকার্য ইত্যাদির জন্য অপচয়মূলক ব্যয় হয় না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলে সমান মর্যাদা পায়, ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও বলা হয় যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার মত ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহের বিনাশ ঘটে না। ইহা যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থকে বজায় রাখে, তেমনি আবার সাধারণ স্বার্থের সহিত উহার সমন্বয়সাধনও করে। ফলে সম্ভব হয় উন্নততর জীবনযাত্রা।

সুবিধা : ইহা ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনা উভয়েরই ত্রুটি হইতে মুক্ত

কিন্তু ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ। দেখা যায় ইহা মাত্র কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সফল হইয়াছে। যেখানে বহু পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় সেখানে—যথা, বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে—সমবায় এখনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই।

ত্রুটি : ১। ইহার কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ

দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠন ব্যাপারে ধরিয়া লওয়া হয় যে সকলেই ব্যবসায় পরিচালনা করিবার উপযুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। সকলেরই ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার যোগ্যতা থাকে না। বহু সমবায় সমিতি যোগ্য পরিচালকের অভাবেই ধ্বংস হইয়াছে।

২। ইহা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত

তৃতীয়ত, সমিতির সদস্যগণ যদি সমবায়ের উচ্চ আদর্শ ও নীতির কথা স্মরণ রাখিয়া —'প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য' কার্য করে তবেই ইহা সফল হইতে পারে। অনেক সময়েই ইহা ঘটে না; ফলে সমবায় সমিতিও সফলতা অর্জন করিতে পারে না।

৩। সমবায়ের নীতি সকলে মানিয়া চলিতে পারে না

ভারতে সমবায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ: ভারতের সমবায়-ব্যবস্থায় উপরি-বর্ণিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে (১৯০৪ সালে) ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হয়। তারপর কৃষক ছাড়াও ক্ষুদ্র কারিগর ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের এই আন্দোলনের মধ্যে লইয়া আসা হয়। কিন্তু অর্ধ-শতাব্দী পরে (১৯৫৪ সালে) দেখা যায় যে ভারতে সমবায় আন্দোলন মোটেই সফল হয় নাই।* যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল তাহাদের মোট ঋণের শতকরা ৩ ভাগের অধিক সমবায় সমিতিগুলি যোগান দিতে পারে নাই এবং মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশও সমবায় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসে নাই। তখন হইতে অবশ্য অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলির ঋণদানের পরিমাণ পাঁচ গুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৯ ভাগ আন্দোলনের অধীনে আসিয়াছে। তবুও আন্দোলন যে সবিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছে একথা বলা যায় না। এখনও জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগের উপর আন্দোলনের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। ঋণদান সমিতিগুলির সুদের হারও বিশেষ স্বল্প নহে; অনেক ক্ষেত্রে ইহা অত্যধিক বলিয়াও বিবেচিত হয়। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সমবায় সমিতি হইতে ঋণ পাওয়া একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারেও ভারতের সমবায় সমিতিগুলি এখনও বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদন বা ক্ষুদ্র শিল্প-সংগঠন কোনটাই উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয় নাই। মোটকথা ভারতের সমবায় আন্দোলন এখনও উন্নততর কৃষিকার্য, উন্নততর ব্যবসায় এবং উন্নততর জীবনযাত্রা ('better farming, better business and better living')—সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ভারতে সমবায়ের অসাফল্য

এই অসাফল্যের মূলে আছে সমবায়ের নীতি ও আদর্শের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার অভাব এবং ইহাদিগকে কার্যকর করিয়া তুলিবার অক্ষমতা। দেখা যায় যে এ-দেশে অধিকাংশ সমবায় সমিতিতেই 'প্রত্যেকে সকলের জন্য' কার্য করে না, বরং অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য কার্য করে। ফলে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ঝগড়াবিবাদ, মিথ্যা হিসাব-প্রদর্শন প্রভৃতি সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অসাফল্যের কারণ

* ১৯৫৪ সালে রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি (Rural Credit Survey Committee) এই অভিমত প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠন সুপরিচালিত করিবার জন্য যে শিক্ষা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার অভাব রহিয়াছে।

ইহার উপর অবশ্য মহাজনদের প্রতিযোগিতার জন্য সমবায় সমিতির কার্য ব্যাহত হইতে দেখা যায়। ফলে সবিশেষ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতে সমবায় সংগঠন আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই।

তবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতে সমবায় দিন দিন সম্প্রসারণের পথে চলিয়াছে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় (Planned Economy) সমবায়ের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হইয়াছে এবং দিন দিন ইহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে আমাদের ন্যায় সমাজতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ-ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র শিল্প, পণ্য বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সমবায় অবশ্যই দিন দিন ক্রমবর্ধমান ভূমিকা গ্রহণ করিবে। এমনকি মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্পেও সমবায়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব, সকল দিকেই সমবায়ের সম্প্রসারণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই লক্ষ্য অনুসারে ঠিক হইয়াছে যে শেষ পর্যন্ত কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন সমবায়ের ভিত্তিতেই করা হইবে। কৃষির ক্ষেত্রে সমবায় সম্প্রসারণের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে 'সেবা সমবায় সমিতি' (Service Cooperatives) দ্বারা দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল ছাইয়া ফেলা হইবে এবং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায়িক কৃষি-সমিতি (Cooperative Farming Societies) স্থাপন করা হইবে। প্রত্যেকটি সেবা সমবায় সমিতি মোটামুটি এক একটি গ্রাম লইয়া গঠিত হইবে। ইহারা কৃষককে স্বল্প সুদে ঋণপ্রদান করিয়া, বীজ সার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া কৃষক ও কৃষির 'সেবা' করিবে। এইজন্যই ইহাদিগকে 'সেবা সমবায় সমিতি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষির কিছুটা সুসংগঠনের ব্যবস্থা করিলে পর সরকার সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের (Cooperative Farming) সম্প্রসারণে মনোযোগী হইবে। আশা করা হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগ লোক সেবা সমবায় সমিতির অধীনে আসিবে এবং মোট পল্লী সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইবে ২.৩ লক্ষে। এই পল্লী সমিতির অধিকাংশ হইবে সেবা সমবায় সমিতি। ইহা ছাড়া অবশ্য সাধারণ কৃষি ঋণদান সমিতি, বিক্রয়করণ সমিতি প্রভৃতিও থাকিবে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়

সেবা সমবায় সমিতি

শিল্প ও সেবামূলক কার্যাদির ক্ষেত্রে সমবায় সম্প্রসারণের যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা সংক্ষেপে এইভাবে করা যাইতে পারে: মাঝারি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সংগঠন যথাসম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতেই করা হইবে। বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-সংগঠন করা সুরু হইবে। ভোগ্যপণ্য

সরবরাহকারী সমবায় সমিতির (Consumers' Cooperatives) সংখ্যাবৃদ্ধি ও উহাদিগকে সরকারী সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করা হইবে। পরিবহণ ও গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায়কে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা প্রদান করা হইবে। এইভাবে কৃষি, শিল্প ও সেবার ক্ষেত্রে সমবায় সম্প্রসারিত হইলে সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থাও (Socialist Pattern of Society) সার্থক হইয়া উঠিবে।

সমবায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৩৪ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State Management): রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে রেলপথ, ডাক-তার, বিমান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচের খাল, মোটরবাস চালানো প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইহার উপর রাষ্ট্র কল-কারখানার মালিক হইয়াও উহাদের পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা, সিন্ধ্রির সার তৈয়ারির কারখানা, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণের কারখানা, রুরকেলা ভিলাই ও দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির মালিক হইল রাষ্ট্র এবং ইহাদের পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছে রাষ্ট্র।

দিন দিন রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা জনস্বার্থের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে মুনাফা দেশের সকল লোক ভোগ করিবে ইহাই ত' অর্থনৈতিক আদর্শ। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত পরিচালনায় অপচয়, অনগ্রসরতা, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে তাহা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকের লক্ষ্য মুনাফা সর্বাধিক করা; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য দেশের সর্বাংগীণ কল্যাণ-সাধন। এই কারণে রাষ্ট্র মুনাফা হ্রাস করিয়াও বহু লোককে নিয়োগ করিতে পারে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নূতন শিল্পের পত্তন করিতে এবং অনিষ্ট-কারক দ্রব্যের উৎপাদন কমাইয়া দিতে পারে। প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফলে এই অর্থ উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সপক্ষে যুক্তি

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অবশ্য সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। পরিচালকগণের পক্ষে উদ্যম ও উৎসাহের অভাব এই প্রকার সংগঠনের প্রধান ত্রুটি। মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং অভ্যাসগত কারণে রাষ্ট্রীয় পরিচালকগণ রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এইজন্যই আবার তাহাদের মধ্যে উৎকোচগ্রহণ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিচালনাও ত্রুটিহীন নয়

পরিচালকগণ ভুল করিতে পারে। তবুও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রতি আকর্ষণ মোটেই কমে নাই; বরং দিন দিন ইহা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সুরুতেই বলা হইয়াছে যে ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার। এই সম্পর্কে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

তবুও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে

সংক্ষিপ্তসার

ব্যবসায় সংগঠনের রূপের মধ্যে এক-মালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা এবং সমবায়ই প্রধান।

এক-মালিকী কারবার : ইহাতে একজন মালিকই মূলধন প্রদান করে, সে-ই পরিচালনা করে এবং মুনাফা ভোগ করে। ইহার কতকগুলি সুবিধা আছে; কিন্তু ইহা সংকীর্ণ পরিধির হয় এবং স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে।

অংশীদারী কারবার : কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিলে ইহাকে অংশীদারী কারবার বলে। একজনের ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলি অংশীদারী কারবারে দেখা যায় না; তবুও ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপ ত্রুটিবিহীন নহে। অসীম দায় (unlimited liability) ইহার প্রধান ত্রুটি।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান : বর্তমানে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বহু ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং একটি পরিচালকমণ্ডলীর হাতে ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। সসীম দায় বা দায়িত্ব ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (১) শেয়ার এবং (২) ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ার বিভিন্ন রকমের হয়—যথা, সাধারণ শেয়ার, প্রতিষ্ঠাতৃগণের শেয়ার, সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার, সর্বাগ্রগণ্য সঞ্চয়মূলক শেয়ার ইত্যাদি। বিভিন্ন শেয়ারের উপর বিভিন্নভাবে লভ্যাংশ বণ্টিত হয়। ডিবেঞ্চারের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়।

সুবিধা : ১। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়; ২। ইহা বিনিময়-অভ্যাস গড়িয়া তুলে; ৩। দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য লোকে বিনিয়োগ করিতে ভয় পায় না; ৪। শেয়ার আবার হস্তান্তরযোগ্য, ৫। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অসুবিধা : অংশীদারদের সংগে পরিচালকমণ্ডলীর যোগাযোগ থাকে না; ২। ব্যবসায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়; ৩। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় অসুবিধা দেখা যায়; ৪। একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে।

সমবায় : ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য। সমবায়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় : ১। সমবায় দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠন, ২। সভ্যদের মধ্যে সম্পর্ক সাম্যের সম্পর্ক, ৩। ইহাতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে, ৪। ইহা সদস্যগণের অর্থ নৈতিক স্বার্থসাধন করে।

কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ভোগ্যপণ্য ক্রয় এবং মধ্যবিত্তদের ঋণ-ব্যবস্থায় সমবায় বিশেষ উপযোগী।

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি : সমবায় সমিতিগুলিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) গ্রামীণ, এবং (২) পৌর। গ্রামীণ সমিতিগুলিকে রাইফিজেন ধরনের এবং পৌর সমিতিগুলিকে সুলজ-ডেলিতস্ ধরনের বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূলত ভারতের সমবায় সমিতিগুলিও এই রাইফিজেন এবং সুলজ-ডেলিতস্ ধরনের।

সমবায় সমিতির আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল ঋণদান ও অ-ঋণদান সমিতির মধ্যে। আবার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতিও দেখা যায়।

ভারতে ঋণদান সমিতি ছাড়াও সমবায়িক কৃষি-সমিতি, তন্তুবায় সমিতি, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমিতি, গৃহনির্মাণ সমিতি, বীমা সমিতি এবং বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি আছে।

...য়ের সুবিধা-অসুবিধা: ইহা ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ত্রুটি হইতে মুক্ত। কিন্তু সমবায়ের কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ—ইহা বৃহৎ ব্যবসায়ের উপযোগী নহে। উপরন্তু, সমবায়ের সফলতা কতকগুলি নীতি পালনের উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহা অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়াছে দেখা যায়।

ভারতে সমবায় আন্দোলন উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্যই একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা উন্নততর কৃষিকায, উন্নততর ব্যবসায়, উন্নততর জীবনযাত্রা —সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের কোনটিকেই সফল করিতে পারে নাই। তবে বর্তমানে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমবায়কে সফল করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় সমবায়ের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হইয়াছে। এই কল্পনাকে রূপদানের জন্য দেশে অসংখ্য সেবা সমবায় সমিতি ও সমবায়িক কৃষি-সমিতি গঠন করা হইবে, এবং শিল্প ও সেবামূলক কার্যাদির ক্ষেত্রেও সমবায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইবে। এইভাবে সমবায়ের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা: বর্তমানে সমাজতান্ত্রিকতার ধারণার প্রসারের ফলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে ইহার কয়েকটি ত্রুটিও দেখা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain and discuss the different forms of Business Organisation.
(H. S. (H) Comp. 1961)

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপের ব্যাখ্যা ও আলোচনা কর।

[১১৭-১২০, ১২৩-১২৪ এবং ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা]

2. Describe the features of a Joint Stock Company. What are its advantages and disadvantages?
(C. U. 1957,'60)

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা এবং অসুবিধা কি কি?

[১১৮-১২২ পৃষ্ঠা]

3. Show how a Joint Stock Company raises its Capital. Indicate the advantages that it enjoys from limited liability and transferability of shares.
(C. U. 1952)

কিভাবে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহ করে তাহা দেখাও। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধ দায় এবং শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা হইতে যে-সুবিধা ভোগ করে তাহার বিবরণ দাও।

[ইংগিত: দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য লোক টাকা খাটাইতে ভয় পায় না। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় যে-কোন সময় টাকা ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। ইহাও বিনিয়োগ-অভ্যাস গড়িয়া তুলে। ......এবং (১১৯-১২১ পৃষ্ঠা)]

4. What is meant by Cooperation? Describe the different types of Cooperative Societies which prevail in India.
(H. S. (H) 1960)

সমবায় বলিতে কি বুঝায়? ভারতে যে বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি দেখা যায় তাহাদের বর্ণনা কর।

[১২৩-১২৪ এবং ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা]

5. State the principles of Cooperation. What are the different types of Cooperative Societies to be found in India?
(H. S. (H) 1962)

সমবায়ের নীতিগুলি বর্ণনা কর। ভারতে কোন্ কোন্ ধরনের সমবায় সমিতি দেখা যায়?

[১২৩-১২৪ এবং ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা]

6. Describe the part which Cooperation can play in the development of Indian agriculture.
(H. S. (H) 1961)

ভারতে কৃষির উন্নয়নে সমবায় যে-ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে তাহা বর্ণনা কর।

[ইংগিত: ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের কৃষির উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হইতে পারে।

বস্তুত, সমবায়ই হইল এইরূপ দেশের কৃষির উন্নয়নের অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা। জার্মেনীতে সমবায় সমিতি গঠন করিয়াই কৃষকগণ অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিল। ভারতে কৃষির ক্ষেত্রে মূলধন বা কৃষি-ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে, বীজ সার প্রভৃতি সরবরাহ ব্যাপারে, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থায়, জলসেচ-ব্যবস্থায় সমবায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এমনকি সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন কৃষিকার্যের অবসান ঘটাইয়া বৃহদায়তন কৃষিকার্যের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষির পুনর্গঠনে সমবায়কে এইরূপ ভূমিকাই প্রদান করা হইয়াছে।……এবং (১২৫-১২৬, ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা)]

7. **Discuss the part played by the Cooperative Movement in removing difficulties of Indian Agriculture.** **(C. U. 1959)**

ভারতের কৃষির ত্রুটি দূরিকরণে সমবায় আন্দোলন যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

[ইংগিত : সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি-ঋণের সুব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, জোতের সংহতিসাধন, ক্ষুদ্র শিল্প গঠনের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে অর্ধ-বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতির প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। তবে এ-পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন কোন দিকেই বিশেষ সফল হয় নাই।…এবং (১২৫-১২৬ এবং ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা)]

8. **Discuss the present state of Cooperative Movement in India. What do you think to be the future of the movement ?**

ভারতে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা কর। সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা তাহা বিবৃত কর। [১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা]

9. **Write a short note on Cooperation.** **(H. S. (H) Comp. 1962)**

সমবায়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [১২১-১২৫ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

(Large and Small-scale Industries)

বর্তমান যুগ একদিকে যেমন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার যুগ, অন্যদিকে তেমনি বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। বস্তুত, সকল ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য যদি ক্ষুদ্রায়তনেই পরিচালনা করা হইত তবে ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে এক-মালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার এবং সমবায়ের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যাইত—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার উদ্ভব ঘটিত না।

বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ

বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ—(ক) শ্রমবিভাগ, (খ) যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং (গ) বিক্রয় বাজারের প্রসার।

উহার মূলে আছে তিনটি কারণ

শ্রমবিভাগ (Division of Labour)ঃ শ্রমবিভাগ প্রথমে সুরু হয় পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে। আদিমতম যুগে কর্মবিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া পশুপক্ষী শিকার ও ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহার পর কৃষিকার্য সুরু ও গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইলে ধীরে ধীরে কর্মবিভাগ দেখা দিল।* কতক লোক মাত্র কৃষিকার্যেই নিযুক্ত রহিল, আবার কতক লোক সংগে সংগে অন্যান্য পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে কৃষিকার্য ছাড়িয়া তাহাদের বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিল। যেমন, যে-ব্যক্তি লাঙল তৈয়ারি করিত সে শুধু লাঙল তৈয়ারিতেই নিযুক্ত রহিল। এইভাবে যে পেশাগত বিভিন্নতা বা কর্মবিভাগ সুরু হইল সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে তাহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে একদিন গড়িয়া উঠিল অসংখ্য পেশার ভিত্তিতে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা। বর্তমান দিনে কেহই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করে না। ইহার পরিবর্তে সাধারণত একটিমাত্র পেশা অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনে নিযুক্ত থাকে; এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক মাত্র শিক্ষকতার কার্যেই নিযুক্ত থাকেন এবং ইহার বিনিময়ে যে-অর্থ পান তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন।

শ্রমবিভাগের সূত্রপাত ও প্রসার

বর্তমান শ্রমবিভাগ ও বিনিময়-ব্যবস্থা

কিন্তু বিভিন্ন পেশায় উৎপাদনকার্যের বিভাগই শ্রমবিভাগের শেষ কথা নয়। শ্রমবিভাগ আরও অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি পেশাও আবার বিভিন্ন অংশ বা প্রক্রিয়ায় (process) বিভক্ত। পূর্বে চিকিৎসককে—যেমন, কবিরাজ বা হকিমকে—রোগনির্ণয়, ঔষধপত্র তৈয়ারি, ঔষধপত্র প্রদান সকল কার্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত। বর্তমানে চিকিৎসক রোগনির্ণয় করিয়া ব্যবস্থাপত্র (prescription) লিখিয়া দিয়াই ক্ষান্ত। ঔষধ তৈয়ারি ও ঔষধ প্রদানের ভার হইল অন্যান্য শ্রেণীর লোকের উপর।** জুতা তৈয়ারির উদাহরণও লওয়া যাইতে পারে। পূর্বে জুতা তৈয়ারির জন্য চর্মকারকে চর্ম সংগ্রহ করিতে হইত। এখন চর্ম সংগ্রহ করে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করে দ্বিতীয় একদল লোক এবং প্রকৃত জুতা তৈয়ারি করে আর একদল লোক। আবার বাটা কোম্পানীর মত জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারির কার্যই শতাধিক ক্ষুদ্রতর প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। কেহ শুধু গোড়ালি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতা পরায়, কেহ বা মাত্র চারিটি করিয়া পেরেক বসায়, ইত্যাদি। অর্থবিত্থার জনক অ্যাডাম স্মিথ

বর্তমান শ্রমবিভাগ—প্রত্যেক পেশা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত

উদাহরণ

---

* পৌরবিজ্ঞানের ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য চিকিৎসক এখনও নিজে ঔষধ দিয়া থাকেন; কবিরাজ বা হকিম নিজে ঔষধপত্র তৈয়ারিও করিয়া থাকেন। তবে গতি হইল চিকিৎসার কার্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করার দিকে।

দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্য ১৮টি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ শতাব্দীর এই সময় বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্যও আছে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা

শ্রমবিভাগের কতকগুলি সুবিধা সহজেই অনুধাবন করা যায়। শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্প বাণিজ্যের এই উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। উদাহরণ দিয়া একজন অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে ইঞ্জিন-নির্মাতা, ইঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রমবিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা কখনও রেলগাড়ি চালানো সম্ভব হইত না। আবার ইঞ্জিন নির্মাণের কার্যও যদি মাত্র একজনকে করিতে হইত তবে কখনই ইঞ্জিন নির্মিত হইত না।

আধুনিক সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ
জুতা তৈয়ারি

দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অ্যাডাম স্মিথ দেখাইয়াছিলেন যে কোন লোকই সকল কার্যের জন্য সমান উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে। তৃতীয়ত, একই কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সে পারদর্শিতাও লাভ করে। চতুর্থত, শ্রমিককে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হয় না বলিয়া সময়ও বাঁচে। পঞ্চমত, শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতে থাকে। পরিশেষে, এই সকল সুবিধার সমন্বয়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং শ্রমিককে অধিক মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়।

অবশ্য শ্রমবিভাগের অসুবিধাও আছে। প্রথমত, অতি সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে; তাহার অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দৈনিক সহস্র সহস্র জুতার গোড়ালি লাগানো যাহার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জুতা নির্মাণ করা আর সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন একই ধরনের কাজ শ্রমিকের মনের উপর আঘাত করে বলিয়া তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, শ্রমিক যে-দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহার চাহিদা কমিয়া গেলে শ্রমিকের পক্ষে বেকার হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে। পরিশেষে, শ্রমবিভাগের জন্য অসংখ্য শ্রমিক অসংখ্য রকমের কাজ করে বলিয়া পরিচালকগণের পক্ষে তাহাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা

যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Use of Machinery): শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতেছে। অপরদিকে আবার নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেছে। উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে যে-সকল সুবিধা হয় তাহাদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) শক্তি (power), এবং (খ) সূক্ষ্মতা (precision)। যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনকার্যে মানুষের শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে। জলস্রোত ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, অণু হইতে আণবিক শক্তির সৃষ্টি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নদী সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীর উপর চাপও কম পড়িতেছে। তাজমহল নির্মাণে মানুষকে পেশীর দ্বারা যত বড় পাথর তুলিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় পাথর আজ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা সূক্ষ্ম, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একই প্রকার জিনিসপত্রও তৈয়ারি করা সম্ভব হইতেছে। পরিশেষে, যন্ত্রপাতি দ্বারা অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও করা যায়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের সহিত জড়িত

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা

যন্ত্রপাতির ব্যবহারের অবশ্য অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে শ্রমিকও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। তাহার পেশীর উপর চাপ কমিলেও মনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় শ্রমিক ইহা সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি আবার প্রথম প্রথম শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়া বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। অবশ্য পরে ঐ নূতন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিলে কর্মচ্যুত শ্রমিকের অধিকাংশ পুনর্নিযুক্ত হয়। আরও বলা যায় যে কদর্য কারখানা-জীবন, বৈচিত্র্যবিহীন পরিশ্রম ইত্যাদি যেমন শ্রমবিভাগের ফল তেমনি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও ফল।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অসুবিধা

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industries) : শ্রমবিভাগ দুই প্রকারের হয়—(ক) ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রমবিভাগ (individual division of labour), এবং (খ) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগকে 'শিল্পের একদেশতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একটি শিল্প যদি দেশের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তাহাকে শিল্পের একদেশতা বলে। পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কল শিল্প প্রভৃতি এই একদেশতার উদাহরণ। ভারতের পাটকলের অধিকাংশ পশ্চিমবংগেই অবস্থিত; কাপড়ের কলের বেশীর ভাগ বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত।

একদেশতা কাহাকে বলে

একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয়সংক্ষেপের (economies) জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ। এই ব্যয়সংক্ষেপের জন্য তাহারা সুবিধাজনক স্থানে গিয়া ভিড় করে; ফলে শিল্পটি ঐ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। নানা কারণে কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে পাটকল স্থাপন করা সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে পাটকল শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

একদেশতার কারণ

যে যে কারণে শিল্পের একদেশতা ঘটে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) কাঁচামালের সান্নিধ্য (Nearness to Raw Materials) : যে অঞ্চলে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী স্থানেই শিল্পটি গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে পাট পাওয়া যায় বলিয়াই কলিকাতার নিকট পাটকল শিল্পের একদেশতা ঘটিয়াছে; ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভাল তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(২) জলবায়ু (Climate) : জলবায়ুও আর একটি কারণ। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মূলে আছে ঐ অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু।

(৩) শক্তির সান্নিধ্য (Nearness to Power) : শক্তিসম্পদের সুযোগ লাভ করিবার জন্যও শিল্পের একদেশতা ঘটে। লৌহ শিল্প কয়লাখনির নিকটেই গড়িয়া উঠে।

(৪) বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য* (Nearness to Market) : প্রাচীনকালে রাজদরবারের নিকটবর্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত। অন্যান্য সুবিধা না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ হইত। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ও বাসনপত্র শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায় যে বিক্রয়বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকট কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

(৫) অন্যান্য কারণ (Other Reasons) : অনেক সময় বন্দর, রেলপথ ও বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্যও শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। মোটকথা, শিল্পের একদেশতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল বহন-ব্যয় (transport cost) জনিত সুবিধা।* যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি লইয়া আসা ও নির্মিত দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, শিল্পপতিগণ অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার।

একদেশতার সুবিধা

একদেশতার ফলে শিল্পের নানা সুবিধা হয়। প্রথমত, অনেক দক্ষ শ্রমিক ঐ স্থানে আসিয়া কর্মপ্রার্থী হয় বলিয়া শ্রমিকসংগ্রহ করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান একসংগে গড়িয়া উঠে বলিয়া যানবাহন ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, নানা সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা হয়। চতুর্থত, শিল্পের একদেশতা ঘটিলে ঐ স্থানে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও গড়িয়া উঠে। পরিশেষে, ঐ স্থানের শিল্পের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ী ক্রয় করিবার সময় লোকে কোন্ কারখানায় বা কোন্ তাঁতীর তৈয়ারি তাহা খোঁজ করে না।

একদেশতার বিপদ

একদেশতার কিন্তু একটি বিশেষ বিপদ আছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প যে দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার চাহিদা যদি বিশেষ কমিয়া যায় তবে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক বেকার-সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইলে পশ্চিমবংগের পাটকলগুলির অধিকাংশ বন্ধ হইয়া পাটকল-শ্রমিকদের মধ্যে অনেক বেকারের সৃষ্টি করিবে।

শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের কারণ

বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industry) : শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অন্যতম অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বৃহদায়তন শিল্প যাহাকে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার অংগ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যন্ত্রপাতি ও শ্রমিককে যদি পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি নিয়োগের সুবিধা উপস্থিত হয়। ফলে শিল্প বৃহত্তর আকার ধারণ করে। বৃহদায়তনে উৎপাদন বা বৃহদায়তন শিল্পের

* "The location of manufacturing industries may be influenced by many factors but often the dominant influence is transport costs."

দিকে বর্তমানে যে-গতি লক্ষ্য করা যায় তাহার তৃতীয় কারণটিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার। বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামের বাজারের মত বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয় নাই। কারণ, সংকীর্ণ বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বিক্রয়বাজারের প্রসার—এই তিনটি বিষয়ই শিল্পকে বৃহদায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

তৃতীয় কারণ বিক্রয়-বাজারের প্রসার

বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা ঃ শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সকল সুবিধা হয় তাহা সকলই বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থসংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়।

তিন প্রকারের সুবিধা ঃ

(ক) উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা ঃ উৎপাদন ব্যাপারে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক। উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা

(১) সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের জন্য যে-ব্যক্তি যে-কার্যের উপযুক্ত তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও (specialised experts) নিয়োগ করা যাইতে পারে।

১। পূর্ণ নিয়োগ

(২) শিল্পের মোট উৎপাদন-ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—যথা, ধার্য ব্যয় (fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost)। কারখানার জন্য যে-জমি লওয়া হইয়াছে তাহার খাজনা, কারখানাগৃহ, অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি এই ধার্য ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। অপরদিকে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি হইল পরিবর্তনশীল ব্যয়। ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির সমানুপাতে ধার্য ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে না বলিয়া দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কম হয়।

২। ধার্য ব্যয় হ্রাস

(৩) একসংগে বহু পরিমাণে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা হয় বলিয়া দামের দিক দিয়া সুবিধা পাওয়া যায় এবং একসংগে অনেক মাল লইয়া আসিলে পরিবহণ ব্যয়ও কম পড়ে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মালপত্র কেনা ও পরিবহণ ব্যাপারে পাইকারী দরের যে সুবিধা পায় তাহা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না।

৩। মাল কেনার সুবিধা

(৪) নূতন নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া ক্রমাগত ব্যয়-সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা যায়।

৪। যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ

(৫) উপজাত দ্রব্য (by-products) হইতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছোট ছোট কারখানায় চিনি

৫। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার

উৎপাদনের সময় অনেকটা রস নষ্ট হয়। বড় বড় কারখানায় এই রস হইতে জ্বালানির জন্য একরকম স্পিরিট তৈয়ারি করা হয়।

৬। গবেষণা

(৬) বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু অর্থ-ব্যয়ও করিতে পারে।

(খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা: বিক্রয় ব্যাপারেও বৃহদায়তন শিল্পের অনুরূপ কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। ইহা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে মাল বহন করিয়া বাজারে দিতে পারে; অনেক দ্রব্য একসংগে বিক্রয় হয় বলিয়া এককপিছু কিছু সুবিধা দিলেও মোট লাভ অধিক থাকে। ইহা ছাড়াও বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, ক্যানভাসার নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে পারে। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে—যেমন, বাটার জুতা বাটার ছাতার বিজ্ঞাপনের কাজ করে।

খ। বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা

(গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক সর্তে অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, মহাজন প্রভৃতি যত অল্প সুদে এবং সহজ জামিনে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয় ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে তাহা দেয় না।
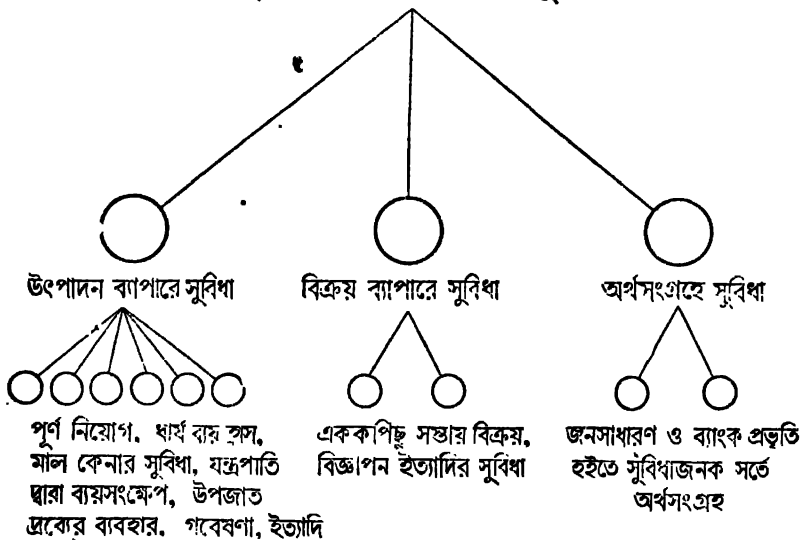
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (External and Internal Economies): বৃহদায়তনে উৎপাদনের উপরি-বর্ণিত সুবিধাসমূহকে সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (economies of scale) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মার্শাল ইহাদিগকে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ

আয়তনজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ:

(external economies) এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (internal economies)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

ক। বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ

বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের উদ্ভব হয় প্রধানত একদেশতার জন্য।* কোন শিল্প (industry) বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (firm) আয়তন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, শিল্পের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংক্ষেপ কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোগ করে না, সংগে সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, পশ্চিমবংগে হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য পাটকল-শ্রমিক আসিয়া হাজির হয় তাহার সুবিধা কোন পাটকল এককভাবে ভোগ করে না, সকল পাটকলই ঐ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও উহা অপরের আয়তনবৃদ্ধির দরুন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুরে টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন কোন রেললাইন পাতা হইলে ঐখানে যে টিন-পাত শিল্প (tin-plate industry) আছে তাহারও পরিবহণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে।

খ। আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিন্তু এককভাবে ভোগ করে। ইহা দেখা দেয় কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কাঁচামাল কিনিতে পারে, অপেক্ষাকৃত কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে পারে, উপজাত দ্রব্য হইতে নূতন বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, দক্ষ ম্যানেজার ও কর্মী নিয়োগ করিতে পারে, ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industry) : বৃহদায়তন উৎপাদনের উপরি-উক্ত সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে। শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্য ভুল হইবে, অনেক ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। ইহার কারণ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ কতকগুলি অসুবিধা বা সীমাও আছে। এই অসুবিধাগুলিই ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধা হিসাবে দেখা দেয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা :

প্রথমত, কতক প্রকারের জিনিসপত্র বহুল অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করিলেই অধিক সফলতা লাভ করা যায়। যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল তাহাদিগকে বৃহদায়তন শিল্পে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। এইজন্য দেখা যায় যে বাজারে 'রেডিমেড' পোশাকের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দর্জির দোকানের

* "External economies are those that...arise from the localisation of industries."

সংখ্যা কমে নাই। অনেক দ্রব্য নির্মাণে আবার ব্যক্তিগত নিপুণতার প্রয়োজন হয়। ইহাদিগকেও বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরী শালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং বৃহদায়তনে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ব্যক্তিগত চাহিদার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজার আবার ভৌগোলিক কারণেও সীমাবদ্ধ হয়। কাঁচা দুধ, মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি অধিকাংশ মাত্র স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করা চলে। এইজন্য এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অতি বৃহদায়তন হইতে পারে না। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তনই শ্রমবিভাগ বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে।*

১। সকল দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না

২। ক্ষুদ্র শিল্পে মালিকের দৃষ্টি সর্বত্র থাকে

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক সকলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে। ইহার ফলে কাঁচামাল সরবরাহকারী ঠকাইতে পারে না, শ্রমিক ঠিকমত কাজ করে, খরিদ্দারের যত্ন লওয়া সম্ভব হয়, ইত্যাদি।

৩। মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক

তৃতীয়ত, পরস্পরের নিকট থাকিয়া কাজ করার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়িয়া উঠে।

৪। পরিচালনার সুবিধা

চতুর্থত, পরিচালনার দিক দিয়াও ক্ষুদ্র শিল্পের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থা অতি জটিল। ইহা রুটিন-পদ্ধতিতেই চলে। ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয়, নানারূপ অপচয় ঘটে এবং ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের এই অসুবিধা নাই। ইহাতে মালিক বা পরিচালক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

পঞ্চমত, ব্যবসায়ের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়িতে পারে—কারণ, লোকের পরিচালনক্ষমতার একটা সীমা আছে। এইরূপ ঘটিলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অভাবে ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইতে পারে।** পরিচালক প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে অথবা প্রয়োজনমত শ্রমিক নিয়োগ করিতে না পারিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। অনেক সময় এই মূলধন সংগ্রহ করার অসুবিধার জন্যই ব্যবসায়ের আয়তনকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

৫। ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের বিধির ভয় নাই

ক্ষুদ্র শিল্পে কিন্তু এই অসুবিধা নাই। অল্প লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার পক্ষে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাত নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ইহা ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে এড়াইয়া চলিতে পারে।

---

* Division of labour is limited by the extent of the market.

** ৬১-৬৩ পৃষ্ঠা দেখ। সেখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে জমি শ্রম মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের মধ্যে অনুপাত অকাম্য হইলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়।

পরিশেষে, বৃহদায়তনে উৎপাদন সর্বদা বাজারে চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। নচেৎ, উৎপন্ন দ্রব্য অবিক্রীত থাকার ফলে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে এ-সমস্যা কিন্তু অতটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করে; সুতরাং চাহিদার সামান্য হ্রাসবৃদ্ধিতে তাহার বিশেষ কিছু যায় আসে না। কোন বৎসরে পূজার সময়ে জুতার চাহিদা পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেলে বাটা কোম্পানীর যতটা ক্ষতি হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুতা নির্মাতাদের ততটা ক্ষতি হয় না।

৬। বাজারের সামান্য পরিবর্তনেও উহার কিছু যায় আসে না

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই সকল সুবিধা বা বৃহদায়তন শিল্পের এই সকল অসুবিধার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি অতি শিল্পোন্নত দেশেও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন। জাপানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হইল শতকরা ৮০ ভাগ। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ৯৫-৯৮ ভাগের মত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৬০-৬১ সালে ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ১৩০০ কোটি টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন এবং ৩৬ লক্ষ লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ২০০ কোটি টাকার মত কম হইলেও উহাদের নিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি লোক। মাত্র তুলাতাঁত শিল্পেই (handloom industry) নিযুক্ত লোকের সংখ্যাই ছিল সকল বৃহদায়তন কলকারখানা খনি এবং চা কফি ইত্যাদির ন্যায় রোপণ শিল্পে (plantation industries) নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান। অতএব, উৎপাদন ও নিয়োগ—উভয় দিক দিয়াই আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

এই সকল সুবিধার জন্যই ক্ষুদ্র শিল্প স্থানচ্যুত হয় নাই

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্প

ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদন করে; কিন্তু কুটির শিল্পে পরিবারের লোকেরাই প্রধানত শ্রমের যোগান দেয়। আমাদের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিশদ আলোচনা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রসংগে পরে করা হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

বৃহদায়তন শিল্প: বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। ইহার মূলে আছে তিনটি কারণ—১। শ্রমবিভাগ, ২। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং ৩। বিক্রয়বাজারের প্রসার।

শ্রমবিভাগের সূত্রপাত হয় অতি সরলভাবে; কিন্তু বর্তমানে ইহা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। কিন্তু সুবিধাই অধিক।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে (১) শক্তি ও (২) সূক্ষ্মতার দিক দিয়া সুবিধা দেখা যায়। ইহার অবশ্য কয়েকটি অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি শ্রমিককে যন্ত্রে পরিণত করে, সাময়িকভাবে বেকার-সমস্যারও সৃষ্টি করে, ইত্যাদি।

শিল্পের একদেশতা: কোন শিল্প দেশের একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে 'একদেশতা' বলা হয়। একদেশতার মূলে আছে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা। এই ব্যয়সংক্ষেপ কাঁচামাল সংগ্রহ, শ্রমিক সংগ্রহ, বাজারে নির্মিত দ্রব্য প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া হইতে পারে। মোটকথা, যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিলে পরিবহণজনিত সুবিধা ভোগ করা যায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেই স্থানেই ভিড় করিতে দেখা যায়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার। একদেশতার যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ অসুবিধা বা বিপদও আছে।

বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থার মূলে যে তৃতীয় কারণটি বর্তমান রহিয়াছে তাহা হইল বিক্রয়বাজারের প্রসার। বিক্রয়বাজারের প্রসার না ঘটিলে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সত্ত্বেও বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব ঘটিত না।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্প তিন প্রকার সুবিধা ভোগ করে—(ক) উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা, (খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা, এবং (গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা।

উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা নিম্নলিখিত প্রকারের: ১। সকলকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে; ২। ধার্য ব্যয় হ্রাস পায়; ৩। মাল কেনার সুবিধা হয়; ৪। যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ করা যায়; ৫। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যায়; ৬। গবেষণার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়।

বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা: অল্প ব্যয়ে বহু মাল বহন করিয়া লওয়া যায়, ২। প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়, ৩। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে।

অর্থসংগ্রহে সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্প সহজে অর্থসংগ্রহ করিতে পারে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ: বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাসমূহ 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' বলিয়া অভিহিত। ইহাদিগকে 'বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ' এবং 'আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ'—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারিত হইলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করে তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত, অপরদিকে কারখানার বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা এককভাবে ভোগ করে তাহাই আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প: বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকিয়া আছে। ইহার কারণ হইল, ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনেরও কয়েকটি সুবিধা আছে যাহা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে: ১। ক্ষুদ্র-প্রতিষ্ঠানে মালিক সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে; ২। খরিদ্দারের প্রতি যত্ন লইতে পারে; ৩। কতকগুলি দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না; ৪। মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দৃঢ় হয়; ৫। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের সমস্যা বিশেষ নাই; ৬। বিক্রয়বাজারের তেজী-মন্দা অবস্থা দ্বারা বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা কম প্রভাবান্বিত হয়।

এই সকলের ফলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু টিকিয়া থাকে নাই, অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। শুধু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে নহে, শিল্পোন্নত দেশসমূহেও বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss briefly the economies that generally result from production on a large scale. (C. U. 1958 ; S. F. (Comp.) 1961)

বৃহদায়তনে উৎপাদন হইতে যে-সকল সুবিধার (ব্যয়সংক্ষেপের) উদ্ভব হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা]

2. Describe the advantages and limitations of Large-scale Industries.

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ও সীমা বর্ণনা কর। (C. U. 1952)

[**ইংগিত:** বৃহদায়তন শিল্পের সীমা বলিতে অসুবিধা বুঝায়। এই অসুবিধাগুলির জন্যই ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থা টিকিয়া আছে।...(১৩৯-১৪০ এবং ১৪১-১৪৩ পৃষ্ঠা)]

3. Describe the relative advantages and disadvantages of large-scale and small-scale production. (P. U. 1962)

বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলির তুলনা কর।

[১৩৯-১৪০ এবং ১৪১-১৪৩ পৃষ্ঠা]

4. What is meant by internal and external economies of large-scale production ? Illustrate your answer by giving two concrete examples of each. (H. S. (C) 1960)

বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিতে কি বুঝায় ? প্রত্যেকটির অন্তত দুইটি করিয়া উদাহরণসহ প্রশ্নটির উত্তর দাও। [১৪০-১৪১ পৃষ্ঠা]

5. Describe the advantages and disadvantages of Division of Labour. Discuss the statement that 'Division of Labour is limited by the extent of the market.' (C. U. 1946, '59)

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। 'শ্রমবিভাগের সীমা বাজারের আয়তন দ্বারা নির্দিষ্ট' —উক্তিটির আলোচনা কর।

[ইংগিত : শ্রমবিভাগের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয়। কিন্তু শিল্প যতটা বৃহদায়তন হওয়া সম্ভব শ্রমবিভাগ ততটাই সম্প্রসারিত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া শিল্পও বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পারে না ; ফলে শ্রমবিভাগও বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।...(১৩৪-১৩৬ এবং ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)]

6. Account for Localisation of Industries. What are its advantages and dangers ? (H. S. (C) Comp. 1960 ; C. U. 1961)

শিল্পের একদেশতার কারণ ব্যাখ্যা কর। ইহার সুবিধা-অসুবিধা কি কি ? [১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা]

দ্বাদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা

(Role of the Government in Economic Development)

সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল এই উক্তি করিয়াছিলেন। উক্তিটির তাৎপর্য হইল যে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিবে এবং ইহাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সকলে একমত। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে সে-সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিশেষ মতবিরোধ দেখা গিয়াছে।* প্রাচীন গ্রীসে

* সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে পৌরবিজ্ঞানের ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা এবং অর্থবিদ্যার ৬-৭ পৃষ্ঠা আর একবার পড়িয়া লইলে ভাল হয়।

রাষ্ট্রশক্তি বা সরকারের কার্যাবলীর কোন সীমা ছিল না। দেশরক্ষা ও শান্তিশৃংখলা রক্ষা ছাড়াও সরকার শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করিত, সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিত, উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করিত। ইহার পর রোমক ও মধ্য যুগে অবশ্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রশক্তি ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণের কার্য একরূপ ছাড়িয়া দিয়া শুধু দেশরক্ষা ও দেশজয়ের কার্যেই ব্যাপৃত থাকে। দেশজয়ের ফলে বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং নৌ-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অন্যান্য কারণে বহির্বাণিজ্যও প্রসারলাভ করে। তখন সরকারকে আবার ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, প্রয়োজনমত বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিতে হয়, নূতন নূতন জলপথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করিতে হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার, আমেরিকা আবিষ্কার প্রভৃতি সকলেরই মূলে আছে সরকারের এই অর্থনৈতিক কার্য। রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হইতে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ পাইয়াই ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করে; স্পেনের রাণী ইসাবেলার সহায়তাতেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন; এবং আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে এইভাবেই বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ গড়িয়া উঠে।

সরকারের কার্যাবলী

গ্রীক ও রোমক যুগ

পরবর্তী যুগ

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের মালিক হিসাবে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র আবার বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়। রাষ্ট্র হইয়া দাঁড়ায় অভিভাবক রাষ্ট্র (Paternal State)। উহা ব্যবসায়ী, বণিক, ভূস্বামী, সাধারণ লোক সকলেরই অভিভাবক হিসাবে কার্য করিতে থাকে। অভিভাবক রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করা হয়, এবং ফলে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হইল, সরকারের কার্যাবলী হইবে সংখ্যায় ন্যূনতম এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যক্তি হইবে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র।

অভিভাবক রাষ্ট্রের যুগ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তারপর ইহার বিষময় ফলের জন্য সুরু হইল ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অধীনে ধনী, ব্যবসায়ী এবং ভূস্বামিগণই সুবিধা ভোগ করে এবং দরিদ্র শ্রমজীবী ক্রমশ পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসে। ফলে সরকারের পক্ষে প্রয়োজন হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার প্রয়োজনমত এই হস্তক্ষেপ করিতে সুরু করে। কারখানা আইন, খনি সংক্রান্ত আইন, দোকান-কর্মচারী আইন প্রভৃতি পাস হয়, বেগার খাটানো নিষিদ্ধ হয়, ইত্যাদি। এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগের অবসান ঘটে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পর যে যুগ সুরু হয় তাহাকে সংক্ষেপে সমষ্টিবাদের যুগ (Age of Collectivism) বলা যায়। সমষ্টিবাদ অনুসারে সরকারের কার্যাবলীর কোন সীমারেখা নাই। জনকল্যাণের প্রয়োজনে সরকারকে সমাজের সকল কাজকর্মকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সকল কাজকর্মই সম্পাদন করিতে হইবে। এই সকল কাজকর্মের মধ্যে আবার অর্থনৈতিক কাজকর্মই প্রধান। অর্থনৈতিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন দ্বারা সরকারকে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ-সাধন করিতে হইবে।

বর্তমান সমষ্টিবাদের যুগ

সমষ্টিবাদ আবার দুই প্রকারের হয়—পূর্ণ ও আংশিক। পূর্ণ সমষ্টিবাদকে সমাজ-তন্ত্রবাদ বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে কিছু থাকে না—সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মই সরকারী নির্দেশে ও সরকারী পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। আংশিক সমষ্টিবাদের অধীনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কিছু কিছু অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare States) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মোট-কথা, রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক হউক আর সমাজ-কল্যাণকরই হউক উহার শাসনযন্ত্র বা সরকার মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসংগে ইহা আমরা দেখিয়াছি।* এই নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য যে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণসাধন করা, তাহাও বলা হইয়াছে। সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সকল ক্ষেত্রেই কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে-সকল নীতি নির্ধারিত হয় সামগ্রিকভাবে তাহারা আর্থিক নীতি (economic policy) বলিয়া অভিহিত হয়।

দুই প্রকারের সমষ্টিবাদ

আর্থিক নীতি

বিভিন্ন দেশের আর্থিক নীতিতে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও একটি বিষয়ে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা হইল যে, সকল আর্থিক নীতিই চায় দেশের জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে।

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য

অভাব হইতে মুক্তি (freedom from want) বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বেকার-সমস্যার সমাধান, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা, টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব, ইত্যাদি। এইগুলির মাধ্যমে প্রত্যেক সভ্যদেশই বর্তমানে জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু অভাব হইতে মুক্ত হওয়াই সভ্য মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংগে সংগে সে চায় কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন (better working conditions)। বিশ্রামবিহীনভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া মানুষকে যদি দৈনন্দিন অন্নসংস্থান করিতে হয় তবে একমাত্র 'অভাব হইতে মুক্তি'কে সে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে না। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্যার সমাধান প্রভৃতির সংগে সংগে কার্যের সর্তা-বলীরও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রসমূহ তাহাই করে।

* ৬-৭ পৃষ্ঠা।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic Functions of the Government) : দেখা গেল যে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্য প্রধানত দুইটি—(ক) জনসাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করা, এবং (খ) তাহাদের কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন করা। জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য অভাব হইতে মুক্তি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল সরকারকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়—যথা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়, বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করিতে হয়, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করিতে হয়, ইত্যাদি। এখন এগুলি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে।

সরকারের দুইটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্য :
১। জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা
২। কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নসাধন করা

অভাব হইতে মুক্তির পথ :

(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : সাধারণ লোকে সর্বদাই উন্নততর জীবনযাত্রার মান কামনা করে। অর্থাৎ, তাহারা চায় আরও ভালভাবে বাঁচিতে, আরও অধিক ভোগ করিতে। সরকারের আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য হইল এই কামনা পরিতৃপ্ত করা বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া। অবশ্য উন্নয়ন অপেক্ষা সংরক্ষণই অধিকতর প্রয়োজনীয়। সুতরাং বর্তমান জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিয়াই সরকারকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ক। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

অনেক সময় লোকে উন্নততর জীবনযাত্রার মান বলিতে অধিক আর্থিক আয়ই বুঝে। এ-ধারণা কিন্তু একান্ত ভুল। আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এমন কোন কথা নাই, কারণ ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পাইতে পারে।* অপরদিকে আবার আর্থিক আয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকেও দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রকৃত আয় বা ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণবৃদ্ধির জন্য সরকারকে কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, বাণিজ্য, সমাজ-সেবা প্রভৃতি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে হয়। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো যাইতে পারে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা

কৃষি এখনও অধিকাংশ দেশে মূল শিল্প। ইহার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যতিরেকে জীবনযাত্রার মান বজায় থাকিতে বা উন্নত হইতে পারে না। কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সরকারকে নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়—যথা, কৃষককে জমিদার ও মহাজনের হাত হইতে নানাভাবে রক্ষা করা, তাহাকে অল্প সুদে ঋণ প্রদান করা, কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা, জলসেচের বন্দোবস্ত করা, সমবায় আন্দোলনের প্রসার করা, কৃষি সংক্রান্ত পরিচালনা গ্রহণ করা,

সরকার ও কৃষি

---

* ...৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ইত্যাদি। শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাষ্ট্র নানাবিধ শিল্প-গঠন করিতেছে, শিল্পসমূহকে মূলধন দিয়া সাহায্য করিতেছে, বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে দেশী শিল্পকে সংরক্ষণ করিতেছে, দেশবিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে। পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থাতেও সরকারী কার্যাবলী কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। বর্তমানে ভারতের ন্যায় অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রই রেলপথ ও বিমানপথের একচেটিয়া মালিক। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনায় মোটর বাস প্রভৃতি অন্যান্য যানবাহনও আছে। আবার সকল দেশেই ডাক ও তার বিভাগের মালিক ও পরিচালক হইল রাষ্ট্র। দেশবিদেশে বাণিজ্য যাহাতে প্রসারিত হয় সরকার সে-দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে সরকার জাহাজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে, হুণ্ডি বা বিলের বাজার (bill market) গড়িয়া তুলে, ইত্যাদি। সমাজসেবার উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা চিকিৎসকের সৃষ্টি, হাসপাতাল স্থাপন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির দ্বারা রাষ্ট্র সেবামূলক কার্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সরকার ও শিল্প

সরকার ও পরিবহণ

সরকার ও বাণিজ্য

সরকার ও সমাজসেবা

উৎপাদনবৃদ্ধি দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে করিতে হইবে। এইজন্য শুধু ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না—মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই সকল মূলধন-দ্রব্য হইতেই আবার ভবিষ্যতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইবে। দূরদর্শী ব্যক্তি যেমন তাহার আয়ের কিছুটা সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে ভবিষ্যৎ আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, জাতিকেও তেমনি জাতীয় আয়ের একাংশ পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিতে হইবে—সমস্তটাই ভোগ করিলে চলিবে না। কিছুদিনের জন্য ঋণ করিয়াও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার ফলে ভবিষ্যতে জীবনযাত্রার মান নামিয়া আসে। ব্যক্তির ন্যায় জাতিকেও এ-বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে। সরকার ঋণগ্রহণ করিলে গৃহীত ঋণকে যথাসম্ভব উৎপাদনকার্যেই নিয়োগ করিতে হইবে।

উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন-গঠন প্রয়োজন

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যা সকল দেশের পক্ষে একরকম নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জীবনযাত্রার মান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত। সুতরাং ইহাকে বজায় রাখিয়া সামান্য পরিমাণে উন্নতির প্রচেষ্টাই হইল তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে প্রধান সমস্যা হইল দ্রুত উন্নয়নের সমস্যা। এইজন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যা সকল দেশে এক নহে

(২) বেকার-সমস্যার সমাধান: মানুষকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য একমাত্র উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, এই উদ্দেশ্যে সরকারকে বেকার-সমস্যারও সমাধান করিতে হইবে। অনেকের মতে, এই বেকার-সমস্যার সমাধানই বর্তমান দিনের সরকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য। জনশক্তি উৎপাদনের

অন্যতম উপাদান। উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিপূর্ণ ব্যবহারের (full utilisation) জন্যই সরকারের পক্ষে সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের একাংশকে যদি সর্বদা বেকার অবস্থায় থাকিতে হয়, অপর একাংশকে যদি মাঝে মাঝে বেকার হইয়া পড়িতে হয় তবে দেশের লোক 'অভাব হইতে মুক্ত' হইতে পারে না। তৃতীয়ত, যাহারা বেকার অবস্থায় থাকে বা বেকার হইয়া পড়ে দেশের উন্নতি বা সমৃদ্ধিতে তাহাদের কোন উৎসাহ বা আগ্রহ থাকে না। চতুর্থত, বেকার ও আংশিক বেকারের সংখ্যা যদি অধিক হয় তবে দেশের মধ্যে অসন্তোষ ও নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দেয়। ইহার ফলে বিপ্লবও ঘটিতে পারে। তখন সরকারের পক্ষে আন্দোলন ও বিপ্লব দমন করিবার দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়; অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করিবার সুযোগ আর উহা পায় না। এই কারণে বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় সরকারকে যাহাতে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দার (trade depression) সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মন্দার সৃষ্টি হইলে উৎপাদনও ব্যাহত হইয়া জীবনযাত্রার মান হ্রাস করে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান রক্ষা কল্পেও উহা প্রয়োজনীয়।

খ। বেকার-সমস্যার সমাধান—ইহা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য

(৩) **সামাজিক নিরাপত্তা:** সামাজিক নিরাপত্তা (social security) বলিতে বুঝায় সমাজের সকলকেই ভবিষ্যৎ আর্থিক অনিশ্চয়তার চিন্তা হইতে রক্ষা করা। বর্তমান দিনে আর্থিক অনিশ্চয়তার আশংকা অধিকাংশ ব্যক্তি ও পরিবারকে সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হঠাৎ মারা যাইতে পারে, উপার্জনক্ষম অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরিয়া পীড়িত হইয়া থাকিতে পারে, বেকার হইয়া পড়িতে পারে, দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া অংগপ্রত্যংগ হারাইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তি ও পরিবারের আয় সহসা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার উপর আছে সাধারণ বার্ধক্য যখন আর কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না।

গ। সামাজিক নিরাপত্তা—ইহার অর্থ

এখন প্রশ্ন হইল, এইভাবে আয়ের পথ রুদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে? পূর্বে বলা হইত যে উপার্জনক্ষম অবস্থায় প্রত্যেককেই আয়ের একাংশ সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদের সঞ্চয়ের সংগতি অতি অল্প—একেবারে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে বহু দরিদ্র ব্যক্তি ত' দিন গুজরানই করিতে পারে না। সুতরাং বর্তমানে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে সরকারকেই অগ্রণী হইয়া সমাজস্থ সকলের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।*

পাশ্চাত্য দেশে এই আর্থিক নিরাপত্তা বা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যে-সকল

* জার্মেনীতে বিসমার্ক এই ধারণার প্রথম প্রচার করেন এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে জার্মেনীই প্রথম সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হয়।

ব্যবস্থা সাধারণত অবলম্বন করা হয় তাহার মধ্যে বার্ধক্যে পেনসন্, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা কর্মক্ষম অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পরিবারের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পীড়িত অবস্থায় অর্থ ও অন্য-প্রকার সাহায্য, বেকার অবস্থায় ভাতা, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বীমা ও ক্ষতিপূরণ—এই কয়টিই হইল প্রধান। ইহাদের ফলে উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিগণ অভাব হইতে কতকটা মুক্ত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে সামাজিক নিরাপত্তা

আমাদের দেশে পূর্বে যৌথ পরিবার (joint family), বর্ণভেদ প্রথা (caste system) প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন কখনও বড় হইয়া উঠে নাই—কারণ, এই সকল সংগঠনই ছিল সামাজিক নিরাপত্তামূলক। যৌথ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ পরস্পরের আর্থিক অনিশ্চয়তার দায়িত্ব গ্রহণ করিত। কেহ কিছুদিন উপার্জনে অক্ষম হইলে তাহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া না খাইয়া থাকিতে হইত না। একই বর্ণভুক্ত (caste) ব্যক্তিগণও পরস্পরকে আপদেবিপদে সাহায্য করিত। কিন্তু যৌথ পরিবার আজ বিলুপ্তপ্রায়, বর্ণভেদ প্রথাও ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ফলে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্ন।

আমাদের দেশের সামাজিক নিরাপত্তা-মূলক প্রতিষ্ঠান

ব্রিটিশ আমলে ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই বলিলে চলে। তখন মাত্র কয়েক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর জন্য পেনসন্ এবং কয়েক শ্রেণীর চাকরিয়াদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের বন্দোবস্ত ছিল। ইহার উপর অবশ্য কিছু কিছু কারখানা-শ্রমিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ এবং প্রসূতি অবস্থায় নারী-শ্রমিক সামান্য সামান্য সাহায্য পাইত।

স্বাধীন ভারতে কারখানা-শ্রমিকদের জন্য ব্যাপকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এখন তাহারা পীড়িত ও অকর্মণ্য অবস্থায় অর্থসাহায্য পায়, চিকিৎসার সুবিধাভোগ করে এবং দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকের মৃত্যু হইলে শ্রমিকের বিধবা স্ত্রী ও নাবালক সন্তানগণ নির্দিষ্ট হারে ভাতা পাইয়া থাকে। ইহার উপর লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি, দিয়াশলাই, বয়ন প্রভৃতি ৬০টির অধিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেরও প্রবর্তন করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা

তবুও বলা যায়, ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ সামাজিক নিরাপত্তার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। কৃষির উপরই ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ নির্ভরশীল। কৃষিজীবিগণকে ভবিষ্যৎ অভাবের আশংকা হইতে মুক্ত করিবার কোন ব্যবস্থা এখনও করিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই।

(৪) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস: ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের হ্রাস দ্বারাও সরকার জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। জাতীয় আয়ের আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে মোট জাতীয় আয় বা

মাথাপিছু জাতীয় আয় দেশের লোকের অবস্থার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে না; ইহার জন্য প্রয়োজন হইল জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয় তাহা অনুসন্ধান করা। অন্যভাবে বলিতে পারা যায়, জাতীয় আয়ের বণ্টনই জনসাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে আছে কিনা, তাহা নির্দেশ করে।

ঘ। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস—ইহার গুরুত্ব

জাতীয় আয়ের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হয় তবে তাহাদের বিলাসব্যসনের পরিমাণ অধিক হইবে এবং অধিকাংশকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাইতে হইবে। দেশে যখন খাদ্যের অভাব তখন হয়ত' মোটরগাড়ী আমদানির ব্যবস্থা হইবে; সাধারণে যখন মাথা গুঁজিবার মত আশ্রয় জোগাড় করিতে পারিতেছে না তখন হয়ত' ধনীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার আর একটি মহল নির্মিত হইবে; জনাকীর্ণ সহরে গৃহনির্মাণের জমি টেনিস খেলার কাজে লাগানো হইবে। সুতরাং দুর্গতদের অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা সরকারের কর্তব্য।

প্রধানত, ধনীদের উপর অধিক করভার চাপাইয়া এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হয়। ধনীদের নিকট হইতে করসূত্রে প্রাপ্ত অর্থে সরকার দরিদ্রের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, বস্তি অপসারণ করিয়া গৃহনির্মাণ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের জন্য অর্থসাহায্য (subsidy) প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে।

কিভাবে ইহা করা হয়

কিন্তু সকল সময় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই সরকারকে কিছু কিছু সমাজতন্ত্রমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হয়। এইজন্য দেখা যায় যে সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বা ন্যায্য মজুরি (minimum of fair wages) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন করিয়াছে, জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন দ্বারা নিষ্কর্মা জমিদারদের আয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, ইত্যাদি।

ভারত এই সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে; ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানহ্রাস দেশের আর্থিক নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে নানারূপ গতিশীল প্রত্যক্ষ কর স্থাপন, ব্যবসাবাণিজ্যের কতকাংশকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন, জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন প্রভৃতি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অবলম্বিত হইয়াছে। তবে ফল এখনও বিশেষ কিছু দেখা যায় নাই। বরং রিজার্ভ ব্যাংক প্রভৃতি প্রকাশিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাসের পরিবর্তে কিছুটা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। অর্থাৎ, জাতীয় আয়ের বণ্টন অধিক বৈষম্যমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* সুতরাং এ-বিষয়ে আরও ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ভারতের উদাহরণ

(৫) টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা: 'অভাব হইতে মুক্তি'র জন্য টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্বও একরূপ প্রয়োজনীয়। লোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য

* ...পৃষ্ঠা দেখ।

আর্থিক আয় বাড়াইবারই চেষ্টা করে। কিন্তু আর্থিক আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি জিনিসপত্রের মূল্যও সমপরিমাণ বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যদি সমপরিমাণ কমিয়া যায় তবে তাহারা পূর্বের ন্যায় অভাবগ্রস্তই থাকে। আবার যদি টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি আর্থিক আয় যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার অপেক্ষাও কমিয়া যায়, তবে লোকের অভাবের পরিমাণ বৃদ্ধিই পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লোকের আর্থিক আয় হয়ত' দ্বিগুণ হইল, কিন্তু ইতিমধ্যেই যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া তিনগুণ হয় তবে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপই হইবে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য অপেক্ষা আর্থিক আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তিকে স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ঙ। মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব—ইহার প্রয়োজনীয়তা

অন্য এক কারণেও এই স্থায়িত্ব প্রয়োজনীয়। সাধারণ লোক সারাজীবন খাটিয়া ও ভবিষ্যৎ অভাব মিটাইবার জন্য জীবন বীমা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। মুদ্রামূল্য যদি হ্রাস পায় তবে তাহারা দেখে যে তাহাদের সঞ্চয়ের [illegible]ল্য কমিয়া গিয়াছে এবং বিনা দোষে তাহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তার জন্য মুদ্রামূল্যের যথাসম্ভব স্থায়িত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

[illegible]মূল্যের স্থায়িত্ব আনয়নের সহিত আর একটি বিষয় জড়িত আছে। ইহা হইল [illegible]ফীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে সরকারকে ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা [illegible]রিতে হয়। উভয় কার্যই সরকার প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করে।

(৬) ব্যাংক-ব্যবস্থার সুসংগঠন: মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায়তা করা রাষ্ট্রের আর একটি অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া গণ্য। সরকার এই কার্যও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করে। রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

চ। মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

(৭) একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ: একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণকেও সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। একচেটিয়া কারবারী অত্যুচ্চ দাম ধার্য করিয়া পণ্য বাজারে ছাড়িতে পারে। ইহাতে ভোগী (consumer) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য একচেটিয়া কারবারকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন একটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ইহা যে-কোন দামে বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় করিতে পারে না। করিলে সরকার উহাতে বাধা দিবে।

ছ। একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ

কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন: অর্থনৈতিক কাজকর্মকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) অর্থোপার্জন বা উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্ম, এবং (খ) অর্থব্যয় বা ভোগ সংক্রান্ত কাজকর্ম।* সুতরাং মানুষের জীবনযাত্রারও দুইটি দিক আছে—কর্মের দিক এবং ভোগের দিক।

* ২-৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এই ভোগের দিক হইতেই মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্যার সমাধান, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহশীল হয়; কারণ এগুলি হইল তাহার অভাব হইতে মুক্তির মাধ্যম। কিন্তু কর্মের দিক দিয়া তাহার আগ্রহ হইল কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নে। অর্থাৎ, শ্রমিক বা উৎপাদক হিসাবে প্রত্যেকেই কামনা করে যে তাহার কার্যের সর্তাবলী আরও সুবিধাজনক হউক। সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে জনসাধারণকে

শ্রমিক হিসাবে মানুষ তাহার কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন কামনা করে
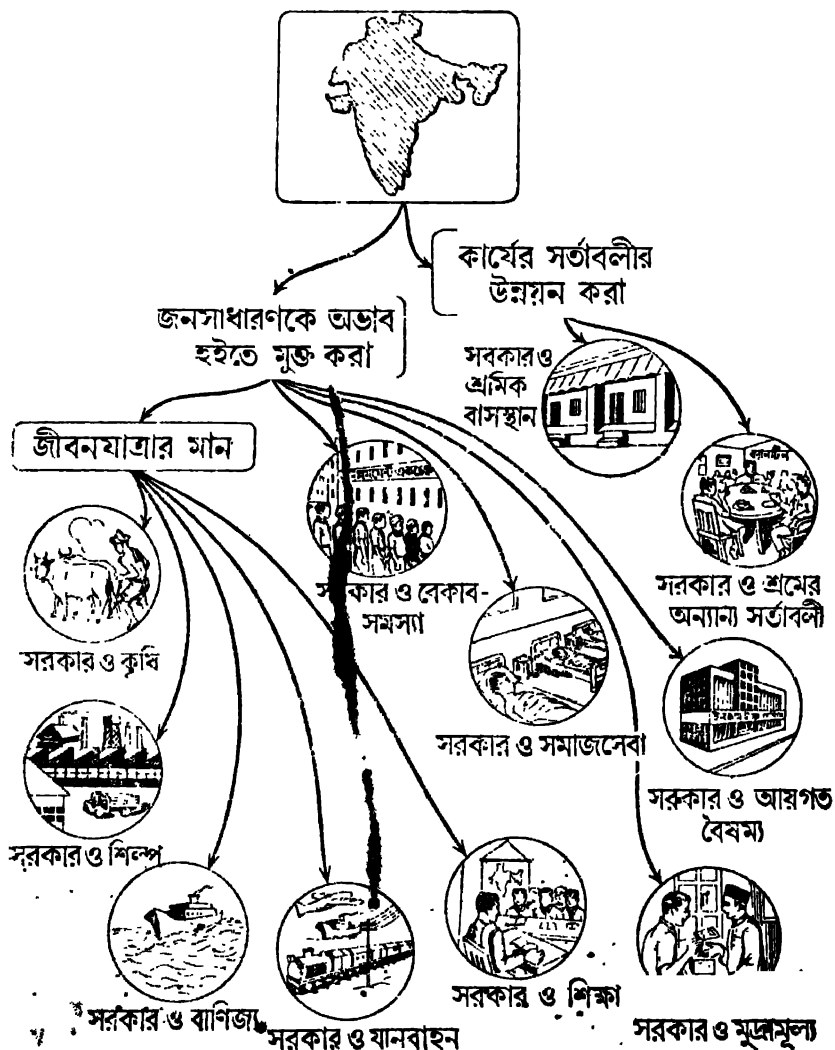
অভাব হইতে মুক্ত করার ন্যায় কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কার্য।

কার্যের সর্তাবলী উন্নয়নের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করিয়া আছে শ্রমের সময় (hours of work)। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার অধিক শ্রম করানো যায় না। ইহার পর বাসগৃহের সুবন্দোবস্ত, কারখানায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি, প্রভৃতিও প্রয়োজনীয়। পরিশেষে, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক যাহাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় তাহার ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হইবে। কারখানা আইন, শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রভৃতি এই সকল উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়। ভারতে ইহাও করা হইয়াছে।

কার্যের সর্তাবলী বলিতে কি বুঝায় এবং ভারতে ইহার উন্নয়ন

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা হইয়াছে।

বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশই আর্থিক নীতি নির্ধারণ করিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা। অভাব হইতে মুক্তি কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বেকার-সমস্যার সমাধান, ধনী-দারিদ্রের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব ইত্যাদি। ভোগী (consumer) হিসাবে মানুষ এগুলি সর্বদাই কামনা করে; আর উৎপাদক বা শ্রমিক হিসাবে সে চায় তাহার কাযের সর্তাবলীর উন্নয়ন।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী: সুতরাং বলা যায়, সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী প্রধানত দুইটি—(ক) জনসাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করা; এবং (খ) তাহাদের কাযের সর্তাবলীর উন্নয়ন করা।

(ক) জনসাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সরকারকে নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হইবে:

১। উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ২। বেকার-সমস্যার সমাধান; ৩। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা বা সকলকেই আর্থিক অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা করা; ৪। করপ্রথার সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস; ৫। মুদ্রা বা টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করা; ৬। ব্যাংক-ব্যবস্থার সুসংগঠন করা; এবং ৭। একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ করা।

(খ) কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নের জন্য সরকারকে ১। শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে, ২। কারখানার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে, ৩। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক যাহাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সুতরাং একদিকে সরকারকে যেমন কৃষি সংক্রান্ত, শিল্প সংক্রান্ত, পরিবহণ সংক্রান্ত, বাণিজ্য সংক্রান্ত, সমাজসেবা বা সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত, বেকার-সমস্যা সংক্রান্ত, মুদ্রামূল্য সংক্রান্ত, ব্যাংক-ব্যবস্থা সংক্রান্ত এবং একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিয়া নাগরিককে অভাব হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, অপরদিকে তেমনি তাহার কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নের প্রচেষ্টাও করিতে হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss the economic functions of the Government.**

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আলোচনা কর। [১৪৮-১৫৫ পৃষ্ঠা]

2. **Write a short note on the economic functions of a modern Government.**
(H. S. (H) Comp. 1962)

আধুনিক সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [১৪৮-১৫৫ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

(Government and Development Planning)

জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিয়াছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে (underdeveloped countries) এই পরিকল্পনা-প্রবণতার আধিক্য দেখা যায়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখিয়াছে যে পরিকল্পিত কর্মসূচী ব্যতিরেকে উৎপাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন—অর্থ-ব্যবস্থার কোন কার্যই সম্যকভাবে সম্পাদিত হয় না।* প্রথমত, জাতীয় আয়ের বণ্টন হয় অতি অন্যায্যভাবে। অল্পসংখ্যক মূলধন-মালিক, জমিদার ও ব্যবসায়ী জাতীয় আয়ের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া থাকে এবং বিপুল সংখ্যাধিক শ্রমিকদের ভাগ্যে জুটে অতি সামান্যই। দ্বিতীয়ত, ইহার ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং ধনীদের বিলাসের দ্রব্য উৎপাদনেই উপাদানসমূহ নিযুক্ত হয়। তৃতীয়ত, খাদ্যবস্ত্রের ন্যায় জীবনধারণের উপকরণের যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলে দরিদ্ররা যাহাতে উহা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয় না। চতুর্থত, উৎপাদন, নিয়োগ প্রভৃতি অব্যাহত রহিল কিনা এবং কিভাবে উৎপাদন ও নিয়োগের সম্প্রসারণ করা যায়—সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য মানুষ পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিয়াছে

এইরূপ অকাম্য অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিহার করিবার দাবির ফলেই দেখা দিয়াছে পরিকল্পনা-প্রবণতা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনপ্রিয় সরকার জনসাধারণের দাবিকে উপেক্ষা করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনার পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে: অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী

* অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলীর আলোচনার জন্য ৬-৭ পৃষ্ঠা দেখ।

অনুসারে অগ্রসর হওয়াই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই কর্মসূচী সরকার বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা প্রণীত হয় এবং উহা সরকার বা ঐ কমিশনের তত্ত্বাবধানেই কার্যকর হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল কাম্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, জাতীয় আয়ের কাম্য বণ্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি সকলই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। যে-দেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণ। অর্থাৎ, কিভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা যায় তাহাই তাহার প্রধান সমস্যা; অপরদিকে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল উন্নয়ন—জাতীয় আয় বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অনুরূপভাবে, যেখানে আর্থিক বৈষম্য অতি প্রকট সেখানে ইহার হ্রাসই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য

যাহা হউক বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মোটামুটি দুই প্রকারের—(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা (maintenance planning), এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা (development planning)। কারণ, এই দুই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে উন্নয়নমূলক হইতে বাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরিকল্পনার শ্রেণীবিভাগ: ১। সংরক্ষণ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

পরিকল্পনা আবার পূর্ণাংগ বা আংশিক হইতে পারে। পূর্ণাংগ পরিকল্পনায় উন্নয়নের সম্পূর্ণ ভার থাকে রাষ্ট্রের উপর, এবং ফলে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন এইরূপ পূর্ণাংগ পরিকল্পনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সেখানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ (private enterprise) বলিয়া কিছু নাই। অপরদিকে আংশিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিলেও উৎপাদনের সমগ্র ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবসান করা হয় না। উৎপাদনক্ষেত্রের একাংশ থাকে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন এবং অপরাংশ থাকে বেসরকারী উদ্যোগাধীন। অবশ্য বেসরকারী উদ্যোগকে রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ ও নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, সরকারী উদ্যোগের সহিত সহযোগিতা করিতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের এইরূপ পাশাপাশি অবস্থানকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়।* ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এইরূপ মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থামূলক আংশিক পরিকল্পনা। এখানে উন্নয়নের আংশিক দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগের উপর ন্যস্ত।

২। পূর্ণাংগ ও আংশিক পরিকল্পনা

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা

---

* Mixed economy implies the co-existence of public and private sectors.

উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সকল সময়ই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ গ্রহণ করে। এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এইরূপ কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে যাহা সক্রিয় সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত দূরীভূত হইতে পারে না। উন্নত দেশসমূহে দেখা যায় যে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীতও জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে অথবা ক্রমশ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ হইল, স্বল্পোন্নত দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিশেষ মুনাফা করিতে পারা যায় না বলিয়া শিল্পপতিগণ শিল্পবাণিজ্য প্রসারে আগ্রহান্বিত হয় না। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এই সকল দেশের প্রগতিশীল সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয়।

ভারতের ন্যায় দেশের পরিকল্পনা উন্নয়নমুখী হয়

স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে কৃষি-ব্যবস্থা। কৃষিই এই সকল দেশের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু কৃষিকেই সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেখা যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির অভাব, কৃষিকার্যের পুরাতন পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য উৎপাদন অতি অল্প হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থার জন্য যাহা উৎপন্ন হয় তাহার[illegible] সমগ্রটা কৃষক পায় না। তৃতীয়ত, জমির মালিকানা কৃষকের পরিবর্তে জমিদারের থাকে বলিয়া কৃষক জমির উন্নয়নে উৎসাহিত হয় না। চতুর্থত, দেখা যায় যে মহাজনগণ কৃষককে উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করিয়া চিরকাল ঋণগ্রস্ত অবস্থায় রাখে। এই সকলের ফলে ভারতের ন্যায় দেশে কৃষক কোনমতে অনাহারে অর্ধাহারে দিন গুজরান করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

অনগ্রসর কৃষি স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার কেন্দ্রস্থল

কৃষির এই সকল ত্রুটির স্বাভাবিক প্রতিবিধান হইল সক্রিয় সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা কৃষিকে সুসংগঠিত করা। কিন্তু একমাত্র কৃষির সুসংগঠনের দ্বারাই সকল উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করা যায় না। বৃহদায়তনে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইলে বহুসংখ্যক কৃষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের জন্যও বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অতএব, সংগে সংগে শিল্পোন্নয়নের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

১। সুতরাং পরিকল্পনায় প্রথমে কৃষিকে সুসংগঠিত করিতে হইবে

অন্যান্য কারণেও শিল্পোন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। প্রথমত, একমাত্র কৃষির উন্নয়নের দ্বারা জাতীয় আয় প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্যকর বলিয়া একটা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসই পাইতে থাকিবে। তৃতীয়ত, শিল্প-গঠন না করা হইলে দেশকে চিরকালই কাঁচামাল রপ্তানি এবং নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিয়া কাল কাটাইতে হইবে।

২। তারপর প্রয়োজন শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া

স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিল্পোন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকও রহিয়াছে—যথা, মূলধন ও শিল্পদক্ষতার অভাব, পরিবহণের অব্যবস্থা, মূল শিল্পের অপ্রাচুর্য, জনসাধারণের স্বল্প ক্রয়শক্তি, ইত্যাদি। সুতরাং এইগুলিকে দূর করিয়াই শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

৩। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়

কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবার সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি এবং জনকল্যাণকর আইন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরিশেষে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পারিলে উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না।

বলা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশের প্রগতিশীল সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সরকারকে শুধু প্রগতিশীল হইলেই চলিবে না, শক্তিশালীও হইতে হইবে। সরকার শক্তিশালী না হইলে জমিদারী প্রথার বিলোপ, শিল্পবাণিজ্যকে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন, ধনীদের উপর উচ্চ হারে করধার্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না। ফলে পরিকল্পনাও সফল হইবে না।

উন্নয়ন পরিকল্পনার তিনটি উপাদান

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান (Factors of Development Planning): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি তিন প্রকার উপাদান বা ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য:

(ক) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষির সুসংগঠন;

(খ) সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়ন;

(গ) পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ:

কৃষির সংগঠনের জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহ

(ক) কৃষির সুসংগঠন: কৃষির সুসংগঠনের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার ইংগিত কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ (fragmented) কৃষি-জোতকে একত্রিত করিয়া, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস করিতে হইবে। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিককে ভূমিদান এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণের জন্য কৃষককে গ্রামীণ মহাজনের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখা চলিবে না। যাহাতে কৃষক সহজে এবং অল্প সুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সমবায় সমিতি গঠন, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তারপর কৃষিজ

পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। সমবায় সমিতি এ-বিষয়েও শ্রেষ্ঠ পন্থা। পর্যাপ্ত সংখ্যায় সমবায় বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করা হইলে ফড়িয়া ব্যাপারী আড়তদার মহাজন প্রভৃতির মত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের (middlemen) পক্ষে আর কৃষককে প্রবঞ্চনা করিয়া মোট শস্যমূল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া হাটবাজারে ওজন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শস্য মজুত রাখিবার জন্য গুদাম-ঘর স্থাপন করা প্রয়োজন।

কৃষকের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু বিশেষ কার্যকর হইবে না যদি-না কৃষকের মধ্যে নূতন পদ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা যায়। এই কার্যের জন্য একদল কর্মী থাকিবে যাহারা গ্রামাঞ্চলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নব জীবনের বার্তা বহন করিয়া বেড়াইবে।* সংগে সংগে অবশ্য অন্যান্যভাবেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। পরিশেষে, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া নূতন জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রগুলি খোলা হইয়াছে।

সুষম শিল্পোন্নয়ন বলিতে কি বুঝায়

(খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন: শিল্পসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প, এবং (খ) বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্প। উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্রতী সরকারকে দেখিতে হইবে যে—(১) এই দুই প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা যেন সুষম পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠে, এবং (২) বৃহদায়তন [illegible] শিল্প-ব্যবস্থাতেও যেন সামঞ্জস্য থাকে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইহাদিগকে বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে বাচাইতে হইবে, কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া এবং মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়নসাধন করিতে হইবে, বিক্রয়বাজারের প্রসার করিতে হইবে।

শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি

বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মত মূল শিল্পসমূহ (basic industries)** গঠন করিতে হইবে। খনিজ শিল্পের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে: যে-শিল্প বেসরকারী মালিকানায় ঠিকমত গঠিত হয় না তাহাদের স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য (targets of production) স্থির করিতে হইবে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে (private sector) মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে

* ভারতের এই ধরনের কর্মী 'গ্রামসেবক' এবং তাহাদের কার্য 'জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা' বলিয়া অভিহিত। বর্তমানে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

** যে শিল্পের উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠে তাহাকে 'মূল শিল্প' বলে। যেমন, কল-কারখানা স্থাপনের জন্য লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য অপরিহার্য বলিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অন্যতম মূল শিল্প বলিয়া গণ্য।

হইবে। নবগঠিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হ্রাস করিতে হইবে এবং শিল্প-পরিচালনার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যকে 'সামাজিক মূলধন' (social capital) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূলধনবৃদ্ধি ব্যতীত যেরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, তেমনি 'সামাজিক মূলধনে'র সম্প্রসারণ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাও কার্যকর হয় না।

এই সকল সেবাকার্যকে সামাজিক মূলধন বলা হয়

এই সামাজিক মূলধনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা (system of transport and communication), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান-ব্যবস্থা, গবেষণা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের আনুষংগিক উপাদান হিসাবেই এগুলির প্রতি উন্নয়নব্রতী সরকারকে মনোযোগ দিতে হইবে।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা (India's Development Plans):

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা উপরি-উক্ত ধরনের। এই পরিকল্পনার যুগ সুরু হইয়াছে ১৯৫১-৫২ সাল হইতে।* পরিকল্পনা এক একবারে পাঁচ বৎসরের জন্য করা হয় বলিয়া প্রত্যেক পরিকল্পনা 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নামে অভিহিত। ১৯৫১ সা র এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়; ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস অবধি ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়; এবং ১৯৬১ সা র এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হইল তৃতীয় পরিকল্পনার সময়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ ১৯৫১-৫২ স হইতে সুরু হইলেও পরিকল্পনার জল্পনাকল্পনা ভারতে বহুদিন হইতেই চলিয়া তেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এ-বিষয়ে কিছুই করা হয় । যাহা হউক, শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পর ভারতের জা সরকার এ-সম্পর্কে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ১৯৫০ সা র মার্চ মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠন রে কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্ত করে। খসড়া পরিকল্পনার যে-সমস্ত সমালোচনা হয় তাহার বিচারবিবেচনা করিয়া অবশেষে কমিশন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর স প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করে। তিমধ্যে যে-সকল ছোট ছোট উন্নয়ন পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিকল্পনার সময় নির্দিষ্ট করা হয় পূর্বোক্ত ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিক্রমা

পরিকল্পনা কমিশন

* ১৯৫০ সাল হইতেই পরিকল্পনার যুগ সুরু হইয়াছে বলা যায়। কারণ, ১৯৫০ সালেই পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The First Five Year Plan) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : (১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, এবং (২) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির গোড়াপত্তন করা। এই প্রসংগে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছিল যে মাত্র উৎপাদনবৃদ্ধিই পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে ; যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের আত্মশক্তিকে বিকশিত করিয়া আশা-আকাংক্ষাকে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার জন্য যোগ্য সামাজিক পরিবেশও গড়িয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং, উৎপাদন-বৃদ্ধির সংগে সংগে আর্থিক বৈষম্যও হ্রাস করিতে হইবে। তবে ভারতে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া প্রথম অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম পরিকল্পনার দুইটি উদ্দেশ্য

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব শীঘ্র মাথাপিছু জাতীয় আয়কে দ্বিগুণ করা। ইহার জন্য একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। আশা করা হইয়াছিল যে প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

পরিকল্পনায় প্রথমে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয় ; পরে ইহাকে বৃদ্ধি করিয়া ২৩৫৬ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক ও পরিবর্তিত ব্যয়ের ভাগ নিম্নে দেখানো হইল :

প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রাথমিক ব্যয়বরাদ্দ	পরিবর্তিত ব্যয়বরাদ্দ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৩১	৩৫৭	১৫.১
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৬১	৬৬১	২৮.১
৩। শিল্প ও খনিজ	১৭৩	১৭৯	৭.৬
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	৪৯৮	৫৫৭	২৩.৬
। সমাজসেবা	৪৫৫	৫৩৩	২২.৬
৬। অন্যান্য	৫১	৬৯	৩.০
মোট	২০৬৯	২৩৫৬	১০০.০

উপরি-উক্ত ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে ঐ পরিকল্পনায় কৃষি, জলসেচ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার (top priority) প্রদান করা হইয়াছিল।

এই দুই খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল ১০১৮ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ। এককভাবে কৃষির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ। পরিবহণ ও সংসরণের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৩ ভাগের উপর। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পক্ষে শিল্পোন্নয়নের প্রতি প্রয়োজনমত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উপরন্তু, ঐ পরিকল্পনায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (Mixed Economy) নীতি অনুসৃত হওয়ায় সরকারের পক্ষে শিল্পোন্নয়নের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজনও হয় নাই। এই দুই কারণে পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ভার মোটামুটি বেসরকারী উদ্যোগের (private enterprise) উপরই অর্পিত হইয়াছিল; এবং বেসরকারী উদ্যোগ শিল্প ও অন্যান্য খাতে মোট ১৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য: ১। কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান

২। মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়ন

চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ২৩৫৬ কোটি টাকার মধ্যে মোট ব্যয় হয় ১৯৬০ কোটি টাকা। বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের মধ্যে এই ১৯৬০ কোটি টাকার বণ্টন নিম্নের ছকটির সাহায্যে দেখানো হইল:

মোট কত টাকা ব্যয় হয়

	উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়ের পরিমাণ	শতকরা ভাগ
১।	কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১ কো[illegible] টাকা	১৫
২।	সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০ " "	২৯
৩।	শিল্প ও খনিজ	১১৭ " "	৬
৪।	পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩ " "	২৭
৫।	সমাজসেবা ও বিবিধ	৪৫৯ " "	২৩
	মোট	১৯৬০ কো[illegible] টাকা	১০০.০

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ১[illegible] ভাগের উপর এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১[illegible] ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষিজ উৎপাদনেরও অনুমিত বৃ[illegible] ঘটিয়াছিল এবং শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

ফলাফল

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Second Five Year Plan): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত। ভবিষ্যতের জন্য উন্নয়নমূলক

অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের সম্মুখে যে খাদ্যাভাব, কাঁচামালের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা বিশেষ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের সমাধান করাই ছিল ইহার লক্ষ্য।

প্রথম পরিকল্পনার পটভূমিকা

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে ঐ পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হয় নাই; জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার বিশেষ লাঘব হয় নাই। উন্নত দেশসমূহের তুলনায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এখনও অত্যন্ত নিম্ন। ইহার উপর আছে ব্যাপক বেকার-সমস্যা। বৎসরের পর বৎসর জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। এই সমস্ত বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়াই ব্যাপকতর আকারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা হয়; এবং প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যাপকতর রূপদান সম্ভবপর হয়। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতেই অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে পরে পরিকল্পনাটির কিছু ছাঁটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। এই কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা দুই পর্যায়ে করা প্রয়োজন—(ক) মূল পরিকল্পনা, এবং (খ) পরিবর্তিত পরিকল্পনা। আলোচনা এইভাবেই করা হইতেছে।

ব্যাপকতর দ্বিতীয় পরিকল্পনার পটভূমিকা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য: ব্যাপকতর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (মূল এবং পরিবর্তিত উভয়েরই) চারিটি মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়: (ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি (quicker pace of development), (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি (wider industrial base), (গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ (accent on employment), এবং (ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত (socialistic bias)। উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছিল।

চারিটি মূল উদ্দেশ্য

(ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি: মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছিল। প্রধানত, দ্রুত শিল্পপ্রসারের মাধ্যমেই এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হইবে বলা হইয়াছিল।

(খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি: পরিকল্পনা কমিশনের মতে, প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের দরুন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটা শক্তিশালী হইয়াছিল। খাদ্যাভাব, কাঁচামালের অপ্রাপ্যতা ও মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আরও বলা হইয়াছিল যে কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক বলিয়াও শিল্পোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি

দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিল্প যেমন কাঁচামাল ও খাদ্যের যোগান ব্যতীত প্রসারলাভ করিতে পারে না, তেমনি কৃষির অগ্রগতিও শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে না। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে লোকের আয় বাড়িলে তবেই কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প কৃষিজীবীদের জন্য বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

শিল্পপ্রসারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেণ্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল শিল্পের (basic industries) সংগঠন। কারণ, এগুলি হইতেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সকল মূল শিল্প গঠনের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ : মূল শিল্প গঠনের জন্য অবশ্য শ্রম অপেক্ষা মূলধনেরই অধিক প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে কর্মহীনতার পরিমাণ দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শ্রমনিয়োগকারী কলাকৌশলের (labour-intensive techniques) প্রবর্তনই পরিকল্পনা কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল। এইজন্য ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা এইরূপ শিল্পসমূহের মাধ্যমে করা হইয়াছিল যাহারা মূলধন অপেক্ষা অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। মূল পরিকল্পনা অনুসারে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কৃষিজীবী, অর্ধ-বেকার, শিল্প-শ্রমিক, শিক্ষিত বেকার সকলই ছিল। পরে ঐ সংখ্যাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে লইয়া আসা হয়।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের কিছু পূর্বে ভারতীয় পার্লামেণ্ট ভারতের জন্য সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা (socialist pattern of society) প্রতিষ্ঠার নীতির ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই এই নীতি প্রতিফলিত হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পবাণিজ্যের উন্নয়নে সরকার উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ করিবে এবং বেসরকারী মালিকানাকে ক্রমশ সংকুচিত করা হইবে। দ্বিতীয়ত বেসরকারী মালিকানায় যে-সকল প্রতিষ্ঠান থাকিবে যথাসম্ভব তাহারা যাহাতে সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে। উপরন্তু, কর-পদ্ধতির পরিবর্তন, বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক-কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যের সম্প্রসারণ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। এইভাবে নানা দিক দিয়া আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ন্যায্য বণ্টন দ্বারা ধীরে ধীরে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইবে।

সরকারী ব্যয়বরাদ্দ

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (private sector) ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় বণ্টন পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হইল।

১	২	৩	৪
উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শতকরা ভাগ	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় শতকরা কত ভাগ ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১২	৫৯
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৯১৩	১৯	৩৮
৩। শিল্প ও খনিজ	৮৯০	১৮	৩৯৭
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	১৩৮৫	২৯	১৬৯
৫। সমাজসেবা	৯৪৫	২০	৭৭
৬। অন্যান্য	৯৯	২	৪৪
মোট	৪৮০০	১০০	

উপরের ছকটির চতুর্থ কলমে প্রদত্ত ব্যয়বৃদ্ধির হার হইতে শিল্পের উপরে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ

বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুমিত ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বা বিনিয়োগের (investment) বণ্টন ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

১। সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	৫৭৫ কোটি টাকা
২। রোপণ শিল্প, পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১২৫ " "
৩। নির্মাণকার্য	৯২৫ " "
৪। কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩৭৫ " "
৫। বিবিধ	৪০০ " "
মোট	২৪০০ কোটি টাকা

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনা (Comparison between the First and the Second Five Year Plan) : প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পটভূমিকা, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর উভয়ের মধ্যে সামান্য তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূত্রপাত মাত্র; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উহার দ্বিতীয় পর্যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনা আকারে বৃহত্তর হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত; বৃহত্তর দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকতর। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল খাদ্যাভাব, কাঁচা-

১। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আকারে বৃহত্তর

মালের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা। এই উদ্দেশ্যে ঐ পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ব্যাপকতর দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল চতুর্বিধ: (১) উন্নয়নের দ্রুততর গতি, (২) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি, (৩) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং (৪) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত। প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হওয়ার ফলেই এইরূপ বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া ব্যাপকতর দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয়।

২। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাপকতর

উপরন্তু, উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির সুসংগঠনের পর উহার দ্বিতীয় উপাদান বা সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়নের দিকে স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি দিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে তাহাই করা হইয়াছিল। বিভিন্ন খাতের মধ্যে শিল্পের উপরই সর্বাধিক ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনামূলক ব্যয়বরাদ্দ (proposed outlay) নিম্নের ছকটিতে দেখানো হইল:

৩। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির পরিবর্তে শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনা	শতকরা ভাগ	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৭	১৫	৫৬৮	১২
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৬১	২৮	৯১৩	১৯
৩। শিল্প ও খনিজ	১৭৯	৮	৮৯০	১৮
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	৫৫৭	২৩	১৩৮৫	২৯
৫। সমাজসেবা	৫৩৩	২৩	৯৪৫	২০
৬। অন্যান্য	৬৯	৩	৯৯	২
মোট	২৩৫৬	১০০	৪৮০০	১০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা: নানা দিক দিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান: (ক) এই পরিকল্পনা ছিল উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট; (খ) কৃষির পরিবর্তে শিল্পের উপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই; এবং (গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা ত্রুটিপূর্ণ।

(ক) পরিকল্পনাকে উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট বলিয়া সমালোচনা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন ইহা সম্ভব হইবে মনে করিলেও অনেকের ধারণা ছিল যে, সরকারী ক্ষেত্রের

৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের ২৪০০ কোটি টাকা—এই ৭২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনাকে কার্যকর করা দুষ্কর হইবে। বিদেশ হইতে মোট ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে উহা ঠিক তত সহজ কার্য নয়। অর্থসংস্থানের অসুবিধাহেতু ১৯৫৮ সালে যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার ছাঁটকাট করিতে হইল তখন পরিকল্পনা যে কতকটা উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট তাহা স্পষ্টতই প্রমাণিত হইল।

১। ইহা উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট

(খ) কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া যে ভুল হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল। পরিকল্পনা কমিশন মনে করিয়াছিল যে, খাদ্য-সমস্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু একরূপ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই খাদ্য-সমস্যা নূতন আকারে দেখা দেয়। খাদ্যমূল্য এরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে কমিশনকে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়াও খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পরিবর্তিত করিয়া শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২৫ ভাগে লইয়া যাইতে হয়।

২। কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া ভুল হইয়াছিল

(গ) পরিকল্পনা অনুসারে সরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতিতে (deficit financing) সংগ্রহ করা হইবে ঠিক হইয়াছিল। অর্থাৎ, সরকার এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং রিজার্ভ ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া প্রদান করিবে। এইভাবে নোট ছাপাইলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে, তাহার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় করা হয় নাই। ফলে শুধু খাদ্যদ্রব্য নহে, সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিই পরিকল্পনা কার্যকর করিবার পথে এক প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দেয়।

৩। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তন (Changes in the Second Five Year Plan) আলোচনার সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে অর্থসংস্থানের অসুবিধাহেতু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনাটি দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল—ক এবং খ অংশ। ক-অংশের অনুমিত ব্যয় ছিল ৩৫০০ কোটি টাকা। স্থির হইয়াছিল যে ক-অংশের জন্য এই ৪৫০০ কোটি টাকা প্রথমে ব্যয় করিয়া সম্ভব হইলে তবেই খ-অংশে হাত দেওয়া হইবে। সম্ভব না হইলে মোটেই হাত দেওয়া হইবে না। শেষপর্যন্ত অবশ্য ৪৫০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন খাতের মধ্যে এই ব্যয়ের বণ্টন দেখানো হইল।

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ	দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০	২৯	৮৬৫	১৯
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪
৪। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩	২৭	১৩০০	২৮
৬। সমাজসেবা ও অন্যান্য	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮
মোট	১৯৬০	১০০	৪৬০০	১০০

হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে যে, প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ খাতে কার্যক্ষেত্রে শতকরা ৫০০ ভাগ বা ৫ গুণ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, যদিও মূল পরিকল্পনায় শতকরা ৩৯৭ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছিল।*

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয়

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল ৩৩০০ কোটি টাকা। নিম্নে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুমিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের বণ্টন দেখানো হইল:

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	মূল পরিকল্পনায় অনুমিত বিনিয়োগ	শেষপর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ
১। সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	৫৭৫	৭২৫
২। পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১২৫	১৭৫
৩। নির্মাণকার্য	৯২৫	১০০০
৪। কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩৭৫	৯০০
৫। বিবিধ	৪০০	৫০০
মোট	২৪০০	৩৩০০ **

* ১৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

** এই হিসাবের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্র হইতে বেসরকারী ক্ষেত্রে যাহা হস্তান্তর করা হয় তাহা ধরা হইয়াছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপেক্ষা কম ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় অনুমানকে বহু পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই দিক দিয়া যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের উপর আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

পরিকল্পনার দশ বৎসরের হিসাবনিকাশ (Review of Ten Years of Planning): ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দশ বৎসর শেষ হয়। এই দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও উন্নয়নের গতির একটি প্রাথমিক হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ হিসাবে পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা যেখানে যেখানে আংশিক বিফল হইয়াছিল তাহাও দেখানো হইয়াছে।

এই দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ ১০,১১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। ইহার উপর ছিল পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা, বিভিন্ন প্রকারের অর্থসাহায্য (subsidies) ইত্যাদির জন্য ১৩৫০ কোটি টাকার মত চলতি ব্যয় (current outlay)। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হইয়াছিল ১১,৪৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় হইল ৬৫৬০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় হইল বাকী ৪৯০০ কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমস্তটাই বিনিয়োগ-ব্যয়।

দশ বৎসরে পরিকল্পনার ব্যয়

পরিকল্পনার দশ বৎসরে সম্প্রসারণ একভাবে ঘটে নাই। আন্তর্জাতিক গোলযোগ ও পরিকল্পনা কার্যকরকরণে ত্রুটির জন্য কখনও কখনও সম্প্রসারণের গতি বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে। অপরদিকে কোন নূতন প্রতিবন্ধকও দেখা দেয় নাই। ফলে ঐ পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় অনুমিত শতকরা ১২ ভাগের পরিবর্তে প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য উৎপাদন-লক্ষ্যে (targets of production) পৌঁছানো মোটামুটি সম্ভব হয়।

প্রথম পরিকল্পনার সফলতা

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই দেখা যায় বৈদেশিক মুদ্রা-সমস্যা যাহা ক্রমে সংকটে (foreign exchange crisis) পরিণত হয়। ইহার উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-জনিত কারণে ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার রদবদল ও ছাঁটকাট করিতে হয়।

ছাঁটকাটের দরুন সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৪৮০০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য ৪৫০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। রদবদল ও ব্যয়হ্রাসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় অনুমিত শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার দশ বৎসরে (১৯৫১-১৯৬১) মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি

দশ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

পাইলেও জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই।*

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের অনুমিত উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ-বিষয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৮·৫ কোটি টন ; কিন্তু পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন পৌঁছায় ৭·৬ কোটি টনে।** অনুরূপভাবে ইস্পাত-পিণ্ডের ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা (production capacity) অনুমানমত ৪৫ লক্ষ টনে পৌঁছিলেও প্রকৃত উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টনের অধিক হয় নাই। কয়লার উৎপাদনও (production) উৎপাদন-লক্ষ্য (target) অপেক্ষা ৫৪ লক্ষ টন কম হইয়া মোট ৫·৪৬ কোটি টনে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আংশিক অসফলতা

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌঁছানো না গেলেও আশা করা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

নিয়োগের (employment) লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য অনুরূপ আশা পোষণ করিতে পারে নাই। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ; পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে আনা হয়। এই ৮০ লক্ষ লোকের জন্যই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রাথমিকভাবে হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যায়।

পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবে স্বীকার না করিলেও দ্রব্যমূল্যরোধে অক্ষমতা হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসফলতার আর একটি দিক। সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনাধীন ৫ বৎসরে পাইকারী সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা (working-class cost-of-living index) বৃদ্ধি পায় প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। ইহার ফলে পরিকল্পনা কার্যকরকরণে অসুবিধা ত' হয়ই, উপরন্তু শিল্প-বিবাদ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদি নানারূপ সামাজিক বিক্ষোভও দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। একথা অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে।•

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপরি-বর্ণিত আংশিক অসফলতা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা মিলাইয়া সম্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয়। এই দশ বৎসরে সামগ্রিক

* ইহা ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব ; ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব করিলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে যথাক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ ও ১৫ ভাগ।

** তৃতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর চূড়ান্ত হিসাবে কিন্তু দেখা গিয়াছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হইয়াছিল ৭·৯৩ কোটি টন।

নিম্নে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল :

ক। কৃষি	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১
খাদ্যশস্য	৫২২ লক্ষ টন	৭৬০ লক্ষ টন
তৈলবীজ	৫১ " "	৭১ " "
ইক্ষুগুড়	৫৬ " "	৮০ " "
তুলা	২৯ " গাঁইট	৫১ " গাঁইট
পাট	৩৩ " "	৪৪ " "
সেচ-সমন্বিত জমি	৫১৫ " একর	৭০০ " একর
নাইট্রোজেন সার ব্যবহার	৫৫ হাজার টন	২৩০ হাজার টন
খ। সমাজোন্নয়ন ও সমবায়		
কত সংখ্যক গ্রামে সম্প্রসারিত	——	৩৭০,০০০
প্রাথমিক সমিতিসংখ্যা	১০৫,০০০	২১০,০০০
গ। শিল্প ও খনিজ		
ইস্পাত-পিণ্ড	১০ লক্ষ টন	৩৫ লক্ষ টন
কাগজ	১·১৪ " "	৩·৫ " "
কয়লা	৩২৩ " "	৫৪৬ " "
মিলবস্ত্র	৩৭২ কোটি গজ	৫১৩ কোটি গজ
সিমেন্ট	২৭ লক্ষ টন	৮৫ লক্ষ টন
চিনি	১১ " "	৩০ " "
ঘ। শক্তি		
উৎপাদনক্ষমতা	২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ	৫৭ লক্ষ কিঃ ওঃ
কত সংখ্যক গ্রাম ও নগরে যোগ দেওয়া হইবে	৩৬৮৭	২৩,০০০
ঙ। পরিবহণ ও সংসরণ		
রেলপথের মালপত্র বহনের ক্ষমতা	৯১৫ লক্ষ টন	১৫৪০ লক্ষ টন
বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা	১১৬,০০০	২১০,০০০
উঁচু রাস্তার পরিমাণ	৯৭,৫০০ মাইল	১৪৪,০০০ মাইল
চ। সমাজসেবা		
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রসংখ্যা	১০,০০০	৩৯,৪০০
কৃষি-বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা	১৫০০	৫৮০০
শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা	৫৬,০০০	৭০,০০০

কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪১ ভাগ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৬ ভাগ। ইহা ছাড়া সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়। সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণবৃদ্ধি ঘটে ২ কোটি একরের কাছাকাছি এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে গিয়া দাঁড়ায়।

তবে দশ বৎসরের সম্প্রসারণ সত্যই প্রশংসনীয়

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উঁচু রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৪৬ হাজার মাইল এবং বাণিজ্যিক খালের সংখ্যা হয় প্রায় দ্বিগুণ। ১২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত হয়, ১৩০০ মাইল রেলপথে দুইটি করিয়া লাইন পাতা হয় এবং ৮৮০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হয়। ইহাদের ফলে রেলপথসমূহের মালপত্র বহনের ক্ষমতা শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বহুগুণ প্রসারলাভ করে। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। গত দশ বৎসরে লোকের গড় জীবনকাল ১০ বৎসরের মত বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Third Five Year Plan):

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগ (১৯৫৮ সালের শেষের দিক) হইতেই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকার্য সুরু হয় এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ খসড়াটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে। এই খসড়ার ভিত্তিতে দীর্ঘ এক বৎসর আলাপ-আলোচনা চলিবার পর চূড়ান্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে।

প্রস্তাবনা: তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য (objectives of planned development) বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতের জনগণকে কাম্য জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধা প্রদান করাই হইল পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য।

পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ভারতের ৪০ কোটি* লোকের জন্য কাম্য জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধা প্রদান করা মোটেই সহজ কার্য নহে, এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে স্বভাবতই দীর্ঘ সময় লাগিবে। তবুও এই লক্ষ্যাভিমুখে চলা এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অতি সামান্য উপকরণ ও তদপেক্ষা সামান্য তথ্য লইয়া প্রথম পরিকল্পনা এই লক্ষ্যের সম্মুখীন হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন অর্থ-ব্যবস্থায় যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সূচনা করিয়া দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে কৃষি, সেচ ও সমাজোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্পের গোড়াপত্তন করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রকৃতি

* পরিকল্পনা প্রণয়নকালে লোকসংখ্যা ৪০ কোটি বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হয় এবং ফলে জনসাধারণ পরিকল্পনায় বিশ্বাসী হইয়া উঠে। সরকারও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

এই সফলতা, অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতর তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় দ্বিগুণ আকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও কর্মসংস্থান, মূল ও বুনিয়াদি শিল্প গঠন, আর্থিক বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোটকথা, সম্প্রসারণের (growth) গতিবৃদ্ধি ছাড়াও ইহা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকে দ্বিতীয় পরিকল্পনারই ব্যাপকতর রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে সম্প্রসারণের আরও গতিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে। উপরন্তু, সম্প্রসারণ যাহাতে আত্মনির্ভরশীল (self-sustaining) হইয়া উঠে সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকৃতি

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রকৃতি

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Third Five Year Plan)ঃ দশ বৎসরের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিত্তিতে রচিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত। বিগত ১০ বৎসরে যে-পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনা তাহা ৫ বৎসরেই মোটামুটি সম্পন্ন করিতে চায়। যদি ইহা সম্ভব হয় তবেই দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সার্থকতায় রূপায়িত হইবে।

পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য

ইহা অবশ্য অতি সহজ কথা নহে। ইহা সম্ভব করিতে হইলে আমাদের শক্তি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে, আমাদিগকে অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হইবে। তবুও ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায় না, কারণ জনসাধারণকে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের জন্য আর অপেক্ষা করিতে বলা চলে না।

এই বৃহত্তর তৃতীয় পরিকল্পনায় পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

(১) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫% বা তাহার কিছু অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে ঐ হার যাহাতে বজায় থাকে সেই পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা;

(২) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

(৩) যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প-যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরেই নির্মিত হয় তাহার জন্য লৌহ ও ইস্পাত, শিল্প-যন্ত্রপাতি, শক্তি ও জ্বালানির উৎপাদন প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্প্রসারিত করা;

(৪) যথাসম্ভব দেশের জনশক্তির (manpower resources) সদ্ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার (employment opportunities) বৃদ্ধিসাধন করা;

(৫) আর্থিক বৈষম্য বেশ কিছুটা দূর করিয়া সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics): (১) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার জন্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৮০০০ কোটি টাকার অধিক এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৪১০০ কোটি টাকা* হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং মোট প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ হইল ১২,১০০ কোটি টাকার অধিক। কিন্তু বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১১,৬০০ কোটি টাকা। অতএব, পরিকল্পনার মোট ব্যয় এবং ব্যয়বরাদ্দ—এই দুইএর মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ফাঁক (gap) রাখা হইয়াছে। এইরূপ ফাঁক রাখিবার কারণ হইল, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ১১,৬০০ কোটি টাকার অধিক অর্থসংস্থানের আশা করা যায় নাই। উপরি-উক্ত ৫০০ কোটি টাকার যে-ফাঁক তাহা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেরই ফাঁক। অতএব, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের কার্যক্রমের ব্যয় হইল ৮০০০ কোটি টাকার উপর, কিন্তু বরাদ্দ করা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা।

(২) তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হইল আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ (self-sustaining growth)। এইজন্য বলা হইয়াছে যে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি দেশেই উৎপাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি। এই আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ-ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইল কৃষিকে অগ্রাধিকার (top priority) প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় শিল্প, শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। কৃষি যদি জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য যোগান দিতে না পারে তাহা হইলে আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে না। আবার প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কৃষির উন্নয়নও সাধিত হইতে পারে না। কারণ, শিল্পই কৃষি-যন্ত্রপাতি যোগান দেয় এবং কাঁচামালের চাহিদা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের সম্যক সম্প্রসারণ ও শিল্প-যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব। অতএব শিল্পোন্নয়নের প্রতি পর্যাপ্ত দৃষ্টি দিতে হইবে। সংগে সংগে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ ও পরিবহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হইবে না। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে অনুমান করা হইয়াছে যে ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ৪৯ কোটির উপর দাঁড়াইবে। ইহা যেন আর বেশী বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(৪) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্যে গতিশীল করের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্প

* সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে যে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হইবে তাহা বাদ দিয়া ৪১০০ কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছে।

সংগঠন, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন (institutional changes) সাধন করা হইবে এবং গ্রামোন্নয়নের আংশিক দায়িত্ব পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির উপর ন্যস্ত হইবে।

(৫) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের আর একটি উপাদান হইল নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। অর্থাৎ, গ্রামবাসীরা যাহাতে নগরবাসীদের মতই উন্নততর জীবন উপভোগ করিতে পারে তাহা দেখা। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম সমাজসেবার (minimum social services) ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাদের মধ্যে আছে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে কোন গ্রামই ইহাদের সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে তাহা হইতেও গ্রামবাসীরা উপকৃত হইবে। এইভাবে শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত হইলে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৪ বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা করা হইবে। যে-সকল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তাহাদের উন্নয়নের অধিক প্রচেষ্টা করা হইবে।

(৭) দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বিশেষ ব্যাহত করিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও যাহাতে এইরূপ না ঘটে তাহার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাজেট-ঘাটতি যথাসম্ভব পরিহার করা ছাড়াও ঋণ-সৃজনও (credit creation) নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।

(৮) চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে কি পরিমাণ উৎপাদন ও উন্নয়ন আশা করা যায় তাহার মোটামুটি হিসাবও তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণ হইল যে তৃতীয় পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় দশকের প্রথম অধ্যায় হিসাবেই দেখা হইয়াছে, একটি পৃথক পরিকল্পনা হিসাবে নয়।

ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যয়বণ্টন (Financial Provisions and Distribution of Outlay) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের ব্যয় ও ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ফাঁক রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, ৮০০০ কোটি টাকার উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলেও বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। এই ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা হইল বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) এবং বাকী ১২০০ কোটি টাকা হইল চলতি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা, বিভিন্ন খাতে অর্থসাহায্য ইত্যাদির দরুন

চলতি ব্যয় (current outlay)। সরকারী ক্ষেত্রের ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয়) মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে বন্টিত হইয়াছে :

উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়ের পরিমাণ	মোটামুটি শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮ কোটি টাকা	১৪
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১৬৬২ " "	২২
৩। মূল ও বৃহদায়তন শিল্প	১০৪২ " "	১৪
৪। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪ " "	৪
৫। খনিজ ও তৈল	৪৭৮ " "	৬
৬। পরিবহণ ও সংসরণ	১৪৮৬ " "	২০
৭। সমাজসেবা	১৩০০ " "	১৭
৮। অন্যান্য	২০০ " "	৩
মোট	৭৫০০ কোটি টাকা	১০০

(সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের এই ৭৫০০ কোটি টাকা হইতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তরিত হইবে। বেসরকারী ক্ষেত্র নিজস্ব সংগতি হইতে ৪১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৩০০ (৪১০০+২০০) কোটি টাকা। এই ব্যয়ের সমস্তটাই হইবে বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure)।) নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ইহার প্রস্তাবিত বণ্টন দেখানো হইল :

বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যয়বণ্টন

১। কৃষি ও সেচ	৮৫০ কোটি টাকা
২। শক্তি	৫০ "
৩। পরিবহণ	২৫০ "
৪। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৩২৫ "
৫। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	১১০০ "
৬। গৃহনির্মাণ, ইত্যাদি	১১২৫
৭। অন্যান্য	৬০০
মোট	৪৩০০ কোটি টাকা

প্রথম পরিকল্পনা
ক
১৫
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন
খ
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি
গ
ঘ
৪
ঙ
পরিবহণ ও সংসরণ
চ
২৩
সমাজসেবা ও অন্যান্য
দ্বিতীয় পরিকল্পনা
ক
১১
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন
খ
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি
গ
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প
ঘ
২০
বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ
ঙ
পরিবহণ ও সংসরণ
চ
১৮
সমাজসেবা ও অন্যান্য
তৃতীয় পরিকল্পনা
ক
১৪
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন
খ
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি
গ
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প
ঘ
২০
বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ
ঙ
২০
পরিবহণ ও সংসরণ
চ
সমাজসেবা ও অন্যান্য
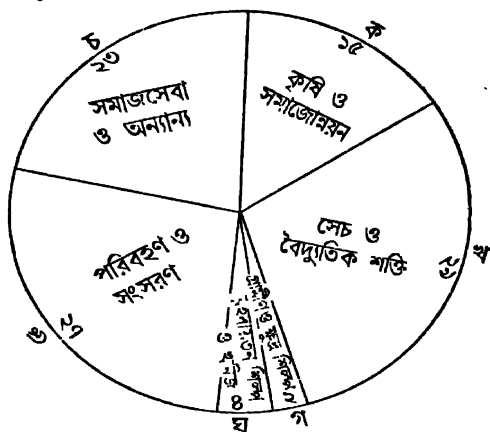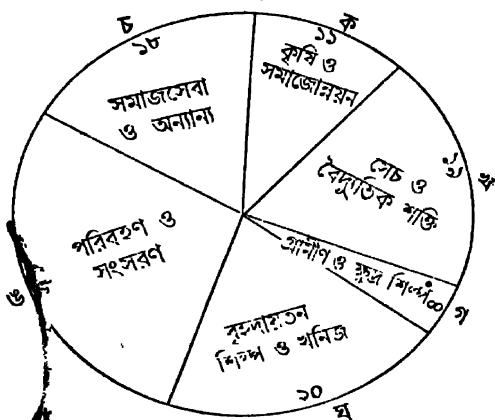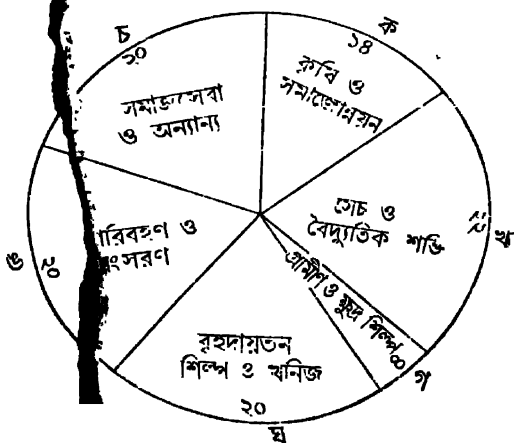
তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আকার (Comparative Size of the Three Plans) ঃ

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ	দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ	তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১	১০৬৮	১৪
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০	২৯	৮৬৫	১৯	১৬৬২	২২
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪	২৬৪	৪
৪। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০	১৫২০	২০
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩	২৭	১৩০০	২৮	১৪৮৬	২০
৬। সমাজসেবা ও অন্যান্য	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮	১৫০০	২০
মোট	১৯৬০	১০০	৪৬০০	১০০	৭৫০০	১০০

উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য ঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতি সম্বন্ধে আশা ও উৎপাদনের লক্ষ্য হইল নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(১) সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ বা তাহার কিছু অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিবে। ফলে পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইবে শতকরা ৩০ ভাগ এবং মাথাপিছু আয়ের শতকরা ১৭ ভাগ।

(২) খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩ কোটি টনের মত বৃদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টনে পরিণত হইবে। ফলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার দাঁড়াইবে শতকরা ৩২ ভাগ।

(৩) অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৩১ ভাগ।

(৪) ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আসিবে।

(৫) সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াটে পৌঁছিবে।

(৬) শিল্পক্ষেত্রে ইস্পাত-পিণ্ডের উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯২ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে; মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৫০০ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৫৮০ কোটি গজ এবং সিমেণ্ট ও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৮৫ লক্ষ টন হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন ও ৩০ লক্ষ টন হইতে ৩৫ লক্ষ টনে পরিণত হইবে। কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণের মত হইবে এবং পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। নির্মিত মোটরগাড়ীর সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে এক লক্ষে পৌঁছিবে। কয়লার উৎপাদন ৫·৪৬ কোটি টন হইতে বাড়িয়া হইবে ৯·৭ কোটি টন।

(৭) পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে রেলপথের মালবহনের ক্ষমতা ১৫·৪ কোটি টন হইতে বাড়িয়া ২৪·৫ কোটি টনে পৌঁছিবে। ১১০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত

হইবে। পথঘাটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং জাহাজী শক্তির পরিমাণ ২ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি পাইবে।

(৮) সমাজসেবার ক্ষেত্রে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা বিশেষ সম্প্রসারিত হইবে এবং চিকিৎসা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইবে। পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ব্যাপকতর আকার ধারণ করিবে।

(৯) ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

(১০) ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক ১৫.৫ গজ হইতে ১৭.২ গজে দাঁড়াইবে এবং খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য ২১০০ হইত ২৩০০-তে পৌঁছিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর (First Year of the Third Plan): ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে পরিকল্পনা-মন্ত্রী পার্লামেণ্টে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৬১-৬২) পরিকল্পনার ব্যয় এবং উন্নয়নের গতি সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি অনুসারে এই বৎসরে পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১৪৮ কোটি টাকা বা দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরের (১৯৬০-৬১) ব্যয় হইতে ৭৭ কোটি টাকা অধিক। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩) ব্যয় ৩০০ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৪৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ব্যয়

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে মোট শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন ৫% বৃদ্ধি পায়। তুলাবস্ত্র, পাট এবং চিনিকে বাদ দিয়া অন্যান্য শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধির হার ছিল ৮%। ইহার মধ্যে নির্মিত ইস্পাতের (ইস্পাত-পিণ্ড নহে) উৎপাদন ২৪ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। লৌহ-আকরের উৎপাদন হয় ১.১৭ কোটি টনের তুলনায় ১.২১ কোটি টন এবং সিমেণ্টের উৎপাদন হয় ৭৮ লক্ষ টন হইতে ৮২ লক্ষ টন। কয়লার উৎপাদন ৩ লক্ষ টনের মত (৫.৫৫ কোটি টন হইতে ৫.৫২ কোটি টনে) হ্রাস পাইলেও পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে (১৯৬২-৬৩) উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬.২ কোটি টনে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ধরা হইয়াছে যে, এই দ্বিতীয় বৎসরে নির্মিত ইস্পাতের উৎপাদন হইবে ৩৯ লক্ষ টন, লৌহ-আকরের উৎপাদন হইবে ১.৩৫ কোটি টন এবং সিমেণ্টের উৎপাদন হইবে ৯৫ লক্ষ টন।

শিল্পজ উৎপাদন

শিল্পপ্রসার

এই প্রকৃত উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে এলুমিনিয়ম, শিল্প-যন্ত্রপাতি, সার, সিমেণ্ট প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা (installed capacity) বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনকার্য বহুদূর অগ্রসর হয়। সরকারী উদ্যোগাধীন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান তিনটির নির্মাণকার্য শেষ হইয়া

॥ প্রেস ইনফরমেশন-ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ উন্নততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের ফল ॥

II

[১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠা]

।। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ।।

II

।। কুটির শিল্পে কারিগরি শিক্ষাদান ।।

[১৯২ পৃষ্ঠা]

সম্প্রসারণকার্য সুরু হয়। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা অধিক উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক কারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্সের আবেদন আসিতে থাকে।

পরিবহণ ও সংসরণ

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেল-পথের বেলায় দেখা যায় যে বাৎসরিক ওয়াগন নির্মাণের সংখ্যা ১২ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯ হাজারের উপরে দাঁড়াইয়াছে, ৪২২ মাইল রেলপথের একাংশে দুইটি করিয়া লাইন পাতা ও অপরাংশে ছোট লাইনকে বড় লাইনে পরিণত করা হইয়াছে এবং ৩২৭ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। পরিকল্পনার এই প্রথম বৎসরেই রেলপথসমূহের কয়লা বহনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই বৎসরে রাজপথের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে ৪ হাজার মাইল। পরবর্তী বৎসরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৫ হাজার মাইলে দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি

বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ১৩%। ইহার ফলে ৩১০০-র মত নূতন গ্রাম ও সহরের বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে আরও ৩৫০০ গ্রাম ও সহর বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাইবে।

সেচ-ব্যবস্থা

বৃহৎ, মাঝারি ও ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মোট ৩২ লক্ষ একরের মত। ১৯৬২-৬৩ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ ইহাকেও ছাড়াইয়া ৪৪ লক্ষ একরের মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

খাদ্যোৎপাদন

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন মোটামুটি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের উৎপাদনবৃদ্ধি ছিল ১.১৬ কোটি টন, তৈলবীজের ৬৮ লক্ষ টন এবং বাজরার ৩৫ লক্ষ টন। ধান্যের উৎপাদন মোটামুটি একপ্রকারই ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ টন। ১৯৬১-৬২ সালে উহা ৩ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী বৎসরে আবার উহা ৪ লক্ষ টনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

সমাজসেবা

শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার বহুপরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও জাতীয় বৃত্তি (national scholar-ships), কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতির অভূতপূর্ব প্রসার দেখা যায়।

কর্মসংস্থান

পরিকল্পনার ঐ প্রথম বৎসরে ২০ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে আরও ২৪ লক্ষ লোকের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ঐ প্রথম বৎসরেই গ্রামীণ অর্ধ-বেকা[illegible]ত্বের বিরুদ্ধে দুইটি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। প্রথম ব্যবস্থাটি অনুসারে উন্নয়ন[illegible]কসমূহে ব্যাপক গ্রামীণ নির্মাণকার্য

(rural works) সুরু হয়, এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি অনুসারে গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এইভাবে শিল্প, কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সকলের সম্প্রসারণ ঘটিলেও জাতীয় আয়ের কিন্তু অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে নাই। প্রাথমিক হিসাব অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে মাত্র শতকরা ৩ ভাগের কিছু উপর।

জাতীয় আয়

তৃতীয় পরিকল্পনার পরিবর্তন: চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার কিছু রদবদলের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। মোটামুটিভাবে ঠিক হইয়াছে যে কৃষি, শিল্প এবং পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ অপরিবর্তিত রাখা হইবে, কিন্তু সমাজসেবার ক্ষেত্রে কিছু ব্যয় হ্রাস করা হইবে। কৃষি ও সমাজোন্নয়নের ক্ষেত্রে আশু ফলপ্রসূ ব্যবস্থাগুলির দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইবে, শিল্পক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদনবৃদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইবে এবং পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে সামরিক দিক দিয়া অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। ইহা ছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই রদবদলকার্য ১৯৬৩ সালের প্রথমেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রদবদল করা হইবে

বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন (Development of Agriculture and Industries under the Plans): প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে অবলম্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল:

(ক) কৃষির উন্নয়ন (Development of Agriculture): প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমত, স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি হইতেই উন্নয়নকার্য সুরু করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, প্রথম পরিকল্পনা যখন প্রবর্তন করা হয় তখন দেশে ছিল দারুণ খাদ্যাভাব। সুতরাং খাদ্য সমস্যার আশু সমাধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের লোককে অভুক্ত অবস্থায় বা অর্ধাহারে রাখিয়া কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে সফল করা যায় না ইহা উপলব্ধি করিয়াই কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তৃতীয়ত, পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার ফলে ভারতে পাট ও তুলার উৎপাদন বিশেষ কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে কাপড়ের কল ও পাটকলগুলি কাঁচামালের অভাবে আংশিকভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুতরাং কৃষির উন্নয়নের দ্বারা তুলা ও পাটের উৎপাদনবৃদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল।

কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ ও ইহার কারণ

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে কৃষির পর্যাপ্ত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে এবং খাদ্য-সমস্যার একরূপ সমাধান হইয়াছে মনে করিয়া কৃষির উপর হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া হয়। পরে আবার খাদ্যসংকট হেতু উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয়। প্রথমে স্থির হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে যতটা উৎপাদন হইয়াছিল তাহার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ২৫ ভাগ অধিক খাদ্যশস্য ও মোট কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইবে। পরে ঠিক করা হয় যে খাদ্যশস্যের ২৫ শতাংশ ও মোট কৃষিজ পণ্যের ২৮ শতাংশ উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে।

আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় আবার কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় খাদ্য-শস্যের শতকরা ৩২ ভাগ এবং অন্যান্য শস্যের শতকরা ৩১ ভাগ উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই তিন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও হইবে তাহার মধ্যে জলসেচ, উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ, জাপানী প্রথায় ধান্য চাষ, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সমবায়-ব্যবস্থার প্রসার এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—এই কয়টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কৃষি-সম্প্রসারণের (agricultural extension)—অর্থাৎ, উন্নততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কৃষির উন্নয়নের পদ্ধতি

(খ) জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি (Irrigation and Power): কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলসেচ-ব্যবস্থার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাতেও এই গুরুত্ব হ্রাস করা হয় নাই।

ভারতে চারি প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়—যথা, কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী এবং খাল। কূপ, নলকূপ এবং পুষ্করিণীর সাহায্যে যে সেচকার্য করা হয় তাহাকে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা (minor irrigation works) বলে। খাল হইতে সেচ-ব্যবস্থা মাঝারি ধরনের (medium) বা বৃহৎ (major) হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে-সকল বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পন্ন করা হয় তাহাদের অনেকগুলিই হইল বহু-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট (multi-purpose)। অর্থাৎ, এগুলি হইতে সেচের ব্যবস্থা ছাড়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যানিরোধ, নৌ-চলাচলের জন্য খাল খনন প্রভৃতি করা যায়। নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়াই এরূপ করা হয় বলিয়া এই ব্যবস্থাকে বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (multipurpose river valley projects) বলা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব হইতেই ভাকরা-নাংগল, দামোদর, প্রভৃতি

কতকগুলি নদী-উপত্যকার কার্য সুরু করা হইয়াছিল। এগুলিকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের সহিত আবার চম্বল, কোশী, রাইহান্দ, কয়না ও কৃষ্ণা—এই পাঁচটি নূতন বহুমুখী এবং কাকড়াপাড়া সেচ-পরিকল্পনা যোগ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আবার যুক্ত হয় রাজস্থান খাল পরিকল্পনা (Rajasthan Canal Project) এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোটখাট পরিকল্পনা। নিম্নে প্রধান প্রধান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।*

বিভিন্ন বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

ভাকরা-নাংগল পরিকল্পনা (Bhakra-Nangal Project): ইহা পাঞ্জাবে অবস্থিত। শেষ পর্যন্ত ইহা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে ৩৬ লক্ষ একর জমি সেচ-সমন্বিত হইবে এবং প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

দামোদর পরিকল্পনা (Damodar Valley Project): খেয়ালী দামোদর এবং উহার উপনদীগুলিতে বাঁধ বাঁধিয়া বিহার ও পশ্চিমবংগের একাংশে বন্যানিরোধ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন হইল ইহার উদ্দেশ্য। শেষপর্যন্ত এই পরিকল্পনা হইতে ১১·৫ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ও ২·৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

মহানদী পরিকল্পনা (Mahanadi Valley Project): মহানদী উপত্যকায় হীরাকুঁদ, টিকারাপাড়া এবং নারাজ এই তিনটি স্থানে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে হীরাকুঁদ বাঁধের কাজ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়েই মোটামুটি শেষ হয়। হীরাকুঁদ হইতে শেষপর্যন্ত ৬·৭২ লক্ষ একর জমিতে সেচ এবং ১·২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বাঁধ হইতে ১৮·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ১·৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

চম্বল পরিকল্পনা (Chambal Project): ইহা রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। প্রথম পরিকল্পনায় ইহার কার্য সুরু করা হয়। ইহাতে ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৮০-৯০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

কুশী পরিকল্পনা (Kosi Project): কুশী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য উত্তর বিহারে বন্যানিরোধ। ইহা হইতে অবশ্য ১৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও হইবে।

রাইহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা (Rihand Dam Project): ইহা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জিলায় অবস্থিত। শেষপর্যন্ত ইহা হইতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ২·৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে।

কয়না পরিকল্পনা (Koyna Project): ইহা বর্তমানে মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। এই পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তি প্রায় ২·৪ লক্ষ কিলোওয়াটের মত।

কৃষ্ণা পরিকল্পনা (Krishna Project): দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর উপরে

* বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকার্যের পরি[illegible]ত হিসাব দেওয়া হইল।

॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ দামোদর উপত্যকায় বোকারো তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র ॥
[১৮৪ পৃষ্ঠা]
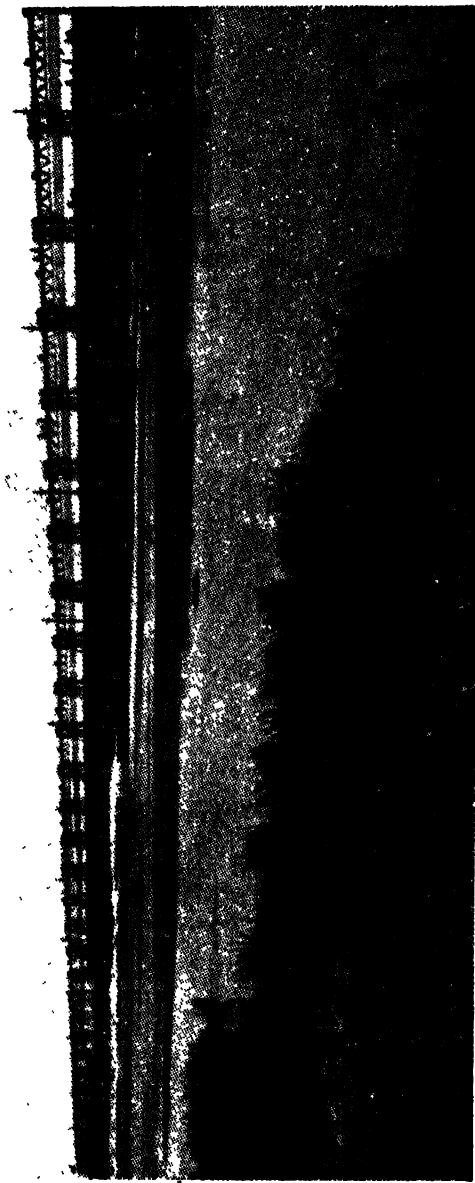
॥ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর সৌজন্যে ॥

॥ দামোদর পরিকল্পনায় দুর্গাপুরের বাঁধ ॥

II

[১৮৪ পৃষ্ঠা]

নাগার্জুনসাগর নামক স্থানে বাঁধ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা প্রধানত সেচ-পরিকল্পনা। ইহা হইতে অন্ধ্র রাজ্যে শেষপর্যন্ত ২০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা হইবে।

কাকড়াপাড়া পরিকল্পনা (Kakrapara Project): ইহা প্রধানত সেচ-পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি বর্তমান গুজরাট রাজ্যের সুরাটে অবস্থিত। ইহা হইতে ৬·৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
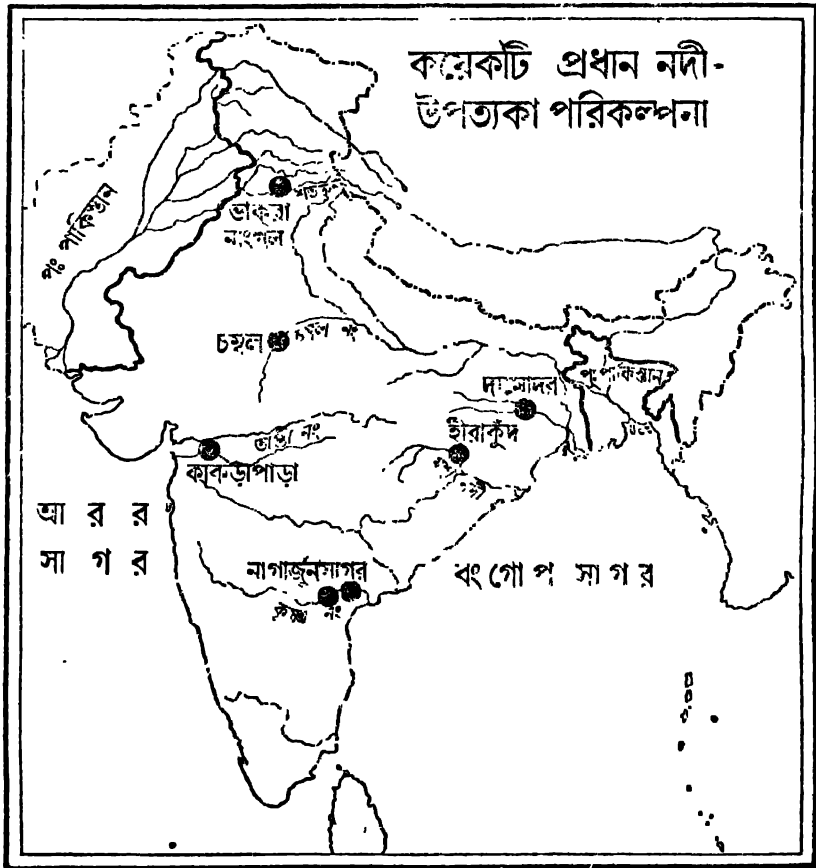
রাজস্থান খাল পরিকল্পনা (Rajasthan Canal Project): এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় ১৯৫৭ সালে। ইহাতে শেষপর্যন্ত ৪২৫ মাইল-দীর্ঘ খাল দ্বারা শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতীর জল পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হইবে। ফলে রাজস্থানের মরুসদৃশ বিকানীর, জলশল্মীর, শ্রীগঙ্গানগর জিলাসমূহ শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে রাজস্থান খাল পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনকার্য করা হয়।

আর একটি বৃহৎ সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা হইল গ্যাণ্ডক পরিকল্পনা (Gandak Project)। ইহা ভারত ও নেপাল সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে নেপাল সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার ও বিহার সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সকল রকমের সেচ-ব্যবস্থা হইতে ২ কোটি একরের মত জমি সেচ-সমন্বিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ২ কোটি একর জমিকে সেচের অধীনে আনিবার আশা করা হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইলে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে পৌঁছিবে।

(গ) শিল্পোন্নয়ন (Industrial Development): শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ৪ ভাগ করা হইয়াছিল শিল্প ও খনিজ খাতে; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ। পরিমাণের দিক দিয়া প্রথম পরিকল্পনায় বৃহদায়তনে শিল্প ও খনিজ খাতে ৭৪ কোটি টাকা ব্যয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।* প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্য সফল হওয়াতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। এ-সম্পর্কে পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে, খাদ্য-সংকট, কাঁচামালের যোগান এবং মুদ্রাস্ফীতি কতকটা আয়ত্তের মধ্যে আসার ফলে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উপরন্তু, স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি অনুসারে কৃষিকে সুসংগঠিত করিয়া তবেই সুষম শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায়

দেশের শিল্পোন্নয়নে স্বাধীন ভারতের সরকার ঠিক কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহার প্রথম ব্যাখ্যা করা হয় ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায়। তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হইলেও বলা হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে (১) অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন, (২) আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ এবং (৩) রেলপথ—এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সরকারী এলাকায় থাকিবে। ইহা ছাড়া কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতারের যন্ত্রপাতি, বিমানপোত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন একমাত্র সরকারই করিবে। বাকী সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য বেসরকারী উদ্যোগে থাকিবে।

পুরাতন শিল্পনীতি

এই শিল্পনীতি অনুসারেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তে এক নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়।

নূতন শিল্পনীতি

এই নূতন শিল্পনীতি অনুসারে সমস্ত শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ

* ১৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

তৈল, রেলপথ ও বিমানপথ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি ১৭টি মূল শিল্প বা সেবামূলক কার্য। এগুলির উন্নয়নের ভার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হস্তেই থাকিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে ১২টি শিল্প—যথা, যন্ত্রপাতি, রসায়ন, কয়লা ও তৈল ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ, মোটর চলাচল ইত্যাদি। এগুলি বর্তমানে বেসরকারী মালিকানায় থাকিলেও ক্রমশ ইহাদিগকে রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বা অবশিষ্ট শিল্পগুলিকে বেসরকারী মালিকানাতেই রাখা হইবে। তবে এগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

নূতন শিল্পনীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকাকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের নীতি অনুসারেই এরূপ করা হইয়াছে।

পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শিল্পবাণিজ্যই সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় থাকে। শিল্পবাণিজ্যের কিছু সরকারী ও কিছু বেসরকারী পরিচালনায় থাকিলে উহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়।* প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই ছিল আদর্শ। এখনও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে; কিন্তু উহা আর এখন আদর্শ নহে। আদর্শ বা লক্ষ্য হইল সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এইজন্য ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হইয়াছে। এইভাবে ভবিষ্যতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে আরও সম্প্রসারিত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তখন পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিবে।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতে সমাজতন্ত্রের পথে গতি

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের শতকরা ৭.৬ ভাগ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ খাতে ব্যয় করা হয় মোট ৭৪ কোটি টাকা বা মোট পরিকল্পনার ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৪ ভাগ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ খাতে ৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। বাকী ৬৯০ কোটি টাকার প্রায় সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্প ও বিভিন্ন মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে, শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৯০০ কোটি টাকা এবং উহার মধ্যে ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের অংশ ছিল ১৭৫ কোটি টাকার মত। শুধু বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়োগের (investment) কথা ধরিলে (খনিজ ক্ষেত্রের ব্যয়

* ১৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

এবং চলতি ব্যয় বাদ দিয়া) দেখা যায় যে উহার পরিমাণ ছিল ৭৭০ কোটি টাকা, যদিও মূল পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। অতএব, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ মূল পরিকল্পনার অনুমান অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

সরকারী উদ্যোগে যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান এ-পর্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেলা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবংগের দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা তিনটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। শেষপর্যন্ত এই তিনটি কারখানার মোট উৎপাদনক্ষমতা হইবে বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন।* ইহা ছাড়া মহীশূরের সরকারী ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে আরও একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইবে। তারপর আছে সিন্ধ্রি, নাংগল, রুরকেলা ও নিভেলির সার তৈয়ারির কারখানা। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ তৈয়ারির কারখানাও সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হইবে। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ইহার উৎপাদন এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে বর্তমানে ভারত রেল-ইঞ্জিন নির্মাণে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে, এমনকি ভারত রেল-ইঞ্জিন রপ্তানি করার অবস্থাতেও পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে এই কারখানায় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনও নির্মিত হইতেছে।

অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে পেরাম্বুরের রেলকোচ নির্মাণের কারখানা, টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা, বিমান নির্মাণের কারখানা, সাধারণ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, গৃহনির্মাণের উপকরণের কারখানা, কয়েকটি পেনিসিলিন ও ডি. ডি. টি. কারখানা, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সংবাদপত্র মুদ্রণ-কাগজের কারখানা, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা, চশমার কাঁচের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, তৈল শোধনাগার, ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত বোকারোর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছাড়া অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণ শিল্প, মূল রসায়ন শিল্প. ঔষধপত্রাদি উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করা হইবে এবং পেট্রল পরিশোধনের (oil refining) ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার অনুমিত ব্যয় হইল প্রায় ১৯০০ কোটি টাকা; কিন্তু পরিকল্পনায় বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৫২০ কোটি টাকা। সুতরাং আশংকা হয় যে পরিকল্পনাধীন সময়ে কার্যক্রমকে পুরাপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে আগামী ১৫ বৎসরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে শেষ না করিলেও বিশেষ

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

* প্রথমে মোট উৎপাদনক্ষমতা ৩০ [illegible] টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। বর্তমানে কারখানা তিনটির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দ্বারা উৎপা[illegible]ক্ষমতা উপরি-উক্তভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
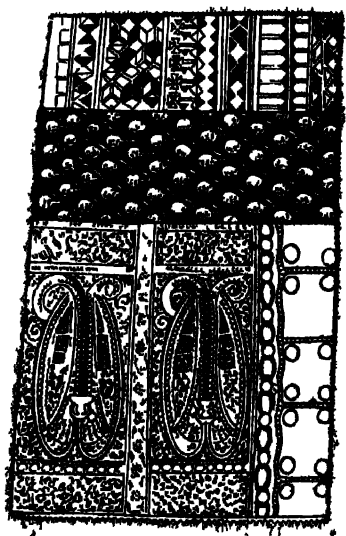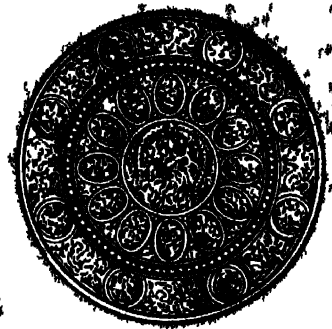
॥ ভারতের কুটির শিল্পজাত কয়েকটি দ্রব্য ॥ [১৮৯-১৯২ পৃষ্ঠা]

অসুবিধা হইবে না। এই পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে আশা করা হইয়াছে।

(ঘ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন (Development of Cottage and Small-scale Industries): কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহিত বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সমন্বয় আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়নের অন্যতম ঘোষিত নীতি। অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নই আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে; যাহাতে বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও কাম্যভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

ভারতের কুটির শিল্প

ভারতের কুটির শিল্পসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) গ্রামীণ, এবং (খ) পৌর। গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি তৈয়ারি, বেতের কার্য প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অবশ্য সুতাকাটা ও বয়ন শিল্পই অধিক প্রসিদ্ধ।

পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই-এর কাজ, সূচী শিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান:

সকল দেশের শিল্প-ব্যবস্থাতেই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের এক নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনই সুবিধাজনক। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অন্যান্য দিক দিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয় বলিলেও চলে।

১। নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয়

ভারতে শুধু কুটির শিল্পসমূহে নিযুক্ত লোকের জন্য ২ কোটির মত এবং মাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছে ৫০ লক্ষ লোক, যাহা বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান। ইহার সহিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ধরিলে নিয়োগের পরিমাণ যে বহুগুণ অধিক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে বেকারের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন কর্মসংস্থানের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২.৬ কোটির মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯০ লক্ষের নিয়োগের ব্যবস্থা মাত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতেই হইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মত সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়।

২। ইহাদের মাধ্যমে ছদ্ম বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস সম্ভব

দ্বিতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ছদ্ম বেকারের পরিমাণও কমানো যাইতে পারে। ইহাতে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিবে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু, কোন বৎসর ফসল [illegible] হইলে কৃষককে অনাহারে মরিতে হইবে না,

তৃতীয়ত, মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্যও আমাদিগকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সকল প্রকার বৃহদায়তন শিল্পগঠনের জন্য যে-পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা বর্তমানে আমাদের নাই। সুতরাং সামান্য সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংগঠিত করিতে হইবে এবং বেশীর ভাগ মূলধন মূল শিল্প (basic industries) গঠনে নিয়োজিত করিতে হইবে। চতুর্থত, এইভাবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে মুদ্রাস্ফীতিও বিশেষ প্রবল হইতে পারিবে না। আমাদের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বর্তমান পর্যায়ে ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩। বর্তমানে মূলধনের অসংগতির জন্য এই সকল শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন

৪। ইহাদের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান অনেকাংশে সম্ভব

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাইসাইকেলের অংশ ক্ষুদ্র শিল্পে নির্মিত হইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পরিশেষে, শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাহিরেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিরাট বাজার রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

৫। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের স্থান এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা রহিয়াছে—যথা, (১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, (২) মূলধনের অভাব, (৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল, (৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা, এবং (৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা।

এই সকল শিল্পের সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকসমূহ

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা: কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে কাঁচামাল সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের (middlemen) জন্য। ইহারা বেশ কিছু করিয়া মুনাফা করে বলিয়া কাঁচামালের দামও বাড়িয়া যায়। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া কাঁচামাল সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সময় কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে অনেক সময় উৎপাদনও বন্ধ রাখিতে হয়।

(২) মূলধনের অভাব: ভারতীয় কৃষকদের মত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর-গণও দরিদ্র। সম্বলহীন বলিয়া তাহাদিগকেও যখন-তখন মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় আবার তাহাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে স্বল্প দামে মাল বিক্রয় করিবার সর্তেও ঋণ করিতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর ও মালিকরা তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

(৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল: এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য

আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে।

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা: বিক্রয়ের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের আর একটি প্রধান অসুবিধা। কাঁচামাল সংগ্রহের ন্যায় এ-ব্যবসায়ে ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে শোষণ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মালও অনেক সময় নষ্ট হয়।

(৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা: অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। যেমন, অনেক প্রকার তাঁতবস্ত্রই মিলবস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহা যে কুটির শিল্পের স্বাভাবিক দুর্বলতা তাহা নহে; অনেকাংশে ইহা বহুদিনের অবহেলার ফল।

এই অসুবিধাগুলি দূর করিয়াই যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকগুলিকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন কিভাবে দূর করা যায় কিভাবে অসুবিধাগুলিকে দূর করা সম্ভব তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা ও মূলধনের অভাব সমবায় সমিতির সাহায্যে অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণও সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাম্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। একই সমবায় সমিতি যদি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে কাঁচামাল ও মূলধন যোগাইয়া সাহায্য করে এবং তাহার পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, তবে শিল্পীর পক্ষে মহাজনের শরণাপন্ন হইবার বা ফড়িয়া, ব্যাপারী ইত্যাদির হাতে পড়িবার কোন দরকার হয় না।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের জন্যও মূলধনের প্রয়োজন। ইহা সমবায় সমিতির সামর্থ্যে না কুলাইলে সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারকে লইতে হইবে।

যাহাতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে কিছু দিনের জন্য বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণকে বাঁধিয়া দিতে হইবে, বৃহদায়তন শিল্পের উপর কর বা সেস (cess) বসাইয়া সেই অর্থ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করিতে হইবে।

পরিশেষে, সকল প্রকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা একপ্রকার নহে। যেমন, তাঁত শিল্পের সমস্যা রেশম শিল্পের সমস্যা হইতে পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন বোর্ড গঠন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়ন দায়িত্ব তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সরকার এই সকল বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্যই করিয়া যাইবে।

অবলম্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থাসমূহ আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এইভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

১। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, ২। সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, ৩। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা, ৪। বিক্রয়-বাজারের সংগঠন, ৫। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা, এবং ৬। বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ বোর্ড গঠন।

কাঁচামাল যোগানো এবং সুলভে ঋণ প্রদানের জন্য প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির উপরই নির্ভর করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India), রিজার্ভ ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমেও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বিক্রয়বাজারের সংগঠনের জন্য সমবায়িক বিক্রয়-সংগঠন (cooperative sales organisation) ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সরকারও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাদের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্রশিল্পের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে-সকল বোর্ড গঠন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তাঁতশিল্প বোর্ড, খাদি ও গ্রামীন শিল্প বোর্ড, হস্তশিল্প বোর্ড, সিল্ক বোর্ড এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রথম পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যয় হয় ৪৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা; পরে উহাকে কমাইয়া ১৬০ কোটি টাকায় আনা হইলেও শেষপর্যন্ত ব্যয় হয় ১৭৫ কোটি টাকার মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৬৪ কোটি টাকা। এই বরাদ্দবৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হইল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। অর্থাৎ, যাহাতে তাহারা আপনা হইতেই বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

সংক্ষিপ্তসার

আধুনিক যুগ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই মানুষ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রধানত দুই প্রকারের—(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা, এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা। উন্নত দেশের পরিকল্পনা প্রথম এবং ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। পরিকল্পনা আবার পূর্ণাংগ বা আংশিক হইতে পারে। আংশিক পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলে।

অনগ্রসর কৃষি স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া উন্নয়নকার্য কৃষি হইতে শুরু করিতে হয়। প্রথমে কৃষিকে সুসংগঠিত করিয়া পরে শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দিতে হইবে। সংগে সংগে অবশ্য পরিবহণের সুব্যবস্থা, সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান : বলা যাইতে পারে, উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান প্রধানত তিনটি—

(ক) কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষির সুসংগঠন ;

(খ) সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়ন ;

(গ) পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ।

(ক) **কৃষির সুসংগঠন :** ইহার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—যথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের একত্রিকরণ, ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থার সংস্কার, ঋণ-ব্যবস্থা ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সংগঠন, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে।

(খ) **সুষম শিল্পোন্নয়ন :** ইহার জন্য ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প এবং যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইবে। সকল প্রকার যন্ত্রচালিত শিল্প যাহাতে গড়িয়া উঠে সে-দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

(গ) **সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ :** এই সকল সেবাকার্যকে সামাজিক মূলধনও বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান ব্যবস্থা প্রভৃতি।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা : ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ইহার যুগ শুরু হইয়াছে। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাষ শেষ হইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার সময় চলিতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ২৩৫৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। ইহাতে কৃষি, জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে ব্যাপকতর। প্রথমে অবশ্য যে-আকারে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় তাহার কিছু রদবদল করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারিটি : ১। উন্নয়নের দ্রুততর গতি, ২। শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি, ৩। নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং ৪। সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত।

মূল পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়।

এই পরিকল্পনার নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়াছিল—১। ইহা ছিল উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট; ২। কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লইয়া শিল্পে আরোপ করা ভুল হইয়াছিল; ৩। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই শেষোক্ত ত্রুটির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করিবার বিশেষ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পরিকল্পনাকে ক এবং খ এই দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। ক-অংশের জন্য ব্যয়বরাদ্দ হয় ৪৫০০ কোটি টাকা। এই ৪৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত যদি কিছু সংগৃহীত হয় তবেই খ-অংশে হাত দেওয়া হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে, মোট ৪৫০০ কোটি টাকাই ব্যয় করা সম্ভব হইবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের বিনিয়োগ আবার প্রাথমিক অনুমানকে (২৪০০ কোটি টাকা) ছাড়াইয়া ৩৩০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দশ বৎসরের পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ : প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার দশ বৎসরে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে তাহার একটি প্রাথমিক হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই দশ বৎসরে মোট বিনিয়োগ ১০,১১০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১১,৪৬০ কোটি টাকা হইয়াছিল বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুমিত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ-বিষয়ে

লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় নাই। লৌহ ও কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যেও পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। তবে আশা করা যাইতেছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের অবস্থা ক্রমশই মন্দের দিকে যায়। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিও রোধ করিতে পারা যায় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় এ-বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

এইরূপ আংশিক অসফলতা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয়। আশা করা হইয়াছে, এই দশ বৎসরে কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ৪১ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: চূড়ান্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে। প্রস্তাবনায় তৃতীয় পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত হইত না।

উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য: তৃতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঁচটি—১। বাৎসরিক ৫% বা তাহার অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা, ২। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং বাণিজ্যিক শস্যেরও পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদন করা, ৪। জনশক্তির সদ্ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার বৃদ্ধিসাধন করা, ৫। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া। বৈশিষ্ট্য—১। তৃতীয় পরিকল্পনা আকারে স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর হইয়াছে; ২। ইহাতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ও ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার উপর ফাঁক রাখা হইয়াছে; ৩। ইহাতে আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে; ৪। ইহাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইবে; ৫। সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন করা হইবে; ৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য এবং আঞ্চলিক সমতা আনয়নের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে; ৭। দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের ব্যবস্থাও করা হইবে; ৮। এই পরিকল্পনায় চতুর্থ পরিকল্পনার উৎপাদন ও উন্নয়ন লক্ষ্যও মোটামুটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় মোট ১১,৬০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল ৭৫০০ কোটি টাকা। উক্ত ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ ৬৩০০ কোটি টাকা; বাকী ১২০০ কোটি টাকা চলতি ব্যয়ের জন্য।

উক্ত বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল উন্নয়ন সংঘটিত হইবে তাহাও অনুমান করা হইয়াছে।

বর্তমানে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুটা পুনর্বিন্যাস করা হইতেছে।

(ক) বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষিজ উন্নয়ন: প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে আবার অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচ, উন্নততর সার ও বীজ ব্যবহার, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সমবায়-ব্যবস্থার প্রসার, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(খ) সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি: সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে কোন পরিকল্পনাতে উপেক্ষা করা হয় নাই। নদী পুষ্করিণী ইত্যাদি পুরাতন ব্যবস্থা ছাড়াও কতকগুলি বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা দ্বারা সেচ সম্প্রসারণের এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) শিল্পোন্নয়ন: শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনার প্রাক্কালে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। ঐ শিল্পনীতি অনুসারে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া মালিকানা এবং আরও কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত

হয়। ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নূতন নূতন শিল্প গঠন এবং পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতেছে।

(ঘ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন: আমাদের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থায় নিয়োগের সংস্থা হিসাবে, ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের মাধ্যম হিসাবে, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান হিসাবে এবং মূলধনের অসংগতি ইত্যাদির জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ বাধাও রহিয়াছে—যথা, কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, মূলধনের অপ্রাচুর্য, সনাতন উৎপাদন-পদ্ধতি ও অনুন্নত কলাকৌশল, অসংগঠিত বিক্রয়বাজার এবং বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা। সুতরাং এই বাধাগুলিকে অপসারণ করিয়াই সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় তাহাই করা হইয়াছে। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, বিক্রয়বাজারের সংগঠন এবং বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প-সমূহকে সংরক্ষণ—এই কয়টি ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন বোর্ড স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নভার উহাদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is Development Planning? Indicate the role of the Government in it.

উন্নয়ন পরিকল্পনা কাহাকে বলে? এই পরিকল্পনায় সরকারের ভূমিকা কি হইবে ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত: পরিকল্পনা-প্রবণতা একরূপ বিশ্বজনীন হইলেও বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনার রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উন্নত দেশসমূহের পরিকল্পনা হইল সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা হইল উন্নয়ন পরিকল্পনা। ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।...এবং (১৫৬-১৫৭ এবং ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা)]

2. Give in brief the aims and objectives of India's Five Year Plans.
(H. S. (H) 1960 ; P U. 1961 : H. S. (H) Comp. 1961,'62)

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[১৫৮, ১৬২, ১৬৩-১৬৫ এবং ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা]

3. Give in brief the achievements and failures of the First and Second Plans. (B. U. 1961)

সংক্ষেপে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ প্রদান কর। [১৭০-১৭৩ পৃষ্ঠা]

4 What do you understand by economic planning? Indicate the progress of the Indian Economy under the first two Five Year Plans.

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ? প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা কতটা উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখাও। [১৫৬-১৫৭ এবং ১৭০-১৭৩ পৃষ্ঠা]

5. Give an idea of Industrial Development under the Five Year Plans.

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [১৭২ এবং ১৮৬-১৮৮ পৃষ্ঠা]

6. Give a brief outline of the Third Five Year Plan. (En. 1962)

সংক্ষেপে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিচয় দাও। [১৭৩-১৮০ পৃষ্ঠা]

7. Describe the main features of our Third Five Year Plan. In what respects, if any, does the plan diff[er] from the two previous Plans?

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা[র] প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা কর। এই তৃতীয় পরিকল্পনা পূর্ববর্তী পরিকল্পনা দুইটি হইতে কোন দিক দি[য়া] পৃথক কিনা, তাহা দেখাও।

[১৭৫-১৭৬ এবং ১৬২-১৬৩, ১৬৪-১৬৫, ১৭৯ পৃষ্ঠা]

8. Give an idea of the programme of industrial development under our Five Year Plans.

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমের একটি বিবরণ দাও। [১৮৬-১৮৯ পৃষ্ঠা]

9. Briefly discuss the industrial policy of the Government of India.

সংক্ষেপে ভারত সরকারের শিল্পনীতির আলোচনা কর। [১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা]

10. Estimate the place of cottage and small-scale industries in the economy of India. How do you propose to plan the future development of such industries? (H. S. (H) Comp. 1960)

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের স্থান নির্দেশ কর। উহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? [১৮৯-১৯২ পৃষ্ঠা]

11. Indicate the importance of the village and small-scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries? (H. S. (H) 1960)

আমাদের অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রামীণ (কুটির) ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উহারা বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের পাশাপাশি সম্প্রসারিত হইতে পারে? [১৮৯-১৯২ পৃষ্ঠা]

12. Write a short note on '*Mixed Economy*'. (H. S. (H) 1962)

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [১৫৭ এবং ১৮৭ পৃষ্ঠা]

চতুর্দশ অধ্যায়

সরকারী আয়-ব্যয়

(Government Finance)

সরকারী আয়-ব্যয়কে সাধারণের আয়-ব্যয়ও (Public Finance) বলা হয়। সরকারী বা সাধারণের আয়-ব্যয়ে সরকারের আয় ও ব্যয় এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যা আলোচনা করা হয়। এই সরকারী আয়-ব্যয়ের চারিটি প্রধান শাখা আছে—যথা, (ক) সরকারী আয়, (খ) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী ঋণ এবং (ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান (financing of development)।*

সরকারী আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন শাখা

সরকারের কার্যক্ষেত্রের দিন দিন প্রসার ঘটিতেছে বলিয়া সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থারও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন প্রকারের আয়-ব্যয় পদ্ধতি (Different Systems of Public Finance) : সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকারের হইতে পারে

তিন প্রকারের সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতি

* আয়-ব্যয় পরিচালনা (financial administration) সরকারী আয়-ব্যয়ের আর একটি শাখা। কিন্তু প্রাথমিক অর্থবিদ্যায় ইহার আলোচনা করা হয় না; উচ্চতর পর্যায়ে করা হয়।

(ক) পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়ের পদ্ধতি (System of Predetermined Income): এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় পদ্ধতির অনুরূপ। ইহাতে আয় অনুসারেই ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের আয় যখন মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে এবং বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ভারতে যখন ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র তখন সরকারকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ, ভূমি-রাজস্ব হইতে আয় ছিল মোটামুটি নির্দিষ্ট।

(খ) পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়-পদ্ধতি (System of Predetermined Expenditure): এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই বর্তমান ভারতে অনুসরণ করা হয়। বস্তুত, ইহাকে একরূপ সকল সভ্য দেশে অনুসৃত পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহাতে আয় অনুসারে ব্যয়নির্বাহ করা হয় না; পূর্ব হইতেই ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া কিভাবে ঐ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে তাহা স্থির করা হয়।

এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকার ইচ্ছামত ব্যয়ের পরিকল্পনা করিয়া প্রয়োজনমত অর্থসংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং ব্যয় নির্ধারণ করিবার সময়ে কি পরিমাণ আয় হওয়া সম্ভব সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হয়।

(গ) বাণিজ্যিক পদ্ধতি (Commercial System): ইহাতে আয় বা ব্যয় কোনটাই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট হয় না। দেখা হয় যে আয় কিরূপ হইবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে কিনা সে-বিষয়েও বিবেচনা করা হয়। আবার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মত ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা তাহাও দেখা হয়। সাধারণত সরকার-পরিচালিত ব্যবসাবাণিজ্যেই—যেমন, রেলপথ ও সরকারী বাস চলাচলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, প্রকৃত সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে নহে।

সরকারী আয় বা রাজস্ব (Public Income or Revenues):

সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে দুই ধরনের রাজস্ব সংগ্রহ করে। (ক) সরকার কর্তৃক পরিচালিত জনহিতকর সংস্থাসমূহ যে সেবামূলক কার্যাদি পরিবেশন করে তাহার ব্যবহারের জন্য জনসাধারণকে দাম দিতে হয়। কলিকাতায় সরকারী বাসে বা রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিলে টিকিট-বাবদ পয়সা দিতে হয়, খাম পোষ্টকার্ড কিনিলে দাম দিতে হয়, ইত্যাদি। এই ধরনের রাজস্বকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue) বলে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে লোকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব দিতে বাধ্য নয়। যেমন, রেলভ্রমণ না করিলে টিকেটের জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

দুই প্রকারের রাজস্ব

ক। কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

কিন্তু সরকারের রাজস্বের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থ হইতে। এই বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থকে কর (tax) বলে। রেলে ভ্রমণ না করিলে লোকে টিকিট বাবদ পয়সা দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়কর দিতেই হইবে। করের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার বদলে করপ্রদানকারী কোন বিশেষ সুবিধা দাবি করিতে পারে না। যে-ব্যক্তি

রেলগাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটে সে আরামে ভ্রমণের দাবি করিতে পারে, কিন্তু যে-ব্যক্তি বহু অর্থ আয়কর হিসাবে প্রদান করে সে দাবি করিতে পারে না যে তাহার গৃহের সম্মুখে ৪ জন পুলিস-পাহারা মোতায়েন রাখা হউক। সুতরাং করের সহিত সুবিধার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই; কর ধার্য করা হয় রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য। কর হইতে যে-রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহাকে কর-রাজস্ব (tax revenue) বলে।

খ। কর-রাজস্ব

করসংগ্রহের নীতি (Canons of Taxation): রাষ্ট্রের সাধারণ কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার বাধ্যতামূলকভাবে করসংগ্রহ করে। অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, এই সংগ্রহকার্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ্যাডাম স্মিথই প্রথমে নিম্নলিখিত সাতটি নীতির প্রথম চারিটির ব্যাখ্যা করেন।

করসংগ্রহের প্রধান সাতটি নীতি

(ক) সমতার নীতি (Canon of Equality): রাষ্ট্র ধনী-দরিদ্র সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয়; রাষ্ট্র না থাকিলে কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ থাকিতে পারে না। সুতরাং সকলকেই রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য করপ্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সকলকে সমপরিমাণ কর দিতে বলা অন্যায়। যাহার আয় মাত্র ১ শত টাকা তাহার ১ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির মত করপ্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ীই করপ্রদান করিবে, রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতিই গ্রহণ করা সমীচীন। ইহাকে সমতার নীতি বলা হয়।

সমতার নীতি বলিতে কি বুঝায়

(খ) নিশ্চয়তার নীতি (Canon of Certainty): ধার্য করের পরিমাণ, করপ্রদানের সময় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে করদাতার পূর্ব হইতেই সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে লোকে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না এবং নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিবে। হয়ত' যখন লোককে কর দিতে বলা হইবে তখন তাহার হাতে মোটেই টাকাকড়ি থাকিবে না; ফলে তাহাকে ঋণ করিতে হইবে। করধার্য ব্যাপারে এই নীতি নিশ্চয়তার নীতি নামে পরিচিত।

(গ) সুবিধার নীতি (Canon of Convenience): জনসাধারণের নিকট হইতে কর এমনভাবে আদায় করা উচিত যাহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়। সমগ্র প্রাপ্য একসংগে চুকাইয়া দিতে বলিলে, অথবা অসময়ে করপ্রদান করিতে বলিলে লোকের অসুবিধা হয়। এইজন্য বেতনভুক্ ব্যক্তিদের আয়কর মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটিয়া লওয়া হয়; কৃষকদের নিকট হইতে কিস্তিতে কিস্তিতে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হয়। আবার কিস্তির যাহা বাকী থাকে তাহা ফসল তুলিবার পরই দাবি করা হয়। করধার্যের এই নীতি সুবিধার নীতি বলিয়া অভিহিত।

(ঘ) ব্যয়সংক্ষেপের নীতি (Canon of Economy): করসংগ্রহ করিতে বিপুল ব্যয় হইলে রাষ্ট্রের কোষাগারে সামান্য রাজস্বই জমা পড়ে। সুতরাং ব্যয়সংক্ষেপের নীতিও অনুসরণ করিতে হইবে। যে কর আদায় করা ব্যয়বহুল

তাহা বাদ দিতে হইবে এবং যত অল্প ব্যয়ে করসংগ্রহ করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঙ) **পরিবর্তনশীলতার নীতি** (Canon of Elasticity) : করধার্য এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে করের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে। ইহা হইলে সরকারী কার্যসম্পাদন ব্যাহত হইবে না, জনসাধারণও অসুবিধা ভোগ করিবে না। উদাহরণস্বরূপ, আয়কর ও ভূমি-রাজস্বের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়কর পরিবর্তনশীল। অধিক রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে আয়করের হার বর্ধিত করিলেই হইল। আবার যদি মনে হয় যে করভার হ্রাস করা প্রয়োজন তবে হার কমাইয়া দিলেই চলিবে। ভূমি-রাজস্ব কিন্তু সাধারণত নির্দিষ্ট। প্রয়োজনমত সরকার ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে না; আবার অজন্মার বৎসরে ইহার হ্রাস করিয়া কৃষককে সুবিধাও দিতে পারে না। তবে একেবারে দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইলে ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মকুফ করিতে পারে।

পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব

(চ) **উৎপাদনশীলতার নীতি** (Canon of Productivity) : কর হইতে সরকারের যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাগম হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে-কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অতি সামান্য তাহা ধার্য না করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক করই যথাসম্ভব উৎপাদনশীল হইবে। যে কর-ব্যবস্থায় সামান্য সামান্য আয় হয় এরূপ কর থাকা অপেক্ষা দেশের কয়েকটি উৎপাদনশীল কর থাকাই বাঞ্ছনীয়। উৎপাদনশীলতার নীতি এরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে দেশের উৎপাদনকার্য ব্যাহত হইয়া যেন মোট রাজস্ব প্রাপ্তিতে হ্রাস না ঘটায়।*

(ছ) **সরলতার নীতি** (Canon of Simplicity) : পরিশেষে, সরলতার নীতিও অনুসরণের চেষ্টা করিতে হইবে। যে-সকল কর ধার্য করা হইবে তাহাদের সম্পর্কে সকল বিষয় জনসাধারণ যেন সহজে বুঝিতে পারে।

করসংগ্রহের উপরি-উক্ত নীতিগুলিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (characteristics of the good tax-system) বলিয়াও অভিহিত হয়। যে কর-ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু সকল নীতি বা সকল বৈশিষ্ট্য কোন কর বা কোন কর-ব্যবস্থাতেই দেখা যায় না। সুতরাং যাহাতে অধিকাংশগুলি পরিদৃষ্ট হয় তাহাই যথাক্রমে উত্তম কর বা উত্তম কর-ব্যবস্থা।

উক্ত সাতটি নীতিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত করা হয়

বিভিন্ন প্রকারের কর (Types of Taxes) : কর প্রধানত দুই শ্রেণীর—(ক) প্রত্যক্ষ (direct), এবং (খ) পরোক্ষ (indirect)। যে করের

* উদাহরণস্বরূপ আয়করের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়করের হার অতিরিক্ত হইলে লোকের উপার্জনের ইচ্ছা হ্রাস পায় বলিয়া শেষপর্যন্ত আয়কর হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ কমিয়াই যায়।

…র সরানো যায় না তাহাকেই প্রত্যক্ষ কর বলে—যথা, আয়কর, ব্যয়কর, সম্পদকর, দানকর ইত্যাদি। যাহাদের উপর এগুলিকে ধার্য করা হয় তাহাদিগকেই উহার ভার বহন করিতে হয়। অপর-দিকে, পরোক্ষ করের ভার অপরের নিকট স্থানান্তরিত করা যায়। যেমন, বিক্রয়কর বা উৎপাদন-শুল্ক (excise duties), সরকার বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীর নিকট হইতে আদায় করে ; কিন্তু উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা উহা ক্রেতার উপর চাপাইয়া দেয়।

ক… দুই শ্রেণীর : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা : প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ধনীদের নিকট হইতে বেশী এবং স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে কম আদায় করা যায়। প্রয়োজন হইলে দরিদ্রকে করপ্রদান হইতে রেহাইও দেওয়া চলে। সুতরাং ইহা সমতার নীতির অনুকূল। যে পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহাকে গতিশীলতার নীতি (principle of progression) বলা হয়। এ-সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা :
১। ইহা ন্যায্য কর

প্রত্যক্ষ করের নির্দিষ্টতা আছে। কত আয়কর প্রদান করিতে হইবে তাহা করপ্রদানকারী সুনিশ্চিতভাবে জানে বলিয়া তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারে।

২। ইহা নির্দিষ্ট

প্রয়োজনমত প্রত্যক্ষ কর হইতে আয় বৃদ্ধি করা যায়, আবার দরকারমত উহার ভারও হ্রাস করা যায়।

৩। ইহা পরিবর্তনশীল

প্রত্যক্ষ কর হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্বও সংগৃহীত হয়। অতএব উহা উৎপাদনশীল। প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ করিতে ব্যয়ও কম।

৪। ইহা উৎপাদনশীল

পরিশেষে, সচেতন নাগরিকতার দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ কর সমর্থন করা হয়। লোকে জানিয়া-শুনিয়া করপ্রদান করে বলিয়া সরকার করলব্ধ অর্থ কিভাবে ব্যয় করিতেছে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে। ইহার ফলে জনকল্যাণ প্রসারলাভ করে।

৫। ইহা নাগরিকতার প্রসার করে

প্রত্যক্ষ করের কয়েকটি বিশেষ ত্রুটিও আছে। প্রথমত, এই প্রকার কর সরাসরি দিতে হয় বলিয়া ইহা মোটেই জনপ্রিয় নয়। এই কারণে প্রত্যক্ষ করের হার অধিক হইলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, সমালোচনা প্রভৃতির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

অসুবিধা :
১। ইহা অপ্রিয়

প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়াও সহজ। আয়ের মিথ্যা হিসাব দাখিল করিলে আয়কর হইতে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর দেশে শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির প্রসার ঘটায়। দেশে পৌরচেতনা জাগ্রত না হইলে এবং শিক্ষার প্রসার না হইলে প্রত্যক্ষ কর পরিচালনা করা অনেকটা কঠিন হইয়া পড়ে। লোকে যদি বুঝিতে না পারে যে সরকার সাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্যই করসংগ্রহ করিতেছে তবে তাহারা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া হিসাব দাখিল করে না ; আবার অশিক্ষার জন্য কখন

২। ইহা ফাঁকি দেওয়া সহজ

কিভাবে হিসাব দাখিল করিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারে না। ফলে সরং ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।*

প্রত্যক্ষ কর সকলের নিকট হইতে আদায় করা যায় না বলিয়া ইহাতে সকলের নাগরিক-চেতনার উন্মেষ ঘটে না। লোকে যখন নিজে করপ্রদান করে মাত্র তখনই সরকার কিভাবে অর্থ ব্যয় করিতেছে সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর মাত্র আংশিক নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি করে।

৩। ইহা আংশিক নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি করে

পরোক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা: দ্রব্যাদির মূল্যের মধ্যেই অনেক সময় পরোক্ষ কর ধরা থাকে বলিয়া লোকে করপ্রদান করিতেছে বলিয়া সব সময় বুঝিতে পারে না। যেমন, দর্শক যখন সিনেমার বা খেলার মাঠের টিকিট কাটে তখন টিকিটের সম্পূর্ণ দামকেই দর্শনী বলিয়া ধরিয়া লয়। অনুরূপভাবে, লোকে ৬ বা ৭ নয়া পয়সার একটি দিয়াশলাই কিনিবার সময় ইহার মধ্যে যে উৎপাদন-শুল্ক ধরা আছে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। ফলে পরোক্ষ করের বিরুদ্ধে অসন্তোষ কম হয়।

সুবিধা:
১। ইহা জনপ্রিয়

প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ করও বেশ রাজস্ব সংগ্রহে সহায়তা করে। চিনি, দিয়াশলাই, সুপারি, কেরোসিন তৈল, তামাক প্রভৃতির উপর ধার্য পরোক্ষ করই বর্তমানে ভারত সরকারের রাজস্বের সর্বপ্রধান উৎস। রাজ্যসমূহের বেলাতেও দেখা যায় যে বিক্রয়কর হইতে বহু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়।

২। ইহাও উৎপাদনশীল

পরোক্ষ কর সকলকেই স্পর্শ করে। সুতরাং রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য ধনী-দরিদ্র সকলেই অর্থপ্রদান করিবে এই নীতি পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। উচ্চ হারে পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া অনিষ্টকারক দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যে মদ্য গঞ্জিকা অহিফেন প্রভৃতির উপর উৎপাদন-শুল্ক ধার্য করা হয়।

৩। ইহা সকলকেই স্পর্শ করে

কিন্তু পরোক্ষ কর ন্যায্য কর নহে। ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। এক টাকার জিনিস কিনিলে ৫ নয়া পয়সা বিক্রয়-কর দিতে হইবে। একজন ধনীর পক্ষে ৫ নয়া পয়সা কিছুই নয়, কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তি উহাতে কষ্টবোধ করিতে পারে।

অসুবিধা:
১। ইহা ন্যায্য কর নহে

দ্বিতীয়ত, অজ্ঞতা যদি কাম্য বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে পরোক্ষ করকে সমর্থন করা যাইতে পারে না। পরোক্ষ করপ্রদানকারী করপ্রদান সম্বন্ধে সচেতন থাকে না বলিয়া তাহার পৌরচেতনার উন্মেষ হয় না।

২। ইহার দ্বারা পৌরচেতনার উন্মেষ ঘটে না

---

* দোকানদার ও উৎপাদনকারীও অনেক সময় সঠিক হিসাব দাখিল করে না। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা সাধারণ ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষা অল্প। ফলে ইহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

অনেক সময় পরোক্ষ করও সংগ্রহ করিতে সরকারের বিশেষ অসুবিধা ও বহু ব্যয় হয়। আমাদের দেশে লোকে আয়কর বহু পরিমাণে ফাঁকি দেয় সত্য, কিন্তু বিক্রয়কর বড় কম ফাঁকি দেয় না।

৩। সংগ্রহ ব্যাপারেও ত্রুটি দেখা যায়

সমানুপাতিক ও গতিশীল কর (Proportional and Progressive Taxes): করসংগ্রহের অন্যতম নীতি হিসাবে এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন যে প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ীই করপ্রদান করিতে হইবে—অর্থাৎ, কর-নির্ধারণ সমতার নীতির (principle of equality) অনুকূল বা ন্যায্য হইবে। এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে এই সমতার নীতি অনুসরণ করা যায়? এ্যাডাম স্মিথের মতে, সমানুপাতিক হারে কর ধার্য করিলেই ইহা সম্ভব। যাহার ১০০ টাকা আয় সে যদি ১০ টাকা আয়কর প্রদান করে, তাহা হইলে যাহার ১০০০ টাকা আয় তাহার নিকট হইতে ১০০ টাকা কর আদায় করিলেই ন্যায্য ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন, সমানুপাতিক হারে কর-নির্ধারণ করিলেই সমতার নীতি পালিত হয়

কিন্তু সমানুপাতিক হারে কর-নির্ধারণ করিলেই যে সমতার নীতি পালিত হয় আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে, লোকের আয়-বৃদ্ধির ফলে করপ্রদানের ক্ষমতা সমানুপাতিক হার অপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, যাহার আয় ১০০ টাকা সে যদি আয়ের শতকরা ১০ ভাগ করপ্রদান করে, যাহার আয় ১০০০ টাকা তাহাকে শতকরা ১০ ভাগের অধিক হারেই কর দিতে হইবে। এইরূপ করকে গতিশীল কর (progressive tax) বলা হয়। এই গতিশীল করই ধনী-দরিদ্রের মধ্যে 'ত্যাগের সমতা' (equality of sacrifice) প্রতিষ্ঠা করে; 'সমতার নীতি' বলিতে এই ত্যাগের সমতাই বুঝায়।

আধুনিকগণ বলেন, ইহার জন্য করকে গতিশীল করা প্রয়োজন

গতিশীল কর দ্বারাই ত্যাগের সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়

গতিশীল হারে করধায বর্তমানে সকল সভ্য দেশেই কর-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহার দ্বারা ত্যাগের সমতা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করা হয়। আমাদের দেশে প্রবর্তিত আয়কর সম্পদকর দানকর সম্পত্তিকর প্রভৃতি সকল করই গতিশীল। পরোক্ষ করকে গতিশীল করা কঠিন। সিনেমা বা খেলার মাঠে উচ্চ শ্রেণীর টিকিটের উপর অধিক হারে প্রমোদকর ধার্য করা যায়; কিন্তু সুপারি, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর একই হারে কর বসানো ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ভারতের গতিশীল কর-ব্যবস্থা

করভার ও উহার বণ্টন (Tax Burden and its Distribution): করের মাধ্যমে সরকার যে-পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তাহাই হইল ঐ দেশের জনসাধারণের উপর করভার (tax burden), কারণ ঐ পরিমাণ করের অর্থভারই জনসাধারণকে বহন করিতে হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এই করভার দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা

যায় যে লোকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ীই করভার বহন করিবে। দরিদ্র অপেক্ষা ধনীর করভার বহনের সামর্থ্য অধিক; সুতরাং ধনীকে দরিদ্র অপেক্ষা বেশী কর প্রদান করিতে হইবে। কতটা বেশী কর প্রদান করিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আবার উপরি-বর্ণিত ত্যাগের সমতার নীতিরই উল্লেখ করিতে হয়। অর্থাৎ, ধনী যতটা পরিমাণ বেশী কর প্রদান করিলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ত্যাগের সমতা আসে, ধনীর পক্ষে ততটাই বেশী কর প্রদান করা উচিত। অতএব করভার যাহাতে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয় তাহার জন্য গতিশীল করই ধার্য করা উচিত।

সরকারী ব্যয় (Public Expenditure): বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, শিল্পোন্নয়ন, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার পরিচালনা প্রভৃতি নানা কার্যে সরকারকে অর্থব্যয় করিতে হয়। নানাভাবে এই সকল ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে—যথা, ক্ষেত্র অনুসারে, সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে, উদ্দেশ্য অনুসারে, ইত্যাদি।

তিন প্রকারের সরকারী ব্যয়

(ক) ক্ষেত্র অনুসারে শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকারসমূহের পৃথক পৃথক ব্যয়। আমাদের দেশে ভারত সরকার দেশ-রক্ষার জন্য ব্যয় করে, রাজ্য সরকার পুলিস জেল ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য ব্যয় করে, ইত্যাদি।

১। ক্ষেত্র অনুসারে

(খ) সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় যে কে বা কাহারা সুবিধা (benefit) ভোগ করিতেছে তাহা দেখা। কতকগুলি ব্যয় সকলের সুবিধার জন্যই করা হয়—যেমন, দেশরক্ষার জন্য ব্যয়, শিক্ষার জন্য ব্যয় ইত্যাদি। আবার কতকগুলি ব্যয় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্যই করা হয়। যেমন, পেনসন্; ইহা মাত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরাই পাইতে পারে, সকলে নহে।

২। সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে

(গ) উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগে দেখা হয় যে ঐ বিশেষ ব্যয় উৎপাদনশীল না অনুৎপাদনশীল। রেলপথ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য ব্যয় যে উৎপাদনশীল ইহা সহজেই অনুমেয়। এগুলিতে ব্যয় করিলে ভবিষ্যতে সরকারের আয় বাড়িবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়কেও উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ, এগুলির জন্য ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। তবে ইহারা পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল মাত্র, প্রত্যক্ষভাবে নহে। ইহাদের জন্য ব্যয় করিলে সরাসরি সরকারের আয়বৃদ্ধি ঘটে না।

৩। উদ্দেশ্য অনুসারে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়

যুদ্ধ, সৈন্যবাহিনী পোষণ প্রভৃতির জন্য ব্যয়কে সাধারণত অনুৎপাদনশীল বলিয়া ধরা হয়। তবে দেশরক্ষার জন্য ব্যয় অপরিহার্য বলিয়া ইহার একাংশকে উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে, উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। বর্তমানে সমাজ-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সরকারের প্রায় সকল ব্যয়কেই উৎপাদনশীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু অতিমাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে-ব্যয় তাহাকে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলিয়া গণ্য না করিয়া উপায় নাই। কারণ, ইহাতে সমাজের ক্ষতিই হয়।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট

এ্যাডাম স্মিথের ন্যায় প্রাচীন লেখকগণ সরকারী ব্যয় লইয়া আলোচনা করেন নাই —কারণ, তাঁহারা ইহা সুনজরে দেখিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে সরকার যত কম ব্যয় করে ততই ভাল। এই ধারণা সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে সরকারের কার্যাবলী হইল ন্যূনতম। সুতরাং সরকারের ব্যয়ও হইবে ন্যূনতম।

পূর্বে সরকারী ব্যয় লইয়া আলোচনা করা হইত না

বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিন শেষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে উক্ত ধারণা আর পোষণ করা হয় না। বর্তমানের ধারণা হইল যে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া চলিতে হইবে। শুধু দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা নয়—শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন, বেকার-সমস্যার সমাধান, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যোন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন, পরিবহণের সুব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্যই সরকারকে প্রয়োজনমত ব্যয় করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমানে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়

সরকারী ঋণ (Public Debt) : প্রয়োজনমত ব্যয় করিবার জন্য অনেক সময়ই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। এই ঋণকে সরকারী ঋণ বা সাধারণের ঋণ (Public Debt) বলা হয়। দেখা যায় যে সরকার সাধারণত তিন প্রকার ব্যয়ের জন্য ঋণ করে : (ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য ব্যয়, (খ) যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য জরুরী ব্যয়, এবং (গ) উৎপাদনশীল বা উন্নয়নমূলক ব্যয়।

সরকারী ঋণের কারণ

(ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য ঋণ : আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেই কর-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করা উচিত নহে। দেখিতে হইবে যে এই ব্যয়াধিক্য অনিশ্চিত (casual) না নিয়মিত ধরনের। অনিশ্চিত ধরনের ব্যয়াধিক্য মিটাইবার জন্য ঋণগ্রহণ করাই যুক্তিসংগত ; কিন্তু ঘাটতি যদি নিয়মিত হইতে থাকে তবে করের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টাই করিতে হইবে।

(খ) যুদ্ধ ব্যাপারে জরুরী ব্যয়ের জন্য ঋণ : অনেক দেশেই সরকারী ঋণের এক মোটা অংশ যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য গৃহীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এইপ্রকার ঋণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড অন্যতম প্রধান উত্তমর্ণ দেশ (creditor country) ছিল ; যুদ্ধের ফলে উহা অধমর্ণ দেশ (debtor country) হইয়া পড়ে। ভারতের সরকারী ঋণের একাংশ যুদ্ধের জন্য গৃহীত।

(গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য ঋণ: ব্রিটিশ আমলে ভারতে রেলপথ নির্মাণ, জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির জন্য বহু ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। বর্তমানেও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার নিয়মিত ঋণ গ্রহণ করিতেছে।

সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Debt): নানাভাবে সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ করা চলে। তন্মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ হইল বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত (external) এবং আভ্যন্তরীণ (internal) ঋণের মধ্যে। সরকার যখন দেশের বাহির হইতে ঋণ সংগ্রহ করে তখন উহাকে বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ বলা হয়; এবং দেশের লোকের নিকট হইতে ঋণ লইলে উহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে।

১। বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ও আভ্যন্তরীণ ঋণ

দ্বিতীয়ত, সরকারী ঋণ স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন হইতে পারে। অতি স্বল্প-কালীন ঋণ—যেমন, ৩ অথবা ৬ মাসের জন্য ঋণ সরকার সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করে, এবং দীর্ঘকালীন হইলে উহা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করে।

২। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ

সরকারী ঋণ আবার উৎপাদনশীল (productive) এবং অনুৎপাদনশীল (unproductive) উভয় প্রকারেরই হয়। উৎপাদনশীল ঋণ রেলপথ, বিমান, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি লাভজনক কার্যে নিয়োগ করা হয়, এবং অনুৎপাদনশীল ঋণ বাস্তুহারাদের সাহায্যদান, দুর্ভিক্ষত্রাণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা হয়। ঋণ উৎপাদনশীল হইলে ঋণ দ্বারা সৃষ্ট সম্পত্তির (assets) আয় হইতে ঐ সুদ ও ধীরে ধীরে আসল মিটানো চলে; কিন্তু ঋণ অনুৎপাদনশীল হইলে অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত রাজস্ব সুদ বাবদ ব্যয় করিতে হয়।

৩। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ

উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Development): সামান্য ঋণসংগ্রহ করিয়া অথবা রাজস্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়নির্বাহ করা চলে। কিন্তু ভারতের ন্যায় বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য অর্থসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত করস্থাপন, অধিক ঋণসংগ্রহ—বিশেষ করিয়া স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহ—রেলপথ ইত্যাদির ন্যায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে মুনাফার প্রচেষ্টা, বিদেশে অর্থসংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়

অতিরিক্ত করস্থাপনের দ্বারা অর্থসংগ্রহ প্রধানত দেশের জনসাধারণের করপ্রদান-ক্ষমতার (taxable capacity) উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণ যদি ইতিমধ্যেই করপ্রদানক্ষমতার সীমায় গিয়া পৌছিয়া থাকে তবে অতিরিক্ত করস্থাপন করিলে ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাহত হইয়া মোট কর রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

১। অতিরিক্ত করধার্য ও ইহার সীমা

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে। মুনাফা-

যদি ইতিমধ্যেই উচ্চমাত্রায় গিয়া পৌঁছিয়া থাকে তবে আয়বৃদ্ধির আশা করা ভুল। উদাহরণস্বরূপ, বাসের বা রেলপথের মাসুল বা পণ্য-পরিবহণের ভাড়া সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধি করিলে লোকে রেলে বা বাসে ভ্রমণ কমাইতে বাধ্য হইবে। ফলে ইহাদের মোট আয় কমিতেই থাকিবে। অবশ্য ভাড়া বা মূল্য বাড়াইয়া আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা গেলেও সুপরিচালনার মাধ্যমে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া মুনাফা কতকটা বাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে করপ্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

২। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধি ও ইহার সীমা

ঋণসংগ্রহ দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) জনসাধারণের মোট সঞ্চয়, এবং (খ) এই সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার জন্য সংগঠন (machinery for collection of savings)। দেশের লোকের সঞ্চয় যদি অত্যল্প হয় তাহা হইলে ঋণের মাধ্যমে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় না। আবার সংগ্রহের জন্য সংগঠন যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলেও চলিবে না। সুতরাং সরকারের কার্য হইবে সকলকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে এই সঞ্চয় সংগ্রহ করা। স্বল্পোন্নত দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলিয়া স্বল্প সঞ্চয়সংগ্রহের প্রতি সরকারকে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। ঋণসংগ্রহ—ইহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণসংগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। সুতরাং বিদেশেও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হয়। বৈদেশিক সরকার, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণসংগ্রহ এবং বৈদেশিকগণকে সংশ্লিষ্ট দেশে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াই এই অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহের আর একটি প্রয়োজন হইল যন্ত্রপাতি, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্তির সুবিধালাভ। দেশে ঋণসংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও সকল সময় ইহার দ্বারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আনয়ন করা যায় না। কিন্তু বিদেশে সংগৃহীত অর্থকে সরাসরি মূলধন-দ্রব্যে (capital goods) রূপান্তরিত করিয়া আমদানি করা চলে।

৪। বৈদেশিক মূলধন—ইহার প্রয়োজনীয়তা

অবশেষে, ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ন্যায় বিরাট উন্নয়নকার্যের জন্য সরকারকে কিছু কিছু ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

৫। ঘাটতি ব্যয়

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing): সাধারণত কর-রাজস্ব, রেলপথের ন্যায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ প্রভৃতি হইতে সরকারের যে চলতি আয় হয় তাহার অধিক ব্যয় করা হইলে সেই ব্যয়কে 'ঘাটতি ব্যয়' বলা হয়। সরকার ঋণ করিয়া বা জমা অর্থ তুলিয়া বা নোট ছাপাইয়া ঐ ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ঘাটতি ব্যয়ের যে-সংজ্ঞা দিয়াছে তাহা একটু অন্য ধরনের। ইহাতে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থকে ঘাটতি ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই।

ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে

অর্থাৎ, কর-রাজস্ব, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকারের ঋণ—এই তিন সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হইলেই তাহা ঘাটতি ব্যয় বলিয়া গণ্য। সুতরাং এই ব্যয় সংকুলানের পদ্ধতি হইল দুইটি: (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা, এবং (২) রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় করিলে ঐ টাকা ক্রিয়াশীল (active) হইয়া উঠে ;* এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে রিজার্ভ ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া প্রদান করে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই একরূপ 'নব-সৃষ্ট' টাকাকড়ি বাজারে বিনিময়ের কার্য করিতে থাকে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে—কারণ, টাকাকড়ি বৃদ্ধি পাইলেও সংগে সংগে জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধি পায় না।

ভারতের ঘাটতি ব্যয়

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহ (Financing of India's Five Year Plans) : আমাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কিভাবে অর্থসংস্থান করা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহার ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ছকটির মাধ্যমে করা হইল। ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে ঘাটতি ব্যয় ছাড়া অন্যান্য সূত্র হইতে অর্থসংস্থানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয় হয় মাত্র ৯৪৮ কোটি টাকা। ছকটিতে ইহাও দেখা যাইবে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় ইহার প্রায় অর্ধেক বা ৫৫০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা হইল চূড়ান্ত হিসাব।

(হিসাব কোটি টাকায়)

অর্থসংস্থানের বিভিন্ন সূত্র	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (পরিবর্তিত)	তৃতীয় পরিকল্পনা
১। কর-রাজস্ব এবং রেলপথ ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত	৭৫২	১১৫২	২৮১০
২। বিভিন্ন সূত্রে সঞ্চয়সংগ্রহ	৫০৯	১৪১০	১৯৪০
৩। বৈদেশিক সাহায্য	১৮৮	১০৯০	২২০০
৪। ঘাটতি ব্যয়	৪২০	৯৪৮	৫৫০
৫। বিবিধ সূত্র	৯১	—	—
মোট	১৯৬০	৪৬০০	৭৫০০

* সরকারের টাকা যতক্ষণ জমা অবস্থায় ছিল ততক্ষণ উহার কোন কার্য (বিনিময় সম্পাদনের কার্য) ছিল না ; সুতরাং টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিমাণও কম ছিল। এখন জমা হইতে তুলিয়া খরচের ফলে ঐ টাকা বিনিময়কার্যে নিযুক্ত হওয়ায় উহা 'ক্রিয়াশীল' হইল ; এবং ফলে টাকাকড়ির যোগানও বাড়িল।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারী আয়-ব্যয়কে সাধারণের আয়-ব্যয়ও বলা হয়। ইহার প্রধান শাখা চারিটি—(ক) সরকারী আয়, (খ) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী ঋণ এবং (ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান।

সরকারী আয়-ব্যয়ের পদ্ধতি প্রধানত তিনটি—(ক) পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়ের পদ্ধতি, (খ) পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়ের পদ্ধতি, এবং (গ) বাণিজ্যিক পদ্ধতি।

সরকারের আয় বা রাজস্ব : সরকারী রাজস্ব দুই প্রকারের—(ক) কর-রাজস্ব, এবং (খ) কর নিরপেক্ষ রাজস্ব। কর হইতে সংগৃহীত রাজস্বকে কর-রাজস্ব এবং সেবামূলক কার্যাদি হইতে সংগৃহীত রাজস্বকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলে।

কর-সংগ্রহের নীতি : সরকার করসংগ্রহ কার্য কয়েকটি নীতি অনুসারে সম্পাদন করে। ইহাদের মধ্যে ১। সমতার নীতি, ২। নিশ্চয়তার নীতি, ৩। সুবিধার নীতি, ৪। ব্যয়সংক্ষেপের নীতি, ৫। পরিবর্তনশীলতার নীতি, ৬। উৎপাদনশীলতার নীতি, এবং ৭। সরলতার নীতি—এই সাতটিই প্রধান। এই নীতিগুলিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলিয়াও অভিহিত করা যায়। যে কর-ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশ পরিদৃষ্ট হয় তাহাকেই উত্তম কর-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের কর : কর প্রধানত দুই শ্রেণীর—(ক) প্রত্যক্ষ কর, এবং (খ) পরোক্ষ কর। যে করের ভার অন্যের উপর সরানো যায় না তাহাকে প্রত্যক্ষ কর এবং যে করের ভার অন্যের উপর সরানো যায় তাহাকে পরোক্ষ কর বলে। আয়কর, ব্যয়কর, দানকর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের এবং বিক্রয়কর, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

প্রত্যক্ষ করের নিম্নলিখিত কয়েকটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় : ১। ইহা নির্দিষ্ট, ২। ইহা পরিবর্তনশীল, ৩। ইহা উৎপাদনশীল, ৪। ইহা নাগরিকতার প্রসার করে। ইহার অসুবিধাগুলি হইল যে, ১। ইহা অপ্রিয়, ২। ইহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, ৩। ইহা আংশিক নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি করে।

পরোক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা ঠিক ইহার বিপরীত। সুবিধা হইল যে ১। ইহা জনপ্রিয়, ২। ইহাও উৎপাদনশীল, ৩। ইহা সকলকেই স্পর্শ করে। কিন্তু ১। ইহা ন্যায্য কর নহে, ২। ইহার দ্বারা পৌরচেতনার উন্মেষ ঘটে না, ৩। করসংগ্রহের ব্যাপারেও ত্রুটি দেখা যায়।

সমানুপাতিক ও গতিশীল কর : প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে, সমানুপাতিক হারে কর ধার্য করিলেই সমতার নীতি পালিত হয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ কিন্তু বলেন যে ইহার জন্য গতিশীল হারে কর ধার্য করা প্রয়োজন। গতিশীল কর বলিতে বুঝায় ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করা। গতিশীল করধার্য বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ভারতও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

সরকারী ব্যয় : সরকারী ব্যয়ের তিনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়—(ক) ক্ষেত্র অনুসারে, (খ) সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে, এবং (গ) উদ্দেশ্য অনুসারে। ক্ষেত্র অনুসারে ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার প্রভৃতির ব্যয়। সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ব্যয় সাধারণের সুবিধা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন্য করা হয়। উদ্দেশ্য অনুসারে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অবশ্য উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট।

আধুনিক কর্মমুখর রাষ্ট্রে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

সরকারী ঋণ : সরকার মোটামুটি তিনটি কারণে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে : (ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য, (খ) যুদ্ধ ইত্যাদি জরুরী ব্যয়ের জন্য, এবং (গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য। এই ঋণের আবার তিনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে—(ক) বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ও আভ্যন্তরীণ ঋণ, (খ) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ, এবং (গ) উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ।

উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংস্থান: উন্নয়নকার্যের জন্য সরকার নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করে—যথা, ১। অতিরিক্ত করধার্য, ২। সেবা ও দ্রব্য সরবরাহকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, ৩। ঋণসংগ্রহ, ৪। বৈদেশিক মূলধনসংগ্রহ, এবং ৫। ঘাটতি ব্যয়।

এই কয়টি সূত্র হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The revenue of the Government may be divided into two parts, namely, Tax revenue and Non-Tax revenue." Illustrate this proposition.

"সরকারের রাজস্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। [১৯৭ পৃষ্ঠা]

2. Define a Tax. Explain the characteristics of a good Tax. (C. U. 1951)

করের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উত্তম করের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা কর। [১৯৭-১৯৮ এবং ১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠা]

3. Define a Tax. Discuss the merits and defects of Direct and Indirect Taxes. (H. S. (H) 1960)

করের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[১৯৭-১৯৮ এবং ২০০-২০২ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between a Direct and an Indirect Tax. Give examples of both from the Indian Tax-system. (H. S. (H) Comp. 1960)

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ভারতীয় কর-ব্যবস্থা হইতে উভয়ের উদাহরণ দাও। [১৯৯-২০২ পৃষ্ঠা]

5. What is a Direct Tax? Give a brief account of some of the important taxes levied in this country? (H. S. (H) 1962)

প্রত্যক্ষ কর কাহাকে বলে? এ-দেশে প্রবর্তিত আছে এরূপ কয়েকটি প্রধান করের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [১৯৯-২০০পৃষ্ঠা এবং ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৬০-৬১ ও ৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা]

6. Distinguish between a Progressive and a Proportional Tax. Why is the principle of progression preferred to that of proportion in the Tax-system of a modern community?

গতিশীল কর ও সমানুপাতিক করের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। বর্তমান সময়ের কর-ব্যবস্থায় সমানুপাতের নীতি অপেক্ষা গতিশীলতার নীতিকে সমর্থন করা হয় কেন? [১৯৮ এবং ২০২ পৃষ্ঠা]

7. What is Progressive Taxation, and what are its merits? Give two examples of progressive taxes. (C. U. 1959)

গতিশীল হারে কর ধার্য বলিতে কি বুঝায়? ইহার গুণ কি কি? দুইটি গতিশীল করের উদাহরণ দাও।

[ইংগিত: ভারতে আয়কর, সম্পদকর, সম্পত্তিকর প্রভৃতি এই করের উদাহরণ এবং.................. ২০২ পৃষ্ঠা]

8. What is a Tax? How should the burden of taxes be distributed among the people? (H. S. (H) 1961)

কর কাহাকে বলে? বিভিন্ন করের ভার জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইবে?

[১৯৭-১৯৮ এবং ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা]

9. What are the different purposes of public expenditure? Explain your answer with special reference to Indian conditions. (H. S. (H) 1962)

কি কি উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়নির্বাহ করা হয়? ভারতের উদাহরণ লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও।

[ইংগিত: বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় নির্বাহ করা হয়—যথা, প্রতিরক্ষা, দেশে শান্তিশৃংখলা রক্ষা,

স্বাস্থ্যোন্নয়ন, শিক্ষাবিস্তার, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন, পরিবহণের সুব্যবস্থা, বেকার-সমস্যার সমাধান, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া সরকার যে ঋণ করে তাহার সুদের দরুন এবং করসংগ্রহ করিবার জন্যও সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। সাধারণত প্রতিরক্ষা, দেশে শান্তিশৃংখলা রক্ষা প্রভৃতি খাতে সরকারী ব্যয়কে অনুৎপাদনশীল ব্যয় এবং স্বাস্থ্যোন্নয়ন, শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতির জন্য ব্যয়কে উৎপাদনশীল ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এভাবে সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা ভুল। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় না হইলে এবং দেশে শান্তিশৃংখলা না থাকিলে কোন উৎপাদনশীল ব্যয়ই ফলপ্রসূ হয় না। পূর্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে সরকারী ব্যয়কে সুনজরে দেখা হইত না, কিন্তু বর্তমান দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজনমত সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দাবি করা হয়। বস্তুত, সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই কর ও ঋণের মাধ্যমে সরকারকে আয়বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। উপরন্তু, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে সরকারকে 'ঘাটতি ব্যয়ের' পদ্ধতিরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। ভারতের উদাহরণ লইয়া আজিকার দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি অনুধাবন করা যাইতে পারে। ভারত শুধু যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র তাহাই নহে, ভারত পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছে। তাই ভারতকে প্রতিরক্ষা, শান্তিশৃংখলা রক্ষা এবং সাধারণ উৎপাদনশীল ব্যয় ছাড়াও পরিকল্পনার কার্যে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইতেছে।......(২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা এবং ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৬২-৬৩ ও ৬৬ পৃষ্ঠা)।

10. What is Public Debt? Why is Public Loan incurred? Distinguish between different types of Public Debt.

সরকারী ঋণ কাহাকে বলে? সরকারী ঋণ গ্রহণ করা হয় কেন? বিভিন্ন ধরনের সরকারী ঋণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [২০৪ ২০৫ পৃষ্ঠা]

11. Show how a Government finances Development Programmes. Illustrate your answer with reference to India.

কিভাবে সরকার উন্নয়ন কার্যের জন্য অর্থসংস্থান করে তাহা দেখাও। ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টিকে বুঝাইয়া দাও। [২০৫-২০৭ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা

(Money and Banking)

অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রার টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে। টাকাকড়ির মাধ্যমেই বর্তমানে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়; লোকে টাকাকড়ি উপার্জন এবং ব্যয় করিতেই সারাদিন ব্যস্ত থাকে।* আমরা দেখিয়াছি যে চিরকালই এইরূপ ছিল না। প্রথমে মানুষকে স্বয়ং ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে হইত; এবং পরে অভাব বৃদ্ধি পাইলে এবং শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter) করিত। দ্রব্য-বিনিময়ে নানারূপ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় টাকাকড়ির উদ্ভব হয়।

* ২-৩ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপারে বিনিময়কারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অভাবের সংগতির (coincidence of wants) প্রয়োজন ছিল। যে-ব্যক্তির ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহাকে এরূপ এক বস্ত্র উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত যাহার ধান্যের অভাব আছে। ইহা না হইলে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্পাদিত হইত না।

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধার জন্য টাকাকড়ির উদ্ভব হয়

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জিনিসপত্র ইচ্ছামত বিভক্ত করা যাইত না বলিয়া অসুবিধা দেখা দিত। একটি গরুর মূল্য ২০ কুইণ্টাল গম হইলে যাহার মাত্র ২ কুইণ্টাল গমের প্রয়োজন ছিল তাহাকে ২০ কুইণ্টাল গমই লইতে হইত। কারণ, গরুটিকে ত' আর ১০ ভাগে ভাগ করিয়া মাত্র ১ ভাগ গম-বিক্রেতাকে দেওয়া যাইত না। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য-নির্ধারণ করাও কঠিন ছিল। ১ কুইণ্টাল গমের বিনিময়ে ১·৫ কুইণ্টাল ধান্য, ২ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে ৫ খানি বস্ত্র, ১৫ খানি বস্ত্রের বিনিময়ে ১ কুইণ্টাল ধান্য পাওয়া গেলে ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কতটা গম পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

টাকাকড়ির প্রচলন হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। যে লোক ধান্যের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে আর ধান্যের অভাব আছে এইরূপ বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, গরু-বিক্রেতাকে বাধ্য হইয়া ২০ কুইণ্টাল গম লইতে হয় না এবং ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কি পরিমাণ গম পাওয়া যাইবে তাহার হিসাবের জন্য বিরাট অংক কষিতে হয় না।

টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। সকলেই টাকাকড়ির মাধ্যমে দ্রব্যাদি বিনিময় করে। একখানি ১০ টাকার নোটের বিনিময়ে ঐ পরিমাণ মূল্যের সকল জিনিসই পাওয়া যাইবে। এই নোটকে কাগজী মুদ্রা (paper money) বলা হয়। কাগজী মুদ্রা ছাড়াও ধাতব মুদ্রা আছে—যথা, পুরাতন টাকা আধুলি সিকি এবং ১, ২, ৫, ১০, ২৫, ৫০ নয়া পয়সা প্রভৃতি।* এই কাগজী ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বহু পরে। প্রথম প্রথম কোন বিশেষ দ্রব্যকেই টাকাকড়ি বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গরু, ছাগল, চামড়া, শস্য, কড়ি এমনকি ক্রীতদাসও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সকল গরু ছাগল বা ক্রীতদাস একই রকমের নহে বলিয়া মূল্য-নির্ধারণের অসুবিধা দূরীভূত হয় নাই। ফলে মানুষকে ধাতব মুদ্রার দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে। ধাতুর মধ্যেও মানুষ তাম্র ব্রোঞ্জ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একসংগে বহু সোনা ও রূপার টাকা বহন করিয়া লইয়া যা[illegible]য়া অসুবিধাজনক। প্রথমত, এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কাগজী মুদ্রার প্রচলন হ[illegible]। বর্তমানে কাগজী মুদ্রাই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য-

টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার বিনিময়ের মাধ্যম

বর্তমানের মুদ্রা-ব্যবস্থা

* কিছুদিন পরে পুরাতন আধুলি সিকি [illegible]ভৃতির প্রচলন থাকিবে না।

লাভ করিয়াছে এবং টাকাকড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক হিসাবে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছে।

টাকাকড়ির কার্যাবলী (Functions of Money) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যাইবে। টাকাকড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে না ; ইহা মূল্যেরও পরিমাপ করে। বর্তমানে মূল্য (value) টাকাকড়ির অংকেই প্রকাশ করা হয়। এইভাবে প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে।* আবার টাকাকড়ির অংকেই সঞ্চয় করা হয় এবং দেনাপাওনা মিটানো হয়। সুতরাং দেখা যায় যে টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি : (ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্য পরিমাপের কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, এবং (ঘ) দেনাপাওনা মিটানোর মান হিসাবে কার্য।

চারিটি প্রধান কার্য

(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য (Function as a Medium of Exchange) : ইহাই টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য এবং টাকাকড়ির প্রচলন হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্যই। বর্তমানে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমেই করে।

(খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য (Function as a Measure of Value) : বর্তমানে আমরা দ্রব্যাদির বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করি না, টাকাকড়ির অংকে উহাদের 'দাম' নির্ধারণ করি। যখন বলি যে ১ কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা, তখন ঐ পরিমাণ সরিষার তৈলের মূল্য পরিমাপের জন্য 'টাকাকড়ি' ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে টাকা (Rupee) মূল্য পরিমাপের একক। অন্যান্য দেশেরও এইরূপ নিজ নিজ একক আছে—যেমন, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, সোবিয়েত ইউনিয়নের রুবল, পাকিস্তানের পাকিস্তানী টাকা ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক বিনিময়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের টাকাকড়ির 'একক'র মধ্যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ভারতের একটি টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৬ পেনি পাওয়া যায়।

মূল্য পরিমাপের একক

(গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য (Function as a Store of Value) : লোকের আয় একসংগে ব্যয়িত হয় না। যে ব্যক্তি মাস-মাহিনা পায় সে সারামাস ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যয় করে ; যে কৃষক মাত্র একপ্রকার শস্য উৎপাদন করে তাহাকে উহার বিনিময়ে সারাবৎসর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে চালাইতে হয়। পূর্বে এইরূপ বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যৎ জিনিসপত্র মজুত রাখা হইত ; বর্তমানে টাকাকড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষা ইত্যাদির জন্য সঞ্চয়ও করে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির আকারে করা হয়। জিনিসপত্র মজুত রাখা বা স্বর্ণরৌপ্য ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখা অপেক্ষা

বর্তমানে জিনিসপত্রের পরিবর্তে টাকাকড়ি সঞ্চয় করা হয়

* ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

টাকাকড়ির আকারে সঞ্চয় করা অনেক সুবিধাজনক ও নিরাপদ। টাকাকড়ি নষ্ট হয় না, মাটির তলায় লুকাইয়া রাখারও প্রয়োজন হয় না। ব্যাংকে, পোষ্ট অফিসে বা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া উহা জমা রাখা যাইতে পারে। ব্যাংক ও সরকার জমা টাকাকড়িকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োগ করে।* এইভাবে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য সম্পাদনের দ্বারা টাকাকড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

এইরূপ সঞ্চয়ের উপযোগিতা

(ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য (Function as a Standard of Deferred Payments) : বর্তমান সমাজে দেনাপাওনা মিটানোর কার্য সর্বদাই চলিয়া থাকে। পূর্বে জিনিসপত্র ঋণ করা হইত এবং ঐ জিনিসপত্রেই ঋণ পরিশোধ করা হইত। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে জিনিসপত্র সকল সময় একই প্রকারের হয় না। একটি ছাগল ধার লইয়া পরে ছাগল ফেরত দিতে গেলে মহাজন ভালভাবে দেখিয়া লইবে যে ছাগলটি কিরূপ। মনঃপূত না হইলে সে অন্য একটি ছাগল লইয়া আসিতে বলিবে; কিন্তু খাতকের হয়ত' আর ছাগল নাই। টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটাইলে এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার লইয়াছে সে ১০০ টাকাই শোধ দিবে; কিছু সুদ দেওয়ার কথা থাকিলে কিছু সুদও দিবে।

টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুবিধা

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে-ব্যক্তি ১০ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইয়া গেলে তাহার সঞ্চয়ের মূল্য ৫ হাজার টাকা হইয়া যাইবে; অথবা যে-ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার দিয়াছে সে ফেরত পাইবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক ফেরত পাইবে। সুতরাং, টাকাকড়ির মূল্য বিশেষ পরিবর্তনশীল হইলে চলিবে না। কিন্তু দেখা যায় যে আধুনিক সমাজে টাকাকড়ির মূল্য প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এ পরিবর্তন যতটা কম হয় তাহা দেখাই সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য।

টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব প্রয়োজন

টাকাকড়ির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আছে। টাকাকড়িই বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিয়াছে। সংগঠক টাকাকড়ি দিয়াই কাঁচামাল ক্রয় করে, শ্রমিককে মজুরি প্রদান করে, জমির মালিকের খাজনা মিটায় এবং মূলধন সরবরাহকারীকে সুদ দেয়। টাকাকড়ি না থাকিলে ইহাদের সকলের জন্যই তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে হইত; ফলে সে উৎপাদনকার্যে মনোনিবেশ করিবার অবকাশই পাইত না।

টাকাকড়ির আর একটি কার্য—উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা

টাকাকড়ি কি? (What is Money ?) : এখন প্রশ্ন করা যায়, টাকাকড়ি কি? ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে যাহাই টাকাকড়ির কার্য সম্পাদন

---

* ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

করে তাহাই টাকাকড়ি (money is what money does)। সুতরাং, যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিবে, তাহাকেই টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত করা যায়। কাগজী মুদ্রায় যদি এই সকল কার্য চলে তবে কাগজী মুদ্রাই টাকাকড়ি।

যাহাই টাকাকড়ির কার্য করে তাহাই টাকাকড়ি

এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে প্রচলিত আছে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ, বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকলে ঐ বস্তুকে লইতে স্বীকার করিবে। বর্তমানে যে-প্রকার টাকাকড়ি সকলকেই লইতে হইবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আইন-নির্দিষ্ট টাকাকড়িকে বিহিত মুদ্রা (legal tender money) বলে। বর্তমানে আমাদের দেশে নয়া পয়সার মুদ্রা এবং পুরাতন সিকি আধুলি প্রভৃতি উভয়ই বিহিত মুদ্রা। কিন্তু কিছুদিন পরে পুরাতন সিকি আধুলি বিনিময় ও লেনদেনের কার্যে চলিবে না—কারণ, উহারা আর বিহিত মুদ্রা থাকিবে না।

টাকাকড়ি হইতে হইলে বস্তুকে সর্বজন-গ্রাহ্য হইতে হইবে

অতএব টাকাকড়ির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়: বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি। সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংকেই করা হয়।

সংজ্ঞা: সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যমই টাকাকড়ি

বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি (Kinds of Money): টাকাকড়ির মাধ্যমে হিসাবনিকাশ এবং বিনিময়কার্য সম্পাদন করা হয়। সুতরাং প্রথমত, টাকাকড়ি দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (money of account), এবং (২) আসল টাকাকড়ি (actual money)। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি আসলে বর্তমান নাও থাকিতে পারে। ভারতে সেদিন পর্যন্ত পাই পয়সার অংকে হিসাব করা হইত; কিন্তু পাই পয়সার প্রচলন বহুদিন পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আসল টাকাকড়ি হইল তাহাই যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে। বর্তমানে ভারতে হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি হইল টাকা ও নয়া পয়সা। কারণ, ইহাদের অংকেই হিসাবনিকাশ করা হয়। অপরদিকে আসল টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের কার্যে ব্যবহৃত সকল প্রকারের মুদ্রা—যথা, কাগজী নোট, বিভিন্ন মূল্যের নয়া পয়সা, পুরাতন আধুলি সিকি প্রভৃতি।

১। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি এবং আসল টাকাকড়ি

ভারতে এই দুই প্রকারের টাকাকড়ি

আসল টাকাকড়িকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—কাগজী টাকাকড়ি (paper money), এবং ধাতব টাকাকড়ি (metallic money)। কাগজী টাকাকড়ি সরকার বা ব্যাংক প্রচলন করিয়া থাকে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইলে উহাকে কারেন্সী নোট এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হইলে উহাকে ব্যাংক-নোট বলা হয়। সরকার যে

কাগজী ও ধাতব টাকাকড়ি

কারেন্সী নোট প্রচলন করে তাহা দুই প্রকারের হয়—(১) পরিবর্তনীয় (convertible), এবং (২) অপরিবর্তনীয় (inconvertible)। দাবি করা হইলে পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকে, কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ব্যাংক-নোট সকল সময়েই পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা। আমাদের দেশে সরকার যে ১ টাকার নোট প্রচলন করে উহা অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা; এবং অন্য সমস্ত নোট যাহা রিজার্ভ ব্যাংক প্রচলন করে তাহা পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা।

৩ : কাগজী নোট দুই প্রকারের—পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়

ধাতব মুদ্রা প্রধানত দুই প্রকারের—(১) প্রামাণিক মুদ্রা (Standard Coin), এবং (২) নিদর্শক মুদ্রা (Token Coin)। প্রামাণিক মুদ্রাই দেশের প্রধান মুদ্রা। সাধারণত ইহা স্বর্ণে বা রৌপ্যে নির্মিত হয় এবং ইহার ধাতুমূল্য লিখিত মূল্যের (face value) সমান হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা (Sovereign) ছিল এই ধরনের প্রামাণিক মুদ্রা। ইহাকে গলাইয়া ফেলিলে ২০ শিলিং মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া যাইত।

৪। ধাতব মুদ্রা দুই প্রকারের—প্রামাণিক ও নিদর্শক

নিদর্শক মুদ্রা বলিতে নিকৃষ্টতর ধাতুনির্মিত মুদ্রাসমূহকেই বুঝায়। উহারা মূল্যের নিদর্শক (token of value) মাত্র। অর্থাৎ, উহাদের লিখিত মূল্য ও ধাতব মূল্য সমান হয় না। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নিকেলের টাকা, পুরাতন আধুলি সিকি, নয়া পয়সার মুদ্রা সকলই নিদর্শক মুদ্রা। উহাদের গলাইয়া বিক্রয় করিলে ঐ পরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় না।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল সসীম বিহিত মুদ্রা (limited legal tender) এবং অসীম বিহিত মুদ্রার (unlimited legal tender) মধ্যে। কতক প্রকারের মুদ্রা বিনিময় বা দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। অপরদিকে অসীম বিহিত মুদ্রা হইল তাহাই যাহা বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-কোন পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতে সিকি নয়া পয়সার মুদ্রা প্রভৃতি সসীম বিহিত মুদ্রা। ইহাদিগকে ১ টাকার বেশী দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ১ টাকার মুদ্রা বা নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। লোকে ইহাদিগকে যে-কোন পরিমাণে লইতে বাধ্য।

৫। সসীম ও অসীম বিহিত মুদ্রা

উপরি-উক্ত সকল প্রকারের টাকাকড়িই সরকার বা টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত। সামগ্রিকভাবে ইহাদিগকে কারেন্সী (Currency) বলা হয়। ইহা ছাড়া ব্যাংকের টাকাকড়ি (Bank Money) বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িও আছে। ব্যাংক-ব্যবস্থা টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃজন করিয়া। কিভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা ইহা করে তাহার আলোচনা পরে করা হইবে।

সরকার-সৃষ্ট ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি

মুদ্রামান (Monetary Standards) : কাগজী ও ধাতব উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলনই বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে করা হয়। মুদ্রা প্রচলনের এই পদ্ধতিকেই মুদ্রামান বলে। মুদ্রামান প্রধানত দুই প্রকারের হয়—(১) ধাতব মুদ্রামান (Metallic Standard) এবং কাগজী মুদ্রামান (Paper Standard)।

ধাতব মুদ্রামান ও কাগজী মুদ্রামান

ধাতব মুদ্রামানের অধীনে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা অথবা উভয় ধাতু নির্মিত মুদ্রাই প্রামাণিক ও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা এইভাবে প্রচলিত থাকিলে উহাকে একধাতু স্বর্ণমান (Monometallic Gold Standard), মাত্র রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত থাকিলে উহাকে একধাতু রৌপ্যমান (Monometallic Silver Standard) এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই প্রচলিত থাকিলে উহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallic) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্বিধাতুমানের অধীনে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং উভয়ই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। যাহাতে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে মূল্যের পার্থক্য দেখা না দেয় তাহার জন্য অবাধ মুদ্রাংকনের ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ, যে-কেহ স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া গিয়া টাঁকশাল হইতে উহার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পাইতে পারে।* ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এইরূপ দ্বিধাতুমান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। পরে ১৮৩৫ সাল হইতে একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

একধাতু স্বর্ণমান, একধাতু রৌপ্যমান ও দ্বিধাতুমান

কাগজী মুদ্রামানের অধীনে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকেই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেই কাগজী মুদ্রামানের উদ্ভব হয় না—কারণ ঐ কাগজী মুদ্রা সম্পূর্ণ পরিবর্তনীয় মুদ্রা বা প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রা (representative money) হইতে পারে। প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রা বলিতে সেই মুদ্রাকেই বুঝায় যাহা প্রামাণিক মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করে। জনসাধারণ দাবি করিবামাত্র কাগজের নোটের পরিবর্তে ঐ প্রামাণিক ধাতুমুদ্রা বা ঐ ধাতু প্রদান করিতে হইবে। এই কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রার বিরুদ্ধে শতকরা ১০০ ভাগই ধাতু জমা রাখা হয়। বিগত তৃতীয় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ-দাবিপত্র (Gold Certificate) ছিল এইরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্রা।

কাগজী মুদ্রামানের প্রকৃতি

---

* ধরা যাউক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময়-মূল্য ১ : ১৬ ঠিক করিয়া দেওয়া গেল। অর্থাৎ, একটি ১ তোলা ওজনের স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে অনুরূপ ওজনের ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাজারে যদি ১ তোলা স্বর্ণের বদলে ১৭ তোলা রৌপ্য পাওয়া যায় তবে লোকে স্বর্ণমুদ্রা গলাইয়া রৌপ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। এইজন্য টাঁকশাল হইতে নির্দিষ্ট হারে মুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে; টাঁকশাল হইতে যদি একটি ১ তোলা স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ১৬ তোলা রৌপ্য পাওয়া যায় তবে বাজারে কেহই ১ তোলা স্বর্ণের পরিবর্তে ১৭ তোলা রৌপ্য দিবে না। [উদাহরণটিকে সহজ করিবার জন্য তোলাকে গ্রামে পরিণত করা হইল না।]

বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান (Varieties of Gold Standard): উপরে যে স্বর্ণমানের বর্ণনা দেওয়া হইল তাহাকে স্বর্ণমুদ্রামান (Gold Currency or Gold Circulation Standard) বলে। ইহাতে স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা একেবারে প্রচলিত না করিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত স্বর্ণ-দাবিপত্র বা কাগজী নোটের দ্বারাও স্বর্ণমান বজায় রাখা যায়। সুতরাং স্বর্ণমান বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

চারি প্রকারের স্বর্ণ-মুদ্রামান

ক। স্বর্ণমুদ্রামান: স্বর্ণমুদ্রামানই স্বর্ণমানের শ্রেষ্ঠ রূপ। ইহার পর স্বর্ণ-পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard), স্বর্ণবিনিময়মান (Gold Exchange Standard), এবং স্বর্ণসমতামান (Gold Parity Standard) প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

স্বর্ণপিণ্ডমানের বৈশিষ্ট্য

খ। স্বর্ণপিণ্ডমান: ইহার অধীনে কাগজী নোট বা কোন নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। ইহাকে ইচ্ছামত স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা যায় না। কিন্তু টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জনসাধারণকে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে টাকাকড়ির এককের মূল্য স্বর্ণমূল্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। ভারতে ১৯২৭-৩১ সাল এই কয় বৎসর স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তিত ছিল।

স্বর্ণবিনিময়মানের প্রকৃতি

গ। স্বর্ণবিনিময়মান: ইহাতেও কাগজী বা নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিনিময়কার্যের জন্য ইহাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায় না। টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না। কিন্তু বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঐ মুদ্রাকে নির্দিষ্ট হারে এমন এক মুদ্রায় বিনিময় করা যায় যাহা স্বর্ণমানের উপর স্থাপিত। ব্যাখ্যাস্বরূপ ভারতে ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত স্বর্ণবিনিময়মানের উল্লেখ করা যায়।* এই সময় আভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য ভারতে প্রচলিত টাকার (Rupee) পরিবর্তে স্বর্ণ পাওয়া যাইত না; কিন্তু বৈদেশিক দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য উহার বিনিময়ে ১ টাকা = ১ শিলিং ৪ পেনি—এই হারে ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিং পাওয়া যাইত। ষ্টার্লিং স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই ষ্টার্লিং-এর মাধ্যমে মূল্য প্রদানের অর্থই ছিল স্বর্ণের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করা। যথা, ভারতীয় টাকা = ষ্টার্লিং = স্বর্ণ। এইভাবে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বর্ণ প্রদান করিতে হয় বলিয়া ইহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলে।

স্বর্ণসমতামান কাহাকে বলে

ঘ। স্বর্ণসমতামান: বর্তমানে ভারতের ন্যায় অনেক দেশই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের** সদস্য। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদভুক্ত হইলে দেশকে উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য (gold value) ঘোষণা করিতে ও বজায় রাখিতে হয়। সকল দেশেরই

---

* অনেকের মতে, ভারতে স্বর্ণবিনিময়ের সময় ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ধরা যায়।

** পৌরবিজ্ঞানের ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

মুদ্রামূল্য স্বর্ণের সহিত সম্পর্কিত থাকে বলিয়া এই সকল বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যের সমতা দেখা যায়। এইজন্য ইহাকে স্বর্ণসমতামান বলা হয়। ভারতের টাকার স্বর্ণমূল্য যতটা, মার্কিন মুদ্রার (ডলার) ২১ সেণ্টের স্বর্ণমূল্য ততটাই। সুতরাং ভারতীয় টাকা ও মার্কিন ডলারের মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ টাকা=২১ সেণ্ট।

অনুরূপভাবে, ভারতীয় টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ টাকা= ১ শিলিং ৬ পেনি। স্বর্ণসমতামানের উপর স্থাপিত মুদ্রাকে পরিচালিত মুদ্রা (Managed Money) বলা হয়।

পরিচালিত মুদ্রা

স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, স্বর্ণের মাপকাঠিতে মূল্য পরিমাপ এবং শেষপর্যন্ত স্বর্ণের দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা হয় বলিয়াই বিশেষ মুদ্রাকে স্বর্ণমান আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু স্বর্ণ-বিনিময়মান ও স্বর্ণসমতামানে আভ্যন্তরীণ দেনাপাওনা মিটানোর কার্য কখনই স্বর্ণের মাধ্যমে করা হয় না; স্বর্ণপিণ্ডমানে ইহা কতকটা করা হয় এবং স্বর্ণমুদ্রামানে ইহা পুরাপুরিই করা হয়। এইজন্য বলা হয় যে স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ আছে (there are degrees of gold standard)।

উপসংহার

স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Paper Money): বর্তমানে যে কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার উপর প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে কাগজী মুদ্রার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা।

প্রথমত, কাগজী মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য। বহু টাকার নোট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যত সুবিধাজনক বহু টাকার মুদ্রা লইয়া যাওয়া তত সুবিধাজনক নহে। ধাতব মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লইতে অনেক সময় নষ্ট হয়; কাগজী মুদ্রার পরীক্ষার কার্য অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হয়।

সুবিধা :
১। সহজ বহনযোগ্যতা

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট মুদ্রণের ব্যয়ও কম। সোনারূপা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিতে যে বিরাট ব্যয় হয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে তাহা বাঁচিয়া যায়। ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে অনেক সোনারূপা ক্ষয় হয়। ইহাকে জাতীয় ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাগজের নোটের বেলায় এই ক্ষতি হয় না।

২। ব্যয়সংক্ষেপ

তৃতীয়ত, কাগজী মুদ্রাকে সহজেই বদলান যায়। নোট পুরাতন হইয়া গেলে তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্তে আর একখানি নোট সহজেই ছাপিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ধাতব মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বদলান অপেক্ষাকৃত কঠিন।

৩। পরিবর্তনশীলতা

চতুর্থত, কাগজী মুদ্রার যোগান অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়। সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির দরুন দেশে যতই ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনের কার্য সম্প্রসারিত হইবে টাকাকড়ির চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সোনারূপার টাকার যোগান

৪। সম্প্রসারণশীলতা

সোনারূপার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহা সকল সময় প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। কিন্তু প্রয়োজনমত কাগজের নোট ছাপিয়া দিলেই হইল। অবশ্য নোট মুদ্রণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা রাখা হয়; তবে সাধারণত নোটের মূল্যের একটি অংশমাত্র এইভাবে জমা রাখা হয়। ফলে যত জমা হয় তাহার অনেক অধিক নোট ছাপাইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকাকড়ি সরবরাহ করা চলে। বর্তমানে ভারতে যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপার জন্য ১১৫ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয় না।*

অসুবিধা :
১। সম্প্রসারণশীলতার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে

এই যে যত খুশি তত নোট ছাপা চলে ইহাই কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। ইহার জন্য সরকার রাজস্বসংগ্রহে মনোযোগ না দিয়া নোট ছাপানোতেই আগ্রহশীল হইতে পারে। ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে ইহার বিরুদ্ধে জমার পরিমাণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে এবং একদিন কাগজী মুদ্রা 'আর পরিবর্তনীয় নয়' বলিয়া ঘোষিত হইবে। তখন উহার মূল্য দ্রুত পড়িয়া যাইবে এবং মর্যাদা নষ্ট হইবে। এই এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির (inflation) চরম অবস্থা বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মেনীতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাংগেরী, গ্রীস এবং চীন দেশে এইরূপ ঘটিয়াছিল। কাগজী নোটের দাম এত পড়িয়া গিয়াছিল যে বহু লোক শেষপর্যন্ত উহা লইতেই অস্বীকার করিয়াছিল।

২। কাগজী নোট বিদেশীয়রা গ্রহণ করে না।

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট বিদেশীয়রা গ্রহণ করিতে চায় না। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কাগজী মুদ্রার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে এই বিনিময়-হার বজায় রাখিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সকল বিদেশীয়ই কাগজী নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে।

৩। ইহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে

তৃতীয়ত, অসাবধানবশত কাগজী মুদ্রা নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। এক তাড়া নোট কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে।

টাকাকড়ি সৃজন এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (Creation of Money and Bank Money): ধাতব মুদ্রার যুগে রাজ-দরবারের তত্ত্বাবধানে টাকাকড়ি সৃজন বা মুদ্রা নির্মাণ করা হইত। তারপর কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বিভিন্ন ব্যাংক পূর্ণ পরিবর্তনীয় কাগজী নোট ছাপাইতে থাকে। বর্তমানে নোট প্রচলন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (Central Bank) একচেটিয়া অধিকার। আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং সরকারের নির্দেশানুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কার্য সম্পাদন করে। রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সুতরাং এখানে নোট

বর্তমানে নোট প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার

* এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের দাম হিসাব করা হয় আন্তর্জাতিক মূল্যে (at international price) বা তোলা প্রতি ৬২.৫০ টাকা হিসাবে।

প্রচলনের ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। নোট ছাড়া ধাতব মুদ্রার প্রচলন করে সরকার। আমাদের দেশে সরকার অবশ্য ১ টাকার নোটও ছাপাইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, টাকাকড়ি সৃষ্টির মালিক হইল সরকার। সরকারের নির্দেশমত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলন এবং টাঁকশাল মুদ্রা নির্মাণ করিয়া চলে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি একমাত্র সরকারেরই ক্ষমতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। শুধু সরকার নহে, দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ির যোগান দিয়া থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের ন্যায় ব্যাংকগুলিও টাকাকড়ির সৃষ্টি করে। ব্যাংকের যোগান দেওয়া এইরূপ টাকাকড়িকে ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (bank money) বলা হয়। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।*

ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ি সৃষ্টি করে

ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ব্যাংকের আমানত (bank deposits) ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকে আমানতের বিরুদ্ধে চেক কাটিয়া লেনদেনকার্য সম্পাদন করে। সুতরাং চেকও বিনিময়ের মাধ্যম। কিন্তু চেক সকলে লইতে রাজী হয় না বলিয়া—অর্থাৎ, ইহা সর্বজনগ্রাহ্য নহে বলিয়া অনেক অর্থবিদ্যাবিদ ইহাকে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। ইঁহাদের মতে, চেক নহে—ব্যাংকের আমানতই টাকাকড়ি। আমানতের দরুনই চেকের দাম; আমানত আছে বলিয়াই চেকের মাধ্যমে বিনিময়কার্য (যাহা টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য) সম্পাদন করা যায়।

আমানতই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি

এখন প্রশ্ন, ব্যাংক আমানত বা তাহার টাকাকড়ি সৃষ্টি করে কিরূপে? এই বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যাংক কাহাকে বলে এবং ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি?—তাহা জানা প্রয়োজন।

ব্যাংক (Banks): ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে—যথা, বণিকদের ব্যবসায় বা বাণিজ্য (trade), মহাজনদের ব্যবসায় (money lending) এবং স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। বর্তমান ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পূর্বপুরুষ বলিয়া এই তিন-জনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বণিকদের ব্যবসায় হইতে।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ

প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য ধাতব মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। ধাতব মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য হইলেও ইহা লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে বণিকরা আসল টাকাকড়ি বহন না করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিত পত্র বহন করিত। যে-নগরে বণিকের বাসস্থান ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিত পত্র প্রদান করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই ঐ পত্র বাহির করিত। যাহা হউক, ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বণিকের উপর লোকের বিশ্বাস থাকায়

১। বণিকদের ব্যবসায়

* [illegible] পৃষ্ঠা।

তাহারা নগদ টাকার পরিবর্তে ঐরূপ লিখিত পত্র লইতে আপত্তি করিত না। প্রয়োজনমত তাহারা পত্র-প্রচলনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগদ টাকাও গ্রহণ করিতে পারিত; অথবা দেনা মিটাইতে ঐ পত্র কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারিত। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্রের ব্যবহার সুরু হইল। এই ঋণপত্রই পরে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডিতে পরিণত হয়।

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশের ইতিহাসে পরবর্তী পূর্বপুরুষ হইল মহাজন বা ঋণ-ব্যবসায়ী। ঋণের ব্যবসায় অতি প্রাচীন। ইহার উদ্ভব হয় টাকাকড়ির প্রচলনের সংগে সংগেই। অতীতে ঋণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায়ে খাটাইত। এইভাবে সে ঋণের ব্যবসায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন সঞ্চিত অর্থের মালিকরা তাহাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহা মহাজনদের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন লইয়া এই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করিত; ক্রমেই সে ইহা তাহার নিজের টাকাকড়ির সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া খাটাইতে লাগিল এবং যে তাহার নিকট টাকা খাটাইবার জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহাকে নির্দিষ্ট সুদ দিতে লাগিল। এইভাবে আমানত গ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য সুরু হইল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল।

২। মহাজনদের ব্যবসায়

চেকের ব্যবহার ব্যাংক-ব্যবসায়ের পরবর্তী অধ্যায়। এই কার্য সুরু করে ইংরাজ স্বর্ণকারগণ। প্রাচীন ইংলণ্ডে ধনী বণিকরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া রসিদ লইত এবং গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত লইবার সময় এই রসিদ প্রত্যর্পণ করিত। পরে এই রসিদ প্রত্যেক বারেই স্বর্ণকারের নিকট ফেরত না আসিয়া টাকাকড়ির মত দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেক বারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া দেনা মিটানো ও পাওনাদারের পক্ষে ঐ স্বর্ণ আবার গচ্ছিত রাখার অসুবিধা দূর হইল। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পরবর্তী যুগে ব্যাংক-নোটে পরিণত হয়।

৩। স্বর্ণকারদের ব্যবসায়

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকল সময় আমানত-রসিদও ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী তাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ তাহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্ণকারকে দিতে পারিত। এইরূপ লিখিত নির্দেশ চেক ছাড়া আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার পুরাপুরি ব্যাংক-ব্যবসায়ীতেই পরিণত হইল।

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, সে হুণ্ডি বাট্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ সরবরাহ করে। এই কার্য উত্তরাধিকার সূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, মহাজনদের মত সে সঞ্চয়সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করে। তৃতীয়ত, সে

স্বর্ণকারদের মত নগদ টাকা ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুব্যবস্থা করিয়া দেয়।

ব্যাংক-ব্যবসায় কাহাকে বলে? (What is Banking ?) : ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনায় ব্যাংকের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটি তিন ধরনের কার্য করিয়া থাকে—যথা, বাণিজ্যে ঋণ সরবরাহের কার্য, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের কার্য এবং চেক বা ঋণপত্রের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর কার্য। এই তিন প্রকার কার্যই ঋণ সংক্রান্ত কার্য বলিয়া ব্যাংক-ব্যবসায়কে 'ঋণের ব্যবসায়' (business of dealing in credit) বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, ব্যাংক ঋণ লইয়া কারবার করে। একজন আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদের মতে, ব্যাংক অর্থ সরবরাহ ব্যাপারে অন্যতম মধ্যস্থ; ইহা ঋণ আদানপ্রদানের কারবারী।* বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যাহারা অর্থ সঞ্চয় করে এবং যাহারা সেই অর্থ শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে তাহারা দুই ভিন্ন শ্রেণীর লোক। ব্যাংকই উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বা মধ্যস্থতার কার্য করে। উহা সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ অর্থ আবার শিল্পপতি, বণিক প্রভৃতিকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এইভাবে ঋণের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠান মুনাফালাভের প্রচেষ্টা করে তাহাকেই ব্যাংক বলা যায়।

বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি। যে-ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা রাখে সে বিশ্বাস করে যে তাহার টাকা নষ্ট হইবে না। তেমনি ব্যাংকও যখন ঋণ প্রদান করে তখন বিশ্বাস করে যে ঐ টাকা আদায় করা যাইবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর বিশ্বাস না থাকিলে ব্যাংক ঋণ প্রদান করিবার সময় সরকারী ঋণপত্র ইত্যাদির ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য সম্পদের (assets) জামিন দাবি করে। সুতরাং ব্যাংকের কারবার হইল বিশ্বাসের কারবার। ইংরাজীতে ইহাকেই বলা হয় 'ক্রেডিটে'র (credit) কারবার।

কিন্তু প্রত্যেক ঋণ বা বিশ্বাসের কারবারীই ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য নয়। অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এবং কোন্ কোন্ ঋণ-ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবসায়ী (banker) বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) দ্বারা এইরূপ ব্যাংক-ব্যবসায় ও ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে চেক ব্যবহার না করিলে, চলতি আমানত (current account) বা চাহিবামাত্র জমা টাকা ফেরত দিবার ব্যবস্থা না থাকিলে এবং অন্যান্য কাজকারবারে জড়িত থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বলিয়া গণ্য হইবে না। উপরন্তু, প্রত্যেক ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন ঋণের কারবার আইনের দৃষ্টিতে 'ব্যাংক' বলিয়া পরিগণিত হয় না।

* A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts.

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (Utility of Banking): বর্তমান অর্থনৈতিক জগতে ব্যাংক-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সঞ্চয় শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া ব্যাংক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করে। ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ; ইহাতে কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়। এইজন্য লোকে সঞ্চয়ে আগ্রহশীলও হয়। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু সঞ্চয় সংগ্রহ করে না, সঞ্চয় বৃদ্ধিও করে। অতএব মূলধন-গঠনে (capital formation) দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যাংক দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া শিল্প-বাণিজ্য বিনিয়োগ করে

ব্যাংকগুলি শুধু আমানতের মাধ্যমেই সঞ্চয় সংগ্রহ করে না; অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। এই সূত্রে বহু পরিমাণে স্থায়ী মূলধন সংগৃহীত হয়।

ব্যাংক শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে

ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণ সৃজন করিয়া প্রয়োজনমত টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনমত টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যাইত তবে সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা (developing economy) পদে পদে ব্যাহত হইত।

টাকাকড়ি সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করে

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অনেকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লোকে দূরে বসিয়া যখন কেনাবেচা করে তখন ব্যাংকের মাধ্যমেই টাকার লেনদেন হয়। অনেক সময় আবার ধারে কেনাবেচা চলে। ক্রেতা তখন নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল্য পরিশোধের জন্য এক অংগীকারপত্র বা হুণ্ডি (Bill of Exchange) প্রদান করে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা ঐ হুণ্ডি ব্যাংক হইতে কিছু ডিস্কাউণ্ট বাদ দিয়া ভাঙাইয়া লইতে পারে। এইভাবে ধারে বিক্রয় করিয়াও ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে।* বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়ও ব্যাংকের মাধ্যমে হয়।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে

পরিশেষে, ব্যাংকগুলি অনেক সময় ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা এবং এজেন্ট হিসাবে কার্য করে। ইহাতেও ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ উপকৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজকল্যাণে নিরত থাকে।

ব্যাংক অন্যান্যভাবেও ব্যবসাবাণিজ্যকে সাহায্য করে

* ধরা যাউক, কলিকাতার এক ব্যবসায়ী ক বোম্বাই-এর এক ব্যবসায়ী খ-এর ৩ মাস পরে মূল্য পরিশোধের সর্তে ১ হাজার টাকার মাল বিক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুতিপত্র বা হুণ্ডি লিখিয়া লইল। এখন ক-এর যদি ঠিক ১ মাস পরেই টাকার প্রয়োজন হয় তবে ক ঐ প্রতিশ্রুতিপত্র বা হুণ্ডি ২ মাসের ডিস্কাউণ্ট বাদ দিয়া কোন ব্যাংক হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারিবে। ২ মাস পরে ব্যাংক খ-এর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবে।

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Banks): ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা হইতেই ব্যাংকের নিম্নলিখিত কার্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

(ক) সঞ্চয়সংগ্রহ (Collection of Savings): সঞ্চয়সংগ্রহই ব্যাংকের প্রাথমিক কার্য। ব্যাংক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখে এবং ইহার দরুন সুদ প্রদান করে। আমানত প্রধানত দুই ধরনের—(ক) চলতি আমানত (demand deposit), এবং (খ) মেয়াদী আমানত (time deposit)। চলতি আমানত হইতে আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে; কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা উঠানো যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তবেই আমানত ফেরত পাওয়া যায়। তবে মেয়াদী আমানত জামিন রাখিয়া টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে। ব্যাংক মেয়াদী আমানত বহুদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার সুদ চলতি আমানতের উপর সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক হয়। আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জমা আমানত (savings deposit) বলে। ইহা হইতে সপ্তাহে একবার কি দুইবার নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেক কাটিয়া তোলা যায় এবং ইহার সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা বেশী হয়।

ব্যাংক আমানত দ্বারা দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করে

(খ) ঋণ ও বিনিয়োগ (Loans and Investments): সংগৃহীত সঞ্চয় হইতে ব্যক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য। নানাভাবে ব্যাংক এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সরাসরি ঋণপ্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, হুণ্ডি ডিস্কাউন্ট করিতে পারে। হুণ্ডি ভাঙানোও একপ্রকার ঋণপ্রদান কার্য। তৃতীয়ত, উহা শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার অথবা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া অর্থ বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে।

(গ) টাকাকড়ির সৃজন (Creation of Money): টাকাকড়ি সৃজন করা ব্যাংকগুলির অন্যতম প্রধান কার্য। ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। পূর্বে অনেক ব্যাংকই নোট ছাপাইয়া টাকাকড়ির সৃষ্টি করিতে পারিত। বর্তমানে এ-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের নাই।

(ঘ) অন্যান্য কার্য (Other Functions): ব্যাংক অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ইহা মুদ্রা-বিনিময় (money-changing) করে; স্বর্ণ রৌপ্য টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে; স্বর্ণ রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে; শেয়ার-ডিবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে সহায়তা করে। উপরন্তু, ব্যাংক মক্কেলের এজেন্ট বা ট্রাস্টী হিসাবে বাড়ীভাড়া আদায় করে; উহা ডিভিডেণ্ড আদায়, চিঠিপত্র প্রদান, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কার্যও করিয়া থাকে। পূর্বের স্বর্ণকারদের মত এখনও ব্যাংকগুলি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

টাকাকড়ির সৃজন ও ব্যাংক-ব্যবস্থা (Creation of Money and the Banking System) : এখন ব্যাংক-ব্যবস্থা কিভাবে টাকাকড়ি সৃজন করিয়া থাকে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। আমানতের উদ্ভব দুই প্রকারে হয় : (ক) যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাংকে জমা দেয় তখন তাহার নামে ঐ টাকা আমানত পড়ে। যেমন, আমি যদি ১ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিই তবে ঐ টাকা আমার নামে আমানত হইবে। (খ) এইভাবে আমানতের দরুন টাকাকড়ি না পাইয়াও ব্যাংক আমানতের সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রকার আমানত সৃষ্টিকেই টাকাকড়ির সৃজন (creation of money) বলা হয়।

ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করিয়া টাকাকড়ি যোগান দেয়

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাংক কিভাবে টাকাকড়ি বা আমানত সৃষ্টি করে তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, দেশে একটিমাত্র ব্যাংক আছে এবং ব্যাংকটির নাম শতাব্দী ব্যাংক। শতাব্দী ব্যাংকে এক হাজার টাকা আমানত হইল। অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাংক ইহা জানে যে আমানতকারী ঐ ১ হাজার টাকার অধিকাংশটাই চেক কাটিয়া খরচ করিবে এবং সামান্য কিছু নগদ লইতে পারে। আবার আমানতকারীর নিকট হইতে যাহারা চেক পাইবে তাহারাও যে সমস্তটা নগদে লইবে না, তাহাদেরও যে অনেকে ব্যাংকে চেক জমা দিবে এবং ইহার ফলে আমানত আবার ব্যাংকের নিকট ফিরিয়া আসিবে—ইহাও শতাব্দী ব্যাংকের জানা আছে। সুতরাং ১ হাজার টাকা যে আমানত হইয়াছে তাহার একাংশ নগদ টাকায় রাখিলেই ব্যাংকের চলিবে। এই একাংশ যদি শতকরা ১০ ভাগ বা মোট ১০০ টাকা হয়, তবে বাকী ৯০০ টাকা শতাব্দী ব্যাংক ঋণ প্রদান করিতে পারে।

একটিমাত্র ব্যাংক কিভাবে ইহা করে তাহার দৃষ্টান্ত

কিন্তু ব্যাংক যখন ঋণ প্রদান করে তখন সাধারণত ঋণগ্রহীতাকে নগদ টাকা দেয় না, তাহার হিসাবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানত দেখায় মাত্র। আমাদের উদাহরণে শতাব্দী ব্যাংক যদি একমাত্র ক-কেই ৯০০ টাকা ঋণ দেয় তবে উহা তখনই ক-এর হাতে নগদ ৯০০ টাকা দিবে না, ক-এর হিসাবে ৯০০ টাকা আমানত দেখাইবে মাত্র। ক ঐ আমানত হইতে ইচ্ছামত চেক কাটিয়া খরচ করিতে পারিবে। সুতরাং এই ৯০০ টাকা হইল ঋণ আমানত। ইহার জন্য ক কোন টাকা জমা দেয় নাই; ক-কে ঋণ প্রদান করিয়াই ব্যাংক এই আমানতের সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য ইংরাজীতে বলা হয় যে, প্রত্যেকটি ঋণ একটি করিয়া আমানতের সৃষ্টি করিয়া থাকে (every loan creates a deposit)। আমানতই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলিয়া আমানত সৃষ্টির অর্থই টাকাকড়ির সৃজন। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ৯০০-এর মত টাকাকড়ি (money) সৃষ্ট হইল।

এখানেই কিন্তু বিষয়টির শেষ হয় না। যে ৯০০ টাকা ব্যাংক ঋণপ্রদান করিল তাহারও মাত্র একাংশ ক এবং ক যাহাদের নামে চেক কাটিবে তাহারা নগদ

টাকায় তুলিয়া লইবে; বাকী টাকা শতাব্দী ব্যাংকেই, চেকের মারফতে ফিরিয়া আসিবে—অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, এ-ক্ষেত্রেও শতকরা ১০ ভাগ নগদ টাকা অর্থাৎ মোট ৯০ টাকা প্রয়োজন হইবে। সুতরাং (৯০০ – ৯০) টাকা = ৮১০ টাকা শতাব্দী ব্যাংক আবার ঋণ প্রদান করিতে পারে।

এ-পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাংকে মাত্র ১০০০ টাকা জমা পড়িয়াছে। কিন্তু আমানত হইয়াছে (১০০০ + ৯০০ + ৮১০) টাকা = ২৭১০ টাকা। সুতরাং শতাব্দী ব্যাংক (২৭১০ – ১০০০) টাকা = ১৭১০ টাকা (আমানত) সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে ব্যাংক তাহার প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণের মত টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারে।

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক। সুতরাং লোকে যখন চেক পাইয়া জমা দিবে তখন শতাব্দী ব্যাংকেই জমা দিবে। কিন্তু দেশে একটিমাত্র ব্যাংক থাকে না। ফলে লোকে যখন চেক কাটে তখন ঐ চেক অন্য ব্যাংকে জমা পড়ে বলিয়া টাকাকড়ি এক ব্যাংক হইতে অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে বিশেষ কোন ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু একসংগে সকল ব্যাংকের—অর্থাৎ, দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার অবস্থার কোন তারতম্য হয় না। টাকাকড়ি 'শতাব্দী ব্যাংক' হইতে 'জাতীয় ব্যাংকে' স্থানান্তরিত হইলে 'শতাব্দী ব্যাংকে'র আমানত বা ঋণ-সৃজনের ক্ষমতা কমে, কিন্তু 'জাতীয় ব্যাংকে'র ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্ষমতা পূর্বের মতই থাকিয়া যায়।

সকল ব্যাংক কিভাবে ইহা করে

অনুরূপভাবে, ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় করে তখন তাহাকে নগদ টাকা না দিয়া তাহার নামে আমানত দেখাইতে পারে। ঋণপত্র-বিক্রেতা প্রয়োজনমত ঐ আমানত হইতে টাকা তুলিয়া লইবার অধিকারী হয়। এই আমানত হইতেও চেকের দ্বারা টাকা উঠানো হয় এবং ঐ সকল চেকেরও অধিকাংশ আবার ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ে।

এইভাবে সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ি ব্যতিরেকেও মোট টাকাকড়ির যোগান বাড়িতে এবং বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইতে পারে।

অবশ্য ব্যাংকগুলির পক্ষে এই পদ্ধতিতে টাকাকড়ি সৃজনের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে ব্যাংকগুলি যে-ঋণ প্রদান করে ঋণগ্রহীতা তাহার একাংশ তখনই বা কিছু পরে নগদ টাকায় লইতে পারে বলিয়া ব্যাংকগুলিকে কিছু নগদ টাকা বা মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ রাখিয়া দিতে হয়। কিন্তু নগদ টাকার যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে-পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়িবে তাহাই কতকটা অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ বা টাকাকড়ি সৃজনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবে।

ঋণদান-পদ্ধতিতে টাকাকড়ি সৃজনের কতকগুলি প্রতিবন্ধক

দ্বিতীয়ত, দেশের লোক যদি বিনিময়কার্যে চেক অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যবহার করিতে অধিক অভ্যস্ত হয় তবে ব্যাংক বিশেষ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক লোকই ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণ অনতিবিলম্বেই নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া লয়। ফলে ব্যাংকের নগদ টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়। ১ হাজার নগদ টাকা তুলিয়া লইলে ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা মোটামুটি ১০ হাজার (১ হাজার টাকার ১০ গুণ) টাকার মত কমিয়া যায়। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা কি পরিমাণ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে তাহা নির্ভর করে ঐ দেশের লোকে নগদ টাকা কি পরিমাণ ব্যবহার করে তাহার উপর।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক দেশেই রীতি (convention) বা আইন অনুসারে ব্যাংকগুলিকে গৃহীত আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। সুতরাং যখনই কোন আমানত সৃষ্টি করা যাইবে তখনই উহার দরুন কিছু টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি করিতেও সমর্থ। ইহার ফলে ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদানের মাধ্যমে যথেচ্ছ পরিমাণে টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে না। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে (Commercial Banks) উহাদের গৃহীত চলতি ও মেয়াদী আমানতের (Demand and Time Deposits)* শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংক যদি দেখে যে, ব্যাংকগুলি অত্যধিক ঋণপ্রদান করিতেছে তবে ঐ জমার অনুপাত ৫ গুণ বা শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

অনেকের মতে, ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা নাই। ব্যাংক যে ঋণপ্রদান করে তাহা শুধু হাতে করে না, সম্পত্তির জামিনের বিরুদ্ধেই করে। সুতরাং সম্পদই টাকাকড়িতে রূপান্তরিত হয়, শূন্য হইতে টাকাকড়ির সৃষ্টি হয় না। এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া যায় না—কারণ দেখা যায়, ব্যাংক অনেক সময় ব্যক্তিগত সুনাম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঋণ প্রদান করে। উপরন্তু, যে-কোন উন্নত দেশে যে-কোন সময় ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত আমানতের হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে উহা নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। কোন এক বিশেষ দিনে ইংলণ্ডে মোট ব্যাংক-আমানতের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কখনই ৯০ কোটি পাউণ্ড ছাড়াইয়া যায় নাই। ব্যাংক-ব্যবস্থা যদি টাকাকড়ি বা আমানত সৃজন করিতে না পারে তবে ৯০ কোটি পাউণ্ড নগদ টাকাকড়ি হইতে ৩০০ কোটি পাউণ্ড আমানত আসিল কোথা হইতে? অতএব এই বলিয়া উপসংহার করা যায় যে, বিনিময়ের মাধ্যম বা টাকাকড়ি সৃজন করিবার ক্ষমতা ব্যাংক-ব্যবস্থার আছে।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক (Types of Fank): ব্যাংকের কার্যাবলীর আলোচনা হইতে এ-ধারণা করা অবশ্যই ভুল হইবে যে সকল কার্যই প্রত্যেক ব্যাংক

* 'Demand Deposit' কে চলিত ভাষায় সাধারণত 'Current Account' বলা হয়।

না থাকে। শিল্পজগতে বর্তমানে যেরূপ শ্রমবিভাগ দেখা যায়, ব্যাংক-ব্যবস্থাতেও সেইরূপ বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) পরিদৃষ্ট হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানই যেরূপ সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না, তেমনি কোন ব্যাংকই ব্যাংকের সকল কার্য সম্পাদন করে না। ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে

এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জমিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank): বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক সমাজের সমাজপতি। দেশের অভ্যন্তরে সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, দেশের কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা, দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং নানাভাবে উন্নয়ন কার্যে সহায়তা করা ইহার দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী। আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ও সরকারী তত্ত্বাবধানে ইহা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী:
১। নোট প্রচলন

দ্বিতীয়ত, মুদ্রার ও ঋণের পরিমাণের উপর টাকাকড়ির যোগান নির্ভর করে বলিয়া দেশের ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। কি পরিমাণ টাকাকড়ির যোগান দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট থাকে। টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে উহা নোট ছাপা কমাইয়া দেয় এবং অন্যান্য ব্যাংককে ঋণদান হ্রাস করিতে নির্দেশ দেয় বা বাধ্য করে; অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা স্থির হইলে নোট ছাপা বাড়াইয়া দেয় এবং ব্যাংকগুলিকে ঋণদানে উৎসাহিত করে। এইভাবে টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

২। ঋণ নিয়ন্ত্রণ

টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য সমস্ত ব্যাংকের ব্যাংক। এই সমস্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট একটি করিয়া হিসাব এবং তাহাদের গৃহীত আমানতের কিছু অংশ জমা রাখিতে হয়। ইহার পরিবর্তে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে কিছু সুবিধাও পাইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৩। ইহা অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

তাহাদের স্বল্পকালীন ঋণদান করে। প্রথম শ্রেণীর হুণ্ডি (first class bills of exchange) পুনর্বাট্টা (rediscount) করে ইত্যাদি।*

৪। ইহা সরকারের ব্যাংক

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। ইহা সরকারের টাকা জমা রাখে, প্রয়োজন হইলে সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করে এবং সরকারী ঋণ (Public Debt) পরিচালনা করে।

৫। ইহা মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখে

পঞ্চমত, অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট বিনিময় হার বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়।

৬। অন্যান্য কার্য

পরিশেষে, দেশের শিল্পবাণিজ্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, ব্যাংক ফেল পড়িয়া লোকের আমানত যাহাতে নষ্ট না হয়, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তব্য। মোটকথা, ব্যাংক-ব্যবস্থা দেশের শিল্পবাণিজ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে; তাহার ভালমন্দ সমস্ত কিছুর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়ী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বলা হইয়াছে যে, টাকাকড়ির যোগান মুদ্রার ন্যায় ঋণের উপরও নির্ভর করে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে টাকাকড়ির সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে। ব্যাংকসমূহের এই ক্ষমতা যাহাতে সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দেখে যে, অন্যান্য ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণদান করিতেছে বা যে-সময় ঋণদানের মাধ্যমে টাকাকড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে-সময় ঋণদানে বিরত থাকিতেছে তখন উহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পন্থাসমূহ

(ক) নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion): ইহা দ্বারা বুঝায় ব্যাংকগুলির বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করা—তাহাদের বলা হয় যে, তাহারা দেশের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কার্য করিতেছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সংযত হওয়া কর্তব্য।

নৈতিক প্রণোদন বলিতে কি বুঝায়

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন (Changes in the Bank Rate): নৈতিক প্রণোদনে বিশেষ ফল না হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য যে-সকল পন্থা অনুসরণ করে, সুদের হারের পরিবর্তন তাহার অন্যতম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

* পুনর্বাট্টা বলিতে বুঝায় একবার ভাঙানো হুণ্ডিকে পুনরায় ভাঙানো। ২২৩ পৃষ্ঠার উদাহরণে 'ক' কোন ব্যাংকের নিকট হইতে হুণ্ডি ডিস্কাউন্ট করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের ২ মাস পূর্বে টাকা লইল। ঐ ব্যাংকের যদি আবার ২ মাসের পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হয় তবে উহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারিবে।

সুদের হার বৃদ্ধি করিলে অন্যান্য ব্যাংকও উহা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে। কারণ, প্রয়োজনমত তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেই ঋণ লইতে হয়। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকে কম ঋণ গ্রহণ করিবে। ফলে, শেষপর্যন্ত মোট ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

সুদের হারের পরিবর্তন কিভাবে কার্য করে

(গ) খোলা বাজারে কারবার (Open Market Operations): খোলা বাজারে কারবারের অর্থ হইল সাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন সাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে তখন ক্রেতা আমানত হইতে টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া উহার মূল্য প্রদান করে। ফলে ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া ঋণদানের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করিলে ঐ টাকা ব্যাংকে আমানত পড়ে এবং ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খোলা বাজারে কারবারের অর্থ

(ঘ) জমার অনুপাতে পরিবর্তন (Variation in the Reserve Ratio): অন্যান্য ব্যাংকের আমানতের যে-অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। নূতন আইন অনুসারে আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলী ব্যাংকগুলি (Scheduled Banks) তাহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ আইনত জমা রাখিতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার অনুপাতকে ৫ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলিকে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত জমা দিবার নির্দেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অধিক টাকা জমা দিতে হইলে ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা কমিয়া যায়; আবার জমার পরিমাণ কম হইলে ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা

(ঙ) ঋণ-বরাদ্দ নীতি (Rationing of Credit): পরিশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-বরাদ্দ করিবার ক্ষমতাও থাকিতে পারে। এইরূপ হইলে ইহা নির্দেশ দিতে পারে যে, কোন্ ব্যাংক কত পরিমাণ ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আলোচনা প্রসংগে যে-সকল 'অন্যান্য ব্যাংকে'র কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। সাধারণের নিকট হইতে আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ, এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্যকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করা, হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা, মক্কেলের পক্ষে এজেন্ট ও ট্রাষ্টীর কার্য করা, মূল্যবান জিনিস ও দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা, ইত্যাদিই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংককে যৌথ পুঁজি ব্যাংকও (Joint Stock Bank) বলা হয়। এরূপ বর্ণনার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। ইংলণ্ডে প্রথমে একমাত্র 'ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ড'ই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্য পরিচালনা করিত এবং উহা যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে

গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককেই যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না, কারণ যে-আমানতের মাধ্যমে উহা অর্থ সংগ্রহ করে তাহা স্বল্পমেয়াদী হয়। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য, শিল্পবাণিজ্যের শেয়ার-ডিবেঞ্চার বিক্রয়কার্য, ইত্যাদি বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) বলিয়া ইহাও সম্পাদন করে না।

বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথ পুঁজি ব্যাংক নামেও পরিচিত

ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না

বিনিময় ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংক (Exchange Banks, Industrial Banks and Land Mortgage Banks) : যে-সকল ব্যাংক প্রধানত বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য করিয়া থাকে তাহাদিগকে বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks), যে-সকল ব্যাংক প্রধানত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান বা উহাদের শেয়ার-ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করে তাহাদিগকে শিল্প ব্যাংক (Industrial Banks) এবং যে-সকল ব্যাংক জমিবন্ধকী কার্য করে তাহাদিগকে জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) বলা হয়।

বিশেষ কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা। কিন্তু অনেক সময় মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্যাংক গড়িয়া উঠে। এই সকল ব্যাংক সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank) নামে অভিহিত। পারস্পরিক সহায়তায় স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা এইরূপ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

সমবায় ব্যাংক

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা (The Indian Banking System) : ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে ব্যাংক-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য ও দেশীয় উভয় পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাংকগুলি হইল : (ক) রিজার্ভ ব্যাংক, (খ) ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, (গ) যৌথ পুঁজি ব্যাংকসমূহ, এবং (ঘ) বিনিময় ব্যাংকসমূহ। দেশীয় পদ্ধতিতে যাহারা ব্যাংক-ব্যবসায় করে তাঁহারা দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী (Indigenous Bankers) নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া সমবায় ব্যাংক, জমিবন্ধকী ব্যাংক, পোষ্ট অফিস সেভিংস্-ব্যাংক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ব্যাংক আছে।

ভারতীয় ব্যাংকগুলি দুইটি পদ্ধতিতে পরিচালিত

রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India) : রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইহা ১৯৩৪ সালের আইন দ্বারা ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে ইহা অংশীদারগণের ব্যাংক ছিল ; ১৯৪৯ সালে ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পূর্বে ইহার মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। এখন মূলধনের পরিমাণ ঐ একই আছে, তবে সমগ্রটার মালিক হইল রাষ্ট্র।

ইহাই ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

রিজার্ভ ব্যাংকের কার্য পরিচালনার ভার একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত। বোর্ডের সভাপতিকে গভর্ণর বলা হয়। ব্যাংকের সদর কার্যালয় বা কেন্দ্রীয় বোর্ড বোম্বাই-এ অবস্থিত। কেন্দ্রীয় বোর্ড ছাড়াও কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও নূতন দিল্লীতে চারিটি স্থানীয় বোর্ড আছে। ব্যাংকের নীতি-নির্ধারণ করে অবশ্য ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডসমূহকে ভারত সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়।

পরিচালনা

রিজার্ভ ব্যাংক মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত—(ক) নোট প্রচলন বিভাগ (Issue Department), এবং (খ) ব্যাংকিং বিভাগ (Banking Department)। ব্যাংকিং বিভাগের কয়েকটি উপবিভাগ আছে—যথা, কৃষি-ঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department), বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (Department of Exchange Control), ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ (Department of Banking Operations), ব্যাংক উন্নয়ন বিভাগ (Department of Banking Development), পরিদর্শন বিভাগ (Inspection Department) এবং শিল্প মূলধন বিভাগ (Industrial Finance Department)। ব্যাংকিং পরিচালনা বিভাগ এবং পরিদর্শন বিভাগ অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালনা সম্বন্ধে নির্দেশ দেয় এবং উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

গঠন

কার্যাবলীও অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুরূপ

রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলিয়া ইহা স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকে।

(১) নোট প্রচলন: রিজার্ভ ব্যাংক নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী; ইহা এক টাকার নোট ছাড়া অন্য সমস্ত নোটই প্রচলন করিয়া থাকে। বর্তমানের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার মত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারে।

(২) সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য: কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের ব্যাংক সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদিত হয় রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে। এই সকল সরকারের টাকাকড়ি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা থাকে। রিজার্ভ ব্যাংক সরকারী ঋণ পরিচালনা করে, প্রয়োজনমত সরকারের অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণ করে, সরকারকে স্বল্পকালীন ঋণ প্রদান করে এবং বিদেশে ভারত সরকারের এজেন্ট হিসাবে কার্য করে।

(৩) টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষা: টাকার বিনিময়-মূল্য রক্ষার ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর অর্পিত। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে নির্দিষ্ট হারে পাউণ্ড, ডলার প্রভৃতি বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়।

(৪) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য: রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সকল তপশীলী বাণিজ্যিক ও বিনিময় ব্যাংককে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। ইচ্ছা করিলে রিজার্ভ ব্যাংক যে এই জমার পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ৫ গুণ বা শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে তাহার উল্লেখ পূর্বেই

করা হইয়াছে।* তপশীলী ব্যাংকগুলিকে (Scheduled Banks) আবার রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট সাপ্তাহিক হিসাবনিকাশ প্রদান করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে ঐ সকল ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ, পুনর্বাট্টা** প্রভৃতির সুবিধাও ভোগ করে।

(৫) কৃষি-ঋণ সংক্রান্ত কার্য: রিজার্ভ ব্যাংকের কৃষি-ঋণ বিভাগের কার্য হইল কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায় সমিতির প্রসার ও সুসংগঠন, তাহাদের ঋণ প্রদান করা ইত্যাদির মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্যসাধনে করিবার প্রচেষ্টা করে।

(৬) ঋণ ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ: ইহাই রিজার্ভ ব্যাংকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইহা সুদের হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে কারবার, জমার অনুপাতের পরিবর্তন প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা যে-কোন ব্যাংককে উপদেশ, নির্দেশ ও আদেশ প্রদান করিতে পারে। ইহার এই নির্দেশ ও আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বিভিন্ন সংশোধনসহ ১৯৪৯ সালের ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) হইতে প্রাপ্ত।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ রিজার্ভ ব্যাংকের এলাকাধীন নহে

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের এলাকাধীন নহে। ফলে ভারতের সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India): পূর্বে এই ব্যাংকের নাম ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাংক (Imperial Bank of India)। ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ছিল ভারতের বৃহত্তম যৌথ পুঁজি ব্যাংক। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক।

পূর্বে ইহা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক নামে অভিহিত ছিল

রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পূর্বের ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যই সম্পাদন করে। উপরন্তু, ইহার উপর গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থা (rural credit system) সুসংগঠিত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইহা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন নূতন শাখা খুলিতেছে, অর্থ স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (remittance facilities) দান করিতেছে এবং গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংগ্রহের প্রচেষ্টা করিতেছে।

কার্যাবলী

অনেক স্থলে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের এজেণ্ট হিসাবেও কার্য করে।

যৌথ পুঁজি ব্যাংক (Joint Stock Banks): ভারতের কোম্পানী আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রীরত এই সকল ব্যাংক পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সকল প্রকার বাণিজ্যিক কার্যই সম্পাদন করে। এইজন্য ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক বলিয়াও অভিহিত। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) তপশীলভুক্ত বা তপশীলী (scheduled),

ইহারা বাণিজ্যিক ব্যাংক নামেও অভিহিত

* ২২৭ পৃষ্ঠা। ** ২২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

এবং (খ) তপশীল-বহির্ভূত (non-scheduled)। রিজার্ভ ব্যাংক অনুমোদিত ব্যাংকগুলির একটি তালিকা বা তপশীল রক্ষা করে; এবং এই তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিই তপশালী ব্যাংক নামে পরিচিত।

তপশীলী ও তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক

তপশীলভুক্ত হইবার জন্য ব্যাংকের মূলধন (আমানত নহে) ৫ লক্ষ টাকা হইবার প্রয়োজন হয়। তপশীলী ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে কয়েকটি সুবিধা পায়। ইহার পরিবর্তে তপশীলী ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ জমা রাখিতে হয়। তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক-গুলিকে তাহাদের আমানতের অনুরূপ অংশ হয় নিজেদের নিকট নগদ টাকায় না-হয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়।

বর্তমানে ভারতে ৩৪৫-এর মত উল্লেখযোগ্য যৌথ পুঁজি ব্যাংক আছে। ইহার মধ্যে তপশীলী ব্যাংকের (বিনিময় ব্যাংক বাদ দিয়া) সংখ্যা হইল ৬৮।* সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাংক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া—এই কয়টিই বড় বড় যৌথ পুঁজি ব্যাংক।

কয়েকটি যৌথ পুঁজি ব্যাংক

বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks): বিনিময় ব্যাংকগুলিও তপশীলী যৌথ পুঁজি ব্যাংক। তবে দুইটি কারণে ইহাদের পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়: (১) ইহাদের মালিকানা সম্পূর্ণ বিদেশীয়; (২) বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থসাহায্য এবং মুদ্রা বিনিময় ইহাদের কার্য। মালিকানা বিদেশীয় বলিয়া ইহাদিগকে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংকও (Foreign Exchange Banks) বলা হয়।

বিনিময় ব্যাংক ও যৌথ পুঁজি ব্যাংক

বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) যাহাদের ব্যবসায়ের বৃহত্তর অংশ ভারতে সীমাবদ্ধ; এবং (খ) যাহারা বৃহৎ বৈদেশিক ব্যাংকের ভারতীয় শাখামাত্র। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক (National Bank of India), মারক্যান্টাইল ব্যাংক (Mercantile Bank of India), চার্টার্ড ব্যাংক (Chartered Bank) ইত্যাদিই প্রধান। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে আছে লয়েড্স্ ব্যাংক (Lloyds Bank), ন্যাশনাল সিটি ব্যাংক অফ্ নিউ ইয়র্ক (National City Bank of New York), ইত্যাদি।

দুইশ্রেণীর বিনিময় ব্যাংক

বহির্বাণিজ্যে অর্থসাহায্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় বিনিময় ব্যাংকগুলির প্রধান কার্য হইলেও ইহারা উত্তরোত্তর অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতেছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যান্য কার্য—যথা, আমানত গ্রহণ ঋণপ্রদান ইত্যাদিও সম্পাদন করিতেছে। ১৯৬২ সালের শেষে উহাদের মোট সংখ্যা ছিল ১৫।

কার্যাবলী

---

* পূর্বে সংখ্যা আরও অনেক বেশী ছিল। এখন সংযুক্তিকরণের (amalgamation) ফলে সংখ্যা কমিয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছে।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ (Indigenous Bankers) ঃ মহাজন, সাউকর, শ্রেষ্ঠী, স্রফ্ প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ এই পর্যায়ভুক্ত। ইংরাজদের আগমনের বহু পূর্ব হইতেই ইহারা সনাতন পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। ঋণপ্রদান, হুণ্ডি লইয়া কারবার, আমানতগ্রহণ, সোনারূপার ব্যবসায়, মালমজুত প্রভৃতি দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ের অংগীভূত।

দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়ী কাহাদের বলে

ইহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতি

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই সকল ব্যাংক-ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবসায়ের বহির্ভূত কাজকারবারও করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহারা রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীন নহে।

ভারতের বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক
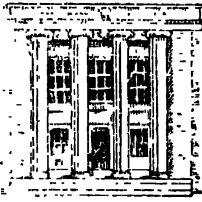
রাষ্ট্রীয় ব্যাংক

রিজার্ভ ব্যাংক

পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক
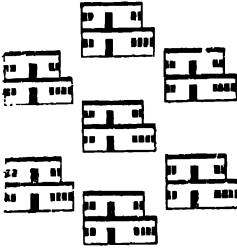
বিনিময় ব্যাংক
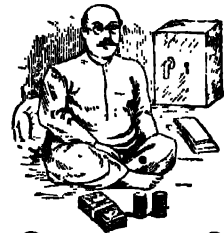
দেশীয় ব্যাংক ব্যবসায়ী
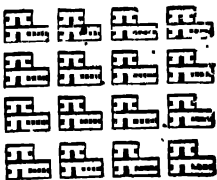
যৌথ পুঁজি ব্যাংক

সমবায় ব্যাংক

সংক্ষিপ্তসার

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধার জন্য টাকাকড়ির উদ্ভব হয়। টাকাকড়ি বর্তমান বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মানুষ দেখিয়াছে যে উর্ধ্ব মূল্যের টাকাকড়ির জন্য কাগজ এবং স্বল্প মূল্যের টাকাকড়ির জন্য ধাতব মুদ্রাই শ্রেষ্ঠ।

টাকাকড়ির কার্যাবলী: টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি—(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, এবং (ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব প্রয়োজন।

টাকাকড়ি উৎপাদন-ব্যবস্থাকেও চালু রাখে।

টাকাকড়ি কি?: বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি। সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংকেই প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি: প্রধানত টাকাকড়ি দুই প্রকারের হয়—(ক) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি, এবং (খ) আসল টাকাকড়ি।

আসল টাকাকড়ি দুই প্রকারের হয়—(১) কাগজী টাকাকড়ি, (২) ধাতব টাকাকড়ি। কাগজী টাকাকড়ি বা নোট দুই প্রকারের—(১) পরিবর্তনীয়, (২) অপরিবর্তনীয়। ধাতব মুদ্রাও দুই প্রকারের —(১) প্রামাণিক ও (২) নিদর্শক।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) সসীম বিহিত মুদ্রা ও (খ) অসীম বিহিত মুদ্রার মধ্যে।

উপরি-উক্ত সকল টাকাকড়িই সরকার-সৃষ্ট। ইহা ছাড়াও ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি আছে।

মুদ্রামান: মুদ্রামান মোটামুটি দুই প্রকারের—(ক) ধাতব মুদ্রামান, (খ) কাগজী মুদ্রামান। ধাতব মুদ্রামানের অধীনে ১। একধাতু স্বর্ণমান, ২। একধাতু রৌপ্যমান, এবং ৩। দ্বিধাতুমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

স্বর্ণমান আবার চারি প্রকারের হয়—১। স্বর্ণমুদ্রামান, ২। স্বর্ণপিণ্ডমান, ৩। স্বর্ণবিনিময়মান, ৪। স্বর্ণসমতামান। এইজন্য বলা যায় যে স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ আছে।

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা: কাগজী মুদ্রার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—১। ইহা সহজ বহনযোগ্য, ২। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয়, ৩। ইহা পরিবর্তনশীল, এবং ৪। ইহা সম্প্রসারণশীল। ইহার অসুবিধাগুলি হইল—১। ইহার সম্প্রসারণের জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে; ২। ইহা বিদেশীয়রা গ্রহণ করে না; এবং ৩। ইহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে।

টাকাকড়ি সৃজন ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি: বর্তমানে একমাত্র সরকারই টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া অনেক সময় মনে করা হয়। কিন্তু ইহা ভুল। সরকারের ন্যায় ব্যাংকগুলিও টাকাকড়ি সৃজন করে। এইরূপ টাকাকড়িকে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলা হয়। ব্যাংকের আমানতই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি।

ব্যাংক: ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে: (ক) বণিকদের ব্যবসায়, (খ) মহাজনদের ব্যবসায়, এবং (গ) স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। ব্যাংক-ব্যবসায়কে ঋণের ব্যবসায় বলা হয়। বিশ্বাসই এই কারবারের ভিত্তি; ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ ব্যক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঋণ দেয়।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা: ব্যাংক দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করে; শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে; টাকাকড়ির সৃষ্টি করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করে; আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে; এবং অন্যান্যভাবেও ইহা দেশের শিল্পবাণিজ্যে সহায়তা করে।

ব্যাংকের কার্যাবলী : বলা যায়, ব্যাংকের কার্যাবলী চারি প্রকারের—১। সংক্ষয়সংগ্রহ, ২। ঋণ ও বিনিয়োগ, ৩। টাকাকড়ির সৃজন, এবং ৪। অন্যান্য কার্য। ব্যাংক সঞ্চয় সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার আমানতের মাধ্যমে।

টাকাকড়ি সৃজন : ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃষ্টি করিয়া; আমানত সৃষ্টি বলিতে বুঝায় আমানতের দরুন টাকা না পাইয়াও আমানত বা জমার সৃষ্টি। ঋণপ্রদানের মাধ্যমেই ব্যাংক এইরূপ আমানত সৃষ্টি করে। মোটামুটি দেশের ব্যাংক-ব্যবসায় নগদ টাকায় যে পরিমাণ আমানত গ্রহণ করে তাহার ১০ গুণ পর্যন্ত টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে। এইরূপ টাকাকড়ি সৃজন ব্যাংকগুলি কতটা করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, দেশে নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ, দেশের লোকের নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের অভ্যাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি, ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক : বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জমিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই প্রধান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক সমাজের সমাজপতি। ইহার কার্যাবলীর মধ্যে ১। নোট প্রচলন, ২। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ৩। টাকাকড়ির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা, ৪। অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, ৫। সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, এবং ৬। মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখা—এই কয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থ-ব্যবস্থার ভালমন্দের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকাংশে দায়ী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রিত করে। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা পাঁচটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে—১। নৈতিক প্রণোদন, ২। সুদের হারে পরিবর্তন, ৩। খোলা বাজারে কারবার, ৪। জমার অনুপাতে পরিবর্তন এবং ৫। ঋণ-বরাদ্দ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্যকে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথ মূলধনী ব্যাংক নামেও পরিচিত।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের জন্য বিনিময় ব্যাংক, শিল্পবাণিজ্যকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য শিল্প ব্যাংক, জমিবন্ধকী কাযের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং পারস্পরিক সহায়তায় ঋণপ্রদানের জন্য সমবায় ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থা : ভারতে উপরি-উক্ত ধরনের অধিকাংশ ব্যাংকই আছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইল রিজার্ভ ব্যাংক। রিজার্ভ ব্যাংকের পর আছে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক। পূর্বে ইহা ইম্পিরিয়াল ব্যাংক নামে পরিচিত ছিল। যৌথ পুঁজি ব্যাংকগুলি দুই শ্রেণীভুক্ত—তপশীলী ও তপশীল-বহির্ভূত। ভারতের বিনিময় ব্যাংকগুলি বিদেশী মালিকানাধীন। ইহা ছাড়াও গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যাংক-ব্যবসায় পরিচালনাকারী দেশীয় ব্যাংক-ব্যবসায়িগণ আছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the difficulties attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the introduction of money.

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর। টাকাকড়ির প্রচলনের ফলে এই অসুবিধাগুলি কিভাবে দূরীভূত হইয়াছে তাহা দেখাও। [২১০-২১২ পৃষ্ঠা]

2. What is money ? Describe the functions of Money.

(H. S. (H) 1961 ; H. S. (C) Comp. 1961 ; P. U. 1962)

টাকাকড়ি কি ? টাকাকড়ির কার্যাবলী বর্ণনা কর। [২১২-২১৪ পৃষ্ঠা]

3. Describe the advantages of Money. (H. S. (H) Comp. 1961)
টাকাকড়ি ব্যবহারের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা কর। [২১০-২১৩ পৃষ্ঠা]

4. Describe the merits and demerits of Paper Money. (C. U. 1948, '49)
কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। [২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা]

5. What is a Bank ? What are its services to society for which you consider it useful ? (H. S. (H) 1961)
ব্যাংক কাহাকে বলে ? যে-সকল উপায়ে ব্যাংক সমাজের উপকার করে তাহাদের বর্ণনা কর। [২২২-২২৪ পৃষ্ঠা]

6, What are the functions of banking ? Carefully explain their importance in modern business. (H. S. (H) Comp. 1960)
ব্যাংক-ব্যবসায়ের কার্যাবলী কি কি ? বর্তমান ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে উহাদের গুরুত্ব কতটা তাহা দেখাও। [২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা]

7. Describe the functions of a bank ? What are the advantages of a good banking system ? (H. S. (H) Comp. 1962)
কোন ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর। সুসংগঠিত ব্যাংক-ব্যবস্থার সুবিধা কি কি ? [২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা]

8. What are the functions of banks ? How are those functions beneficial to the people in a country ? (H. S. (C) 1962)
ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি ? এই সকল কার্যে দেশের লোকের কিভাবে উপকার হয় ? [২২৩-২২৪ পৃষ্ঠা]

9. What are the functions of banks ? Do banks create Money ?
ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি ? ব্যাংকগুলি কি টাকাকড়ি সৃজন করে ? [২২৪-২২৭ পৃষ্ঠা]

10. What is a Central Bank ? What are its functions ? Illustrate your answer with reference to India ? (C. U. 1949, '50, '51, '57)
কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাহাকে বলে ? ইহার কার্যাবলী কি কি ? ভারতের দৃষ্টান্ত লইয়া প্রশ্নের উত্তর দাও। [২২৮-২২৯ এবং ২৩১-২৩৩ পৃষ্ঠা]

11. State the functions of a Central Bank. (H. S. (H) 1962)
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর। [২২৮-২২৯ পৃষ্ঠা]

12. State and explain the functions of a Central Bank in a modern banking organisation. (H. S. (C) Comp. 1960)
বর্তমান ব্যাংক-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর উল্লেখ ও ব্যাখ্যা কর। [২২৮-২৩০ পৃষ্ঠা]

13. State the functions of Commercial Banks in India. (H. S. (C) Comp. 1960)
ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির কার্যাবলী বর্ণনা কর। [২৩০-২৩১ এবং ২৩৩-২৩৪ পৃষ্ঠা]

14. Give a brief description of the Indian Banking System. (C. U. 1957, '58)
ভারতের ব্যাংক-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [২৩১-২৩৫ পৃষ্ঠা]

ষোড়শ অধ্যায়

টাকাকড়ির মূল্য

(Value of Money)

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর (Value of Money and Price Level): আমরা দেখিয়াছি, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশের কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইল, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়।

অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্য বলিতেও উহার বিনিময়-মূল্য বুঝায়।* অর্থাৎ, এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহাই টাকাকড়ির মূল্য। ইহাকে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি (purchasing power) বলা হয়।

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি বুঝায়

ভারতে টাকাকড়ির একক হইল 'টাকা' (Rupee)। সুতরাং এক টাকার যে-পরিমাণ ক্রয়শক্তি—অর্থাৎ, এক টাকায় যতখানি জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায় তাহাই এ-দেশে টাকাকড়ির মূল্য। অনুরূপভাবে, ইংলণ্ডে এক পাউণ্ডের বিনিময়ে যতখানি জিনিসপত্র কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ঐ দেশে টাকাকড়ির মূল্য।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের (Price Level) বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিতে হইবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং টাকাকড়ির মূল্যও বহুগুণ কমিয়া গিয়াছে। সাধারণ কথাবার্তায় লোকে যে প্রায়ই বলে 'টাকার আর দাম নাই' তাহা এই জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি বা টাকার মূল্যহ্রাসের উল্লেখ মাত্র।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের বিপরীত

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ (Reasons for Changes in the Price Level): মূল্যস্তরের পরিবর্তন প্রধানত দুইটি কারণে ঘটে—(ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন। জিনিসপত্রের যোগান যদি পূর্বের মতই থাকে, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে জিনিসের গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান অপরিবর্তিত

* অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য আছে; কিন্তু এক বিনিময় ছাড়া টাকাকড়ির কোন উপযোগিতা নাই। অতএব টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এই বিনিময়-মূল্য ছাড়া আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

থাকিয়া জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া গেলে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে।

টাকাকড়ি ও জিনিসপত্রের যোগান পরিবর্তিত হইলেই মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয়

আবার যদি এরূপ হয় যে টাকাকড়ির যোগান বাড়িল এবং সংগে সংগে জিনিসপত্রেরও যোগান কমিয়া গেল তবে মূল্যস্তর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। একদিকে ক্রমাগত নোট ছাপানোর দরুন টাকাকড়ির যোগান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল; অপরদিকে আমদানি কমিয়া যাওয়া, কলকারখানা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে সাধারণের জন্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছিল। ফলে মূল্যস্তর চারি গুণের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money): দেখা গেল, মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে (ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, এবং

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

(খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন—উভয়ের জন্যই। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে শুধু টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে, জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তনের জন্য নহে। আবার তাঁহারা এই বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন ঘটে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের জন্যই, অন্য কোন কারণে নহে। ইহার ফলে যে-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বলা হয়। তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: টাকাকড়ির পরিমাণ যে-দিকে এবং যতটা পরিবর্তিত হইবে মূল্যস্তরও সেই দিকে এবং ততটা পরিবর্তিত হইবে। টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ যদি দ্বিগুণ হয় তবে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে; টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হইয়া যায় মূল্যস্তরও অর্ধেক হইয়া যাইবে।

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money) মূল্যস্তরের (Price Level) ঠিক বিপরীত। সুতরাং মূল্যস্তর যতটা বৃদ্ধি পায় টাকাকডির মূল্যও ততটা কমে; এবং অপরদিকে মূল্যস্তর যতটা কমে টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি ততটা বৃদ্ধি পায়।

বিখ্যাত মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ফিসার (Fisher) টাকাকড়ির এই পরিমাণতত্ত্বকে প্রথমে নিম্নলিখিত সমীকরণের রূপে প্রকাশ করেন:

$$PT = MV$$

$$\text{অথবা } P = \frac{MV}{T}$$

সমীকরণটিতে PT হইল টাকাকড়ির চাহিদার এবং MV টাকাকড়ির যোগানের দিক। টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্ট হয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র হইতে। ইহার পরিমাণ T হইল এবং গড়পড়তা জিনিসপত্রের মূল্য বা মূল্যস্তর P হইলে মোট PT পরিমাণ টাকাকড়ির চাহিদা হইবে। অপরদিকে M হইল নগদ বা সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ির

পরিমাণ যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি টাকা দ্বারা অনেকবার বিনিময়কার্য সম্পাদন করা চলে। আমি যে টাকাটি রামের নিকট হইতে জিনিস বেচিয়া পাইলাম তাহা আবার শ্যামকে জিনিস কিনিবার জন্য দিতে পারি। সুতরাং ঐ টাকাটি দুইটি টাকার কায—অর্থাৎ, দুইবার বিনিময় সম্পাদনের কার্য করিতে পারে; অন্য একটি মুদ্রা আবার তিনবার বা চারিবার বিনিময় সম্পাদন করিতে পারে। এইভাবে দেশে যত সরকার-সৃষ্ট মুদ্রা আছে তাহাদের বিনিময় সম্পাদনের একটি গড় নির্ণয় করা যায়। এই গড়কেই V বা টাকাকড়ির প্রচলনগতি (velocity of circulation) বলা হয়। টাকাকড়ির পরিমাণকে টাকাকড়ির প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বে ইহাকে MV আকারে প্রকাশ করা হয়।

ফিসারের সমীকরণ

এখানে $PT = MV$ হইলে, MV-কে T দিয়া ভাগ করিলেই P কত তাহা জানা যাইবে। কোন কারণে হঠাৎ যদি M বা মোট টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে P বা মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইবে। অপরদিকে কোন কারণে টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তবে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে।*

অধ্যাপক ফিসারের উপরি উক্ত পরিমাণতত্ত্বে শুধু সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়ির কথা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় চলে। এই কারণে ফিসার পরে নিম্নলিখিতভাবে অর্থের পরিমাণতত্ত্বটির পরিবর্তনসাধন করেন:

পরিবর্তিত সমীকরণ

$$PT = MV + M'V'$$

* একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন এক দেশে মাত্র ১০০০টি ধাতব মুদ্রা (M) প্রচলিত আছে, এবং মোট জিনিসপত্রের সংখ্যা ৬০০০। ৬০০০ সংখ্যক জিনিসপত্রের মধ্যে ৪০০০টি বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় (T)। বাকী ২০০০ যাহারা উৎপাদন করে তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। অতএব ৪০০০টি সংখ্যক জিনিসপত্রের ক্রয়বিক্রয় ১০০০টি মুদ্রার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেকটি মুদ্রা গড় ৮ বার করিয়া হস্তান্তরিত হইলে—অর্থাৎ, মুদ্রার প্রচলনগতি ৮ হইলে পাটীগাণিতিক মূল্যে সমীকরণটি এইরূপ দাঁড়াইবে:

$$P = \frac{M(১০০০) \times V(৮)}{T(৪০০০)}$$

অথবা $P = \frac{৮০০০}{৪০০০}$

অথবা $P = ২$। অর্থাৎ, জিনিসপত্রের গড়মূল্য বা মূল্যস্তর হইল ২ টাকা।

এখন ধরা যাউক, হঠাৎ কোন কারণে ঐ দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হইল। ফলে P-ও দ্বিগুণ হইবে—যথা,

$$P = \frac{M(২০০০) \times V(৮)}{T(৪০০০)}$$

অথবা $P = ৪$।

এখানে M′ বলিতে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং V′ বলিতে উহার প্রচলনগতি বুঝাইতেছে। সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের একাংশ পাওয়া যাইবে; এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে টাকাকড়ির যোগানের অপরাংশ পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে অবশ্য সমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। ইহা এই প্রকার রূপ ধারণ করিবে মাত্র :

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখন P বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে শুধু M-এর পরিবর্তনের জন্য নহে, M′-এর পরিবর্তনের জন্যও বটে। অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশে নগদ ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি—উভয়ের পরিমাণ যতটা বাড়িবে মূল্যস্তরও ততটা বাড়িবে; এবং এই দুই প্রকার টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইবে মূল্যস্তরও ততটা হ্রাস পাইবে।

সমালোচনা : টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের (T) এবং টাকাকড়ির প্রচলনগতির (V এবং V′) কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই অনুমান ঠিক নহে।

তত্ত্বটি ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরশীল

দেখা যায় যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদনের পরিমাণেও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। দাম বাড়িলে মুনাফা বেশী হয় বলিয়া উৎপাদকগণ অধিক উৎপাদনে আগ্রহান্বিত হয়; অপরদিকে দাম কমিলে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। আরও দেখা যায়, টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে উহার প্রচলনগতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। ফলে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয় না।

মোটকথা, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় টাকাকড়ির মূল্য নির্ভর করে উহার চাহিদা ও যোগান—উভয়ের উপর। এই চাহিদা ও যোগান নানা বিষয়ের—যথা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ, দেশের লোকে কি-পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যবহার করে, এবং কি-পরিমাণ প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় (barter) করে,—ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালর দিকে যাইতে থাকে তবে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। ইহা ঘটিবে টাকাকড়ির প্রচলনগতি বাড়িয়া। অপরদিকে দেশে কাজকারবারে যদি মন্দার সূচনা হয় তবে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইলেও মূল্যস্তরে বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। কারণ, সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রচলনগতি কমিয়া যাইতে পারে।

একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই উহার মূল্য-নির্ধারক নহে

অতএব, একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই টাকাকড়ির মূল্য-নির্ধারণ করে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ (Measurement of Changes in the General Price Level) : মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, বিলাস-দ্রব্যের মূল্যস্তর, শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্তর, ইত্যাদি। চালডাল, গমআটা, তৈল, লবণ, মসলাপাতি, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি—সকল জিনিসের গড়পড়তা দামকে 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলা যাইতে পারে।

সাধারণ মূল্যস্তর বলিতে কি বুঝায়

এই সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনই দেশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে ইহার পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয়; এবং সাধারণ মূল্যস্তরবৃদ্ধি বা টাকাকড়ির মূল্যহ্রাসের ফলে দরিদ্র চাকরিয়ারা যাহাতে দুর্দশায় পতিত না হয় তাহার জন্য মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ইত্যাদি। মূল্যস্তর কমিয়া আসিলে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মাগ্‌গি ভাতা আবার কমাইয়া দেওয়া হয়, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা হয়।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের গুরুত্ব

কিন্তু এক সময়ের তুলনায় অন্য এক সময় মূল্যস্তর বাড়িল কি কমিল এবং কতটা পরিমাণ বাড়িল বা কমিল তাহা বুঝা যায় কিরূপে? ইহা বুঝিবার উপায় হইল সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে সূচকসংখ্যা পদ্ধতি (Device of Index Numbers) বলা হয়। সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিয়া দ্রব্যমূল্য বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় সূচকসংখ্যার দ্বারা

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য (absolute value) পরিমাপ করিবার কোন উপায়ই নাই; যাহা করা যায় তাহা হইল উহার আপেক্ষিক মূল্য (relative value)—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় উহার পরিবর্তন নির্ধারণ করা। টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যত প্রকার দ্রব্য ও সেবা যে-পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে এক টাকার মূল্য হইল ২ কিলোগ্রাম চাল, ৩ কিলোগ্রাম গম, $\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম ডাল, ১ খানি সূক্ষ্ম শাড়ির এক-দশমাংশ, ১ খানি মোটা ধুতির এক-চতুর্থাংশ, বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-বেতনের এক-ষষ্ঠাংশ, ডাক্তারের ফী'র এক-পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে যে তালিকা প্রস্তুত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহা সীমাহীন হইবে। সুতরাং ইহা সম্ভব নয়।

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য পরিমাপ করা যায় না, মাত্র আপেক্ষিক মূল্যই করা যায়

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য বলিতে কি বুঝায়

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন (Construction of Simple Index Number) : সূচকসংখ্যায় বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া

গড়পড়তা দাম বা উহার বিপরীত- টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন হিসাব করা হয়। সুতরাং সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মূল্যস্তরের সংখ্যা (a series of price level)।

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে

মূল্যস্তর বিভিন্ন প্রকারের হয় বলিয়া সূচকসংখ্যাও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা যাইতে পারে—যথা, সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, বিলাস-দ্রব্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে সূচকসংখ্যা প্রণয়ন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হইয়া থাকে।

সূচকসংখ্যা প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর

(ক) ভিত্তি বৎসর নির্বাচন (Selection of the Base Year): প্রথমেই ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে—অর্থাৎ, যে বৎসরের তুলনায় অন্যান্য বৎসরের দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করা হইবে তাহাকে প্রথমে বাছিয়া লইতে হইবে।

(খ) দ্রব্যাদির নির্বাচন (Selection of Commodities): দ্বিতীয়ত, সূচকসংখ্যার উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে। যদি শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করা হয়, তবে শ্রমিকরা যে-যে দ্রব্য ও সেবা সচরাচর ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। যদি এরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিবার জন্য সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিতে হয় তবে যত বেশী সংখ্যক দ্রব্য ও সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ততই ভাল।

দ্রব্যাদির নির্বাচন কিভাবে করিতে হইবে

(গ) দাম সংগ্রহ (Collection of Prices): দ্রব্যাদি নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্ট সকল বৎসরে উহাদের দাম সংগ্রহ করা প্রয়োজন। খুচরা দাম (retail prices) সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পাইকারী দামও (wholesale prices) চলিতে পারে।

(ঘ) ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের গড় দাম ১০০ করিয়া ধরিয়া তুলনার বৎসরে উহা শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা দেখানো প্রয়োজন।

(ঙ) এইবার সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া উহাদের মধ্যে তুলনা করিলেই মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যাইবে। ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের দাম ১০০ করিয়া ধরা হয় বলিয়া ঐ বৎসরের গড় ১০০ হইতে বাধ্য। তুলনার বৎসরের গড় ১০০ অপেক্ষা যতটা অধিক বা কম হইবে মূল্যস্তর ততটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মনে করা যাউক, ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৩ সালে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের পরিবর্তন নির্ধারণ করা প্রয়োজন।* দেশে চাউল গম তৈল ঘৃত ও মৎস্য এই পাঁচ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রধানত ব্যবহৃত হইলে সূচকসংখ্যাটি পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার ছকটির মত হইবে।

---

* আমাদের দেশে ১৯৫৮ সাল হইতে মেট্রিক ওজন-পদ্ধতি আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়; দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা তাহার পূর্বেই চালু হইয়াছিল।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসরে (১৯৫৮ সাল) দাম	ভিত্তি বৎসরের গড়	১৯৬৩ সালের দাম	১৯৬৩ সালের গড় (১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি)
	প্রতি কুইন্টাল টা. ন.প.		প্রতি কুইন্টাল টা. ন.প.	
১। চাউল	৫০ ০০	১০০	৬০ ০০	১২০
২। গম	৬০ ০০	১০০	৭৫ ০০	১২৫
৩। তৈল	২০০ ০০	১০০	২৪০ ০০	১২০
৪। ঘৃত	১০০০ ০০	১০০	১২০০ ০০	১২০
৫। মৎস্য	৩০০ ০০	১০০	৪৫০ ০০	১৫০
		৫০০ ÷ ৫ = ১০০		৬৩৫ ÷ ৫ = ১২৭

এই কাল্পনিক সূচকসংখ্যা অনুসারে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৩ সালে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের দাম গড়পড়তা শতকরা ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে। এইভাবে খাদ্যদ্রব্যের সূচক-সংখ্যার পরিবর্তে সাধারণ সূচকসংখ্যা (General Index Number) প্রণয়ন করিয়া যদি দেখা যায় যে, সকল জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম শতকরা ঐ ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে তবে টাকাকড়ির মূল্য ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ কমিয়াছে বুঝিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation): মুদ্রাস্ফীতি বা ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ইনফ্লেশন (inflation) বর্তমানে একটি বিশেষ সুপরিচিত শব্দ হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ অনেকেরই জানা নাই। যখনই জিনিসপত্রের দাম কোনরূপ বৃদ্ধি পায় তখনই লোকে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির অর্থ মুদ্রাস্ফীতি নয়। উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য কিছু পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। ইহাকে অর্থবিদ্যায় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা হয় না। আবার অনেকের ধারণা আছে যে মূল্যবৃদ্ধি হইলেই সাধারণ লোকের দুঃখদুর্দশা উপস্থিত হয় এবং এই দুঃখদুর্দশার অবস্থাই মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন। ইহাও ঠিক নহে। অনেক সময় মন্দাবাজারের দরুন মূল্যস্তর বিশেষ নামিয়া আসে। তখন নিয়োগ, উৎপাদন, আয় সকলই কমিয়া যায়। ফলে লোকে ভোগ্যদ্রব্যের জন্য পূর্বের মত ব্যয় করিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই দাম বা মূল্যস্তর কমিয়া আসে। এই অবস্থাই সাধারণের দুঃখদুর্দশার সূচক—কারণ, তাহাদের আয় ও নিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহার পর ব্যবসায়ক্ষেত্রে আবার সুদিন আসিলে উৎপাদন বাড়িতে থাকে; ফলে নিয়োগ ও আয়ের পরিমাণও বাড়িতে থাকে। তখন লোকের দুঃখের অনেকটা অবসান হয়। এই অবস্থায় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য অধিক টাকাকড়ি ব্যবহৃত হয় বলিয়া দামও ঊর্ধ্বমুখী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দাম বা মূল্যস্তরের বৃদ্ধি মাত্রই লোকের দুঃখদুর্দশার নির্দেশক নহে।

মূল্যবৃদ্ধির ফলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না

আবার মূল্যবৃদ্ধির ফলেই লোকের দুঃখদুর্দশা বাড়ে না

কিন্তু যদি টাকাকড়ির পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে এবং ইহা সকল সময়ই দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনকে ছাড়াইয়া যায় তবেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই অবস্থায় শুধু উৎপন্ন দ্রব্যাদি নহে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্যও ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে—কারণ, উহাদেরও যোগান চাহিদার সহিত তাল রাখিতে পারিবে না।

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা

টাকাকড়ি ও ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত—অর্থাৎ, বিনিময়কার্যের জন্য যতটা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলেই এইরূপ অবস্থা ঘটে।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

অতএব বলিতে পারা যায়, সাধারণের আয় বা ক্রয়ক্ষমতা যে-হারে বৃদ্ধি পায় ভোগ্যদ্রব্যাদির সরবরাহ তদপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সাধারণত উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পূর্ণ-নিয়োগের (full employment of the factors of production) পর দেশে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে দেখা যায়।

মুদ্রাসংকোচ (Deflation) : মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা হইল মুদ্রাসংকোচ। এই অবস্থায় মোট আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় বলিয়া মোট টাকাকড়ির পরিমাণ এবং ফলে, মূল্যস্তরও কমিয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থাকেই মুদ্রাসংকোচের অবস্থা বলা হয়।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল (Effects of Changes in Prices) : জিনিসপত্রের দাম বা উহার বিপরীত মুদ্রামূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফল সমাজের সকল শ্রেণীর উপর সমান নহে। এই কারণেই সরকারকে মুদ্রামূল্যে যথাসম্ভব স্থায়িত্ব রক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বস্তুত, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা বা দামের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারণ সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত।*

দাম বৃদ্ধি পাইলে কিছু লোকের লাভ হয়। খাতক (debtor), শিল্পপতি, মালমজুতকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। খাতক সকল সময়ই পূর্বের চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধ করে; অথচ দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুতরাং খাতক লাভবান এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পপতিদের লাভ হয় প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, তাহারা যখন কাঁচামাল ক্রয় করে তখন উহার দাম কম থাকে, কিন্তু যখন তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করে তখন কাঁচামালের দাম বাড়িয়া যায়।

দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়

তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করিবার সময় সেই সময়কার বর্ধিত দামেই কাঁচামালের হিসাব করে। উদাহরণস্বরূপ, শীতবস্ত্র-উৎপাদক ৮ টাকা পাউণ্ড দামে পশম কিনিল; কিন্তু তৈয়ারি আলোয়ান বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে পশমের দাম বাড়িয়া ১০ টাকা পাউণ্ড হইয়াছে। সে এই ১০ টাকা দামে হিসাব করিয়াই আলোয়ানের দাম ঠিক করিবে। দ্বিতীয়ত, তৈয়ারি জিনিসের দাম যে-হারে বৃদ্ধি পায়, মজুরি সুদ ইত্যাদি সে-হারে বৃদ্ধি পায় না। যাহারা মালমজুতের ব্যবসায় করে তাহাদেরও লাভ

* ১৫২-১৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

হয়। কিন্তু যাহারা মাস-মাহিনা অথবা দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে কার্য করে তাহাদের বেতন ও মজুরি দামবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে না বলিয়া দামবৃদ্ধির ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেনসনভোগী প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের আয় একেবারে ধরাবাঁধা তাহাদের আরও ক্ষতি হয়। শ্রমজীবীরা কিন্তু একদিক দিয়া লাভ করে—কারণ, তাহাদের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। ভারতের ন্যায় দেশে কৃষকের দুই দিক দিয়া লাভ হয়। প্রথমত, ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋণের ভার কমিয়া যায়; দ্বিতীয়ত, কৃষিজ উৎপন্নের দাম বাড়িলেও খাজনা বাড়ে না। পরিশেষে, বর্ধিত দামের ফলে সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়া যায়। ইহাতেও অনেকের ক্ষতি হয়।

দাম হ্রাস পাইলে সকল দিক দিয়াই ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে—যথা, পাওনাদার লাভবান ও খাতক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পপতিদের মুনাফা কমে, মালমজুতকারীর লোকসান হয়, যাহারা বেতন ও মজুরি পায় তাহাদের অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠে, কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ কমে। সুতরাং শ্রেণী হিসাবে তাহাদের ক্ষতিই হয়। কৃষকেরও ক্ষতি হয়। খাজনা, সুদ প্রভৃতির হার একই থাকে অথচ পণ্যের দাম কমার জন্য তাহার আয় কমিয়া যায়। পেনসনভোগীর ন্যায় লোকের আয় নির্দিষ্ট থাকিলেও অবস্থা পূর্বাপেক্ষা সচ্ছল হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট আয়ের বিনিময়ে তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। পূর্বে যাহারা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদেরও অনুরূপ সুবিধা হয়।

দাম হ্রাস পাইলে বিপরীত শ্রেণীর লাভক্ষতি হয়

সংক্ষিপ্তসার

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর: টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি বুঝায়। টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের ঠিক বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ: দুইটি কারণে মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয় (ক) টাকাকড়ির চাহিদায় বা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন, (খ) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব: প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে একমাত্র টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের ফলেই মূল্যস্তর বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হয়। তাঁহাদের আরও ধারণা ছিল যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হইল টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন। এই ধারণার ফলেই টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সংক্ষেপে তত্ত্বটি অনুসারে, টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বাড়িবে বা কমিবে, মূল্যস্তরও সেই পরিমাণ বাড়িবে বা কমিবে। টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকাকড়ির পরিমাণ অর্ধেক হইলে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরশীল। ইহা একটি আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা এবং কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি সকল জিনিসের গড়পড়তা দামকে সাধারণ মূল্যস্তর বলা হয়। মূল্যস্তরের পরিবর্তন বুঝা যায় সূচকসংখ্যা প্রণয়নের দ্বারা। সূচকসংখ্যা টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্য—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় টাকাকড়ির মূল্য নির্দেশ করে।

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন: সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মূল্যস্তর। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ইহা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। প্রণয়ন করিবার বিভিন্ন স্তর হইল নিম্নলিখিত রূপ: (ক) প্রথমে ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে; (খ) তারপর উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে

হইবে ; (গ) তৃতীয় স্থলে দাম সংগ্রহ করিতে হইবে ; (ঘ) চতুর্থত, ভিত্তি বৎসরের তুলনায় গড় দাম শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে ; (ঙ) পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া তুলনা করিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি : মূল্যবৃদ্ধি মাত্রই মুদ্রাস্ফীতির নির্দেশক নহে ; আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেই লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে না। মূল্যবৃদ্ধি হইতে হইতে যদি পূর্ণনিয়োগের অবস্থা আসার পরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে তবেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতি হইল ভোগ্যদ্রব্যাদির সরবরাহ অপেক্ষা সাধারণের ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল : দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়। যাহাদের লাভ হয় তাহাদের মধ্যে দেনাদার, শিল্পপতি, কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিই প্রধান। যাহাদের ক্ষতি হয় তাহাদের মধ্যে পাওনাদার, শ্রমিক, বাঁধা মাহিনার চাকরিয়া প্রভৃতি আছে। নিয়োগবৃদ্ধি হয় বলিয়া ফলগতভাবে শ্রমিকরা অবশ্য লাভবান হয়। দাম হ্রাস পাইলে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the term 'Value of Money' ? How can you measure changes in the Value of Money ? (C. U. 1951)

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায় ? কিভাবে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবে ? [২৩৯ এবং ২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা]

2. What are Index Numbers ? Why and how are they constructed ?

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে ? কেন এবং কিভাবে তাহাদের প্রণয়ন করা হয় ? [২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা]

3. Construct a Simple Index Number showing change in the prices of foodstuff. খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে পরিবর্তন দেখাইয়া একটি সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন কর। [২৪৩-২৪৫ পৃষ্ঠা]

4. Write short notes on : (a) Index Numbers, (b) Inflation. (H. S. (H) Comp. 1962)

(ক) সূচকসংখ্যা, এবং (খ) মুদ্রাস্ফীতির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [২৪৩-২৪৬ পৃষ্ঠা]

5. Explain carefully the relationship between changes in the quantity of money and changes in the general price level. (C. U. 1953, '60)

টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন এবং সাধারণ মূল্যস্তরে পরিবর্তনের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা সঠিকভাবে বর্ণনা কর। [২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা]

6. What is meant by the term Value of Money ? How is the Value of Money related to the quantity of money ? (H. S. (H) 1962)

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায় ? টাকাকড়ির মূল্য টাকাকড়ির পরিমাণের সহিত কিভাবে সম্পর্কিত ? [২৩৯-২৪২ পৃষ্ঠা]

7. Explain the Quantity Theory o the Value of Money. (H. S. (C) Comp. 1960)

টাকাকড়ির মূল্যের পরিমাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। [২৪০-২৪২ পৃষ্ঠা]

8. What is 'Inflation' ? How does inflation affect businessmen and wage-earners ? (H. S. (H) 1960)

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে ? ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল কি তাহা ব্যাখ্যা কর। [২৪৫-২৪৬ এবং ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা]

9. How will a period of rising prices affect the following groups in the population : (a) Farmers, (b) Wage-earners, and (c) Teachers ? (H. S. (H) Comp. 1960)

উঠতি দাম জনসংখ্যার নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা কর : (ক) কৃষক, (খ) বেতনভোগী, এবং (গ) শিক্ষক। [২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা]

10. What is Inflation and what are its evils ? (H. S. (C) 1961)

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে এবং ইহার কুফল কি কি ? [২৪৫-২৪৬ এবং ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা]

একাদশ শ্রেণী

সপ্তদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে? (What is International Trade ?) : বর্তমান দিনে অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোন দেশই বাঁচিয়া থাকিতে চাহে না। চাহিলেও ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাই এক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত নানাপ্রকার বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। প্রত্যেক দেশই তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের কতকগুলি অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে এবং উহাদের পরিবর্তে আবার অন্যান্য দেশ হইতে কতকগুলি দ্রব্য আমদানি করে। যেমন, আমাদের দেশ অন্যান্য দেশে চা, পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্র প্রভৃতি রপ্তানি করে আবার খাদ্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করে। এক দেশের সহিত অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদির এই বিনিময়কেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলিতে আন্তর্জাতিক দ্রব্য-বিনিময় বুঝায়

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ (Territorial Division of Labour) : মূলত এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নয়। যে কারণে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সেই কারণেই এক দেশ অন্য দেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হয়। এই কারণটি হইল শ্রমবিভাগ। ব্যক্তির কথা ধরিলে দেখা যায় যে কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজে উৎপাদন করে না। প্রত্যেকেই কোন এক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জন করে এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অন্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহার অভাব পূরণ করে। যেমন, চিকিৎসক চিকিৎসাকার্যেই নিযুক্ত থাকেন, খাদ্যের জন্য মাঠে যাইয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হন না, অথবা নিজে ইট কাটিয়া বাড়ী নির্মাণের চেষ্টা করেন না। এই সকল দ্রব্য তিনি চিকিৎসা হইতে অর্জিত অর্থের বিনিময়ে অন্যের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন। এমনকি কৃষিতে তাঁহার দক্ষতা অন্যান্য কৃষকের তুলনায় অধিক হইলেও তিনি চিকিৎসাই করিবেন—কারণ, তাঁহার নিজের দক্ষতা কৃষি অপেক্ষা চিকিৎসাতেই অধিক। এইভাবে বিভিন্ন লোক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অভাবপূরণের জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে এবং বিনিময়ের মাধ্যমে তাহা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। চাষী চাষ করে, ডাক্তার ডাক্তারি করেন, উকিল ওকালতি করেন, শিক্ষক শিক্ষকতা করেন, শ্রমিক কারখানায় কাজ করে, রাজমিস্ত্রী বাড়ী নির্মাণ করে। কিন্তু সকলেই বিনিময়ের মাধ্যমে অন্নবস্ত্র আশ্রয় ও অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

শ্রমবিভাগের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব হয়

শ্রমবিভাগের কারণ দক্ষতার বিভিন্নতা

এইরূপ শ্রমবিভাগের সুবিধা হইল যে, বিভিন্ন লোক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকায় একদিকে যেমন কর্মদক্ষতা বাড়ে এবং উৎপাদন বেশী হয়, অপর-দিকে তেমনি বহু রকমের জিনিসপত্রের উৎপাদন সম্ভব হয় এবং ফলে লোকের জীবনধারণের মান বৃদ্ধি পায় ও ভোগে বৈচিত্র্য আসে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা

ব্যক্তির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও কর্মবিভাগ দেখা যায়। সকল অঞ্চলের সকল দ্রব্য উৎপাদনে সমান দক্ষতা বা সুযোগসুবিধা থাকে না। যে অঞ্চলের যে-দ্রব্য উৎপাদনে অধিক সুবিধা থাকে সেই অঞ্চলের সেই দ্রব্য উৎপাদনে তাহার উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়োগ করে। যেমন, আমাদের দেশে বোম্বাই কাপড়, পশ্চিমবংগ পাট এবং উত্তর-প্রদেশ চিনি উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে বলিয়া এই সকল অঞ্চলে যথাক্রমে বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প এবং চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ

ভারতের উদাহরণ

এই একইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানগুলি নিয়োগ করে এবং নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করে। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা দেশ যে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয় তাহাকে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ (territorial division of labour) বলা হয়। আভ্যন্তরীণ শ্রমবিভাগের ফলে যেমন দেশের

আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগেরই ব্যাপকতর রূপ
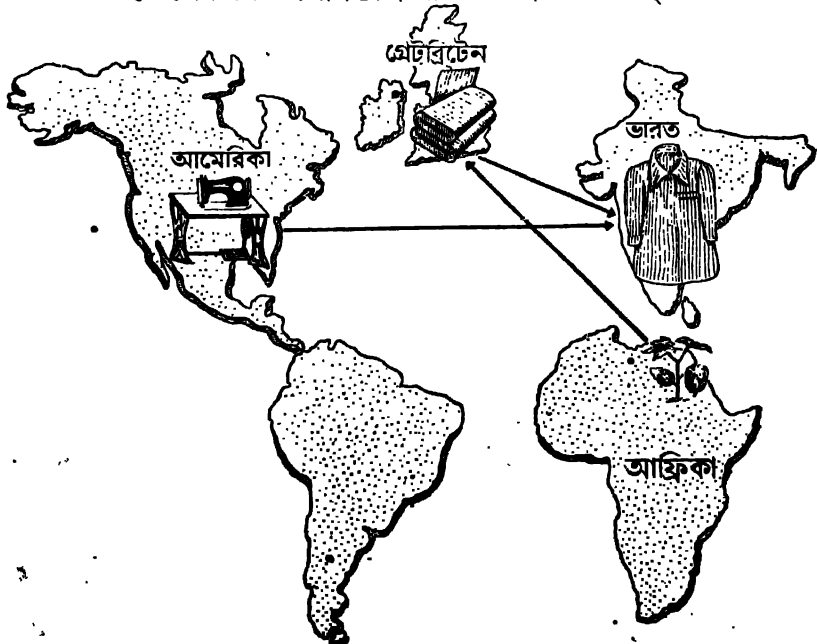
উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলেও তেমনি বিভিন্ন দেশের এবং সমগ্রভাবে পৃথিবীর উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করে। একটু পরেই আমরা এ-বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিব।

আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগকে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ বলা হয়

বর্তমানে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে দেখা যায়, কোন কোন দ্রব্য পৃথিবীর নানা দেশের সহযোগিতায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সার্টের উল্লেখ করা যায়। সার্টটির তুলা হয়ত' মিশরে উৎপন্ন হইয়াছে, কাপড় বুনা হইয়াছে ইংলণ্ডে, এবং আমেরিকায় তৈয়ারি সেলাই-এর কলে সেলাই হইয়া উহা বাংলাদেশে কেহ পরিধান করিতেছে।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Domestic and International Trade) :

এখন প্রশ্ন হইল, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি যদি একই হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনার সার্থকতা কি ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মুখ্যত প্রকৃতি এক হইলেও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন মোটামুটি গতিশীল (mobile) থাকে। অর্থাৎ, যে-সকল শিল্পে আয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে সে-সকল শিল্পেই উহারা সরিয়া আসিয়া নিয়োজিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধন অপেক্ষাকৃত গতিবিহীন (immobile)। যেমন, মার্কিন দেশে শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরি অধিক হইতে পারে; কিন্তু এই অধিক মজুরির জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যাইতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এক হইলেও উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে :

১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন গতিশীল নহে

এই গতিহীনতার একাধিক কারণ আছে। যেমন, ভাষাগত পার্থক্য, দেশপ্রীতি, সামাজিক রীতিনীতির বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক সংগঠনের পার্থক্য, সরকারী বাধানিষেধ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিকদের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। মূলধনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কারণ প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে, যদিও অবশ্য শ্রম অপেক্ষা মূলধন অধিক গতিশীল।

কেন গতিশীল নহে

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক দেশের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যাহা এক দেশ হইতে অন্য দেশে চালান দেওয়া যায় না—যেমন, জলবায়ুর অবস্থা, জমির উর্বরতা, ভূগর্ভস্থিত খনিজ সম্পদ প্রভৃতি।

২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও রহিয়াছে

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকার আমদানি-রপ্তানি শুল্ক বসাইয়া ও অন্যান্যভাবে বাধা-নিষেধের সৃষ্টি করে; কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সরকার সাধারণত এ-ধরনের বাধানিষেধ আরোপ করে না।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিতও হয়

চতুর্থত, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের। অতএব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনাপাওনা মিটাইবার জন্য এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার সমস্যা দেখা দেয়।

৪। মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যাও রহিয়াছে

উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যাকে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন হয়।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তত্ত্ব (Territorial Division of Labour and the Law of Comparative Cost):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি :

দেখা গেল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হইল দেশগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ। এখন এই শ্রমবিভাগ কিভাবে হয় ও ইহার সুবিধা কি কি তাহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। যে-ক্ষেত্রে এক দেশ কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্য দেশ উহা পারে না, সে-ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দেশটি তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে প্রথম দেশ হইতে ঐ দ্রব্য আমদানি করিলে লাভবানই হইবে। এইরূপ অবস্থায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু বুঝিবার অসুবিধা হয় তখনই যখন কোন দেশ কোন দ্রব্য নিজে উৎপাদন করিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দেশ হইতে ঐ দ্রব্য আমদানি করে। কারণ, আমরা প্রশ্ন করিতে পারি, নিজেই যদি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে ঐ দেশ বিদেশ হইতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য আমদানি না করিয়া নিজে উৎপাদন করিলেই ত' পারে? যেমন, ইংলণ্ড নিজেই মাখন উৎপাদন করিতে দক্ষ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইংলণ্ড অন্য দেশ হইতে উহা আমদানি করে এবং বিনিময়ে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা অদ্ভুত মনে হইলেও ইহার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই কারণের সন্ধান পাওয়া যায় আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতির (Principle of Comparative Advantage or Cost) মধ্যে। এই নীতি অনুসারে যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক দক্ষতা (comparative advantage) অধিক সে-দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি করিলে এবং যে-দ্রব্য উৎপাদনে উহার আপেক্ষিক দক্ষতা সর্বাপেক্ষা কম সেই দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আমদানি করিলেই লাভবান হইবে।

১। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতা

২। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা

আপেক্ষিক সুবিধা কাহাকে বলে

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, ক এবং খ এই দুইটি দেশে যথাক্রমে কাপড় ও চা উৎপন্ন হইতে পারে। ক দেশে উৎপাদনের এক একক উপাদানের (নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম মূলধন ও জমি) দ্বারা ১০০ পাউণ্ড চা কিংবা ১০০ গজ কাপড় উৎপাদন করা যায়; অপরদিকে খ দেশে উৎপাদনের ঐ এক একক উপাদানের সাহায্যে ৫০ পাউণ্ড চা অথবা ১০০ গজ কাপড় উৎপাদন করা যায়। এখন আমাদের ধারণা হইতে পারে ক

উদাহরণ

দেশের পক্ষে খ দেশ হইতে চা বা কাপড় কোন কিছু আমদানি না করিয়া উভয় দ্রব্যই দেশের মধ্যে উৎপাদন করা লাভজনক। এ-ধারণা কিন্তু ভুল; একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ক দেশ চা উৎপাদন করিয়া খ দেশ হইতে কাপড় আমদানি করিলে উভয় দেশই লাভবান হইবে। কারণ ক দেশের আপেক্ষিক দক্ষতা হইল চা উৎপাদনে এবং খ দেশের আপেক্ষিক সুবিধা হইল কাপড় উৎপাদনে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়।

ধরা যাউক, ক এবং খ দেশ প্রত্যেকের দুই 'একক' করিয়া উৎপাদনের উপাদান আছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না করিয়া উভয় দেশই উপাদানের এক 'একক' করিয়া উপাদান চা এবং কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে। এই অবস্থায় দুই দেশের উৎপাদন এইরূপ দাঁড়াইবে:

ক দেশ:	১০০ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
খ দেশ:	৫০ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
দুই দেশের মোট:	১৫০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়

এখন যদি ধরা যায় যে ক দেশ তাহার উৎপাদনের দুই একক উপাদান দ্বারা মাত্র চা উৎপাদন করে, অপরদিকে খ দেশ তাহার উৎপাদনের দুই একক উপাদান দ্বারা শুধু কাপড় উৎপাদন করে তাহা হইলে উভয় দেশের উৎপাদনের অবস্থা হইবে এইরূপ:

ক দেশ:	২০০ পাউণ্ড চা	+	০০০ গজ কাপড়
খ দেশ:	০০০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়
দুই দেশের মোট:	২০০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়

এই হিসাব হইতে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, ক দেশ মাত্র চা উৎপাদনে এবং খ দেশ মাত্র কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত থাকায় দুই দেশের মোট মিলিত উৎপাদন অধিক হইয়াছে। কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকিলেও চা-এর উৎপাদন ১৫০ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ২০০ পাউণ্ড হইয়াছে। অর্থাৎ, বিশেষিকরণ (specialisation) বা শ্রমবিভাগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৫০ পাউণ্ড চা অধিক উৎপন্ন হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বিশেষিকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়

ইহার পর প্রশ্ন উঠে, পৃথকভাবে ক বা খ দেশের কি লাভ হইল? ইহার উত্তর দেওয়াও কঠিন নয়। ক দেশের অভ্যন্তরে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে এক পাউণ্ড চা-এর পরিবর্তে পাওয়া যায় ১ গজ কাপড়, অপরদিকে খ দেশে উভয় দ্রব্য উৎপন্ন হইলে এক গজ কাপড়ের বদলে পাওয়া যায় ½ পাউণ্ড চা।

আন্তর্জাতিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে সকল দেশেরই লাভ হয়

এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক দেশ এক পাউণ্ড চা-এর বিনিময়ে এক গজ কাপড়ের কম লইতে-রাজী হইবে না, কারণ ঐ দেশের ভিতরেই এক পাউণ্ড চা-এর পরিবর্তে এক গজ কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। অপরদিকে খ দেশ ১ পাউণ্ড চা-এর বিনিময়ে ২ গজের অধিক কাপড় দিতে প্রস্তুত থাকিবে না; কারণ ঐ দেশের অভ্যন্তরেই

২ গজ কাপড় দিলে ১ পাউণ্ড চা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার হইবে এক পাউণ্ড চা-এর পরিবর্তে এক গজ হইতে দুই গজ কাপড়ের মধ্যে।

কিভাবে লাভবান হয় তাহার দৃষ্টান্ত

ঠিক কোথায় কাপড় ও চা-এর বিনিময় হার দাঁড়াইবে তাহা নির্ভর করিবে ক দেশের কাপড়ের জন্য চাহিদা এবং খ দেশের চা-এর জন্য চাহিদার তারতম্যের উপর। ধরা যাউক, দুই দেশের মধ্যে কাপড় ও চা-এর বিনিময় হার হইল ১ গজ কাপড় = ·৭৫ পাউণ্ড চা। এখন যদি খ দেশ ১০০ গজ কাপড় ক দেশে রপ্তানি করিয়া ৭৫ পাউণ্ড চা ক দেশ হইতে আমদানি করে, তাহা হইলে দুই দেশের দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে এই প্রকার :

ক দেশ :	১২৫ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
খ দেশ :	৭৫ পাউণ্ড চা	+	১০০ গজ কাপড়
মোট :	২০০ পাউণ্ড চা	+	২০০ গজ কাপড়

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, উভয় দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে লাভবান হইতেছে। কারণ, প্রত্যেক দেশ যদি চা এবং কাপড় উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করিত তাহা হইলে ক দেশ ১২৫ পাউণ্ড চা-এর স্থলে মাত্র ১০০ পাউণ্ড চা ভোগ করিতে পারিত আর খ দেশ ৭৫ পাউণ্ড চা-এর স্থলে মাত্র ৫০ পাউণ্ড চা ভোগ করিত। শ্রমবিভাগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক এবং খ দেশ প্রত্যেকে ২৫ পাউণ্ড করিয়া অধিক চা ভোগ করিতে পারিতেছে।

আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

এই উদাহরণ হইতে আমরা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। ইহা হইল যে-দেশের যে-জিনিস উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষতা থাকে সেই দেশ কেবল সেই জিনিস উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই ঐ দেশের এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়; এবং লোকেও অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারে। এই সাধারণ সত্যকে আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের নীতি (Principle of Comparative Advantage or Cost) বলিয়া অভিহিত করা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে ক দেশের চা উৎপাদনে দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অধিক, আর খ দেশের আপেক্ষিক দক্ষতা—অর্থাৎ, সর্বাপেক্ষা কম অসুবিধা রহিয়াছে কাপড় উৎপাদনে। সুতরাং ক দেশ চা উৎপাদন ও খ দেশ কাপড় উৎপাদন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিলে উভয় দেশেরই লাভ হইবে।

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা নীতি

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ভাল উকিল হয়ত' নিজেই ভাল টাইপ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজে টাইপ না করিয়া টাইপ করিবার জন্য লোক নিয়োগ করেন—কারণ, তাঁহার দক্ষতা ওকালতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উহা হইতেই তাঁহার অধিক আয় হয়। তাই নিজে

টাইপ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া মাহিনা দিয়া টাইপ করাইবার জন্য সহকারী (assistant) নিয়োগ করেন।

আমরা দুইটি দেশ ও দুইটি দ্রব্য লইয়া ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। বহু দ্রব্য ও বহু দেশের বাণিজ্যের বেলাতেও ঐ একই যুক্তি খাটে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of International Trade): আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের ভিত্তিতে বাধাবিহীনভাবে আন্তর্জাতিক বা ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ এবং বাণিজ্য সংগঠিত হইলে যে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করা যায় তাহার ইংগিত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কোন দেশ যে-জিনিস উৎপাদন করিতে পারে না তাহা অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে সারা পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হয় এবং বিভিন্ন দেশের সম্পদ ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা যায়; ফলে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের সংগে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগের ফলে এক দেশ অন্য দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হয় এবং অপর দেশের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। ইহা ব্যতীত আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান দেশগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কতকটা সহায়তা করে।

> সুবিধা:
> ১। ইহাতে দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়াও ভোগ করিতে পারে
> ২। মোট উৎপাদন অধিক হয়
> ৩। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়
> ৪। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নৈতিক প্রসার ঘটে
> ৫। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়

অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে কতকগুলি অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। প্রথমত, বর্তমান লাভের (immediate gain) জন্য অনেক সময় ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি করা হয়। যেমন, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া দেশের কয়লা লৌহ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি করা হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্য দেশে স্বল্প মূল্যে মাল ঢালিয়া ঐ দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। এরূপ অন্যায্য প্রতিযোগিতার চাপে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্য ও বিশেষিকরণের ফলে দেশের অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুষম প্রসার (balanced development) ব্যাহত হইতে পারে। যেমন, কৃষি উন্নতিলাভ করিয়া শিল্প অনুন্নত থাকিতে

> অসুবিধা:
> ১। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি ঘটিতে পারে
> ২। এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে ধ্বংস করিতে পারে

পারে, অথবা শিল্প প্রসারলাভ করিয়া কৃষি অনুন্নত থাকিতে পারে, অথবা মাত্র কয়েকটি শিল্পের প্রসার ঘটিলেও মোট শিল্প-ব্যবস্থা অনগ্রসর থাকিয়া যাইতে পারে। ইহাতে এক দেশ অন্য দেশের উপর অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এইরূপ পরমুখাপেক্ষিতা যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় বিপদ টানিয়া আনিতে পারে—কারণ তখন অন্য দেশ হইতে দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৩। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে থাকে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াই সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়। এ-বিষয়ে নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে। এখানে ইহা বলা যাইতে পারে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ত্রুটিগুলিকে দূর করিবার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন থাকিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে যথাসম্ভব অব্যাহত রাখাই যুক্তিযুক্ত, কারণ ইহার সুবিধাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade of India): অতি সুদূর অতীতেও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভাস্কো-ডি-গামা কর্তৃক ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপের সহিতও ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তারপর ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ধীরে ধীরে ভারতের বহির্বাণিজ্য ইংরাজদের হস্তে গিয়া পড়ে। বিদেশী শাসক নিজ স্বার্থে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত করে। ভারত হইয়া দাঁড়ায় সুলভ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ এবং ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার। এই ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক বহির্বাণিজ্য (colonial type of foreign trade) বলা হয়—কারণ সাম্রাজ্যিক শক্তির অধীন উপনিবেশের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতি এইরূপই হয়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলিতে গেলে, উপনিবেশগুলি কাঁচামাল রপ্তানি এবং নির্মিত দ্রব্য আমদানি করে। ভারতবর্ষও অন্যতম ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হইয়া উহা করিতে লাগিল। এই ঔপনিবেশিক ধরনের বহির্বাণিজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পূর্বতন বৈশিষ্ট্য:

১। ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণভার ব্রিটিশের হস্তে ছিল বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তরাজ্যের (United Kingdom) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় দেখা যায় ভারতে মোট আমদানির শতকরা ৩৩ ভাগ আসিতেছে যুক্তরাজ্য হইতে, এবং মোট রপ্তানির শতকরা ৪৪ ভাগ যাইতেছে ঐ যুক্তরাজ্যে।

২। বহির্বাণিজ্যে ছিল যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) নিয়মিতভাবেই অনুকূল হইত ; কিন্তু লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) অনুকূল হইত না। এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সাহায্যেই ব্রিটিশ সরকারের নানারূপ প্রাপ্য মিটানো হইত। পরিশেষে, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, ব্রিটিশ আমলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্রিটিশের স্বার্থে পরিচালিত হইত। যাহাতে ভারতে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়বাজার নষ্ট না হইয়া যায়, যাহাতে ভারত হইতে সুলভে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইংরাজরা ভারতের শিল্প-প্রসারে যথাসম্ভব বাধাপ্রদান করিয়াছিল দেখা যায়।

৩। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নিয়মিত অনুকূল ছিল

বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of India's Foreign Trade at present): বর্তমানে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রথমত, ভারত আর কাঁচামাল রপ্তানিকারী ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি-কারী দেশ নহে। বর্তমানে ভারতের রপ্তানির একটা মোটা অংশ শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া গঠিত। একমাত্র পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণই ১৪০ কোটি টাকার কাছাকাছি এবং তুলাবস্ত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ ৪৫-৫০ কোটি টাকার মত। কয়েক বৎসর পূর্বে তুলাবস্ত্রজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ আরও অধিক ছিল। সম্প্রতি নয়া চীন ও অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতার ফলে উহা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। আমদানির ক্ষেত্রেও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া শিল্পপ্রসারের জন্য যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে ভারত কাঁচাপাট ও কাঁচাতুলা রপ্তানি করিত, এখন প্রধানত কাঁচাপাট ও কাঁচাতুলা আমদানি করে। পূর্বে ভারত খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি করিত ; এখন ভারতকে প্রভূত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়।

বর্তমান বৈশিষ্ট্য :

১। ভারত এখন শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি ও কাঁচামাল আমদানি করে

দ্বিতীয়ত, পূর্বের তুলনায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য ছিল ৩২১ কোটি টাকার মত ; ১৯৫১-৫২ সালে উহা ১৬৭৬ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১৮০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য কিছু কমিলেও উহা ছিল ১৬৪৬ কোটি টাকা।

২। বহির্বাণিজ্যের মোট মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে

তৃতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী গতিরও (Direction) অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক কারণে এখনও যুক্তরাজ্যের (U. K.) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইলেও অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে ভারতের মোট আমদানির শতকরা ২০ ভাগের মত আসে যুক্তরাজ্য হইতে এবং রপ্তানির ২৭-২৮ ভাগ যায় যুক্তরাজ্যে।

৩। দেশানুযায়ী গতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে

চতুর্থত, দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (Trade Balance) নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে। ১৯৪৮–৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫–৫৬ সাল পর্যন্ত—এই আট বৎসরে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮০০ কোটি টাকার উপর। ইহার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য ইত্যাদির আমদানিবৃদ্ধি ও বিভিন্ন কারণে রপ্তানিহ্রাসের দরুন প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩১০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানির পরিমাণ ৫৭৫০ কোটি টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে, ইহার বিরুদ্ধে ৩৭০০ কোটি টাকার দ্রব্যাদি রপ্তানি করা সম্ভব হইবে। অতএব, প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে ২০৫০ কোটি টাকা বা দ্বিতীয় পরিকল্পনার ঘাটতির কাছাকাছি।

৪। বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নিয়মিত প্রতিকূল হইতেছে

ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য (Chief Articles of India's Import and Export) : বর্তমানে ভারতে যে-সকল পণ্য আমদানি করা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান : (১) বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি, (২) খাদ্যদ্রব্য, (৩) খনিজ তৈল, (৪) লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য, (৫) অন্যান্য ধাতুনির্মিত দ্রব্য, (৬) পরিবহণের সাজসরঞ্জাম, (৭) বৈদ্যুতিক দ্রব্য, (৮) বাসনপত্র ও মনিহারী দ্রব্য, (৯) ঔষধপত্র, (১০) কাঁচাতুলা, (১১) কাঁচাপাট, (১২) কাগজ, (১৩) রসায়ন দ্রব্য এবং (১৪) সিল্ক ও রেয়ন। ইহাদের মধ্যে যন্ত্রপাতি ও খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণই সর্বাধিক। ১৯৬১–৬২ সালে মোট পণ্য আমদানি ১০৩৮ কোটি টাকার মধ্যে যন্ত্রপাতির মূল্য ছিল ২৩২ কোটি টাকা, খাদ্যদ্রব্যের ১২৬ কোটি টাকা, খনিজ তৈলের ৯৬ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন ধাতুনির্মিত দ্রব্যের ১৫০ কোটি টাকা।

আমদানি পণ্য

ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য

ইহা ছাড়া ৮৯ কোটি টাকার মত রাসায়নিক দ্রব্য এবং ৬৩ কোটি টাকার কাঁচাতুলা আমদানি করা হইয়াছিল।

রপ্তানি পণ্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল (১) পাটজাত দ্রব্য, (২) চা, (৩) তুলাজাত দ্রব্য, (৪) বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য—যথা, ম্যাংগানীজ আকর ইত্যাদি, (৫) বনস্পতি তৈল, (৬) কাঁচাতুলা,* (৭) চর্ম। ইহাদের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি মূল্যই সর্বাধিক। ১৯৬১-৬২ সালে মোট পণ্য রপ্তানি ৬৬২ কোটি টাকার মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি মূল্য ছিল ১৪০ কোটি টাকা, চা-এর রপ্তানি মূল্য ছিল ১২১ কোটি টাকা এবং তুলাজাত দ্রব্যের ৪৮ কোটি টাকা।

রপ্তানি পণ্য

বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত এবং লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Balance of Trade and Balance of Payments): ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা (goods and services) বিদেশে রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে অন্য কতকগুলি দ্রব্য ও সেবা আমদানি করে। রপ্তানি ও আমদানি (exports and imports) হইল প্রত্যেক দেশের বহির্বাণিজ্যের দুইটি দিক। রপ্তানির যে মোট মূল্য দাঁড়ায় তাহা বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য আর আমদানির মোট মূল্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য। অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানির মূল্য হইল দেশের আয়, আর আমদানির মূল্য দেশের ব্যয়।

আমদানিকে দেশের ব্যয় ও রপ্তানিকে দেশের আয় বলা হয়

এখন রপ্তানির মধ্যে যে-সকল পণ্যদ্রব্য (merchandise) থাকে তাহাদের দৃশ্য-রপ্তানি (visible exports) বলা হয়। অনুরূপভাবে আমদানির মধ্যে যে-সকল পণ্যদ্রব্য থাকে তাহাদের বলা হয় দৃশ্য-আমদানি (visible imports)। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আমরা বিদেশে পাঠাই তাহা হইল ভারতের দৃশ্য-রপ্তানি; অপরদিকে আমরা বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য, খাদ্য প্রভৃতি যে-সকল বস্তুগত দ্রব্য আমদানি করি তাহা হইল ভারতের দৃশ্য-আমদানি।

দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানি

ভারতের দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানির উদাহরণ

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের এই দৃশ্য-আমদানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য-রপ্তানির মোট মূল্যের পার্থক্যকে 'বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' (Balance of Trade) বলা হয়। যখন দেশের দৃশ্য-রপ্তানির মোট মূল্য দৃশ্য-আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন এই উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'অনুকূল

দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানির পার্থক্যকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বলে

* দেশবিভাগের পর কিছুদিন পর্যন্ত ভারত কাঁচাতুলা আমদানিই করিতেছিল। এখন ঐ পণ্য রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই করে। যে-প্রকার কাঁচাতুলা আমদানি করা হয় তাহা হইল লম্বা আঁশের, অপরদিকে ছোট আঁশের তুলাই রপ্তানি করা হয়।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' (Favourable Balance of Trade)। আবার যখন দৃশ্য-আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য-রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত' (Unfavourable or Adverse Balance of Trade)।

অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে। যদি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্য রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ৮ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্য আমদানি করে তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের ২ কোটি টাকা অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আবার যদি কোন দেশ কোন বৎসরে বিদেশে ১০ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে এবং বিদেশ হইতে ১২ কোটি টাকা মূল্যের বস্তুগত দ্রব্যাদি আমদানি করে তাহা হইলে বলা হয় যে ঐ দেশের ২ কোটি টাকা প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

উদাহরণ

কিন্তু কোন দেশের 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনাপাওনার সম্পূর্ণ চিত্র এই দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানি হইতে পাওয়া যায় না। দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানি বাবদ দেনাপাওনা ছাড়া সেবামূলক কার্য ও অন্যান্য খাতেও দেশের বিদেশের নিকট দেনাপাওনা হয়। যেমন, (১) কোন দেশ যখন বিদেশের জাহাজাদি ব্যবহার করে তখন তাহার জন্য বিদেশকে মাসুল দিতে হয়; (২) বিদেশী ব্যাংক বা বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে কাজকারবার করা হইলে তাহার জন্য দেশের নিকট বিদেশের প্রাপ্য হয় এবং দেশকে উহা পরিশোধ করিতে হয়; (৩) কোন দেশ অন্য দেশ হইতে ঋণ করিয়া থাকিলে তাহার জন্য বিদেশকে সুদ দিতে হয়, (৪) কোন দেশের লোক যখন ভ্রমণ বা ব্যবসায় বা শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইয়া টাকাকড়ি খরচ করে তখন তাহার দরুন বিদেশের প্রাপ্য হয়; (৫) বিদেশে দূতাবাস প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক দেশকে বিদেশে ব্যয় বহন করিতে হয়; (৬) বিদেশী চলচ্চিত্রের ভাড়া বাবদ দেশকে বিদেশের প্রাপ্য মিটাইতে হয়; (৭) এক দেশ অন্য দেশকে সাহায্যস্বরূপ দান (donations) করিতে পারে; ইহার দরুন এক দেশের নিকট অন্য দেশের পাওনা থাকিতে পারে।

দৃশ্য আমদানি-রপ্তানি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্ণ চিত্র প্রকাশ করে না

কোন দেশকে যেমন এই সকল খাতে বিদেশের পাওনা মিটাইতে হয় তেমনি আবার এই সকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্যও হয় এবং বিদেশকে উহা পরিশোধ করিতে হয়। এখন এই ধরনের যে-সকল খাতে বিদেশের নিকট দেশের প্রাপ্য হয় তাহাদিগকে অদৃশ্য-রপ্তানি (invisible exports) বলা হয়। কারণ, দৃশ্য-রপ্তানির মত এই সকল অদৃশ্য কাজ-কারবারের সুবিধা ভোগের জন্যও বিদেশ হইতে দেশে অর্থাগম হয়। অনুরূপভাবে উপরি-উক্ত ধরনের যে-সকল খাতে কোন দেশকে বিদেশের প্রাপ্য মিটাইতে হয় তাহাদিগকে অদৃশ্য-আমদানি (invisible imports) বলা হয়।

কারণ আমদানি-রপ্তানি অদৃশ্যও হয়

তাহা হইলে এখন পর্যন্ত দেখা গেল যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন দেশের আমদানি-রপ্তানি দৃশ্য ও অদৃশ্য এই দুই রকমের হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য হয় তাহাকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত' (Balance of Payments on Current Account) বলা হয়। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের মত এই লেনদেনের উদ্বৃত্তও অনুকূল (favourable) বা প্রতিকূল (unfavourable) হইতে পারে। যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন বলা হয় যে চলতি হিসাবের খাতে দেশের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত (Unfavourable Balance of Payments on Current Account) হইয়াছে। আবার যখন দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানির মোট মূল্য দেশের দৃশ্য ও অদৃশ্য আমদানির মোট মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তখন চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল (Favourable Balance of Payments on Current Account) হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়।

চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত

লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল ও অনুকূল দুই-ই হইতে পারে

চলতি হিসাবের খাতে কোন দেশের লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে রপ্তানি বাবদ বিদেশের নিকট প্রাপ্য অর্থের দ্বারা বিদেশের পাওনা সম্পূর্ণ চুকাইয়া দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, দেশের দেয় ও প্রাপ্য অর্থের মধ্যে কাটাকাটি হইয়াও ঘাটতি থাকিয়া যায়। আবার দেশের চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যের মধ্যে কাটাকাটি হওয়ার পরও বিদেশের নিকট দেশের পাওনা থাকিয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইল, চলতি হিসাবের খাতে দেনাপাওনার মধ্যে এই যে পার্থক্য হয় তাহা পূরণ হয় কিভাবে? যে-ক্ষেত্রে দেশের চলতি হিসাবে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত হয় সে-ক্ষেত্রে হয়ত' স্বর্ণ পাঠাইয়া বিদেশের অতিরিক্ত পাওনা চুকাইবার চেষ্টা করা হয়; অনুরূপ-ভাবে বিদেশের নিকট অতিরিক্ত পাওনা থাকিলে ঐ দেশ স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া উহা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

লেনদেন-উদ্বৃত্ত পূরণ হয় কিরূপে? এই উদ্দেশ্যে অনেক সময় স্বর্ণ প্রেরণ করা হয়

কিন্তু স্বর্ণের দ্বারা সব সময়ে সম্পূর্ণ পাওনা চুকানো সম্ভব হয় না। দেশের লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি থাকিয়াই যায়। এই ঘাটতি পূরণ হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশের 'মূলধনের হিসাবের খাতে' (on Capital Account) লেনদেনের উদ্বৃত্তের দ্বারা। এই উদ্বৃত্তের অর্থ হইল বিদেশের নিকট ঋণ করা। ধরা যাউক, চলতি লেনদেনের হিসাবের খাতে কোন দেশের ১০ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং অন্য কোন উপায়ে—যথা, স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া এই প্রাপ্য মিটানো যাইতেছে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ দেশ ঐ টাকা বিদেশের নিকট হইতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে। এই দিক দিয়া বলা হয় যে দেশের বৈদেশিক

উহা সম্ভব না হইলে বিদেশের নিকট ঋণ করা হয়

বৈদেশিক লেনদেন হিসাবে জমা ও খরচ সকল সময় সমান হয়

লেনদেনের হিসাবে জমা ও খরচ পরস্পরের সমান হইতে বাধ্য। কারণ, চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের উদ্বৃত্তে ঘাটতি হইলেও উহা বৈদেশিক ঋণ এবং স্বর্ণ প্রেরণের সাহায্যে পূরণ হয়।

কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ঋণের সাহায্যে দেশের চলতি হিসাবের খাতে লেনদেনের ঘাটতি পূরণ চলিতে পারে না; অর্থাৎ, চিরকাল অপর দেশ হইতে ধার করিয়া জিনিসপত্র ও সেবা ভোগ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দেশকে উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া অন্য দেশ হইতে অধিক আমদানির মূল্য চুকাইবার চেষ্টা করিতে হয়। এই দিক দিয়া দেখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শেষপর্যন্ত হইল একপ্রকার সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter)। কোন বিশেষ দেশ হইতে যত মূল্যের পণ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি রপ্তানি করিতে পারে উহা মাত্র তত মূল্যেরই পণ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্য অন্য দেশ হইতে আমদানি করিতে সমর্থ হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একপ্রকার দ্রব্য-বিনিময়

ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত (India's Balance of Payments):

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত সাধারণত অনুকূলই হইত। এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সাহায্যেই ইংলণ্ডের হোমচার্জ* প্রভৃতি নানা প্রকারের প্রাপ্য মিটানো হইত। যুদ্ধের সময় বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বিশেষভাবে অনুকূল হয়। এই উদ্বৃত্তের অধিকাংশ ভারতের পাওনা হিসাবে ইংলণ্ডে ষ্টার্লিং-এ জমা হয়।** দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পর বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেন-উদ্বৃত্ত বরাবরই প্রতিকূল হইয়াছে। তবে সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫১-৫৬) প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১৮ কোটি টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই (১৯৫৬-৫৭) প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং চূড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইয়াছে ১৯২০ কোটি টাকা। নিম্নের ছকটির সাহায্যে কিভাবে এতটা লেনদেন ঘাটতি হইয়াছিল তাহা দেখানো হইল:

পূর্বে অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অভূতপূর্ব লেনদেন ঘাটতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৫৬-৬১) ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত (হিসাব কোটি টাকায়)

মোট আমদানি	৫৩৭০
মোট রপ্তানি	৩০৬৫
বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত	−২৩০৫
অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি	+৩৮৫
লেনদেন-উদ্বৃত্ত	−১৯২০

* পরাধীন থাকাকালীন ভারতকে নানা খাতে ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ করিতে হইত। সামগ্রিকভাবে ইহা হোমচার্জ (Home Charges) বা বিলাতী দক্ষিণা নামে অভিহিত।

** এই পাওনাকে ষ্টার্লিং পাওনা (Sterling Balances) বলা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পাওনা হয়।

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে পণ্য আমদানির পরিমাণ পণ্য রপ্তানির পরিমাণ হইতে ২৩০০ কোটি টাকার মত অধিক হওয়ার ফলেই এইরূপ অভূতপূর্ব লেনদেন ঘাটতি হইয়াছিল। আমদানি এত অধিক হওয়ার কারণ ছিল পরিকল্পনার প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির এবং খাদ্যাভাবহেতু খাদ্যদ্রব্যের অনুমান অপেক্ষা অধিক আমদানি।

যাহা হউক, ঘাটতির কতকাংশ বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের দ্বারা পূরণ করা হয়, কিন্তু বেশীর ভাগ মিটানো হয় ইংলণ্ডের নিকট পাওনা হইতে। ঘাটতি মিটাইবার জন্য ভারতকে ইংলণ্ডের নিকট পাওনা হইতে উঠাইয়া মোট ৫৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। অবশ্য রপ্তানিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানি বন্ধ করিয়া প্রতিকূল লেনদেনের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টাও করা হয়। ইহার ফলে ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিলেও পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬০-৬১) ঘাটতি আবার ২১০ কোটি টাকার মত (২২৪ হইতে ৪৩৪ কোটি টাকা) বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকূল লেনদেনের প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা

মূল তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৫৭৫০ কোটি টাকার মত দ্রব্যাদি আমদানি করিতে হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। ইহার উপর পূর্বে গৃহীত ঋণের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৫৫০ কোটি টাকা বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে। অতএব, বিদেশের পাওনা মিটাইবার জন্য মোট প্রয়োজন হইবে ৬৩০০ কোটি টাকা। ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে মোট ৩৭০০ কোটি টাকার মত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। সুতরাং হিসাবমত লেনদেন-ঘাটতি ২৬০০ কোটি টাকা হইবার কথা ছিল। প্রথমে আশা করা হইয়াছিল যে এই ঘাটতি বৈদেশিক সাহায্য হইতে মিটানো সম্ভব হইবে। পরে কিন্তু এতটা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় রপ্তানির লক্ষ্যকে উক্ত ৩৭০০ কোটি টাকা হইতে ৪২৫০ কোটি টাকায় বা গড়ে বাৎসরিক ৮৫০ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও লেনদেন-উদ্বৃত্ত

এতটা রপ্তানিবৃদ্ধি সম্ভব হইবে কিনা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ ত' আছেই, তাহার উপর আবার চীনের সহিত যুদ্ধের দরুন প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির আমদানির পরিমাণ অকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা কোথায় দাঁড়াইবে বা তৃতীয় পরিকল্পনাই বা কিরূপ গ্রহণ করিবে সে-সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা অসম্ভব। অতএব, এই পরিকল্পনার প্রথম বৎসর (১৯৬১-৬২) হইতে যে লেনদেন-উদ্বৃত্তের গতি কিছুটা পরিবর্তিত হইয়া ঘাটতি ১১০ কোটি টাকার মত (৪৩৪ হইতে ৩২৩ কোটি টাকা) কম হইয়াছিল, তাহাতে আশান্বিত হইবার কোন কারণ নাই।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection):

অবাধ বাণিজ্য কাহাকে বলে

অবাধ বাণিজ্য বলিতে বুঝায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর সকল প্রকার বাধানিষেধ রহিত অবস্থা। অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে বিনা শুল্কে ও বিনা বাধায় দ্রব্যাদি আমদানি করিতে

দেওয়া হয়। অবশ্য বলা হয় যে সরকার রাজস্ব (revenue) সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশী জিনিসের উপর কিছুটা শুল্ক বসাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা অবাধ বাণিজ্যের নীতি লংঘন করা হয় না। তবে যাহাতে বিদেশী উৎপাদক ও দেশী উৎপাদকের মধ্যে বিভেদকরণ না হয় সেজন্য যে-ধরনের বিদেশী দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক ধার্য করা হয় সেই ধরনের দেশীয় দ্রব্যের উপর উৎপাদন-শুল্ক (excise duty) বসানো হয়।
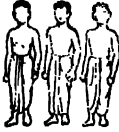
অপরদিকে সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুযোগসুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা।

সংরক্ষণ কাহাকে বলে

এই বাধানিষেধ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। প্রথমত, বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক বসানো যাইতে পারে। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায় এবং দেশের লোক বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্তে দেশী জিনিসপত্র ক্রয় করে। সুতরাং সংরক্ষণমূলক শুল্কের সাহায্যে দেশের উৎপাদকরা বিদেশী উৎপাদকের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, সরকার দেশীয় উৎপাদকদের অর্থসাহায্য (bounties and subsidies) করিতে পারে। ইহার দ্বারা দেশীয় উৎপাদকরা অপেক্ষাকৃত কম দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে এবং বিদেশী উৎপাদকদের সংগে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়ত, সরকার বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ (quota) বাঁধিয়া দিতে পারে। ইহার ফলে দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বিদেশী দ্রব্য আসিতে পারে না। লাইসেন্স-প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, দেশীয় শিল্পের জন্য প্রয়োজন এমন সকল কাঁচামালের বিদেশে রপ্তানির উপর শুল্ক বসাইয়াও দেশীয় শিল্পের সুবিধা করিয়া দেওয়া যায়। কারণ, বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি না হইলে দেশীয় শিল্প অপেক্ষাকৃত কম দামে উহা পায়। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয় এবং সুলভ মূল্যে বাজারে জিনিসপত্র বিক্রয় করা সম্ভব হয়। তবে এরূপ করা হইলে কাঁচামালের উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সংরক্ষণের পদ্ধতি :
১। সংরক্ষণমূলক শুল্ক
২। অর্থসাহায্য
৩। আমদানি নিয়ন্ত্রণ
৪। কাঁচামালের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি (Arguments for Free Trade) :

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(১) অবাধ বাণিজ্য থাকিলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হইতে পারে। এই শ্রমবিভাগের ফলে যে-দেশ যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা ভোগ করে সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে। ফলে সকল দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার হয়, আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় এবং সকল লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চ হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের সপক্ষে যুক্তি

ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি মূল তথ্য
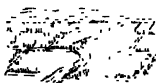
ভারতের জনসংখ্যা	১৯৫১ ৩৫·৯২ কোটি	১৯৬৩ ৪৫·৫০ কোটি (আনুমানিক)
শিক্ষিতের শতকরা ভাগ	১৭	২৪
ভারতের জাতীয় আয় (১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)	১৯৫০-৫১ ৮৮৫০ কোটি টাকা	১৯৬০-৬১ ১২[illegible] কোটি টাকা
মাথাপিছু আয়	২৪৭·৫ টাকা	২৯২·৫ টাকা
কৃষিজ উৎপাদন—খাদ্যশস্য	[illegible] লক্ষ মেট্রিক টন	১৯৬১-৬২ [illegible] লক্ষ মেট্রিক টন
প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক শস্য (তুলা, পাট, তৈলবীজ ও ইক্ষু)	[illegible] লক্ষ মেট্রিক টন	[illegible] লক্ষ মেট্রিক টন
সেচসমন্বিত জমি	[illegible] লক্ষ একর	৭৩২ লক্ষ একর
শিল্পজ উৎপাদন		
নির্মিত ইস্পাত	৭ লক্ষ টন	২৯ লক্ষ টন

ভারতের অর্থনৈতিক জীবন সংক্রান্ত কয়েকটি মূল তথ্য

	১৯৫১	১৯৬১-৬২
সিমেণ্ট	২৭ লক্ষ টন	৮২ লক্ষ টন
মিল বস্ত্র	৩৭২ কোটি গজ	৫১০ কোটি গজ
সমাজোন্নয়ন (কতসংখ্যক গ্রামে সম্প্রসারিত)		৪'১৬ লক্ষ
প্রাথমিক সমবায় সমিতিসংখ্যা	১০৫,০০০	৩১৩,৪৯৯
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য		
আমদানির মূল্য	৬৫০ কোটি টাকা	৯৭৮ কোটি টাকা
রপ্তানির মূল্য	৬০১ কোটি টাকা	৬৬৭ কোটি টাকা
লেনদেন-উদ্বৃত্ত (বৈদেশিক সাহায্য ধরিয়া) দেনা − পাওনা +	+ ৩৯ কোটি টাকা	—২৭৮ কোটি টাকা
মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ (.ক্যালোরি-মূল্যে)		২১০০
মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহার		১৫'৫ গজ

(২) অবাধ বাণিজ্যের ফলে জনসাধারণ স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কারণ অবাধ বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে জিনিসপত্রের দাম কম হয়।

স্বল্প দামের যুক্তি

(৩) অবাধ বাণিজ্যের ফলে শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠনের প্রকৃত আয় বাড়িয়া যায়, কারণ বিশেষিকরণের (specialisation) ফলে তাহাদের উৎপাদন অধিক হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের আয়বৃদ্ধির যুক্তি

এই সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও বর্তমান যুগে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক খুব কমই মিলে। ইহার কারণও আছে। দেখা গিয়াছে যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে অনুন্নত ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের স্বার্থ ব্যাহত হইয়াছে। শিল্পোন্নত ও সাম্রাজ্যিক দেশগুলির সাহিত প্রতিযোগিতায় এই সকল দেশ পারিয়া উঠে নাই। ইহা ছাড়াও কোন দেশই বিদেশ হইতে অকাম্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে দিতে পারে না। অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লইয়া এক দেশ অন্য দেশের শিল্পাদি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিকভাবে মূল্য কমাইয়া ঐ দেশের বাজারে জিনিসপত্র ছাড়িয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।*

সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Protection) : সংরক্ষণের পক্ষে অনেক প্রকারের যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সমর্থনযোগ্য, আর কতকগুলি একরূপ অসমর্থনীয়। যাহা হউক, সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি হইল এইরূপ :

(১) শিশু-শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industries Argument) : অনেক দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের শিল্পপ্রসার সম্ভব হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশ বহুপূর্বে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়ায় উহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পোন্নতি করা যায় নাই। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের পথে পদসঞ্চার করিয়াছে এরূপ দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্যের নীতি ক্ষতিজনক। এইরূপ দেশে এমন অনেক শিশু-শিল্প থাকে যাহাদিগকে শিল্পোন্নত দেশের পুরাতন শিল্পগুলির সহিত সম্মুখ প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়া দিলে তাহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। সুতরাং শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে লালন করিতে হইবে, বাল্যাবস্থায় তাহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সংরক্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ভারত শিল্পে বিশেষ অনুন্নত। শিল্পপ্রসার করিতে হইলে প্রথমদিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

এই যুক্তির সংক্ষিপ্তসার

তবে শিশু-শিল্প সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি না থাকিলেও স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিগণ সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে।

---

* এইরূপ করাকে ডাম্পিং (Dumping) বলা হয়।

(২) শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি (Diversification of Industries Argument) : প্রত্যেক দেশের শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনিতে পারিলে একদিকে যেমন অসামঞ্জস্য দূর হয়, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন শিল্পের মধ্য দিয়া লোকের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে। এইজন্য সংরক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শিল্পের প্রসার করা প্রয়োজন। কিন্তু এই নীতি প্রয়োগে বেশী দূর অগ্রসর হইলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

(৩) জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (Argument for National Self-sufficiency) : কতকগুলি ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হয়। খাদ্য, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য দেশের পক্ষে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল থাকা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল বিষয়ে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইলে যুদ্ধের মত জরুরী অবস্থায় দেশ বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে পারে। তবে এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে কয়েকটি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণযোগ্য হইলেও সর্বক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। কারণ, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ভোগ করা মোটেই সম্ভব হয় না।

(৪) প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Defence Industries Argument) : বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ ও বহিরাক্রমণের আশংকা সকল সময়েই রহিয়াছে। এই অবস্থায় দেশের নিরাপত্তার জন্য কতকগুলি শিল্পকে সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন, অস্ত্রশস্ত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রভৃতি শিল্পকে সংরক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

(৫) অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের নীতি (Argument for Protection against Unfair Competition) : অনেক সময় এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্যকে অসাধু উপায়ে ধ্বংস করিবার জন্য অস্বাভাবিক স্বল্প মূল্যে ঐ দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে থাকে। এই প্রকারের অসাধু প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়।

সংরক্ষণের সমর্থনে উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ছাড়া অন্যান্য যুক্তিরও অবতারণা করা হয়। যেমন, অনেক সময় বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দেশের শ্রমিকদের উচ্চ হারে মজুরি দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সংরক্ষণের দ্বারা উচ্চ রাখা সম্ভব হইলেও জনসাধারণ যেখানে স্বল্প মূল্যে বিদেশী দ্রব্য ভোগ করিতে পারিত সেখানে অধিক দাম দিয়া দেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে ভোগী হিসাবে দেশের লোকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ইহা ছাড়া জিনিসপত্রের দাম চড়া থাকিলে শ্রমিকদের আর্থিক মজুরি উচ্চ হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয় না। আবার বলা হয় যে, সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করা হইলে দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যায়, বিদেশের হাতে যায় না। এ-যুক্তিরও সারবত্তা নাই। এক

অন্যান্য যুক্তি—
ইহাদের পর্যালোচনা

দেশ অন্য দেশের জিনিসপত্র ক্রয় না করিলে অন্য দেশও ঐ দেশের দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না—কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইল একপ্রকার দ্রব্য বিনিময়। সুতরাং আমদানি হ্রাস করিলে রপ্তানিও হ্রাস পাইবে। ফলে দেশের ক্ষতিই হইবে। সংরক্ষণের আর একটি যুক্তি হইল যে, সংরক্ষণ নীতির দ্বারা দেশের নিয়োগ (employment) বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত হইল যে দেশের আমদানি কমাইলে রপ্তানিও কমিবে। অতএব দেশের সংরক্ষিত শিল্পে নূতন নিয়োগ হইলেও পুরাতন রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে নিয়োগ কমিয়া যাইবে। তবে বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশে অব্যবহৃত সম্পদকে কাজে লাগাইয়া সংরক্ষণের দ্বারা শিল্পোন্নত করিতে পারিলে নিয়োগ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

সংরক্ষণের ত্রুটি (Disadvantages of Protection): সংরক্ষণের বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি দেখানো হয় তাহা প্রধানত অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি। প্রথমত, সংরক্ষণের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যে-দিকে উৎপাদনের সর্বাধিক সুযোগ থাকে সে-দিকে উৎপাদনের উপাদানসমূহ নিয়োজিত হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর উৎপাদন কম হয় এবং বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যাদির দাম অধিক হয় এবং ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়ত, সংরক্ষণ নীতির ফলে দেশের উৎপাদকদের মধ্যে দক্ষতাবৃদ্ধি সম্পর্কে শিথিলতা আসে। চতুর্থত, সংরক্ষণ-শুল্ক যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে আমদানি বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং আমদানি-শুল্ক হইতে সরকারের আয়ও কমিয়া যায়। পঞ্চমত, সংরক্ষণ দ্বারা বৈদেশিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হইলে দেশীয় শিল্পগুলি মিলিয়া শিল্পজোট (Trusts) সৃষ্টি করিবার সুযোগ পায় এবং জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে। ষষ্ঠত, একবার সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করা হইলে উহা প্রত্যাহার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, সংরক্ষণের সুবিধাভোগকারী শিল্পগুলি নানা অজুহাত দেখাইয়া উহাতে বাধা প্রদান করে।

সংরক্ষণের ত্রুটি সত্ত্বেও স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে ইহা অপরিহার্য

সংরক্ষণ নীতির এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে উহা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতের সংরক্ষণ নীতি (India's Fiscal Policy): ভারতে ১৯২১ সালের ফিসক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection) নীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই প্রকার সংরক্ষণ নিম্নলিখিত তিনটি সর্ত পূরিত হইলেই প্রদান করা যাইত।

পুরাতন বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি ও ইহার প্রকৃতি

প্রথমত, শিল্পটিকে স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করিতে হইত—যথা, যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামালের সরবরাহ, সুলভ শক্তির যোগান, প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান, ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি সুবিধা থাকা প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত, শিল্পটি এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল যে সংরক্ষণ ব্যতীত উহার উন্নয়ন মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা জাতীয় স্বার্থে

যতটা দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন ততটা সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। তৃতীয়ত, শিল্পটির পক্ষে শেষপর্যন্ত বিনা সংরক্ষণেই বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ারও প্রয়োজন ছিল।

এই নীতিগুলি অনুসারে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে কিনা তাহা নির্ধারণের ভার একটি শুল্ক বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের উপরি-উক্ত সর্তগুলি এতই কঠিন ছিল যে, ইহার দ্বারা ভারতের সামগ্রিক শিল্প-ব্যবস্থা (industrial system) সুসংগঠিত হয় নাই অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে গড়িয়াও উঠে নাই। যাহা হউক, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তুলাবস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাগজের মণ্ড শিল্প (paper pulp industry) প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিল্প ঐ সংরক্ষণের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল।

এই সংরক্ষণ নীতির ফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিযোগী বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রায় বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আবার প্রয়োজন হয় সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে একটি নূতন ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতিই ভারতের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি। ইহার উদ্দেশ্য ভারতের সর্বাংগীণ অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সহাযতা করা, বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র কয়েকটি শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে কোনরকমে রক্ষা করা নয়। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমান সংরক্ষণ নীতি হইল উন্নয়নমূলক (developmental type of protection); আর পূর্বেকার সংরক্ষণ নীতি ছিল প্রতিরক্ষামূলক (defensive type of protection)।

বর্তমান সংরক্ষণ নীতি

নূতন ফিসক্যাল কমিশন শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া সংরক্ষণের সুপারিশ করে। প্রথমত, প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্পগুলিকে (all defence and strategic industries) সংরক্ষিত করিতে হইবে—তাহা এই সংরক্ষণের ব্যয়ভার যাহাই হউক না কেন। দ্বিতীয়ত, মূল শিল্পগুলির (basic industries) ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সংরক্ষণপ্রদানের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অপরাপর শিল্পের বেলায় জাতীয় স্বার্থ, স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন-ব্যয়, সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সংরক্ষণের সময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণপ্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। তবে সকল সময়েই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জাতীয় স্বার্থই হইল মূল লক্ষ্য। এই সকল নীতি অনুসারে সংরক্ষণপ্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে একটি স্থায়ী শুল্ক কমিশন (a permanent Tariff Commission)।

সংক্ষিপ্তসার

এক দেশের সহিত অন্য দেশের দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। শ্রমবিভাগের ফলেই ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্ভব হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ঐ একই—ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের

ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয়। শ্রমবিভাগের কারণ যেমন দক্ষতার বিভিন্নতা, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের কারণও তেমনি দেশগত দক্ষতার বিভিন্নতা। সংক্ষেপে বলা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ব্যাপকতর রূপ।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এইরূপ এক হইলেও উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রহিয়াছে : ১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধন বিশেষ গতিশীল নহে ; ২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদও পরিলক্ষিত হয় ; ৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় ; ৪। এই প্রকার বাণিজ্যে মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যাও রহিয়াছে। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি : দুই কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হইতে পারে—(ক) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে অক্ষমতা, এবং (খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা (comparative advantage)। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত হইবার কারণ হইল আন্তর্জাতিক বিশেষিকরণ (international specialisation)। ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনবৃদ্ধি পায় এবং সকল দেশই লাভবান হয়।

আপেক্ষিক সুবিধাতত্ত্বের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায় : যে-দেশের যে-দ্রব্য উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষতা বা সুবিধা রহিয়াছে সেই দেশ কেবল সেই দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত থাকিলে ঐ [illegible] এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ; এবং স্বাভাবিকভাবেই লোকের ভোগের পরিমাণ অধিক হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রহিয়াছে— ১। ইহাতে কোন দেশ কোন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়াও উহা ভোগ করিতে পারে ; ২। সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদন অধিক হয় ; ৩। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় ; ৪। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও নৈতিক মানের প্রসার ঘটে ; ৫। আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার অসুবিধাগুলি হইল এইরূপ—১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভবিষ্যৎ স্বার্থের হানি ঘটিতে পারে ; ২। এক দেশ অন্য দেশের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস করিতে পারে ; ৩। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এক দেশ অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে।

অসুবিধা অপেক্ষা অবশ্য সুবিধাই অধিক ; তবুও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : কিছুদিনের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। পূর্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের—অর্থাৎ, ভারত কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য রপ্তানি এবং নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিত। বর্তমানে ভারত প্রধানত নির্মিত দ্রব্যই রপ্তানি করে এবং কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। দ্বিতীয়ত, পূর্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটেনেরই প্রাধান্য ছিল ; বর্তমানে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিশেষে, পূর্বে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত নিয়মিত অনুকূল হইত ; বর্তমানে উহা নিয়মিত প্রতিকূল হইতেছে।

ভারতের প্রধান রপ্তানি ও আমদানি পণ্যদ্রব্য : ভারতের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চা, পাটজাত দ্রব্য, তুলাবস্ত্র, ম্যাংগানীজ-আকর, চর্ম ইত্যাদিই প্রধান। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, পরিবহণের সাজসরঞ্জাম, কাঁচাতুলা ও ঔষধপত্রই প্রধান।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ও লেনদেন-উদ্বৃত্ত : আমদানি ও রপ্তানি দুই প্রকার হয়—দৃশ্য ও অদৃশ্য। দৃশ্য-আমদানি ও দৃশ্য-রপ্তানির পার্থক্যকে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত (balance of trade) এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় প্রকার আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যকে লেনদেন-উদ্বৃত্ত (balance of payments) বলা হয়। কোন বৎসরে লেনদেনের এই উদ্বৃত্তকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ন্যায় লেনদেন-উদ্বৃত্তও অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়ই হইতে পারে। লেনদেন-উদ্বৃত্ত পূরণ করা

হয় স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া। ইহা সম্ভব না হইলে বিদেশের নিকট ঋণ করা হয়। অবশ্য চিরকালই ঋণ করিয়া দেনা মিটানো সম্ভব নয়। সুতরাং শেষপর্যন্ত অধিক উৎপাদনের দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়াই দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। এইজন্য বলা হয় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শেষপর্যন্ত একপ্রকার সরাসরি দ্রব্য-বিনিময়।

ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত : যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধের সময়ে ভারতের নিয়মিত অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইত। এই বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইতে বিলাতের পাওনা বা 'হোমচার্জ' মিটানো হইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্ত বিশেষ প্রতিকূল হইয়েছে। ইহার প্রতিবিধানকল্পে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনপ্রকার বাধানিষেধ না থাকিলে তাহাকে অবাধ বাণিজ্য, আর স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুযোগসুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইলে তাহাকে সংরক্ষণ বলে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রধানত চারিটি : ১। সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করা; ২। দেশীয় শিল্পকে অর্থসাহায্য করা; ৩। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা; ৪। কাঁচামাল রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা।

অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি হইল—১। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের যুক্তি, ২। স্বল্প দামের যুক্তি এবং ৩। উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়বৃদ্ধির যুক্তি। অপরপক্ষে সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি হইল— ১। শিশু শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি; ২। শিল্প-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়নের যুক্তি; ৩। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি; ৪। নিরাপত্তামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি; এবং ৫। অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের যুক্তি। মজুরিবৃদ্ধির যুক্তি প্রভৃতি অন্য কয়েকটি যুক্তিও আছে।

সংরক্ষণের অবশ্য কয়েকটি ত্রুটিও দেখা যায়। গুণাগুণের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করিয়া বলা যায় যে স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে সংরক্ষণ সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

ভারতের সংরক্ষণ নীতি : ১৯২১ সালের ফিসকাল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতের বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে কয়েকটি শিল্প সংগঠিত হইয়া উঠে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে ভারতের সংরক্ষণ নীতিকে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে। এই সংরক্ষণ নীতিকে উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ বলিয়া অভিহিত করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the advantages and disadvantages of Foreign Trade.
(H. S. (H) 1961 ; H. S. (H) Comp. 1962)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া আলোচনা কর। [২৫০-২৫১ এবং ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা]

2. Explain the basis of International Trade. What are the advantages of International Trade ? (H. S. (C) Comp. 1961)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা কর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা কি কি ?
[২৪৯, ২৫২-২৫৫ এবং ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা]

3. What is meant by 'Balance of Payments' ? Distinguish it from 'Balance of Trade'.

লেনদেন-উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝায় ? বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় দেখাও।
[২৫৯-২৬২ পৃষ্ঠা]

4. Write a short note on Balance of Trade. (H. S. (H) 1962)

বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠা]

5. Give some reasons why nations find it advantageous to trade with one another. (C. U. 1951)

যে যে কারণে বিভিন্ন দেশ অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করা সুবিধাজনক মনে করে তাহাদের কতকগুলি বর্ণনা কর।

[ইংগিত : বিশেষ করিয়া আপেক্ষিক সুবিধাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে।...

[২৪৯-২৫১ এবং ২৫২-২৫৫ পৃষ্ঠা]

6. Enumerate the chief articles of India's export and import. Indicate the causes of unfavourable balance of trade in India in the last few years. (C. U. 1958)

ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের উল্লেখ কর। গত কয়েক বৎসরে ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইবার কারণ বর্ণনা কর। [২৫৮-২৫৯ এবং ২৬২-২৬৭ পৃষ্ঠা]

7. "International Trade in the last analysis is a kind of barter." Elucidate. (C. U. 1948)

"শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় ছাড়া আর কিছুই নয়।"—ব্যাখ্যা কর।

[২৫৯-২৬২ পৃষ্ঠা]

8. Discuss the arguments that are advanced in favour of Protection.

সংরক্ষণের সপক্ষে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহাদের আলোচনা কর। [২৬৭-২৬৯ পৃষ্ঠা]

9. On what grounds would you justify the present policy of protection of industries of the Government of India? (H. S. (C) 1960)

কি কি কারণে ভারত সরকারের বর্তমান শিল্প-সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করিতে পার?

[২৬৭-২৬৯ এবং ২৬৯-২৭০ পৃষ্ঠা]

অষ্টাদশ অধ্যায়

বাজার

(Markets)

বর্তমানে অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে এবং চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে দাম নির্ধারিত হয়। সুদূর অতীতেই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ যখন পণ্যোৎপাদন (commodity production) এবং বিনিময়ের পথে পদসঞ্চার করে তখন হইতেই বাজার প্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করা হয়।* তারপর ক্রমশ ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নতিলাভ করে ও শিল্পের বিস্তার হয়। সংগে সংগে বাজারও প্রসারিত হয়।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? (What is a Market?) : যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই সাধারণ ভাষায় বাজার

* পৌরবিজ্ঞানের ১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

বলা হয়। এই অর্থে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল ক্রয়বিক্রয়ের জায়গা আছে তাহারা বাজার বলিয়া অভিহিত—যেমন, নূতন বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার, বড়-বাজার প্রভৃতি। আবার গ্রামাঞ্চলে যে-সকল নির্দিষ্ট জায়গায় হাট বসে বা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে তাহাদেরও বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট জায়গাকে বুঝায় না; কোন দ্রব্য বা উৎপাদন-উপাদানের ক্রেতাবিক্রেতা-গণের মধ্যে লেনদেনের যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলিয়া অভিহিত করা করা হয়। নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতারা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে পারে—এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে। টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রেতাবিক্রেতাদের লেনদেন সম্পাদিত হইতে পারে।

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে নির্দিষ্ট জায়গা বুঝায় না

বাজার বলিতে বুঝায় ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক

সুতরাং যদি কোন অঞ্চলে বিশেষ দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে আদানপ্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে উহাদের প্রদত্ত বিভিন্ন দাম একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বাজারের উপাদানের ইংগিত পাওয়া যায়। প্রথমত, বাজারের জন্য বিশেষ দ্রব্য থাকা চাই। বস্তুত, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে পৃথক পৃথক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক বাজার বুঝায়—যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার প্রভৃতি। এই সকল পণ্য (commodities) ব্যতীত অন্যান্য ধরনের বাজারও আছে—যেমন, বিদেশী মুদ্রার বাজার, শেয়ার-বাজার, শ্রমের বাজার। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতা থাকা চাই। যে-কোন দ্রব্যের দাম (price) থাকিলেই উহার বাজার থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

বাজারের উপাদান
১। পৃথক পৃথক দ্রব্য
২। দাম
৩। ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets):

বিভিন্ন-ভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে: পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয় (Local), জাতীয় (National) ও আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলে—যেমন, তরিতরকারি, ইট প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় সাধারণত দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে; সুতরাং উহাদের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। অনেক জিনিস আছে যাহাদের ক্রয়বিক্রয় সমগ্র

১। পরিধি অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

ক। স্থানীয় বাজার

দেশ জুড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় না—দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয় বাজার। বর্তমান জগতে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রসারের ফলে আবার অনেক দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে; ফলে উহাদের বাজার এখন জগদ্ব্যাপী—যেমন, পাট তুলা স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার আন্তর্জাতিক।

খ। জাতীয় বাজার

গ। আন্তর্জাতিক বাজার

দ্বিতীয়ত, সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ করা যায়। মার্শাল (Marshall) সময়ের দিক হইতে চারি প্রকারের বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, অত্যল্পকালীন বাজার (very short-period market), স্বল্পকালীন বাজার (short-period market), দীর্ঘকালীন বাজার (long-period market), এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার (secular period or very long-period market)। এই চারি প্রকারের বাজারের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হইল এইরূপ:

২। সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

অত্যল্পকালীন বাজার: এক দিনের বা কয়েক দিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এইরূপ বাজারের মেয়াদ বা সময় এতই অল্প যে যোগানের (supply) হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না; অর্থাৎ যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এই অবস্থায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে। চাহিদা অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দামহ্রাসের ঝোঁক দেখা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, এক বিশেষ দিনে বাজারে মৎস্য যোগানের কথা ধরা যাউক। ঐ দিনের দামের তারতম্য অনুসারে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা অধিক হইলে মৎস্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে, চাহিদা কম থাকিলে মৎস্যের দাম হ্রাস পাইবে। দাম অত্যল্প হইলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মৎস্যই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ মৎস্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পচনশীল দ্রব্য। তবে সকল দ্রব্যই মৎস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যই কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত স্বল্পকালীন বাজারেও কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

ক। অত্যল্পকালীন বাজার

দৃষ্টান্ত

স্বল্পকালীন বাজার: স্বল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত সময় হাতে থাকে। তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা যতটা পরিমাণ পরিবর্তন সম্ভব যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ততটা পরিমাণই হইবে। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের পক্ষে বিশেষীকৃত বা স্থায়ী সাজসরঞ্জামের বা মূলধনের (specialised or fixed equipment

খ। স্বল্পকালীন বাজার

or capital) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত যোগান মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

দীর্ঘকালীন বাজার: দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সমধিক পরিমাণে যোগানের পরিবর্তনসাধনের যথেষ্ট সময় থাকে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধন, কুশলী শ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে পারে। ইহা ব্যতীত নূতন নূতন কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়া সংশ্লিষ্ট 'শিল্প'র* কলেবর বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন কমানো যায়। দীর্ঘকালীন বাজারের সময় অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

গ। দীর্ঘকালীন বাজার

অতি দীর্ঘকালীন বাজার: মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এক যুগ হইতে অন্য যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন সরবরাহের অবস্থা, মানুষের রুচি অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবর্তিত হইতে পারে। এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে।

ঘ। অতি দীর্ঘকালীন বাজার

বাজারের পরিধি (Fxtent of a Market): সকল দ্রব্যের বাজারের আয়তন বা পরিধি এক প্রকারের নয়। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন কোন দ্রব্যের বাজার জগদ্ব্যাপী, আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসার এবং পরিবহণ ও আদানপ্রদানের সুযোগ-সুবিধার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের বাজারই সম্প্রসারিত হইতেছে, তবুও কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বিস্তৃত হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সর্তগুলির মোটামুটি বর্ণনা এইভাবে করা যায়:

ব্যাপক পরিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন:

(১) স্থায়িত্ব (Durability): ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল দ্রব্যের বাজার স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হয়। ক্ষণস্থায়ী হইলে স্থানান্তরে প্রেরণে অসুবিধা হয় এবং প্রেরণের সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যাদি যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে অন্য কোন বাধা না থাকিলে তাহাদের বাজার তত সম্প্রসারিত হইবে।

(২) সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (Portability): সুপরিসর বাজারের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি সহজেই স্থানান্তরে প্রেরণযোগ্য হওয়া চাই। আয়তনের তুলনায় দাম যত অধিক হইবে দ্রব্যের প্রেরণযোগ্যতা তত বেশী সহজ হইবে। ইটের কথা যদি

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'শিল্প' (industry) বলিতে একই শ্রেণীভুক্ত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (firm) সমষ্টিকে বুঝায়। যেমন, ভারতের সকল পাটকল (jute mills) লইয়া হইল পাটকল শিল্প (jute mill industry)।

ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইটের আয়তন বা ওজনের তুলনায় উহার দাম অতি সামান্য। ফলে উহাকে স্বল্প খরচে অল্প সময়ের মধ্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইহার বাজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। অপরপক্ষে সোনার মত মূল্যবান ধাতুর বাজার বিস্তৃত হয়, কারণ আয়তনের তুলনায় উহার দাম অধিক।

(৩) সহজে চেনার যোগ্যতা (Cognizability): যে-সকল দ্রব্যের গুণাগুণ সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাদের বাজার বিস্তৃত হয়। এইজন্য মূল্যবান ধাতু, সরকারী ঋণপত্র বা কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির বাজার ব্যাপক হয়।

(৪) ব্যাপক চাহিদা (Wide Demand): অন্যান্য সুযোগসুবিধা যতই থাকুক না কেন, কোন দ্রব্যের বাজার সুপরিসর হইতে হইলে ঐ দ্রব্যটির স্থায়ী ও ব্যাপক চাহিদা থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ, সোনারূপা প্রভৃতির চাহিদা জগদ্ব্যাপী বলিয়া উহাদের বাজারও সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and Competition):

বাজারের দুইটি পক্ষ আছে—ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতাবিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকিতে পারে। এই তারতম্যের জন্যই বাজারে বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাজারের বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন; কারণ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ বাজারের অবস্থার (conditions of market) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা যায়। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম-নির্ধারণে এক ধরনের শক্তি কাজ করিবে; আবার বাজারে যদি একচেটিয়া ব্যবসায় চালু থাকে তাহা হইলে দাম-নির্ধারণের সূত্র ভিন্ন আকার ধারণ করিবে।

বাজারের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশ

বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজনীয়তা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition):

অর্থবিজ্ঞাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন: (১) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা (a large number of buyers and sellers), (২) পূর্ণাংগ বাজার (perfect market), (৩) সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ সুযোগ (free entry) এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদন-উপাদানের সম্পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of productive resources)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্ত:

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত। এখন প্রশ্ন হইল, 'বহুসংখ্যক' বলিতে কি বুঝায় এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উহার তাৎপর্যই বা কি? কত সংখ্যা হইলে বহুসংখ্যক হইবে সে-সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা

নিয়ম নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতাদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে, যেন কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা এককভাবে লেনদেন বা দ্রব্যমূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। প্রত্যেক বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট যোগানের তুলনায় এত সামান্য যে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বাজারে ধান্যের মোট যোগানের পরিমাণ ২০০ লক্ষ কুইন্টাল এবং কোন একজন কৃষকের সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতা হইল ২০০ কুইন্টাল। এই অবস্থায় ঐ কৃষক বাজারে ২০০ কুইন্টাল বিক্রয় করিল বা না করিল তাহার দ্বারা বাজারে ধান্যের দাম পরিবর্তিত হইবে না।

১। বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থিতি

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্ত হইল পূর্ণাংগ বাজার। পূর্ণাংগ বাজারের জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়: প্রথমত, ক্রয়বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হইবে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ, বাজারের বিভিন্ন অংশে ক্রয়বিক্রয় কিভাবে চলিতেছে সে-সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্যকভাবে অবহিত থাকিবে। তৃতীয়ত, ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতারা কোন পৃথকাচরণ করিবে না। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দামে ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ লেনদেন চলিবে এবং কাহারও প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না।

২। পূর্ণাংগ বাজার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তৃতীয় সর্ত হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতা। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সুযোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতার জন্যই বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের একই উপাদানের—যেমন, শ্রমের দাম সমান হয়।

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ সুযোগ এবং উৎপাদনের উপাদান সমূহের গতিশীলতা

একচেটিয়া কারবার (Monopoly): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইল একচেটিয়া কারবার। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশন একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একচেটিয়া কারবারে যোগানের ভার থাকে একের হস্তে

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (pure or absolute) হয় তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের কোন প্রকার পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) থাকিবে না এবং স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে কোন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। এইরূপ নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম চড়া রাখিলেও ক্রেতাগণ তাহার নিকট হইতে কম ক্রয় করিবে না বা অন্য দ্রব্যবিক্রেতার দিকে ঝুঁকিতে পারিবে না।

কিন্তু একেবারে পরিবর্ত-দ্রব্য (substitute) ও মোটেই প্রতিযোগিতা থাকিবে না এবং যতই দাম বৃদ্ধি করা হউক না কেন ক্রেতারা সমপরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে থাকিবে এরূপ কল্পনা করা অতিমাত্রায় অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। এইজন্য সাধারণত একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে ঐ দ্রব্যের 'ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব' (absence of close substitutes) দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ পরিবর্তের অভাব বলিতে বুঝায় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (remote) বা এতই অপ্রচুর যে একচেটিয়া কারবারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।

সুতরাং বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা থাকে না

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না তেমনি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থাই বাজারে সচরাচর দেখা যায়। অর্থাৎ, বেশীর ভাগ শিল্পের বেলায় প্রতিযোগিতা হইল অপূর্ণাংগ (imperfect competition)। প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় প্রধানত তিনটি কারণে: প্রথমত, বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অল্প হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিক্রয় দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে যখন দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতা বহুসংখ্যক হয় তখন প্রতিযোগিতা হয় নিখুঁত বা পূর্ণাংগ। এই দুইটির যে-কোনটির অভাবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হইতে পারে।

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা উভয়ই বিরল

কেন প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয়

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল 'একচেটিয়া প্রতিযোগিতা' (Monopolistic Competition)। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute products) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, একচেটিয়া কারবারের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute products) নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট প্রভৃতির দ্বারা পৃথকিকরণের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য উৎকৃষ্টতর তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার আর একটি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly) বা কতিপয় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন বাজারে একজন বিক্রেতা বা বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে মাত্র কতিপয় বিক্রেতা প্রতিযোগিতা করে তাহাকে

অলিগোপলি বা কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার বলা হয়। অলিগোপলির একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বি-বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

আর দুইটি রূপ হইল অলিগোপলি ও ডুয়োপলি

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে হাটবাজার বসার জায়গা বুঝায় না; বুঝায় ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। অর্থনৈতিক বাজারের উপাদান হইল তিনটি—১। পৃথক পৃথক দ্রব্য, ২। প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক দাম, এবং ৩। ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ: নানাভাবে অর্থনৈতিক বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। (ক) পরিধি অনুসারে বাজার—১। স্থানীয়, ২। জাতীয়, এবং ৩। আন্তর্জাতিক—এই তিন প্রকারের হয়। (খ) সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজার আবার—১। অত্যল্পকালীন, ২। স্বল্পকালীন ৩। দীর্ঘকালীন, এবং ৪। অতি দীর্ঘকালীন—এই চারি রকমের হইতে পারে।

বাজারের পরিধি: ব্যাপক পরিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন—১। উহা স্থায়ী হইবে, ২। উহাকে সহজ বহনযোগ্য হইতে হইবে, ৩। উহাকে সহজে চেনা যাইবে, এবং ৪। উহার ব্যাপক চাহিদা থাকিবে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা: ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য অনুসারে বাজারে বিভিন্ন অবস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ অন্যতন অবস্থা হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির কল্পনা করা হইয়াছে—১। বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি, ২। পূর্ণাংগ বাজার, এবং ৩। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা। ইহাদের ফলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজার-দাম সর্বত্র একই হয়।

একচেটিয়া কারবার: একচেটিয়া বাজারে যোগানের ভার থাকে একজন মাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হস্তে। সুতরাং বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না। বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার বা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা উভয়ই বিরল। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থা—অর্থাৎ, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা নানা রকমের হইতে পারে। ইহার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য রূপ হইল অলিগোপলি ও ডুয়োপলি। একচেটিয়া কারবার অবশ্য অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতারই চরম রূপ।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by 'Market' in Economics? What are the conditions that govern the extent of a market?

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কি বুঝায়? বাজারের আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়?

[ইংগিত: বাজারের আয়তন দ্রব্যের স্থায়িত্ব, বহনযোগ্যতা, চাহিদার ব্যাপকতা প্রভৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্রব্য পচনশীল না হইলে, সহজ বহনযোগ্য হইলে, উহার চাহিদা ব্যাপক হইলে বাজারের আয়তন ব্যাপক হইবে।...(২৭৩-২৭৪ এবং ২৭৬-২৭৭ পৃষ্ঠা)]

2. What is Perfect Competition? What are its conditions?
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে? ইহার সর্ত কি কি? [২৭৭-২৭৮ পৃষ্ঠা]

3. Write notes on :
(a) Local, National and International Markets.
(b) Very Short-period Market, Short-period Market, Long-period Market and Very Long-period Market.

টীকা রচনা কর: (ক) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার।
(খ) অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন ও অতি দীর্ঘকালীন বাজার।
[২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা]

ঊনবিংশ অধ্যায়

দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা

(Introduction to Price Determination)

অভাবমোচনের সমস্যাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে ভোগীর নিকট গিয়া পৌছায়। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় বাজারে। সুতরাং বাজারে বিনিময় হইল উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু।

বিনিময় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু

বাজারে বিনিময়কার্য সম্পাদন বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ই করা হইত। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় কয়েকটি সর্তের উপর নির্ভরশীল। অন্যতম সর্ত হইল যে বিনিময়কারী ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই মনে করিতে হইবে যে বিনিময় দ্বারা তাহার লাভ হইবে। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে সরিষার তৈল চায় এবং অপর এক ব্যক্তি সরিষার তৈলের পরিবর্তে চাউল চায়। অতএব, উভয়েরই অপরের দ্রব্য পাইবার জন্য আকাংক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু কতটা চাউলের পরিবর্তে কতটা সরিষার তৈল বিনিময় করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে উভয়ে একমত না হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে না। যাহার চাউল আছে সে যদি মনে করে চাউল বিনিময় করিয়া তাহার যে 'ক্ষতি' হইবে সরিষার তৈল হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী 'লাভ' পাওয়া যাইবে, এবং অনুরূপভাবে সরিষার তৈলের মালিক যদি মনে করে যে সরিষার তৈলের বিনিময়ে চাউল পাওয়ায় তাহার লাভ বাড়িবে—তবেই চাউল ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হইবে। এই যে 'লাভক্ষতি'র উল্লেখ করা হইল অর্থবিদ্যায় উহাকে 'উপযোগ' বলে। সুতরাং বিনিময় দ্বারা উভয় পক্ষেরই

সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় ও ইহার সর্ত

বিনিময়কারী উভয় পক্ষের উপযোগ বর্ধিত হইলে তবেই বিনিময় সম্পাদিত হয়

উপযোগ বর্ধিত হয়। উভয় পক্ষের উপযোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে বিনিময় সম্পাদিত হইবে না।

বর্তমানে পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যাপারেও ঐ একই সর্ত কার্য করে। টাকাকড়ির বিনিময়ে দ্রব্য সংগ্রহ করিলে এক দিক দিয়া উপযোগ বাড়ে, অন্য দিক দিয়া টাকাকড়ি কমিয়া যাওয়ার জন্য উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা কমে। বিক্রেতার পক্ষে দ্রব্যের বিনিময়ে টাকাকড়ি পাওয়ার জন্য উপযোগ বাড়ে, কিন্তু দ্রব্য হস্তান্তরিত হওয়ায় উপযোগ কমে।

টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য

সুতরাং ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই যদি মনে করে তাহাদের উপযোগ বাড়িবে তবেই টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পাদিত হইতে পারে। এইজন্য দেখা যায় যে 'দামে না পোষানোর দরুন' অনেকে বাজারে জিনিস কিনিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে, অথবা খরিদ্দার থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা বিক্রয় করে নাই।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের যখনই 'দামে পোষায়' তখন টাকা ও জিনিসের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। এই দামকে অর্থবিদ্যায় 'বাজার-দাম' (Market Price) বলা হয়। এই দামেই বাজারে জিনিসপত্র বেচাকেনা হয়। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

মূল্য ও দাম (Value and Price): মূল্য ও দামের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করিলে উহাকে দাম বলা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানিতে পারিলে আমরা উহাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ করিয়া লইতে পারি। ধরা যাউক, এক কিলোগ্রাম চাউলের দাম ৫০ নয়া পয়সা এবং এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা; এ-ক্ষেত্রে উভয়ের বিনিময়-মূল্য হইবে ১ কিলোগ্রাম চাউল = ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল। চাউলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা এবং সরিষার তৈলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ৮ টাকা হয় তবে এখনও ১ কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণত এরূপ ঘটে না—সকল জিনিসের দাম সমপরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে। এই পারস্পরিক মূল্য কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য কি?—এই সকল বিষয় অনুধাবনের সহজ উপায় হইল দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রথমেই আছে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখা।

মূল্যের পরিবর্তে দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান হয় কেন

দাম-নির্ধারণ (Price Determination): সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বাজারে দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং

* ২১-২২ পৃষ্ঠা দেখ।

দাম বা মূল্যের দুইটি দিক আছে—(ক) চাহিদার দিক, এবং (খ) যোগানের দিক। চাহিদার সৃষ্টি করে ক্রেতারা এবং যোগান দেয় উৎপাদকগণ। চাহিদা ও যোগান যেখানে পরস্পরের সমান হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান দ্বারা

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকে মনে করিতেন যে দাম বা মূল্য শুধু যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে কয়েকটি মূল্যতত্ত্বেরও (Theories of Value) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—যথা, শ্রমতত্ত্ব, উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, ইত্যাদি।

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়

মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labour Theory of Value): এই তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহাই উহার মূল্য। একটি দ্রব্য তৈয়ারি করিতে যদি ১০ দিনের এবং অপর একটি তৈয়ারি করিতে যদি ৫ দিনের পরিশ্রম লাগিয়া থাকে তবে প্রথম দ্রব্যটির মূল্য দ্বিতীয় দ্রব্যটির মূল্যের দ্বিগুণ হইবে।

সংক্ষেপে শ্রমতত্ত্ব

নানা দিক দিয়া মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। শ্রম বিভিন্ন ধরনের হয় বলিয়া কতটা শ্রম নিয়োগ করিতে হইয়াছে তাহা মূল্যের মাপকাঠি হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শ্রমই যদি মূল্য নির্ধারক হইত তবে জিনিসপত্রের দাম সকল সময়েই অপরিবর্তিত থাকিত। কিন্তু দেখা যায় যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নহে; প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন এবং সংগঠন-নৈপুণ্যও উৎপাদনকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। পরিশেষে, শ্রম সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে। তখন মূল্য নির্ধারিত হইবে কিরূপে? এ-প্রশ্নের উত্তরও শ্রমতত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সমালোচনা

মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Production Theory of Value): মূল্যের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমতত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব প্রচার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্যের মূল্য উহার উৎপাদন-ব্যয়ের—অর্থাৎ, শ্রম কাঁচামাল মূলধন প্রভৃতি সকলের দরুন ব্যয়েরই সমান হয়। এইভাবে শ্রমতত্ত্বের একটি ত্রুটি দূর করা হইলেও চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত না করার জন্য ইহাতে অন্যান্য ত্রুটি থাকিয়া যায়। সুতরাং এই তত্ত্বও বর্জিত হইয়াছে।

এই তত্ত্বও বর্জিত হইয়াছে

পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Reproduction Theory): এই তত্ত্বের সমর্থকগণ বলেন, আদিতে দ্রব্য নির্মাণ করিতে যে-ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বারা উহার মূল্য নির্ধারিত হয় না, মূল্য নির্ধারিত হয় উহার পুনরুৎপাদন-ব্যয় দ্বারা—অর্থাৎ, ভবিষ্যতে উহা পুনরায় উৎপাদন করিতে কি ব্যয় হইবে তাহার দ্বারা। এই তত্ত্বও মূল্যের ব্যাখ্যা করে না। কোন্

এই তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নহে

দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করিতে বহু ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু উহার যদি কোন চাহিদা না থাকে তবে বাজারে উহার কোন দামই পাওয়া যাইবে না।

মূল্য-নির্ধারণের উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলিকে আংশিক (partial) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহারা মাত্র যোগানের দিক হইতে মূল্য-নির্ধারণের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে।

দাম শুধু যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় না

মূল্য বা দাম নির্ধারণের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাইতে হইলে আমাদিগকে শুধু যোগান নহে, চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কাঁচির দ্বারা কোন কিছু কাটা হইলে যেমন উপরের এবং নীচের দুইটি ফলাই ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম বা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান উভয়ই ক্রিয়া করে। অথবা, ক্রিকেট খেলায় 'ন্যাটা' ব্যাটসম্যান যেমন শুধু বাঁ হাতেই ব্যাট করে না, তাহার ডান হাতটিও যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নহে।

এখন চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার পূর্বে অভাব সম্বন্ধে পুনরায় দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

অভাব (Wants) :

অভাব হইতেই যে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু তাহা আমরা দেখিয়াছি। অভাব আছে বলিয়াই মানুষকে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়।* মানুষের এই অভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

অভাবের বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত, সাধারণভাবে অভাবের কোন সীমা নাই (wants in general are unlimited)। একটি অভাব পরিতৃপ্ত হইলে আর একটি নূতন অভাব আসিয়া দেখা দেয়। যে ব্যক্তির দুই বেলা দুই মুঠা ভাত জুটে না সে মনে করে অন্নকষ্ট দূর হইলেই তাহার সকল অভাব মিটিবে। যখন অন্নকষ্ট দূর হয়, তখন সে অভাববোধ করে পোশাক-পরিচ্ছদের। সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদের অভাব মিটার পর সে দামী পোশাক-পরিচ্ছদের আকাংক্ষা করে। এইভাবে মানুষ সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে প্রতিনিয়ত াই চলে।

১। সাধারণভাবে অভাব অসীম

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে অভাব অসীম হইলেও প্রতিটি অভাব কিন্তু সসীম (each want is limited)। একটি বিশেষ দ্রব্য যতই পাওয়া যায় উহার জন্য আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি সরবৎ পান করিয়া চলে তবে প্রতিটি অতিরিক্ত গ্লাস সরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা ক্রমশ কমিয়া যাইবে এবং শেষে এমন একসময় আসিবে যখন তাহার সরবৎ পানের কোন আগ্রহই থাকিবে না। যে ব্যক্তির ১ জোড়া জুতাও নাই সে প্রথম জোড়া জুতার জন্য যতটা আকাংক্ষা বোধ করিবে, দ্বিতীয় জোড়া জুতার জন্য ততটা আকাংক্ষা বোধ করিবে না। তাহার জুতা জোড়ার

২। প্রত্যেকটি অভাব কিন্তু সসীম

* ২-৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সংখ্যা যদি ক্রমশ বাড়িয়া চলে তবে এমন একসময় আসিবে যখন তাহার নূতন এক জোড়া জুতার জন্য কোন আগ্রহই থাকিবে না। অর্থাৎ, তাহার জুতার জন্য যে-অভাববোধ তাহা সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যাইবে।

৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী

তৃতীয়ত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী (some wants are competitive)। গরম পানীয়ের অভাব চা বা কফি যে-কোন একটি হইতে, জামার অভাব পাঞ্জাবী বা সার্ট যে-কোন একটি হইতে, পরিবহণের অভাব বাস বা ট্রাম যে-কোন একটি হইতে মিটিতে পারে। সুতরাং চা কফির, পাঞ্জাবী সার্টের এবং বাস ট্রামের প্রতিযোগী।

৪। কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক

চতুর্থত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক (some wants are complementary)। চা-এর অভাব দুধ ও চিনির অভাব সৃষ্টি করে; মোটরগাড়ী চড়ার অভাব মিটানোর জন্য মোটরগাড়ী ও পেট্রল দুই-ই চাই, আলু বা পটলের তরকারি আলাদাভাবে রাঁধা গেলেও আলু-পটলের তরকারি রাঁধিতে হইলে আলু ও পটল উভয়ই প্রয়োজন।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ :
১। প্রয়োজনীয়,
২। আরামপ্রদ এবং
৩। বিলাস-দ্রব্য

এইভাবে বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছাড়াও মানুষের অভাবকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, প্রয়োজনীয় অভাব (necessaries), আরামপ্রদ দ্রব্যাদি (comforts), এবং বিলাস-দ্রব্যাদি (luxuries)। প্রয়োজনীয় অভাব বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে—যথা, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব, দক্ষতার জন্য অভাব, রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব ইত্যাদি। যে অভাবগুলি না মিটিলে জীবনধারণই সম্ভব নহে তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য অভাব (necessaries for life) বলে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যূনতম খাদ্যবস্ত্র ও বাসস্থানের উল্লেখ করা যায়।

প্রয়োজনীয় অভাবের প্রকারভেদ

দক্ষতার জন্য অভাব (necessaries for efficiency) হইল সেইগুলি যেগুলি না মিটিলে দক্ষতা বজায় রাখা যায় না। সহরে যে-ডাক্তারের পসার আছে তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী রাখা প্রয়োজন; সাইকেলে চাপিয়া রোগী দেখিতে গেলে তাঁহার দক্ষতা বজায় থাকে না। রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব (conventional necessaries) বলিতে সেগুলিকে বুঝায় যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়। পাড়ায় যদি সকলেরই একটি করিয়া রেডিও সেট থাকে তবে আমাকেও একটি রেডিও সেট রাখিতে হয়, অফিসে সমপদস্থ লোকে সকলেই যদি স্যুট পরিয়া আসে তবে আমাকেও স্যুট পরিতে হয়, ইত্যাদি।

বিলাস-দ্রব্য সেগুলিকেই বলে যেগুলির অভাব মানুষ আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য বোধ করে। দামী দামী জামাকাপড় অলংকার গাড়ীবাড়ী আসবাবপত্র প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, দক্ষতা বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজনীয় নহে। তবুও মানুষ এগুলির আকাংক্ষা করে শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য।

প্রয়োজনীয় অভাব ও বিলাস-দ্রব্যের অভাবের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকে আরামপ্রদ দ্রব্যগুলি। এগুলি হইতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, আড়ম্বর প্রদর্শনও সম্ভব হয় না। এগুলি হইতে কিছুটা আরাম, কিছুটা সুখ ভোগ করা যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই জিনিস ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-ডাক্তারের পসার ভাল তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয়, একজন উচ্চ মাহিনার চাকরিয়ার পক্ষে একখানি গাড়ী হইলে বেশ ভাল হয়, কিন্তু সাধারণ চাকরিয়ার নিকট মোটরগাড়ী বিলাস-দ্রব্য বলিয়াই গণ্য।

একই দ্রব্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার অভাব মিটাইতে পারে

চাহিদা (Demand): অভাববোধ বা আকাংক্ষা হইতেই চাহিদার উদ্ভব হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় শুধু আকাংক্ষা বা পাইবার ইচ্ছাকেই চাহিদা বলিয়া গণ্য করা হয় না। আমি একখানি মোটরগাড়ীর আকাংক্ষা করিতে পারি; কিন্তু আমার মোটর-গাড়ী ক্রয়ের ক্ষমতা বা ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকিতে পারে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে বলা যায় না যে আমার মোটরগাড়ীর চাহিদা রহিয়াছে। অতএব, চাহিদা আকাংক্ষা ছাড়াও অন্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং (২) ক্রয়ের ইচ্ছা।

চাহিদার বৈশিষ্ট্য

ক্রয়ের ক্ষমতা বা ইচ্ছা আবার দামের উপর নির্ভরশীল। কোন দ্রব্যের দাম বেশী হইলে উহা লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে যাইতে পারে অথবা ক্রয়ের ইচ্ছা অন্তর্হিত হইতে পারে। এইজন্য চাহিদা বলিতে কোন বিশেষ দামেই চাহিদার পরিমাণ বুঝায়। বস্তুত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিতে কিছু নাই। 'বাজারে মাছের চাহিদা কত?'—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন। মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। ২ টাকা কিলোগ্রাম হইলে হয়ত' লোকে ১০ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে এবং ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে, ইত্যাদি। সুতরাং বিশেষ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য লোকে কিনিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাই ঐ জিনিসের চাহিদা। বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার জন্য বিভিন্ন দাম থাকে। এই সকল দামকে চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়। চাহিদা-দাম একজনের হইতে পারে, আবার সকলেরও হইতে পারে। একজন ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ কিনিতে প্রস্তুত, সকলে ঐ দামে ১০ কুইণ্টাল মাছ কিনিতে ইচ্ছুক। অতএব, ২ টাকা চাহিদা-দামে ১ কিলোগ্রাম ও ১০ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক চাহিদা। দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে এই সামগ্রিক চাহিদা-দামই গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদা বুঝায়

চাহিদা-দাম

উপযোগ ও চাহিদা (Utility and Demand): ব্যক্তিগতই হউক আর সামগ্রিকই হউক চাহিদা-দাম সকল সময় ব্যক্তির নিকট দ্রব্যের প্রান্তিক

উপযোগের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বলিতে বুঝায় ক্রীত জিনিসের শেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ ; আর সকল একক হইতে যে-উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে মোট উপযোগ (total utility) বলে।

চাহিদা-দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়

ইহা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে ঐ দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট প্রথম এক গ্লাস সরবতের জন্য যেরূপ আকাংক্ষা থাকে, দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্য সেরূপ ইচ্ছা থাকে না। তৃতীয় গ্লাস সরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা আরও কমিয়া যায়। আকাংক্ষা কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা বুঝা যায় লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহা হইতে।

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি প্রথম গ্লাস সরবতের জন্য ৫০ নয়া পয়সা, দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য ২৫ নয়া পয়সা এবং তৃতীয় গ্লাসের জন্য ১২ নয়া পয়সা দিতে প্রস্তুত থাকে তবে তাহার নিকট সরবতের উপযোগ ৫০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ২৫ নয়া পয়সা এবং ২৫ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ১২ নয়া পয়সায় পরিণত হইতেছে। এখন যদি প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ২৫ নয়া পয়সা করিয়াই হয় তবে ঐ ব্যক্তি তুই গ্লাস সরবৎ পান করিবে। এই দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের যে-উপযোগ—অর্থাৎ, ২৫ নয়া পয়সা তাহাই হইল তাহার প্রান্তিক উপযোগ। ইহা বাজার-দামের সমান। এ-ক্ষেত্রে তাহার মোট উপযোগ হইতেছে ৫০ + ২৫ = ৭৫ নয়া পয়সা। ইহার সহিত বাজার-দামের কোন সম্পর্ক নাই। সরবতের দাম প্রতি গ্লাস ১২ নয়া পয়সা হইলে সে তিন গ্লাস পান করিত; ফলে তখনও দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হইত। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত লোকে জিনিস ক্রয় করিয়া চলে বলিয়াই দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ

উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি (Consumers' Surplus): জিনিসের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় বলিয়া ভোগী (consumer) অধিকাংশ সময় একটা উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি উপভোগ করে। ইহাকে উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি বা ভোগোদ্বৃত্ত (consumers' surplus) বলা হয়। আমাদের উদাহরণে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ২ গ্লাস সরবৎ পান করিতেছে বলিয়া সে ৫০ + ২৫ = ৭৫ নয়া পয়সার মত (মোট) তৃপ্তি বা উপযোগ অনুভব করিতেছে, কিন্তু প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ২৫ নয়া পয়সা বলিয়া মোট দাম দিতেছে ৫০ নয়া পয়সা। সুতরাং সে ৭৫ − ৫০ = ২৫ নয়া পয়সার মত অতিরিক্ত তৃপ্তিলাভ করিতেছে। তুই গ্লাসের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তি যদি ৩ গ্লাস সরবৎ পান করিত তবে সে ৫০ + ২৫ + ১২ = ৮৭ নয়া পয়সার মত তৃপ্তিলাভ করিত; কিন্তু প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ১২ নয়া পয়সা বলিয়া ৩৬ (অথবা ৩৭) নয়া পয়সা মোট দাম দিত। ফলে তাহার ৮৭ − ৩৬ (অথবা ৩৭) = ৫১ (অথবা ৫০) নয়া পয়সার উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি লাভ হইত।

এইভাবে মোট উপযোগ হইতে মোট দামকে বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি বা ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ। এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে

হইবে যে এরূপ পরিমাপ করা সকল সময় সম্ভব হয় না, কারণ লোকে কোন্ পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করিয়া কতটা তৃপ্তি পাইল তাহা সকল ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা যায় না।

চাহিদার সূত্র (Law of Demand): উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে দাম যত কম হইবে লোকে জিনিস তত বেশী কিনিবে, পক্ষান্তরে দাম যত বেশী হইবে লোকে জিনিস তত কম কিনিবে। চাহিদা ও দামের মধ্যে এই যে সম্পর্ক ইহাকে চাহিদার সূত্র (Law of Demand) বলা হয়।

চাহিদা-সূচী

চাহিদার সূত্র হইতে কোন্ কোন্ দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাকে চাহিদা-সূচী (Demand Schedule) বলা হয়। নিম্নে একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল:

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ
৩ টাকা	৫ কুইণ্টাল
২·৫০ „	৭ „
২ „	১০ „
১·৫০ „	১৫ „
১ „	২৫ „

দেখা যাইতেছে যে দাম যত কমিতেছে চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়িতেছে। চাহিদার সূত্র অনুসারেই এই রকম হয়।

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে চাহিদার সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে:
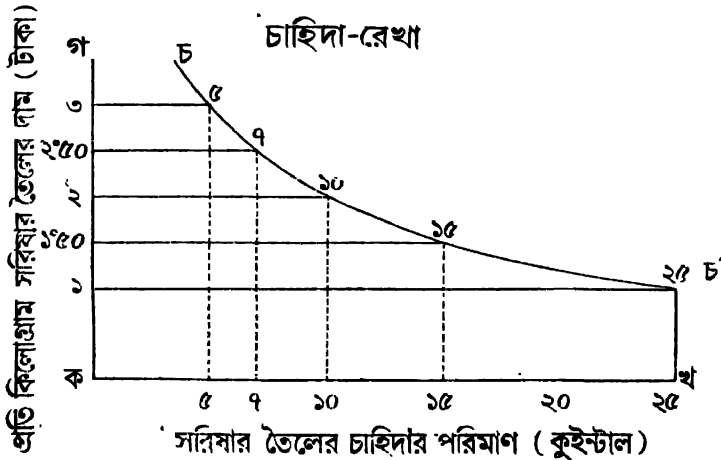
ক গ অক্ষে সরিষার তৈলের দাম এবং ক খ অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা হইল। দাম যখন ৩ টাকা তখন ৫ কুইণ্টাল চাহিদা হয়। দাম কমিয়া ২·৫০, ২·৫০ হইতে ২, ২ হইতে ১·৫০ এবং ১·৫০ হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদাও যথাক্রমে বাড়িয়া

৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইন্টালে দাঁড়াইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক উপরের ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (চ চ') পাওয়া যায় তাহাকে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) বলে। ইহার গতি নিম্নমুখী। ইহার দ্বারা বুঝানো হয় যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

চাহিদা-রেখা

এখন প্রশ্ন, চাহিদার এই সূত্রের মূলে কি কি কারণ আছে—অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কেন?

প্রথমত, প্রত্যেক ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে কোন দ্রব্য পাইতে থাকে উহার জন্য তাহার আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। অর্থাৎ, তাহার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে দাম দিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ, টাকাকড়ির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লোকে ততটাই ত্যাগ স্বীকার করিতে, ততটা অসুবিধা ভোগ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে ভোগ করিতে পারে। অতএব, দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিস ক্রয় করিবে, আর দাম বেশী হইলে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে।

১। প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস

দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কারণ সে পূর্বের তুলনায় কম ব্যয় করিয়া জিনিসটির সেই পরিমাণই ক্রয় করিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক কোন ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিত। মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে সে পূর্বের মত ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিলেও তাহার হাতে ১টি টাকা থাকিয়া যাইবে। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে আরও মাছ কিনিতে ব্যয় কবিতে পারে বলিয়া মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার আয় হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরা হয় এবং ঐ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হয়।

২। আয়-প্রভাব

তৃতীয়ত, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দামের অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ জিনিস অধিকমাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে; আবার কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের অন্য জিনিস অধিকমাত্রায় ক্রয় করে। যেমন, মাছের তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে, আবার মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ও বাড়িলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়িবে ও কমিবে। ইহাকে পরিবর্ত-প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়।

৩। পরিবর্ত-প্রভাব

আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবকে মিলাইয়া দাম-প্রভাব (Price Effect) বলা যায়।

৪। ক্রেতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

চতুর্থত, কোন জিনিসের দাম কমিলে অনেক নূতন ক্রেতা আসিয়া জুটিবে। অর্থাৎ, যাহারা পূর্বের দামে জিনিসটি ক্রয় করিতে পারিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকে জিনিসটি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এই-ভাবে ক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অপরপক্ষে দাম বাড়িলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাসের ফলে চাহিদার পরিমাণও কমিবে।

চাহিদার সূত্রের অনুমান

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দামের পরিবর্তন ছাড়াও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, লোকের আয়ের পরিবর্তন, রুচি-ফ্যাসানের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে চাহিদা পূর্বের তুলনায় কমবেশী হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার সূত্রের উল্লেখ করি তখন এইগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া শুধু দামের সংগে চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি, এবং দেখিতে পাই যে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে আর দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand): দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে—ইহাই চাহিদার নিয়ম। কিন্তু দাম বাড়াকমার ফলে সকল দ্রব্যের চাহিদার সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। দেখিতে পাওয়া যায়, দাম সামান্য কমিলে বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়, কিন্তু চাউল লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বিশেষ কমিলেও উহাদের চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পায় না। দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।*

দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে

অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হইলে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার সামান্য মাত্র পরিবর্তন ঘটে তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand) বলে। চাউল, লবণ, সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। অপরদিকে দামের সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand) বলে। মোটরগাড়ী, রেডিও সেট, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীভুক্ত।

স্থিতিস্থাপক চাহিদা

উদাহরণ

কোন চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক তাহা বুঝা যায় বিভিন্ন দামে ঐ দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ হইতে। চা ও কফির উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক বিভিন্ন বাজার-দামে উহাদের উপর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়:

* **Elasticity of demand may be defined as the degree of response to changes in price.**

চা

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৩ টাকা	১০০০ পাউণ্ড	৩০০০ টাকা
২ "	১২০০ "	২৪০০ "
১ "	১৫০০ "	১৫০০ "

কফি

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪ টাকা	১০০ পাউণ্ড	৪০০ টাকা
৩·৫০ "	২০০ "	৭০০ "
৩ "	৫০০ "	১৫০০ "

দেখা যাইতেছে, চা-এর দাম পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা কমিলেও চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং চা-এর উপর ব্যয়িত মোট টাকার পরিমাণ কমিতেছে। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ। কিন্তু কফির দাম পাউণ্ড প্রতি ৫০ নয়া পয়সা কমিয়া যাওয়ার ফলেই চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ ও ততোধিক হইতেছে এবং কফির উপর ব্যয়িত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই বিশেষত্ব।*

অস্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

স্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদা তত অস্থিতিস্থাপক। চাউল তৈল লবণ প্রভৃতি আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণে ইহাদের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। চা-ও আমাদের দেশে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে; সুতরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে বিলাস-দ্রব্য আমাদের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। ফলে ইহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদা স্থিতি-স্থাপক। কয়লা রন্ধনকার্য, কলকারখানা, রেল-ইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে রন্ধনকার্যে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিতে পারে, আবার দাম কমিলে যাহারা কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

তৃতীয়ত, ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে ঐ ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। বাড়ীঘর নির্মাণের দ্রব্যাদির দাম যদি

---

* চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক কিছুই না হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে 'একের সমান' (equal to unity or one) বলা হয়। ইহাতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পূর্বের মত থাকিয়া যায়। আমাদের উদাহরণে প্রতি পাউণ্ড চা-এর দাম ৩ টাকা হইতে ২ টাকায় কমার ফলে যদি চাহিদা বাড়িয়া ১৫০০ পাউণ্ড এবং ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩০০০ টাকা হইত, তখন চা-এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে একের সমান বলা হইত।

বাড়িয়া যায় তবে লোকে বাড়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে ; পরে আবার মালমসলার দাম কমিলে নির্মাণকার্য সুরু করে।

পরিশেষে, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত (substitute) আছে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন, চা-এর দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে লোকে কফি পান সুরু করিতে পারে, বিদ্যুৎ সরবরাহের দাম বৃদ্ধি করিলে লোকে গ্যাসের বাতি জ্বালাইতে পারে, ইত্যাদি।

চাহিদার মূল্যানুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-Elasticity and Income-Elasticity of Demand) : দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহাকে 'চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Price-Elasticity of Demand) বলা হয়। দাম ছাড়া আরও অনেক কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল আয়ের পরিবর্তন। আয় বাড়িলে লোকে বেশী করিয়া জিনিসপত্র কিনিবে, এবং আয় কমিলে কেনার পরিমাণও কমাইয়া দিবে। আয় কম থাকার জন্য যে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চাপিত, সপ্তাহে মাত্র দুই-তিন দিন মাছ খাইত, জামাকাপড় নিজেই সাবান দিয়া কাচিয়া লইত—আয় বাড়িলে সে প্রথম শ্রেণীর ট্রামে চাপিবে, রোজই মাছ খাইবে এবং জামাকাপড় ধোপার বাড়ী দিবে। ফলে এই সমস্ত জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে। আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে 'চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Income-Elasticity of Demand) বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন কাহাকে বলে এবং কি কি কারণে ইহা ঘটিতে পারে

চাহিদার পরিবর্তন (Change in Demand) : দামের পরিবর্তন না ঘটিয়াও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে চাহিদার পরিবর্তন (Change in Demand) বলা হয়। চাহিদার এই ধরনের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পূর্বের দামেই জিনিসপত্র কমবেশী বিক্রয় হয়। পূর্বোক্ত আয়ের পরিবর্তন ছাড়া নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়।

(১) লোকের রুচি স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন : চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইলে চিনি ও দুগ্ধের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে ; মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা কমিবে ; মেয়েদের মধ্যে জরির জুতা পরার ফ্যাসান চালু হইলে জরির চাহিদা বাড়িবে ; ইত্যাদি।

(২) জনসংখ্যার পরিবর্তন : জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বহু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগে বাড়ীঘর জমি-জমার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; আবার ঐ কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

(৩) আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন : জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইবে। ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্রের ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে এবং ধনীর ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিবে।

(৪) ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা: বাজারের তেজী-মন্দা অবস্থার দ্বারাও চাহিদা প্রভাবান্বিত হয়। তেজী বাজারের (boom market) সময় সকল জিনিসের চাহিদা বাড়ে আবার মন্দাবাজারের সময় সকল জিনিসের চাহিদা কমে।

(৫) পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন: কতকগুলি এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের দাম পরস্পর-সম্পর্কিত—যেমন, চা ও চিনি, মোটরগাড়ী ও পেট্রল, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদাও হ্রাস পাইতে পারে। যেমন, পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে মোটরগাড়ী চড়া কমাইয়া দিতে পারে।

যোগান (Supply): চাহিদার মত যোগানের পরিমাণও দাম-পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। দাম কমিলে মুনাফা কমে; ফলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। আর দাম বাড়িলে মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চাহিদার সূত্রের (Law of Demand) মত যোগানেরও একটি সূত্র আছে। ইহাকে যোগানের সূত্র (Law of Supply) বলা হয়। যোগানের সূত্র হইতে যোগান-সূচী (Supply Schedule) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নিম্নে একটি যোগান-সূচী দেওয়া হইল:

দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানেরও পরিবর্তন হয়

যোগানের সূত্র

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
২.৫০ "	১৩ "
২ "	১০ "
১.৫০ "	৭ "
১ "	৪ "

সূত্রটি হইতে দেখা যাইবে যে দাম যত বাড়িতেছে যোগানের পরিমাণও তত বাড়িতেছে। এই দামকে যোগান-দাম (Supply Price) বলা হয়। যোগানের উপর দামের প্রভাব চাহিদার উপর দামের প্রভাবের ঠিক বিপরীত। এই কারণে যোগান-রেখা (Supply Curve) অংকন করা হইলে তাহার গতিও চাহিদা-রেখার বিপরীতমুখী অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী হইবে।

যোগান-দাম ও যোগান-রেখা

পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রটির সাহায্যে যোগানের সূত্র ব্যাখ্যা করা হইল।

দাম যখন ১ টাকা তখন যোগান ৪ কুইণ্টাল; দাম বাড়িয়া ১ টাকা হইতে ১.৫০ টাকা, ১.৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ২.৫০ টাকা এবং ২.৫০ টাকা হইতে ৩ টাকা হইলে যোগানের পরিমাণও বাড়িয়া যথাক্রমে ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ কুইণ্টাল হইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ নির্দেশক উপরের দিকে ৪, ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (য য´) পাওয়া যায় তাহাই যোগান-রেখা। প্রতিবার দামবৃদ্ধির ফলে ইহা উপরের দিকে উঠিতেছে।
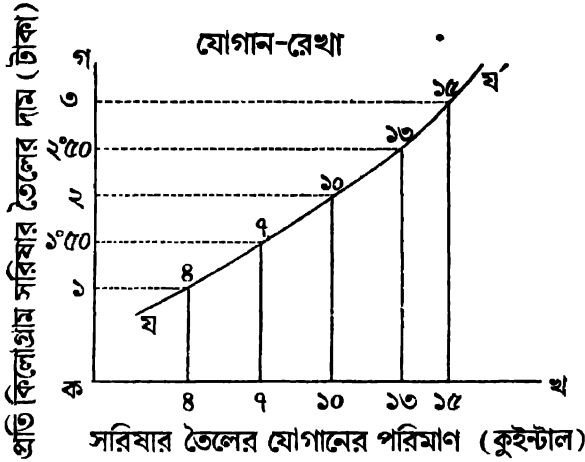
এখন প্রশ্ন হইল, বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান হয় কেন? অর্থাৎ, যোগানের পশ্চাতে কোন্ শক্তি কার্য করে? এই প্রশ্নের বিচারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন যোগানের বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

যোগানের পশ্চাতে কোন্ শক্তি কায করে

সংক্ষেপে বলা যায়, দীর্ঘকালীন বাজারে যোগান নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিলে উৎপাদন-ব্যয় (Cost of Production)* পোষায় উৎপাদকগণ সেই পরিমাণ দ্রব্যই যোগান দিয়া থাকে। আমাদের উদাহরণে ১ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৪ কুইণ্টাল, ১'৫০ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৭ কুইণ্টাল, ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১০ কুইণ্টাল, ইত্যাদি পরিমাণ সরিষার তৈল যোগান দিলে উৎপাদকের পোষায়—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দাম উহা অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইবে না বলিয়া উৎপাদনও কমিবে; ফলে যোগানও হ্রাস পাইবে।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে একমাত্র কায করে উৎপাদন-ব্যয়

স্বল্পকালীন বাজারে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবার বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে মজুত মালের মধ্যে তাহারা কতটুকু পরিমাণ বাজারে ছাড়িবে। ইহা নির্ধারিত হয় সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) দ্বারা। সংরক্ষণ-দাম বলিতে সেই দামকেই বুঝায় যাহা না পাইলে বিক্রেতারা বাজারে মাল ছাড়িবে না। এই সংরক্ষণ-দাম নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, মজুত মালের পরিমাণ ও প্রকৃতি, ভবিষ্যতে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিক্রেতাদের নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক হয় এবং দ্রব্যটি যদি মাছ-তরিতরকারির মত পচনশীল হয় তবে বিক্রেতাদের যথাশীঘ্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া

স্বল্পকালীন ভিত্তিতে কার্য করে সংরক্ষণ-দাম

* স্বাভাবিক বা সাধারণ মুনাফা (normal profit) উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ফেলিতে হইবে। ফলে উহার সংরক্ষণ-দামও কম হইবে। অপরপক্ষে দ্রব্যটি যদি পচনশীল না হয় এবং মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক না হয় তবে দাম কম হইলে বিক্রেতারা দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টাই করিবে। এ-ক্ষেত্রে দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিবে। ভবিষ্যতে যদি চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবেই তাহারা মাল ধরিয়া রাখিবে, নচেৎ নয়। আবার বিক্রেতাদের নিকট নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা যদি খুব বেশী হয় তবে ভবিষ্যতে চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের পক্ষে স্বল্প দামে বিক্রয় করিবার চাপ অধিক হইবে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সংরক্ষণ-দাম নির্ধারিত হয়।

সংরক্ষণ-দাম কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

সংরক্ষণ-দাম বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইলেও উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। কারণ, ব্যবসায়ীরা নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির প্রভাব যথাসম্ভব কাটাইয়া উঠিয়া যতক্ষণ-পর্যন্ত-না দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ মাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। অবশ্য স্বল্পকালীন চাহিদা যদি বিশেষ হ্রাস পায় এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তবে আর মাল ধরিয়া রাখে না—উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অল্প বাজার-দামেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। অতএব, বলা যায় যে স্বল্পকালীন যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়।

স্বল্পকালীন ভিত্তিতেও যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা পুরাপুরিই প্রভাবান্বিত হয়—উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ, বহুদিন ধরিয়া লোকসান দিয়া কেহই উৎপাদন করিতে চাহে না।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়

উৎপাদন-ব্যয় এবং উৎপন্নের বিধিসমূহ (Cost of Production and Laws of Returns):

দেখা গেল, দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় সকল ক্ষেত্রে এক থাকে না। উৎপাদন-ব্যয় কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপন্নের বিধির (Laws of Returns) উপর।

উৎপন্নের বিধিও যোগানকে প্রভাবান্বিত করে

উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি—(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি। নিম্নে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns):

ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে ঘটিতে থাকে; এবং ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা দেয়। এই কারণে ইহাকে

ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও বলে

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Increasing Cost) বলা হয়।* নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে :

ধান্যের উৎপাদন	কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ কুইন্টাল	১০ টাকা
২০০ "	১২ "
৩০০ "	১৫ "
৪০০ "	২০ "

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিধিটি মাত্র কৃষি ও অনুরূপ কার্যের বেলাতেই ক্রিয়া করে না, উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার কার্যকারিতা দেখা যায়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থায় পৌছানোর পর যদি যে-কোন উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরগুলির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া যাওয়া হয় তবে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে উৎপাদন ঘটিতে থাকিবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জমি শ্রম ও মূলধন বাড়ানো সম্ভব হইলেও সংগঠক একই থাকে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়।

একসময় না একসময় ইহা উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই কাষ করে

(খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of Increasing Returns) : উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত যতক্ষণ কাম্য অবস্থায় না পৌঁছায় ততক্ষণ উহাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ঘটে। ফলে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এইজন্য এই সূত্রকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Decreasing Cost) বলা হয়। প্রধানত উৎপাদনের যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দানের প্রাধান্য নাই, সেখানেই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। তবে কৃষির বেলাতেও প্রথম প্রথম এই বিধি কার্য করিতে পারে। বিধিটিকে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হইল :

ইহা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি নামেও পরিচিত

সিমেন্টের উৎপাদন	টন প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ টন	১০০ টাকা
২০০ "	৯০ "
৩০০ "	৮০ "
৪০০ "	৭০ "

বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে এরূপ ঘটিতে দেখা যায়

বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ততই সুবিধা পাওয়া যায়। অন্যান্যভাবেও ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে। ফলে একক প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ কমিয়া আসে। অবশ্য অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া এরূপ চলিতে

* ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

পারে না। উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অবস্থা অতিক্রম করিলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ক্রিয়া সুরু করিবে।

(গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns): অনেক সময় সমহারে উৎপাদন হইতে দেখা যায়। সুতরাং এককপিছু উৎপাদন-ব্যয়ও অপরিবর্তিত থাকে। ইহারও একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে।

কাপড়ের উৎপাদন	মিটার প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ মিটার	৫০ নয়া পয়সা
২০০ "	৫০ "
৩০০ "	৫০ "
৪০০ "	৫০ "

সমহারে উৎপন্নের বিধি ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির সমপ্রভাবের ফল। প্রকৃতির দানের অপ্রতুলতার জন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের দিকে যতটা ঝোঁক দেখা যায়—শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য ঠিক ততটাই ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। ফলে উৎপাদন ও উৎপাদন-ব্যয়ের হার একই থাকে।

ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান বিধির ফল সমান হইলে সমহারে উৎপাদন ঘটে

দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থা বিভিন্ন উৎপন্নের বিধির অধীন বলিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও বিভিন্ন হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মাধীন হইলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে যোগান-দামও বাড়িতে থাকিবে; উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সূত্রাধীন হইলে যোগান যত বাড়িবে যোগান-দাম তত কমিবে; এবং সমহারে উৎপন্নের বিধি কার্য করিলে যোগান-দাম কমিবেও না, বাড়িবেও না—একই থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন-ব্যয়ের জন্য যোগান-দাম বিভিন্ন হয়

সংক্ষিপ্তসার

বিনিময় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু। পূর্বে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় করিত। দ্রব্য-বিনিময় হউক আর টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ই হউক বিনিময়কারী উভয় পক্ষ লাভবান হইয়াছে মনে না করিলে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় না। উভয় পক্ষ তখনই লাভবান হয় যখন উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। আধুনিক বিনিময়ের উদাহরণ দিয়া বলিতে গেলে, টাকাকড়ি ও দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইলে তবেই বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। যে-দামে ইহা হয় তাহাকে বাজার-দাম বলে।

মূল্য ও দাম: মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম বলে। দামের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা মূল্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি।

দাম-নির্ধারণ: দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দিক দিয়া কয়েকটি তত্ত্বও উদ্ভূত হইয়াছে—যথা, (ক) শ্রমতত্ত্ব, (খ) উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, (গ) পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্বের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া মার্শাল ঘোষণা করেন যে, কাঁচি দিয়া কোন কিছু কাটিতে হইলে যেমন কাঁচির দুইটি ফলাই ব্যবহার করিতে হয়, তেমনি দামও চাহিদা এবং যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়—একমাত্র চাহিদা বা একমাত্র যোগান দ্বারা নহে।

অভাব: অভাবের জন্যই মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মানুষের অভাবের চারিটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। সামগ্রিকভাবে অভাব অসীম, ২। প্রত্যেকটি অভাব কিন্তু সসীম, ৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী, ৪। কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক।

মানুষের অভাবকে মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১। প্রয়োজনীয়, ২। আরামপ্রদ, ৩। বিলাস-দ্রব্য। প্রয়োজনীয় অভাব আবার তিন ধরনের হয়—(ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয়, (গ) রীতিগত প্রয়োজনীয়।

চাহিদা: অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদা বুঝায়। বস্তুত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিয়া কিছু নাই। চাহিদা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(ক) আকাঙ্ক্ষা, (খ) ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং (গ) ক্রয়ের ইচ্ছা। বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার জন্য বিভিন্ন দাম থাকে। ইহাকে চাহিদা দাম বলে।

উপযোগ ও চাহিদা: উপযোগ ও চাহিদার মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

ব্যক্তির নিকট চাহিদা-দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ বলিতে বুঝায় একটি জিনিসের শেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ। ভোগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এইভাবে হ্রাস পাইতে পাইতে উপযোগ যতক্ষণ পর্যন্ত না দামের সমান হয় ততক্ষণ ব্যক্তি ক্রয় করিয়া চলে।

উদ্বৃত্ত তৃপ্তি: বিভিন্ন একক হইতে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু দাম সকল এককের বেলায় একই থাকে বলিয়া ক্রেতা ও ভোগী কতকটা উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি লাভ করে। ইহাকে ভোগোদ্বৃত্ত বলা হয়। মোট উপযোগ হইতে মোট প্রদত্ত দাম বাদ দিয়া ইহার পরিমাপ করা হয়।

চাহিদার সূত্র: চাহিদার সূত্র অনুসারে দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। চাহিদার সূত্র হইতে চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায়—অর্থাৎ, দেখানো যায় যে কোন কোন দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা হইবে। চাহিদার সূত্রের রেখাচিত্র অংকন করিলে তাহা হইতে চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। এই চাহিদা-রেখার গতি নিম্নমুখী। ইহা দ্বারা বুঝানো হয় যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে এই কয়টি নিয়ম কাজ করে: ১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ, ২। আয়-প্রভাব, ৩। পরিবর্ত-প্রভাব, এবং ৪। ক্রেতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি। চাহিদার সূত্র কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটিলেও যে-চাহিদা সামান্য মাত্র পরিবর্তিত হয় তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং দাম সামান্য পরিবর্তিত হইলেই যে চাহিদা বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না হ্রাস পাইতেছে—তাহার দ্বারাও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, নানাভাবে না একই কাজে ব্যবহার্য দ্রব্য, ইত্যাদি।

চাহিদার দামানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা: দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার দামানুগ স্থিতিস্থাপকতা এবং আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন: দাম-পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাকে চাহিদার পরিবর্তন বলা হয়। ১। লোকের রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তন, ২। জনসংখ্যার পরিবর্তন, ৩। আয়ের পরিবর্তন, ৪। আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, ৫। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন, এবং ৬। পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন—এই কয়টি কারণের জন্য চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

যোগান: দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানও পরিবর্তিত হয়। চাহিদার সূত্রের মত যোগানের সূত্র, চাহিদা-দামের মত যোগান দাম এবং চাহিদা-রেখার মত যোগান-রেখাও আছে।

স্বল্পকালীন যোগানের পশ্চাতে কার্য করে 'সংরক্ষণ-দাম' এবং দীর্ঘকালীন যোগানের পশ্চাতে কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়। তবে স্বল্পকালীন ভিত্তিতেও যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়, কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিক্রেতারা যোগান দিবে কিনা মোটামুটি তাহা ঠিক করে।

উৎপাদন-ব্যয় ও উৎপন্নের বিধিসমূহ: উৎপাদন-ব্যয় তিন প্রকারের হয়—১। ক্রমবর্ধমান, ২। ক্রমহ্রাসমান, এবং ৩। সমহার। উৎপন্নের বিধিও তিন প্রকার: ১। ক্রমহ্রাসমান, ২। ক্রমবর্ধমান, এবং ৩। সমহার।

প্রশ্নোত্তর

1. **State and explain the Law of Demand.** **(H. S. (C) Comp. 1961)**

চাহিদার সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। [২৮৮-২৯০ পৃষ্ঠা]

2. **State the Law of Demand. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price to increase it.** **(C. U. 1958)**

চাহিদার সূত্র বিবৃত কর। কেন দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে তাহা ব্যাখ্যা কর। [২৮৮-২৯০ পৃষ্ঠা]

3. **State the distinction between Marginal Utility and Total Utility. Explain the meaning of Consumers' Surplus.** **(C. U. 1955, '60)**

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। উদ্বৃত্ত-তৃপ্তির অর্থ ব্যাখ্যা কর। [২৮৬-২৮৮ পৃষ্ঠা]

4. **What do you understand by Elasticity of Demand? Distinguish between Elastic Demand and Inelastic Demand.** **(P. U. 1961 ; En. 1961 ; H. S. (C) 1961)**

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝায়? স্থিতিস্থাপক চাহিদা ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [২৯০-২৯১ পৃষ্ঠা]

5. **What is meant by 'Elasticity of Demand'? Explain why the demand for luxuries is usually elastic, while the demand for necessaries is inelastic.** **(H. S. (H) Comp. 1961)**

'চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা' বলিতে কি বুঝায়? সাধারণত বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত: বিলাস-দ্রব্যসমূহ আমাদের কম প্রয়োজনীয় অভাব মিটায় বলিয়া, উহাদের ভোগ স্থগিত রাখা যায় বলিয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে উহাদের পরিবর্ত-দ্রব্য আছে বলিয়া উহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। বিপরীত কারণসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।... (২৯০-২৯২ পৃষ্ঠা)]

6. **State the Law of Supply. What are the forces that lie behind it?**

যোগানের সূত্র বিবৃত কর। এই সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কার্য করে? [২৯৩-২৯৫ পৃষ্ঠা]

7. **State and explain the Laws of Increasing and Diminishing Returns.**

ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা কর। [৬১-৬২ এবং ২৯৫-২৯৭ পৃষ্ঠা]

8. **Write notes on: (a) Marginal Utility, (b) Demand Schedule and Supply Schedule, (c) Demand Price and Supply Price.**

টীকা রচনা কর: (ক) প্রান্তিক উপযোগ, (খ) চাহিদা-সূচী ও যোগান-সূচী, (গ) চাহিদা-দাম ও যোগান-দাম। [২৮৬, ২৮৭, ২৮৮ এবং ২৯৩ পৃষ্ঠা]

বিংশ অধ্যায়

দাম-নির্ধারণ বা চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য

(Price Determination or Equilibrium of Demand and Supply)

চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক যে ইহাদের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার নিয়ম অনুসারে দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে; অপরদিকে যোগানের নিয়ম অনুসারে ঠিক বিপরীত ঘটে। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি এক স্থানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price) এবং ঐ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Amount) বলা হয়।

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে দাম ধার্য হয়

নিম্নে চাহিদা ও যোগান সূচী পাশাপাশি সাজাইয়া প্রতিযোগিতামূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হইল :

সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ	প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৫ কুইণ্টাল	৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
৭ ”	২·৫০ ”	১৩ ”
১০ ”	২ ”	১০ ”
১৫ ”	১·৫০ ”	৭ ”
২৫ ”	১ ”	৪ ”

উপরি-উক্ত চাহিদার তালিকা হইতে দেখা যায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু যোগানের তালিকা অনুসারে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা করিয়া তখন চাহিদা ও যোগান উভয়ই ১০ কুইণ্টাল। দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইতে ২·৫০ টাকা হইলে যোগান ১৩ কুইণ্টাল হইবে কিন্তু চাহিদা ৭ কুইণ্টালে নামিয়া আসিবে। ফলে বাধ্য হইয়া বিক্রেতাদের দাম কমাইতে হইবে। অপরদিকে দাম কমিয়া ১·৫০ টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া ১৫ কুইণ্টাল হইবে, কিন্তু যোগান কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। ফলে চাহিদার প্রভাবে দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী হইবে। এইভাবে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে চাহিদা ও যোগান ২ টাকা দামে পরস্পরের সহিত সমান হইবে। এই ২ টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থাই হইল ভারসাম্যের অবস্থা (Equilibrium Position) এবং এই ২ টাকা দামই ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price)। ভারসাম্য-দাম বলা হয় এই কারণে যে ঐ দামে চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার সৃষ্টি হয়।

ভারসাম্য-দাম

বিষয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিম্নে রেখাচিত্রটি অংকন করা হইল :
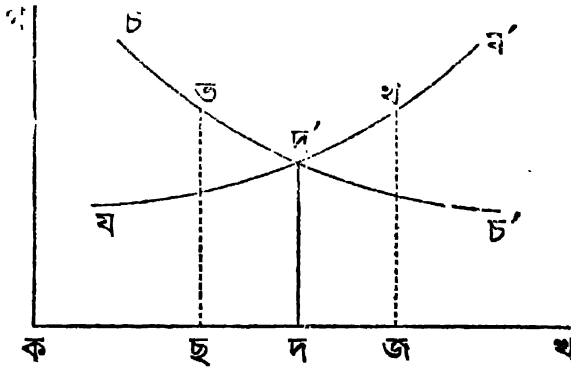
চ চ´ পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা ; উহার গতি নিম্নমুখী। য য´ যোগান-রেখা ; উহা উর্ধ্বগামী।* উহারা পরস্পরকে দ´ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। দ দ´ (অস্থায়ী) ভারসাম্য-দাম পরিমাপ করে। অর্থাৎ, দ দ´ দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান (ক দ পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া ছ ত হয় তবে চাহিদা কমিয়া ক ছ-এ আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যোগান হইবে ক জ পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবার দামকে দ দ´-তে লইয়া আসিবে।
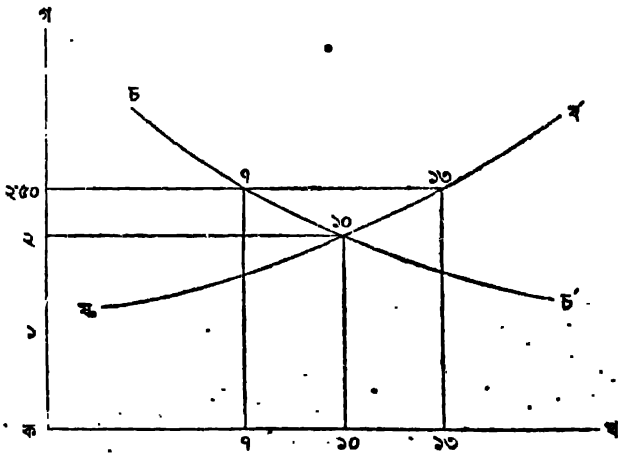
পাটীগাণিতিক হিসাব ধরিলে আমাদের উদাহরণে দ দ´ (দাম) হইল ২ টাকা এবং ক দ (চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ) হইল ১০ কুইন্টাল। দাম দ দ´ (২ টাকা)

* ২৮৮-২৮৯ এবং ২৯৩-২৯৪ পৃষ্ঠা।

হইতে বাড়িয়া ছ ত (২·৫০ টাকা) হইলে চাহিদা ক দ (১০ কুইণ্টাল) হইতে ক ছ-তে (৭ কুইণ্টাল) কমিয়া আসিবে ; কিন্তু যোগান ক দ (১০ কুইণ্টাল) হইতে ক জ-তে (১৩ কুইণ্টাল) বৃদ্ধি পাইবে।

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে এইভাবে বিবৃত করা যায় :

দাম-নির্ধারণের ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের তিনটি নীতি

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

(২) দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে ; দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে।

(৩) এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়।

সংক্ষিপ্তসার

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য : প্রতিযোগিতামূলক দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 'ভারসাম্যের অবস্থা' এবং যে-দামে উহা নির্ধারিত হয় তাহাকে 'ভারসাম্য-দাম' বলা হয়।

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে তিনটি সরল নীতিতে বিবৃত করা যায় :

১। কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

২। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে ; দাম বাড়িলে ইহার বিপরীত ঘটে।

৩। এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Explain how price is determined under conditions of competition.

(P. U. 1961)

কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

[৩০০-৩০২ এবং ৩০৮ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন দেখ।]

একবিংশ অধ্যায়

বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ

(Price Determination under Different Market Conditions)

মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক বাজারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, এবং (খ) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া কারবারের বাজার। ইহা ছাড়াও বাজার যে সময়ের তারতম্য বা পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি।

পূর্ণাংগ এবং অপূর্ণাংগ বা একচেটিয়া বাজার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ (Price Determination in Perfectly Competitive Market) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(১) বাজার-দাম, এবং (২) স্বাভাবিক দাম। সংক্ষেপে, বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন দাম এবং স্বাভাবিক দাম হইল দীর্ঘকালীন দাম। বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; কিন্তু স্বাভাবিক দাম একদিকে প্রান্তিক উপযোগ অপরদিকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। প্রথমে কিভাবে বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাউক।

বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দাম

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতা অসংখ্য থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য একই মানের হয় বলিয়া, পৃথকভাবে ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সামান্য সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া এবং প্রত্যেকেই অপরে কি-দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম এক হয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা

বাজার-দাম এই এক হওয়ার মূলে কাজ করে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত। চাহিদা ও যোগান কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* এখন সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদা ও যোগান একসময় পরস্পরের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা অবশ্য অস্থায়ী। এইজন্য ইহাকে অস্থায়ী ভারসাম্য (Temporary Equilibrium) এবং ঐ দামকে অস্থায়ী ভারসাম্য-দাম (Temporary Equilibrium Price) বা বাজার-দাম (Market Price) বলা হয়।

বাজার-দাম হইল অস্থায়ী ভারসাম্য-দাম

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব (Influence of Marginal Utility and Cost of Production on

* ৩০০-৩০২ পৃষ্ঠা দেখ।

বাজা
যোগানের ।৲
প্রভাব দেখা যায়

বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন ভারসাম্য-দাম। অর্থাৎ, অল্প চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তাহাকেই বাজার-দাম বলে। অল্প সময়ের মধ্যে যোগান মোটামুটি স্থির থাকে। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দামের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন ক্রেতারা যে দাম দিতে চাহিবে বিক্রেতাগণকে তাহাতেই উহা বিক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত বা সংরক্ষণ দাম (Reservation Price) থাকে। এই সংরক্ষণ-দামের জন্য বাজার দামের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।*

অবশ্য চাহিদা বা
উপযোগের প্রভাবই
অধিক

কিন্তু ক্রেতার নিকট বাজার-দাম সর্বদাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। কোন দ্রব্য লোকে যত বেশী পরিমাণ কিনিতে থাকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে উহার প্রতি ক্রীত এককের উপযোগ ততই কমিতে থাকে। এইভাবে একসময় বাজার-দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। যে-ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামের ২ কিলোগ্রাম সরিষার তৈল কিনিল, সে ২ কিলোগ্রামের কম বা বেশী কিনিল না কেন? অথবা, যে ব্যক্তি ২৫ নয়া পয়সা দামের দুই গ্লাস সরবৎ পান করিল, সে ১ বা ৩ গ্লাস সরবৎ পান করিল না কেন? ইহার উত্তর হইল, প্রথম ব্যক্তির নিকট সরিষার তৈলের দ্বিতীয় কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের উপযোগ ২৫ নয়া পয়সার সমান। স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। একজন ২ টাকা দামে ৪ কিলোগ্রাম তৈলও কিনিতে পারে। তাহার নিকট ৪র্থ কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার সমান।** সুতরাং বাজার-দাম মোট বিক্রীত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মনে করিলে ভুল হইবে; উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মাত্র।

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়? (How is Normal Price Determined?): দীর্ঘকালীন বাজারে শেষপর্যন্ত যে-দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলা হয়। স্বাভাবিক দাম বলিতে কোন বিশেষ দামকে বুঝায় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে যে-দাম নির্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক তাহাকেই বুঝায়। স্বাভাবিক দাম দীর্ঘকালীন গড়পড়তা দামও নহে। চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে ইহা ধরিয়া লইয়াই দীর্ঘকালীন গড়পড়তা দাম-

স্বাভাবিক দাম বলিতে
কি বুঝায়

* ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উপযোগ পরিমাপ করা হইয়া থাকে লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহার দ্বারা।...২৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম-নির্ধারণের বেলায় চাহিদা ও যোগানের অবস্থার যে যে পরিবর্তন ঘট্া সম্ভব তাহাদের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়।

স্বাভাবিক দাম আবার অতি দীর্ঘকালীন দাম নাও হইতে পারে। কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব; আবার কয়েকটির বেলায় বহুদিন সময় লাগিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, মোটামুটি যে দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম।

স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদার অবস্থা অনুসারে বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম বা বেশী হইতে পারে। দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতাগণকে লোকসান দিয়া বেচিতে হইবে; এবং দাম বেশী হইলে তাহাদের মুনাফা 'স্বাভাবিক মুনাফা' অপেক্ষা অধিক হইবে। এই দুইটি অবস্থার কোনটিই বেশীদিন বর্তমান থাকিতে পারে না। কোন উৎপাদকই দীর্ঘকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিবে না; এবং মুনাফা স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হইতে থাকিলে সকলে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবে, নূতন নূতন ব্যবসায়ী ঐ দ্রব্য উৎপাদন সুরু করিবে, ইত্যাদি। ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সম্পূর্ণ সমান হইবে। এই দামকে 'স্বাভাবিক দাম' (Normal Price) এবং এই অবস্থাকে প্রকৃত ভারসাম্যের অবস্থা বলা হয়। এই দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সমান হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল বা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ, তাহাদের বাড়াকমার দিকে কোনও ঝোঁক দেখা যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক দামে প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয়।

স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়

এখন প্রশ্ন হইল, স্বাভাবিক দাম কোন্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে? আধুনিক লেখকগণের মতে, ইহা তাহারই সমান হইবে যাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় (average cost) পরস্পরের সহিত সমান। এইরূপ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে কাম্য প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm) বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নে এই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Marginal and Average Cost of Production and Optimum Firm):

কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উহার বিপরীত ঘটে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনের সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও যে পরিবর্তিত হয় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণটি হইতে বুঝা যাইবে।

মোট উৎপাদন (কুইণ্টাল)	মোট উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	গড় উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)
১	১০	১০	১০
২	১৮	৮	৯
৩	২৭	৯	৯
৪	৩৮	১১	৯.৫

দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন যখন ৩ কুইণ্টাল তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হইতেছে। যে-পরিমাণ উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই এরূপ সমান হয় তাহাকে কাম্য উৎপাদন (Optimum Production) বলে। সুতরাং আমাদের উদাহরণে ৩ একক হইল কাম্য উৎপাদন এবং যে প্রতিষ্ঠান ঐ পরিমাণ উৎপাদন করে এবং যাহার প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হয় তাহাই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm)।

কাম্য উৎপাদন ও কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Time Element in Price Determination): চাহিদা ও যোগানের প্রভাব দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই দুই প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সময়ের সংগে সংগে যে পরিবর্তিত হয়, বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের পার্থক্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সময় যতই অল্প হইবে চাহিদার প্রভাব হইবে তত অধিক, এবং সময় যতই দীর্ঘ হইবে যোগানের প্রভাব হইবে তত বেশী।

সময় অল্প হইলে চাহিদা অধিক এবং সময় অধিক হইলে যোগান অধিক প্রভাব বিস্তার করে

সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বাজার চারি প্রকারের হয় বলিয়া* মার্শাল চারি প্রকারের দামের উল্লেখ করিয়াছেন: (ক) অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (Very Short-period or Market Price), (খ) স্বল্পকালীন দাম (Short-period Price), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (Long-period or Normal Price) এবং (ঘ) অতি দীর্ঘকালীন দাম (Very Long-period or Secular Price)।

সময়ানুসারে বাজার-দামের প্রকারভেদ

অত্যল্পকালীন বাজারে দাম অনিয়মিত ও ক্ষণস্থায়ী কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই সময়ে চাহিদার প্রভাব হয় সর্বাধিক। বিক্রেতারা অবশ্য মাল বিক্রয় না করিয়া কিছুদিন বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বেশী দিন তাহাদের পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মোটামুটি চাহিদার প্রভাব দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয়। বলা হইয়াছে যে, এই দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহাতে বিক্রেতার লাভও হইতে পারে আবার ক্ষতিও হইতে পারে।

অত্যল্পকালীন বাজার-দাম

* ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বাজার-দাম অধিক হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগান নির্ভর করে সাজ-সরঞ্জামের অবস্থা ও উৎপাদনের আয়তনের উপর। অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদনের আয়তনে অধিক উৎপাদন করিতে গেলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের (increasing cost) সূত্র ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং উৎপাদকগণ সেই পর্যন্তই উৎপাদন করিবে যে-পর্যন্ত-না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়। এই দামকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short-period Normal Price) বলা যাইতে পারে।

স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম

দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জাম—অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিবর্তন-সাধন করা সম্ভব। কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকে তবে উৎপাদকগণ অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, উৎপাদনের আয়তন বৃহত্তর করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের (decreasing cost) সূত্র ক্রিয়া করে তবে দাম হ্রাস পাইবে; অপরদিকে যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র কার্যকর হয় তবে দাম বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকিলে দাম একই থাকিবে। দীর্ঘকালীন বাজারে এই দামকে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Long-period Normal Price) বলা হয়।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম

অতি দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জামেরও উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত হয়; দামের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এই সকলের ফলে দাম বাজার-দাম বা স্বাভাবিক দাম হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে পারে। এই অতি দীর্ঘকালীন দাম ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত।

অতি দীর্ঘকালীন দাম

উপসংহার ঃ দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের উপসংহার হিসাবে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে, দাম চাহিদা ও যোগানের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে ক্রেতাদের উপযোগকে সর্বাধিক করিবার ইচ্ছা (desire to maximise utility) এবং যোগানের পশ্চাতে কার্য করে সংগঠকদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (desire to maximise profit)। বিশেষ অবস্থায় যখন উভয়েরই প্রচেষ্টা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া তাহারা ক্রয়বিক্রয়ে অগ্রসর হয় তখনই ভারসাম্যের সৃষ্টি হইয়া দাম নির্ধারিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(ক) বাজার-দাম, এবং (খ) স্বাভাবিক দাম।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতাবিক্রেতা থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মান একই হয় বলিয়া, ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট চাহিদা ও যোগানের সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া এবং প্রত্যেকেই অপরে কি দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম একই হয়।

বাজার-দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে-অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া বাজার-দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 'অস্থায়ী ভারসাম্য অবস্থা' বলা হয়। ফলে বাজার-দাম 'অস্থায়ী ভারসাম্য-দাম' নামেও অভিহিত হয়।

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব: বাজার দামের বেলায় যোগান অপেক্ষা চাহিদারই অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়: যে মোটামুটি দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম। স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান: প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হইয়া কাম্য উৎপাদন ও কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে।

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব: সময় যত স্বল্প হয় দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক হইতে দেখা যায়; অনুরূপভাবে সময় যত দীর্ঘ হয় যোগানেরও তত অধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে চারি প্রকার বাজারের জন্য চারি প্রকার দামের কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন— ১। অত্যল্পকালীন দাম, ২। স্বল্পকালীন দাম, ৩। দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম, এবং ৪। অতি দীর্ঘকালীন দাম। অত্যল্পকালীন দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহা প্রধানত চাহিদার প্রভাব দ্বারাই নিরূপিত হয়। স্বল্পকালীন দাম স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম নামেও অভিহিত। ইহা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন দাম বা দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উৎপাদন ব্যয়ের সূত্র দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অতি দীর্ঘকালীন দাম রুচি ইত্যাদির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

উপসংহার: উপযোগ সর্বাধিক করা এবং মুনাফা সর্বাধিক করা যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতার লক্ষ্য বলিয়া যেখানে ইহাদের উভয়ই সর্বাধিক হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Show how price is determined in a competitive market by the interaction of the forces of Demand and Supply. (C. U. 1954, '61 ; B. U. 1961)

কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও। [৩০০-৩০২ পৃষ্ঠা]

2. What is meant by a perfectly competitive market ? Explain how the value of a commodity is determined in such a market. (H. S. (C) 1960)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাহাকে বলে? এইরূপ বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় দেখাও। [২৭৭-২৭৮, ৩০০-৩০২ এবং ৩০৩ পৃষ্ঠা]

3. Explain how price is determined in a market under perfect competition. (H. S. (H) 1960)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

[৩০০-৩০২ এবং ৩০৩ পৃষ্ঠা]

4. What are Market Prices ? Why is demand more influential than supply in fixing market prices ? (H. S. (H) Comp. 1960)

বাজার-দাম কাহাকে বলে? বাজার-দাম নির্ধারণে যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব অধিক হয় কেন?

[৩০৩-৩০৪ পৃষ্ঠা]

5. Distinguish between Market Price and Normal Price. Explain how Market Price of a commodity is determined. (C. U. 1950 ; H. S. (H) 1960)

বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কিভাবে বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। [৩০৩-৩০৫, ৩০০-৩০২ পৃষ্ঠা]

6. What is the distinction between Market Value and Normal Value in economic theory ? Explain how normal value of a thing is determined in a competitive market. (H. S. (C) 1962)

অর্থবিদ্যায় বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় ? কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। [৩০৪-৩০৫ এবং ৩০৫-৩০৬ পৃষ্ঠা]

7. 'The Normal Price of a commodity, under conditions of competition, tends to be equal to its marginal cost of production.'—Discuss. (C. U. 1951, '59)

'প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় স্বাভাবিক দামের পক্ষে দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।'—আলোচনা কর। [৩০৫-৩০৬ পৃষ্ঠা]

8. "As a general rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on Value ; and the longer the period, the more important will be the influence of cost of production on Value." Explain the statement. (C. U. 1960)

"সাধারণ নিয়ম অনুসারে সময় যত স্বল্প হইবে দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক দেখা যাইবে এবং সময় যত দীর্ঘ হইবে দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব তত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর। [৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা]

9. How far does value depend upon cost of production ? (H. S. (H) 1962)

দাম উৎপাদন-ব্যয়ের উপর কতটা নির্ভর করে ?

[উত্তরের কাঠামো : দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা। যোগানের পশ্চাতে কাজ করে উৎপাদন-ব্যয়। এই কারণে দাম ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিতে বাধ্য। তবে সকল প্রকার দামের ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় সমপরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে না। পচনশীল দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন, ক্রেতারা যে দাম দিতে চাহিবে তাহাতেই বিক্রেতাদের বিক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় কিন্তু বিক্রেতাদের সংরক্ষণ-দাম থাকে। এই সংরক্ষণ-দামও কতকটা উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব, পচনশীল ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের বাজার-দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব থাকে। মোটামুটিভাবে, এই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার-দামের (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

স্বাভাবিক দাম অবশ্য সকল সময়ই (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদার অবস্থা অনুসারে বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয়ের কম বা বেশী হইতে পারে। ইহার ফলে বিক্রেতাদের ক্ষতি বা অতিরিক্ত লাভ হইতে পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে কোন উৎপাদকই ক্ষতি সহ্য করিবে না, অথবা স্বাভাবিক মুনাফার বেশী লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং স্বাভাবিক দাম (স্বাভাবিক মুনাফা সহ) উৎপাদন-ব্যয়েরই সমান হইবে। মোটকথা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সময় যত দীর্ঘকালীন হইবে দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাবও তত অধিক হইবে। একচেটিয়া কারবারের বাজারে দাম অবশ্য সকল সময়ই (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।... এবং (২৯৪-২৯৫, ৩০৪, ৩০৫-৩০৬, ৩১০-৩১১ পৃষ্ঠা)]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম

(Price under Monopoly)

যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তখন ঐ অবস্থাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute) পাওয়া যায় না। এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশনই একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।*

একচেটিয়া কারবারের অর্থ

সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসায়ী তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক (maximisation of profit) করা। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে এবং প্রত্যেকে বাজারে মোট দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্রাংশই যোগান দিয়া থাকে। কোন একজনের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাজারে ঐ দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয় না। প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া প্রত্যেক উৎপাদককে বাজারে প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। কেহ বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা অধিক চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতাদের নিকট চলিয়া যাইবে। এইজন্য প্রতিযোগী কারবারী উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া মুনাফা সর্বাধিক করিতে চেষ্টা করে। ফলে শেষপর্যন্ত দাম (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইতে পারে না।

মুনাফা সর্বাধিক করা ব্যবসায়ীর লক্ষ্য

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কিভাবে এই লক্ষ্য সাধন করে

একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা ব্যবসায়ী দ্রব্যের যোগানের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ফলে তাহার দাম (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারী মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা না করিয়া যোগানকেই নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost) এবং বিক্রয়লব্ধ প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) সমান হয় তখনই তাহার মুনাফা হইয়া দাঁড়ায় সর্বাধিক। সুতরাং যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক আয়ের সমান দাঁড়াইবে ততটা পরিমাণ দ্রব্যই সে উৎপাদন করিবে বা যোগান দিবে—কারণ, ইহা করিলেই তাহার লাভ সর্বাধিক হইবে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এক একক (unit) অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে ব্যয় পড়ে

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং বিক্রয়লব্ধ প্রান্তিক আয় সমান হইলেই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হয়

---

* ... পৃষ্ঠা দেখ।

তাহাকে বুঝায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০০ টাকা ব্যয় হয় এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০৫ টাকা পড়ে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইল (১০৫ – ১০০) ৫ টাকা।* অপরদিকে এক একক অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন কারবারী বা প্রতিষ্ঠান যে অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। যেমন, প্রতি একক দ্রব্য ১২ টাকা করিয়া দামে ১০টি দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা। যখন সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যদি প্রতি এককের দাম কমিয়া ১১.৫০ টাকা হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২৬.৫০ টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়—অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত আয় হইবে (১২৬.৫০ – ১২০) ৬.৫০ টাকা। এই উদাহরণে দেখা যায় যে কারবারী যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৫ টাকা। উহা যখন বিক্রয় করে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬.৫০ টাকা। সুতরাং তাহার অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬.৫০ – ৫) ১.৫০ টাকা।

কিভাবে কারবারী ইহা করিতে চেষ্টা করে

এখন, যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ সে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিতে থাকে। কারণ, ইহাতে তাহার লাভের মোট অংক বাড়িয়াই যায়। অবশেষে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়, তখন মুনাফার পরিমাণ হয় সর্বাধিক। ইহার পর সে উৎপাদন বৃদ্ধি করে না। কারণ, তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান যাইবে। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজে বুঝা যাইবে :

উদাহরণ

(হিসাব টাকা ও নয়া পয়সায়)

দ্রব্যের পরিমাণ	প্রতি এককের দাম (টাকা)	মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) বিক্রয়লব্ধ আয়	মোট উৎপাদন-ব্যয়	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) উৎপাদন-ব্যয়	মোট মুনাফা (টাকা)
১০	১১	১১০	—	১০০	—	+১০
২০	৯	১৮০	৭	১৫০	৫	+৩০
৩০	৮	২৪০	৬	১৮৫	৩.৫০	+৫৫
৪০	৭	২৮০	৪	২২৪	৩.৯০	+৫৬
৫০	৬	৩০০	২	২৬৯	৪.৫০	+৩১
৬০	৫	৩০০	০	৩৩০	৬.১০	–৩০

* এখানে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন ধরা হইয়াছে।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে একচেটিয়া কারবারী যখন ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ৭ টাকা দামে বাজারে বিক্রয় করে তখন তাহার মুনাফা (৫৬ টাকা) সর্বাধিক হয়। কারণ, ইহাতেই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (৩ টাকা ৯০ নয়া পয়সা) তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (৪ টাকা) প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। অন্য কোন উৎপাদন ও মূল্যের স্তরে তাহার এতটা মুনাফা করা সম্ভব নয়। ধরা যাউক যে একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা কিন্তু প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ২ টাকা মাত্র। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অধিক হওয়ার ফলে তাহার মোট মুনাফার পরিমাণ ৫৬ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১ টাকায় দাঁড়াইবে। সুতরাং একচেটিয়া উৎপাদনকারী ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া ৪০ একক দ্রব্যই উৎপাদন করিবে। অপরদিকে একচেটিয়া কারবারী যদি উৎপাদন কমাইয়া ৩০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৬ টাকা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ৩ টাকা ৯০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা হইবে, এবং মোট লাভের পরিমাণ হইবে ৫৫ টাকা। এই অবস্থায় উৎপাদন বাড়াইয়া ৪০ একক করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় তখনই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা হয় সর্বাধিক। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং উহা যে-দামে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়-লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দামে উহা বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে।

যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে মুনাফা সর্বাধিক হয় একচেটিয়া কারবারী সেই দামে সেই পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করে

একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের এই সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় চিত্রটি দেওয়া হইল।

চিত্রটির প্রত্যেক স্তম্ভের লম্বালম্বি—অর্থাৎ, উপর-নীচের লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে, আর পাশাপাশি লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে ২০ একক উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ক খ (৫ টাকা) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ক গ (৭ টাকা); সুতরাং প্রান্তিক মুনাফা (marginal profit) হইল খ গ (৭ − ৫ = ২ টাকা)। ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় দেখা যায় যে ৩য় স্তম্ভটির প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশ এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ প্রায় পরস্পরের সমান হইতেছে। অতএব ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলেই একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক মুনাফা হইবে। ইহার পর হইতে স্তম্ভের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার
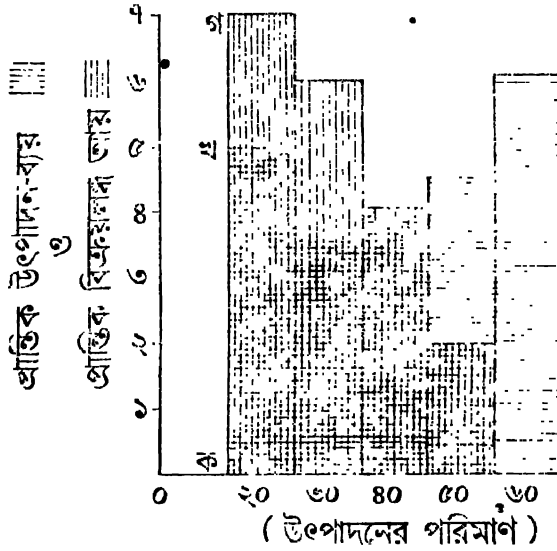
দ্বারা বুঝাইতেছে যে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক মুনাফা ত' হইতেছেই না, বরং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্যের উৎপাদনে লোকসান যাইতেছে।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly) : আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া লইয়াছি যে একচেটিয়া কারবারী সকলের নিকটে একই দামে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রয় করে। একচেটিয়া কারবারী যখন একই জিনিস বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রয় করে তখন তাহাকে বলা হয় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly)। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ দাম পৃথকিকরণ সম্ভব হয় না। কারণ, বহু বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কোন বিক্রেতা কোন খরিদ্দারের নিকট হইতে বাজার-দামের অধিক দাম লইতে পারে না।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়

একচেটিয়া কারবারীর এই দাম পৃথকিকরণ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণ (personal discrimination), স্থানগত দাম পৃথকিকরণ (local discrimination), এবং ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ (use discrimination)। (১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণের বেলায় একই দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। যেমন, কোন চিকিৎসক ধনীদের নিকট হইতে বেশী 'ফী' এবং দরিদ্রের নিকট হইতে কম 'ফী' চাহিতে পারেন; আবার রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে সুযোগসুবিধার পার্থক্য থাকে তাহার তুলনায়

তিন প্রকারের পৃথকিকরণ

অনেক বেশী ভাড়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২) যখন এক স্থান এবং অপর স্থানের মধ্যে একই জিনিসের দামের পার্থক্য করা হয় তখন তাহাকে স্থানগত দাম পৃথকিকরণ বলা হয়। যেমন, বড় বড় যে-সকল দোকানে অভিজাতশ্রেণী জিনিসপত্র ক্রয় করে সেখানে দাম অপেক্ষাকৃত অধিক হয় অথচ সেই সকল দ্রব্যই সাধারণ দোকানে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে পাওয়া যায়। আবার একচেটিয়া কারবারী দেশের বাজারে দামের তুলনায় বিদেশের বাজারে স্বল্প দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। (৩) যখন বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একই জিনিসের পৃথক পৃথক দাম আদায় করা হয় তখন তাহাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কারখানার নিকট অল্প দাম কিন্তু গৃহস্থের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করে।

একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা (Limits to the Power of a Monopolist): অনেক সময়ই একচেটিয়া কারবারী যতটা দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ কার্যত তাহা করে না। একাধিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা কম রাখিতে বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারী আসিয়া ব্যবসায় খুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশী হইলে লোকে পরিবর্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। যেমন, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের বাতি জ্বালাইতে পারে। তৃতীয়ত, দাম উচ্চ হইলে সরকার জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী দাম উঁচু করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দোলন দেখা দিতে পারে। যেমন, কলিকাতায় ট্রামভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল।

চারিটি বাধা

সংক্ষিপ্তসার

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম: সকল প্রকার ব্যবসায়েই কারবারীর উদ্দেশ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একজন বিক্রেতা বাজার দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। তাহাকে বাজারের প্রচলিত দামেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিয়াই মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। একচেটিয়া কারবারী সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া সে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া বাজারের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

সে সেইভাবেই যোগান নিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। যেখানে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় সমান সমান হয় সেখানেই তাহার মুনাফা হয় সর্বাধিক, এবং বাজারে দাম ঐ পরিমাণ উৎপাদন এবং উহার জন্য ক্রেতাদের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার: অনেকক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে একই দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। এই প্রকার দাম পৃথকিকরণ তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণ, (২) স্থানগত দাম পৃথকিকরণ এবং (৩) ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ।

একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা: প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিবর্ত দ্রব্যের ব্যবহার, সরকারী হস্তক্ষেপ, এবং জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের ভয়ে একচেটিয়া কারবারী দাম অত্যধিক করিতে পারে না।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Monopoly? Show how price is determined under Monopoly. (P. U. 1962 ; H. S. (H) Comp. 1961, '62)

একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম নির্ধারিত হয়, তাহা দেখাও। [২৭৮-২৭৯ এবং ৩১০-৩১৩ পৃষ্ঠা]

2. What is Discriminating Monopoly? What are its different varieties?

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়? ইহা কত প্রকারের হইতে পারে? [৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা]

3. What are the limits to the power of a monopolist?

একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কি কি? [৩১৪ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন উৎপাদন-উপাদানের আয়

(Different Types of Factor Incomes)

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—(ক) জমি, (খ) শ্রম, (গ) মূলধন, এবং (ঘ) সংগঠন। ইহারাই পারস্পরিক সহযোগিতায় জাতীয় আয় সৃষ্টি করে; এবং মোট জাতীয় আয় ইহাদের মধ্যে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়। এই কর্মগত বণ্টনই অর্থবিদ্যায় বণ্টন (Distribution) বলিয়া অভিহিত; এবং খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (Factor Incomes) বলা হয়।

উৎপাদন-উপাদানের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন

বণ্টন
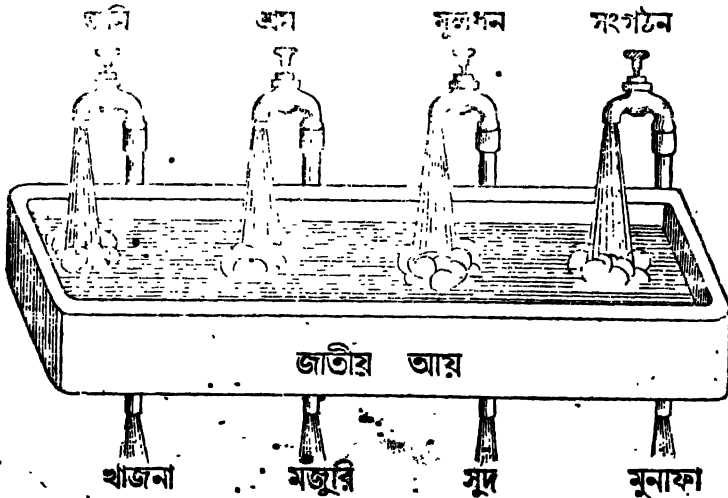
কিভাবে নীট জাতীয় আয় উৎপাদন-উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় ? (How is Net National Income distributed among the Factors of Production ?) : নীট জাতীয় আয়কে লভ্যাংশ বা বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয় (National Dividend) বলা হয়। নীট জাতীয় আয়ের যে যে অংশ উৎপাদনের উপাদানসমূহ পাইয়া থাকে তাহা উহাদের উৎপাদনকার্যে অংশ-গ্রহণের জন্য দাম ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য জমির দাম হইল খাজনা, শ্রমের দাম মজুরি, মূলধনের দাম সুদ এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের দাম মুনাফা। সুতরাং সাধারণ দাম যেভাবে নির্ধারিত হয়, ইহারাও সেইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন-উপাদানের চাহিদা ও যোগান

উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা সৃষ্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয় উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদন-উপাদান-সমূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জন-সংখ্যার উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চাহিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও ঘটে না এবং শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে যোগানবৃদ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শান্তি-শৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

তবুও বলা যায়, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প (Industry) ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (Firm)* মধ্যে পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা বিদ্যুৎ সরবরাহ বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চাহিদা-মত যোগান দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে। আবার বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়লা যোগান দেওয়া হইবে।

উৎপাদন-উপাদানের দাম প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

চাহিদার দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার-দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে, উৎপাদকও তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product) উহার দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে।

---

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠানকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়—যেমন, একটি পাটকল একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সকল পাটকল মিলাইয়া হইল পাটকল শিল্প।

ধরা যাউক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০০ জন শ্রমিকের জন্য যে মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫০ টাকা হইলে ১০০ জন শ্রমিককেই যদি নিযুক্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫০ টাকার বেশী মজুরি দিতে পারে না। ১০০-এর উপর যদি আরও ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইলে) ৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শ্রমিকেরই মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না হইবে তাহা নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র বসানো যাইতে পারে। এই কারণে মূলধনের যোগান-দাম (Supply Price) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অনুরূপ হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন নিয়োগ) আগ্রহান্বিত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে।

এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিবে। ভারসাম্য অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রেই এক হইবে; (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে; এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান হইবে। ইহাই কর্মগত বণ্টনের তত্ত্ব। ইহা চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া ভারসাম্য সৃষ্ট করে

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হয়। এই বণ্টিত জাতীয় আয়ই 'উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়' এবং এইরূপ বণ্টন 'কর্মগত বণ্টন' বলিয়া অভিহিত।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় উপাদানের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার দিক দিয়া

ইহা উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। বিভিন্ন শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়। আবার বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনও পরস্পরের সমান হয়। ভারসাম্য অবস্থায়—যেখানে উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়—(১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে এক হয়, (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়, এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার আয় বা দামের সমান হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the general principles for determining the rate of remuneration of a factor of production ?

কি নীতি অনুসারে উৎপাদন-উপাদানের আয় নির্ধারিত হয় ? [৩১৬-৩১৭ পৃষ্ঠা]

2. What is meant by Functional Distribution ? Briefly describe the general Theory of Distribution ?

কর্মগত বন্টন বলিতে কি বুঝায় ? সাধারণ বন্টনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[ইংগিত : সাধারণ বন্টনতত্ত্ব বলিতে 'কর্মগত বন্টন' বুঝায়।...৩৪ এবং ৩১৫-৩১৭ পৃষ্ঠা]

3. What are Factor Incomes ? Briefly discuss the principles according to which Factor Incomes are determined.

উৎপাদন-উপাদানের আয় বলিতে কি বুঝায় ? যে নীতি অনুসারে উৎপাদন-উপাদানের আয় নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা কর। [৩১৫-৩১৭ পৃষ্ঠা]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

খাজনা

(Rent)

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনা (Contract Rent and Economic Rent) : জমিজায়গা ব্যবহারের জন্য বৎসরান্তে জমির মালিককে যে অর্থ বা ভাড়া দেওয়া হয় সাধারণ ভাষায় তাহাকেই খাজনা বলে। অর্থবিদ্যায় এই খাজনা 'চুক্তি অনুযায়ী খাজনা' (Contract Rent) নামে অভিহিত। চুক্তি অনুযায়ী খাজনা লইয়া অর্থবিদ্যায় আলোচনা করা হয় না। অর্থবিদ্যার আলোচ্য খাজনাকে **'অর্থনৈতিক খাজনা'** (Economic Rent) বলা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন যে-আয় হয় তাহাকে বুঝায়।

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা কাহাকে বলে

জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং শুধু জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে-আয় হয় তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।* জমির উপর ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ থাকিলে উহাদের জন্য দেয় অর্থ অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সকল ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ মূলধন ব্যতীত কিছুই নয়; সুতরাং উহাদের দরুন যে অর্থ প্রদান করা হয় তাহাকে সুদ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে, খাজনা হিসাবে নহে।

অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক খাজনা লইয়া আলোচনা করা হয়

দ্বিতীয়ত, জমি ভাড়া দিয়াও মালিক কিছু কিছু তদারককাজ করিতে পারে এবং ইহার দরুনও সে কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে। ইহাও অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়—কারণ, ইহা পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসাবে গণ্য। এইভাবে চুক্তি অনুযায়ী বা মোট (gross) খাজনা হইতে সুদ, মজুরি প্রভৃতি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।

অর্থনৈতিক খাজনা কাহাকে বলে

অর্থনৈতিক খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' (Producers' Surplus) এই আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের (স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া) অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। কোন জমি হইতে যদি ১০০ টাকার ফসল পাওয়া যায় এবং ঐ জমি চাষ করার দরুন মোট ৯০ টাকা ব্যয় হয় তবে ১০ টাকা হইল অর্থনৈতিক খাজনা। বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাক,ঐ জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকের বীজ সার গরু-লাঙল প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হইয়াছে ৫০ টাকা, সে নিজের পরিশ্রমের দাম ধরিয়াছে ৩০ টাকা এবং মুনাফা** বাবদ ধরিয়াছে ১০ টাকা। তাহা হইলে মোট উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়ায় (৫০+৩০+১০=) ৯০ টাকা; কিন্তু ফসল বিক্রয় হইয়াছে ১০০ টাকায়। এই (১০০−৯০=) ১০ টাকা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। কৃষক ইহা মজুরি হিসাবে লইতে পারে না, মুনাফা বলিয়াও দাবি করিতে পারে না। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ জমিরই দান; ফলে ইহা জমির মালিকের নিকটই যাইবে। কৃষক যদি নিজে জমির মালিক হয় তবে সে নিজেই ইহা গ্রহণ করিবে; অপর কেহ মালিক হইলে তাহাকে দিতে হইবে। কৃষক জমির মালিককে উদ্বৃত্ত টাকা দিতে রাজী না হইলে মালিক হয় নিজেই চাষের ব্যবস্থা করিবে, না-হয় ঐ জমি অপর একজনকে বন্দোবস্ত দিবে।

অর্থনৈতিক খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardo's Theory of Rent):

অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় কেন, এ-সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর তত্ত্বের সংশোধিত রূপই বর্তমানের স্বীকৃত খাজনাতত্ত্ব (Theory of Rent)।

* প্রতিভাবান শ্রমিক বা সংগঠকের যোগানও সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রতিভার দরুন যদি কোন শ্রমিক বা সংগঠক অন্যান্য শ্রমিক বা সংগঠক অপেক্ষা কিছু বেশী পায় তবে ঐ অতিরিক্ত প্রাপ্যকে অর্থনৈতিক খাজনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

** স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।...২৯৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে—(ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য এবং (গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য একটি মাত্র জমি হইতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; সুতরাং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জমি চাষ করিবার। কিন্তু সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নহে বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই হইল অধিক উর্বর জমির খাজনা।

রিকার্ডোর তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বর্তমানে দণ্ডকারণ্যে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চলিতেছে। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে গিয়া বসবাস করিতে বিশেষ চাহিতেছে না। যাহা হউক, দণ্ডকারণ্য পরিষ্কার করিয়া বহু পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য করা হইল এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং প্রথম প্রথম তাহাদের বিনা খাজনায় জমি চাষ করিতে দেওয়া হইল। এই সকল উদ্বাস্তু গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য সুরু করিবে। ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্য কেহই কোন খাজনা দিবে না; এবং ঐ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্পসংখ্যক উদ্বাস্তুর জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

এই প্রথম দল উদ্বাস্তু যদি দণ্ডকারণ্যে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তবে আরও উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিবে। প্রথম দল উদ্বাস্তুর মধ্যে জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে ক্রমে এমন একদিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর পড়িয়া থাকিবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি বিঘা প্রতি ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইন্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে বিঘা প্রতি ঐ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত' ২০ কুইন্টাল শস্য উৎপন্ন হইবে। এ-ক্ষেত্রে (২৫ কুইন্টাল – ২০ কুইন্টাল =) ৫ কুইন্টাল হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা। সরকার সুযোগ বুঝিয়া প্রথম শ্রেণীর জমির মালিকদের নিকট হইতে এ-খাজনা আদায় করিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না। কারণ, উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়—কোনই উদ্বৃত্ত থাকে না। আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করিয়া

ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইণ্টাল ফসলের দাম যদি ৫ টাকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে ১২৫ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১০০ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে। ১০০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কৃষক খাজনা হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। জোর করিয়া কিছু আদায় করা হইলে সে ঐ শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে; এবং প্রয়োজন হইলে দণ্ডকারণ্য হইতে সে আবার পশ্চিমবংগে ফিরিয়া আসিবে।

প্রান্তিক জমি

এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়—কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, রিকার্ডো তাহাদিগকে 'নিকৃষ্ট জমি' (Inferior Land) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে উহাদিগকে 'প্রান্তিক জমি' (Marginal Land) বলা হয়।

দণ্ডকারণ্যে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে। তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার দাম ঠিক ১০০ টাকা—অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। এখন এই তৃতীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইণ্টাল—১৫ কুইণ্টাল =) ১০ কুইণ্টাল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২০ কুইণ্টাল—১৫ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল। এই ১০ কুইণ্টাল ও ৫ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির বিঘা প্রতি খাজনা। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ৫ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ১০ কুইণ্টালে দাঁড়াইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই ঐখানকার জমির মালিক সরকারের হস্তে যাইবে। আর সরকার যদি অর্থনৈতিক খাজনার অতিরিক্ত দাবি করে তবে উদ্বাস্তু বাঙালী আবার পশ্চিমবংগ অভিমুখে যাত্রা করিবে।

১নং জমি ২নং জমি ৩নং জমি

সমালোচনা: তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন উর্বরতাসম্পন্ন জমির উৎপাদনে যে পার্থক্য তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। রিকার্ডোর

আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে খাজনা দামের অংগীভূত নহে—কারণ, চাহিদাবৃদ্ধির ফলে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্যই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে এবং এই কারণেই প্রান্তিক জমির উপর কোন খাজনা দেওয়া হয় না।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ রিকার্ডোর উপরি-উক্ত তত্ত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার কতকগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই। নিয়মিত কৃষিকার্যের ফলে জমির উর্বরতাশক্তি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অপরদিকে মানুষ সার প্রয়োগ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সমালোচনা :
১। জমির অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই

দ্বিতীয়ত, শুধু বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্য হেতুই খাজনার উদ্ভব হয় না; একই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার ফলেও ইহা হইতে পারে।

২। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্যও খাজনার উদ্ভব হয়

তৃতীয়ত, রিকার্ডো যে প্রান্তিক জমির কল্পনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত। কোন জমি কোন বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলে উহা প্রান্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহা অন্য এক কার্যে ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর উদ্বৃত্ত বা খাজনার সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। কোন জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইলে উহাতে মাত্র উৎপাদন-ব্যয় পোষাইতে পারে, কিন্তু গম উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় কুলাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

৩। প্রান্তিক জমির কল্পনা ভুল

পরিশেষে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে বলিয়া রিকার্ডোর যে-অভিমত, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহারও বিরোধিতা করেন। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৪। খাজনা দামের অংগীভূত হইতে পারে

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (Final or Modern Theory of Rent) : রিকার্ডোর মতবাদের সংশোধিত রূপই চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব। সংক্ষেপে ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় : খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে যোগান প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট এবং জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের সূত্রের অধীন বলিয়া উৎপাদকের উদ্বৃত্তের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে লোকে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে পারে, অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করিতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির হার ও নিকৃষ্ট জমির উৎপন্নের হ্রাসের পার্থক্যের উপর। শ্রম ও মূলধন বাবদ ১০০ টাকা একই জমিতে দ্বিতীয়বার নিয়োগ করা হইলে যদি ২০ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ঐ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে নিয়োগ করিলে যদি ১৮ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় তবে কৃষক প্রথম পন্থাই অবলম্বন করিবে। এ-ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম

উৎপাদনের উপাদানের সীমাবদ্ধতার জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়

দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইলে, দ্বিতীয় দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে প্রথমবারের দরুন উদ্বৃত্ত হইবে (২৫ কুইণ্টাল -- ২০ কুইণ্টাল =) ৫ কুইণ্টাল ফসল। ইহাই এই জমির খাজনা, তাহা কৃষক বা জমির মালিক যে-কেহই করুক না কেন।

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price): রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। দাম বৃদ্ধি পাইলেই নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করা হয়। ইহাকে ব্যাপক কৃষিকার্য বলে। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশ ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দামবৃদ্ধির ফলেই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, খাজনা দামের অংগীভূত হয় না—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করাও সর্বাবস্থায় ঠিক নয়। জমি নানা কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া একটি উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া উহাকে অন্য উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত করিলে দাম বাবদ কিছু দিতে হয়। এই দামই খাজনা এবং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। ফলে ইহা দামের অংগীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে, দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া জমির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে কোন উৎপাদনকার্যে উহাকে ব্যবহার করার জন্য সংগঠককে উহার দাম দিতেই হইবে। এই দাম সে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হইতে উহার সংকুলানের ব্যবস্থা করিবে। যেমন, কৃষক যদি কোন জমি হইতে ১০০টাকার ফসল পায়, তবে তাহাকে উহার মধ্য হইতেই খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত উৎপাদকের দিক হইতে খাজনাকে দামের অংগীভূত হইতে দেখা যায়।

খাজনা দামের অংগীভূতও হয়

খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Population): জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশ ব্যাপক অথবা আত্যন্তিক কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়।* উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম হারে ঘটিতে থাকে। সুতরাং উৎপাদকের উদ্বৃত্তের উদ্ভব হয়। জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়

ভারতে খাজনার প্রকৃতি (Nature of Rent in India): রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা শুধু প্রতিযোগিতা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কৃষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের সমস্তটাই জমির মালিকের নিকট চলিয়া যায়। আবার জমির মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন তাহারাও কৃষকদের নিকট হইতে উৎপাদকের উদ্বৃত্তের অধিক আদায় করিতে পারে না।

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা মাত্র প্রতিযোগিতা দ্বারাই নির্ধারিত হয়

---

* ৬১ পৃষ্ঠা দেখ।

ভারতে কিন্তু জমির খাজনা এইভাবে নির্ধারিত হইত না। হিন্দু ও মুসলমান আমলে উৎপন্ন ফসলের একাংশকে খাজনা হিসাবে গণ্য করা হইত। ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগে এই প্রথাই প্রবর্তিত ছিল। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিযোগিতার নীতি প্রবর্তন করে। প্রতিযোগিতার ফলে অনেক ক্ষেত্রে খাজনা অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকগণ বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন আইন প্রণয়ন দ্বারা খাজনা-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও খাজনাহ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইভাবে ভারতে জমির খাজনা—(ক) প্রথা (custom), (খ) প্রতিযোগিতা (competition) এবং (গ) আইন (legislation), এই তিনটি শক্তির ফল হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার অধীনে আরও আইন প্রণয়ন করিয়া প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনাহ্রাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই কার্য সমাপ্ত হইলে ভারতে খাজনা নির্ধারণে আইনের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে।

ভারতে কিন্তু ইহা নির্ধারণ করে ১। প্রথা, ২। প্রতিযোগিতা ও ৩। আইন

সংক্ষিপ্তসার

খাজনা দুই রকমের হইতে পারে—(ক) চুক্তি অনুযায়ী খাজনা, এবং (খ) অর্থনৈতিক খাজনা। অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক খাজনা লইয়াই আলোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা হইল 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত'। উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলিতে মোট উৎপন্ন হইতে উৎপাদন-ব্যয় (স্বাভাবিক মুনাফা সমেত) বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাকে বুঝায়।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব: খাজনাতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যা করেন রিকার্ডো। রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে: (১) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (২) বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তিতে পার্থক্য, এবং (৩) ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য সমাজকে বিভিন্ন জমি চাষ করিতে হয়; ফলে দেখা যায়—উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য। এই পার্থক্যের পরিমাণই খাজনা।

উদাহরণের সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমে যখন জনসংখ্যা পরিমিত এবং খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বল্প থাকে তখন সর্বোৎকৃষ্ট জমিই চাষ করা হয়। পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কৃষির অধীনে আনয়ন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে 'উদ্বৃত্ত' বা খাজনার উদ্ভব হয়। যে জমিতে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না তাহাকে প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলে। রিকার্ডোর মতে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে।

নানাভাবে রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল (১) জমির মৌলিক বা অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই; (২) মাত্র বিভিন্ন জমি চাষ করিলেই খাজনার উদ্ভব হয় না, একই জমিতেও খাজনা উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; (৩) প্রান্তিক জমির কল্পনা ভুল: এবং (৪) কয়েক ক্ষেত্রে খাজনা দামের অংগীভূত হইতে পারে।

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব: এই সমালোচনার ভিত্তিতে যে চূড়ান্ত খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা অনুসারে উৎপাদনের উপাদানের সীমাবদ্ধতার দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি এই সীমাবদ্ধতারই একটি দিক।

খাজনা ও দাম: দামবৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় ও বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক দিয়া ইহা অংগীভূত হয়।

খাজনা ও জনসংখ্যা: জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়।

ভারতে খাজনার প্রকৃতি : রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা মাত্র প্রতিযোগিতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতে কিন্তু খাজনা নির্ধারণ করে তিনটি শক্তি—যথা, (ক) প্রথা, (খ) প্রতিযোগিতা ও (গ) আইন।

প্রশ্নোত্তর

1. **Distinguish between Contract Rent and Economic Rent. Show how Economic Rent originates.**

চুক্তি অনুসারে খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় তাহা দেখাও। [৩১৮-৩২১ এবং ৩২২-৩২৩ পৃষ্ঠা]

2. **Explain Ricardo's Theory of Rent. What is the effect of the pressure of population on Rent?** (C. U. 1952,'58)

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। খাজনার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কি ফল দেখা যায়?

[৩১৯-৩২১ এবং ৩২৩ পৃষ্ঠা]

3. **Discuss the origin and significance of Rent. How is Rent determined in India?** (C. U. 1953)

খাজনার উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। ভারতে খাজনা কিভাবে নির্ধারিত হয়?

[ইংগিত : খাজনার প্রকৃতি বলিতে অর্থনৈতিক খাজনার প্রকৃতি বুঝায়। ...

(৩১৮-৩২১, ৩২২-৩২৩ এবং ৩২৩-৩২৪ পৃষ্ঠা)]

4. **Examine the connection between Rent and Price.** (H. S. (H) Comp. 1961)

খাজনা ও দ্রব্যের দামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [৩১৯-৩২১ এবং ৩২৩ পৃষ্ঠা]

5. **Explain the nature of 'Economic Rent'. Does rent enter into the price of a commodity?** (H. S. (C) 1961)

'অর্থনৈতিক খাজনা'র প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। খাজনা কি দ্রব্যের দামের অন্তর্ভুক্ত হয়?

[৩১৮-৩১৯ এবং ৩২৩ পৃষ্ঠা]

6. **Define 'Economic Rent'. Indicate the effect of the pressure of population on rent.** (H. S. (H) 1962)

'অর্থনৈতিক খাজনা'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। খাজনার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কি ফল হয়, তাহা দেখাও।

[৩১৮-৩২১ এবং ৩২৩ পৃষ্ঠা]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মজুরি
(Wages)

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages) : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রমিককে যে মাসমাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় তাহাই তাহার আর্থিক মজুরি। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে দ্রব্যাকারে

এবং আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি। আর্থিক মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে—কারণ, শ্রমিক হয়ত' বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, ইত্যাদি।

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

আসল মজুরি কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

অস্থায়ী চাকরির আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলে স্থায়ী চাকরির অল্প মজুরি শ্রেয়। ইহাতে প্রকৃত মজুরি অনেক বেশী। কারণ, অস্থায়ী চাকরির স্থায়িত্ব নাই বলিয়া শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

যে-সকল চাকরিতে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে (যেমন, শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতার কার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, টাইপিষ্টদের দৈনিক কার্যের পরে অন্যত্র কিছু উপরি-কাজ ইত্যাদি) সেই সকল চাকরিতে প্রকৃত মজুরি বেশী। ইহা ব্যতীত অনেক চাকরিতে অন্যরকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য, বিনা-মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, পেনসন্, পারিবারিক পেনসন্ ইত্যাদি নানারকম সুবিধা দেওয়া হয়। ঐ সকল চাকরিতে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক। অপ্রীতিকর কার্য বা আয়াসসাধ্য কার্যের—যথা, ইঞ্জিন-চালকের কার্যের আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরি কম—কারণ, তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে।

আসল মজুরি বিশেষভাবে নির্ভর করে মূল্যস্তরের উপর

প্রকৃত মজুরি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া জিনিসের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ৫ টাকা দিয়া যে ভোগ্যবস্তু ক্রয় করা যায় যুদ্ধের পূর্বে তাহা ১ টাকায় ক্রয় করা চলিত। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করিত তাহাদের প্রকৃত মজুরি বর্তমানে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সংগে প্রকৃত মজুরি কমিতে বা বাড়িতে পারে।

আসল মজুরিই জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মান তাহাদের আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির উপর। শ্রমিকদের অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহাদের মজুরি যথেষ্ট কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে দেখা দরকার তাহারা কি পরিমাণ সুযোগসুবিধা ও দ্রব্যাদি ভোগ করিতে সমর্থ। তাহাদের আর্থিক মজুরি কত দেখিয়া শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার বিচার করা চলে না।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Wages Determined?): মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব, এবং (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব।

প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages): এই তত্ত্বানুসারে ধরিয়া লওয়া হয় যে শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতাসম্পন্ন। ইহার ফলে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল শ্রমিক একই মজুরি পায়। অতএব, মজুরি হইল সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের (least productive worker) উৎপাদনের সমান।

প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বের ব্যাখ্যা

শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে নিয়োগকর্তা। সুতরাং নিয়োগকর্তা যে মজুরি দিতে রাজী থাকে তাহাই শ্রমের চাহিদা দাম (Demand Price)। ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রের ন্যায় শ্রমের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চাহিদা-দামে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের চাহিদা থাকে। নিয়োগকর্তা ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির নিয়মের জন্য শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে; ফলে শ্রমের চাহিদার পরিমাণও কমিয়া যায়। কমিতে কমিতে প্রান্তিক উৎপাদন এমন এক অবস্থায় আসে যেখানে উহা বাজারে প্রচলিত মজুরির সমান হয়। ইহার পর আরও শ্রমিক নিয়োগ করিলে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে। সুতরাং সে সেইখানেই থামে। সকল শ্রমিকের দক্ষতা সমান বলিয়া এই প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদনই মজুরির হার নির্ধারিত করে।

উদাহরণ

ধরা যাউক, কোন নিয়োগকর্তা ইতিমধ্যেই ৯০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং আরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইবে কিনা তাহাই তাহার সমস্যা। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ৯১-তম, ৯২ তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কিরূপ হইবে তাহা হিসাব করিবে। যদি ৯০ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ৪০ টাকা, ৯১ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩৫ টাকা এবং ৯২ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ টাকা হয় তবে ৯২ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিতে গেলে সংগঠক ঐ শেষ শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না; ৯১ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিলে অবশ্য শেষ বা প্রান্তিক শ্রমিককে ৩৫ টাকা করিয়া মজুরি দেওয়া যায়। ধরা যাউক, ৯২-তম শ্রমিক ৩০ টাকা মজুরিতেই কাজ করিতে রাজী হইল। তখন সকল শ্রমিককেই ঐ মজুরি লইতে হইবে—কারণ, তাহারা সকলে সমদক্ষতাসম্পন্ন। কেহ যদি উহার বেশী দাবি করে তবে সংগঠক তাহাকে বরখাস্ত করিয়া অন্য একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিবে।

এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমিকরা ঐ ৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন? ইহার কারণ [illegible] অন্য কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইহার অধিক মজুরি দিবে না।

সংগঠক বা নিয়োগকর্তাগণের মধ্যেও প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন অধিক থাকে তাহা আরও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মুনাফা বাড়াইতে আগ্রহশীল হয়। কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসে। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সহিত সমতালাভের চেষ্টা করে। ভারসাম্য অবস্থায় মজুরির হার প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়; এবং প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুরির হারও এক হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন সমান বলিয়া মজুরিও সকল ক্ষেত্রে সমান হইবে

সমালোচনা : প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লয়। পণ্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্দিষ্ট হইলে উহার দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগ দ্বারাই নির্ণীত হয়, তেমনি শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট থাকিলে মজুরি প্রধানত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে—প্রান্তিক উৎপাদন অতি অল্প বলিয়া শ্রমিক অল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী নাও হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নিয়োগহ্রাসের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং মজুরি-নির্ধারণ ব্যাপারে শুধু শ্রমের চাহিদার দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না। উহার যোগানের দিকও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ইহা যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত করে না

জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages) : শ্রমের জীবনযাত্রার মানতত্ত্বে এই যোগানের দিকেরই বিচার করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে মজুরি শুধু জীবনযাত্রার মান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি শ্রমিকরা যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাহা বজায় রাখিবার সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সে মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয় না। ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যায় এবং নিয়োগহ্রাসের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই মজুরি বাড়িয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হয়।

এই তত্ত্বও পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা যোগানের দিকটাই দেখে—চাহিদার অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

উপসংহার : উপসংহার হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব বা জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব কোনটাই মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা পুরাপুরি ব্যাখ্যা করে না। মজুরি হইল শ্রমের দাম। সুতরাং ইহা যে কোন দামের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিরূপিত হয়। চাহিদার দিকে মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং যোগানের দিকে নিম্নতম মাত্রা হইল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বা জীবনযাত্রার জন্য ব্যয়। এই দুই মাত্রার মধ্যে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয়

শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages) : শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার সহিত দর কষাকষি করে শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমে। ইহাকে যৌথ দরাদরি (Collective Bargaining) বলা হয়। নিয়োগকর্তা অধিকাংশ সময়ই শক্তিশালী, তাহার সহিত একা দরাদরি করিয়া শ্রমিক পারিয়া উঠে না। উপরন্তু, একদিন শ্রম না করিলে উহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ, একদিন কর্মহীন অবস্থায় থাকিলে যে উপার্জন হ্রাস পায় তাহা কোন দিনই পূরণ হয় না। শ্রমিকদের অলস অবস্থায় বসিয়া থাকিবার সামর্থ্যও কম। এই সকল কারণের জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দরাদরির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে উপযুক্ত মজুরি আদায়ের চেষ্টা করে।

যৌথ দরাদরি—ইহার উদ্দেশ্য

উপযুক্ত মজুরি বলিতে বুঝায় প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি। মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হইলেও নিয়োগকর্তা সকল সময় শ্রমিককে ইহা অপেক্ষা কম দিতেই চেষ্টা করে। শ্রমিক-সংঘের কাজ হইল দুর্বল নিঃসহায় শ্রম-বিক্রয়কারীদের জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি আদায়ের প্রচেষ্টা করা। ইহা ছাড়াও শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া কৃত্রিম সংখ্যাল্পতার সৃষ্টি করে। ফলে শ্রমিকের মধ্যে যোগান কম হয় এবং প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয় বলিয়া ইহাতে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই শ্রমিক-সংঘের একমাত্র কার্য নহে; উহার অন্যান্য কার্যও রহিয়াছে। শ্রমিক-সংঘ নানাভাবে শ্রম-কল্যাণ (labour welfare) সাধন করে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব, বলা যায় যে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, শ্রম-কল্যাণসাধন ও অন্যান্যভাবে শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহাদের যে স্থায়ী সংগঠন থাকে তাহাকেই শ্রমিক-সংঘ বলা হয়।

শ্রমিক-সংঘের সংজ্ঞা

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলী দুই প্রকারের : (ক) সৌভ্রাত্রমূলক কার্য (fraternal functions), এবং (খ) সংগ্রাম-মূলক কার্য (militant functions)।

শ্রমিক-সংঘের দুই প্রকার কার্যাবলী

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের বুঝায়—যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আমাদের দেশে অনেক শ্রমিক-সংঘ সম্প্রতি এই সকল দিকে দৃষ্টি দিয়াছে।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য

সংগ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি, শ্রমের সময়হ্রাস, কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, নিয়োগ-হ্রাস বা ছাঁটাই-এ বাধা দেওয়া, ইত্যাদি।

সংগ্রামমূলক কার্য

যৌথ দরাদরির জন্য শ্রমিক-সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে (ক) কথাবার্তা চালানো (Negotiation), (খ) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা (Conciliation), (গ) সালিসী বিচার (Arbitration), এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান। ধর্মঘটই শ্রমিক-সংঘের শ্রেষ্ঠ ও শেষ হাতিয়ার ; ইহার দ্বারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক-সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে শ্রমিক-সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্মঘটের মাধ্যমেই হউক আর অন্য পদ্ধতিতেই হউক শ্রমিক-সংঘ কখনও প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি আদায় করিতে পারে না। নিয়োগকর্তাকে যদি প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিতে পারে না।

যৌথ দরাদরির পদ্ধতি

আপেক্ষিক মজুরি (Relative Wages) : আপেক্ষিক মজুরি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চালু থাকে এবং শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হয়—অর্থাৎ, শ্রমিক যদি এক কাজ হইতে সহজে অন্য কাজে যাইতে পারে—তবে সকল ক্ষেত্রেই মজুরির হার এক হইবে। দেশে ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে সকল উকিল যদি ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতে পারেন—তবে ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের উপার্জনে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়।

আপেক্ষিক মজুরি বলিতে কি বুঝায়

মজুরির হারে তারতম্যের কারণ

যে-যে কারণে শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা বা শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে না তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(ক) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ : যে কাজ যত বেশী অপ্রীতিকর তাহার মজুরি তত অধিক। সাধারণ মজুর অপেক্ষা মেথরকে যে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ইহাই তাহার কারণ। শিক্ষকতা কতকটা প্রীতিকর বলিয়া শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তুলনায় কম।

(খ) অনুশীলন বা শিক্ষানবীসকার্যে সুবিধা-অসুবিধা : যে কার্য অনুশীলন করা যত কঠিন, যত ব্যয়সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ তাহার মজুরিও তত অধিক হইবে। ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হইতে বহু অর্থ, সময় ও পরিশ্রম লাগে। সেইজন্য তাঁহারা সাধারণ গ্রাজুয়েট হইতে অধিক মজুরি পাইয়া থাকেন। এই কারণেই আবার দক্ষ শ্রমিকের মজুরি অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক হয়।

(গ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা : যে-সকল কার্যে নিয়োগ নিয়মিত তাহাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়। রাজমিস্ত্রীকে বৎসরে কয়েক মাস বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই সে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরি দাবি করে। অপরপক্ষে যে শ্রমিক

কারখানায় সারা বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত থাকে সে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয়।

(ঘ) দায়িত্বশীল বা দায়িত্বশূন্য কাজ : কার্য দায়িত্বশীল হইলে মজুরিও অধিক হইবে। খাজাঞ্চির কার্যের মজুরি বেশী, কারণ ইহাতে দায়িত্ব আছে; অপরদিকে যে-কেরাণী শুধু চিঠিপত্র ছাড়ার ব্যবস্থা করে (despatcher) তাহার কাজ কতকটা দায়িত্বশূন্য বলিয়া তাহার মজুরিও কম।

(ঙ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা : ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে লোকে বর্তমানে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হয়। এইজন্য শিক্ষানবীসরা (apprentices) সামান্য ভাতাতেই কাজ করে; আইন-ব্যবসায়ীদিগকেও প্রথম প্রথম সামান্য পারিশ্রমিকে ও বিনা-পারিশ্রমিকে কার্য করিতে দেখা যায়।

(চ) আঞ্চলিক কারণ : আঞ্চলিক কারণেও মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যে ব্যক্তি সহরে বাস চালাইয়া থাকে সে পল্লীগ্রামের বাসচালক অপেক্ষা অধিক বেতন পায়; সহরের দিনমজুরও পল্লীগ্রামের দিনমজুর হইতে অধিক মজুরি পায়। আবার আসাম, মণিপুর, হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মজুরির যে-হার তাহা অপেক্ষা পশ্চিমবংগ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে মজুরির হার অধিক।

উপরে যে-বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইল তাহারা শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যে উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান অধিক সেখানে মজুরির হারও কম। শিক্ষক বহু সংখ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া শিক্ষকগণ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য হন; কেরাণীর কার্যের জন্য শ্রমের যোগান অধিক বলিয়া কেরাণীর বেতন অধিক হয় না। অনুরূপভাবেই চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক বলিয়া গ্রামাঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে মজুরি কম এবং নগরাঞ্চল ও উন্নত অঞ্চলে মজুরি বেশী হয়।

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলেই মজুরি অধিক হয়

ভারতে মজুরি (Wages in India) : কিছু দিন পূর্বেও ভারতে মজুরি-সমস্যা বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ তখন অধিকাংশ লোকই ছিল স্বয়ংনিযুক্ত (self-employed)। ক্রমে শিল্পপ্রসার ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মজুরি নির্ধারণের সমস্যাও আসিয়া দেখা দেয়।

ভারতে শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা কম মজুরি পায় কৃষি-শ্রমিকশ্রেণী। তাহাদের জীবনযাত্রার মান বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা হইল ন্যূনতম জীবনধারণের মান (minimum-subsistence standard)।* পরের কাছে খাটিয়া কোনমতে জীবনধারণ করিতে পারিলেই তাহারা যথেষ্ট বলিয়া মনে করে।

কৃষি-শ্রমিকের মজুরি

নগরাঞ্চলে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও অনেক ক্ষেত্রে উহা এখনও ন্যূনতম পর্যায়ে পৌঁছায় নাই। এই কারণেই বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম

নগরাঞ্চলে শ্রমিকের মজুরি

* ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

মজুরি আইন (Minimum Wages Act, 1948) দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবংগে চাউলের কল, ময়দার কল, তৈলের কল, চর্মনির্মাণ কার্য, চর্মশোধন কারখানা প্রভৃতির বেলায় ইহ নির্ধারিত হইয়াছে। তবে সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি ধার্য করিতে এখনও বেশ কিছুদিন সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়। উপরন্তু, ন্যূনতম মজুরি ধার্য করাই যথেষ্ট নহে উহা যাহাতে কার্যকর হয় তাহাও দেখিতে হইবে। এ-কার্যে যে আরও অধিক সময় লাগিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ন্যূনতম মজুরির পর আছে ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন। বস্তুত, ন্যূনতম মজুরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম সোপান মাত্র, পরবর্তী এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর হইল ন্যায্য মজুরি ধার্যকরণ। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ন্যায্য মজুরি ধার্যের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আশা করা যায়, ন্যূনতম মজুরি ধার্যের কার্য কিছুদূর অগ্রসর হইলেই সরকার ন্যায্য মজুরির প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবে।

ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি ধার্য করা

ভারতে শ্রমিক-সংঘ (Trade Unions in India): ভারতে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক-সংঘের প্রসার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলন সুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে।

ভারতে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়:

প্রথমত, এ-দেশে এখনও স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠে নাই। শিল্পে যাহারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে তাহাদের অনেকেই গ্রামবাসী এবং সুবিধা পাইলেই গ্রামে ফিরিয়া যায়। ফলে তাহারা শ্রমিক-সংঘের সহিত বিশেষ জড়িত হইতে পারে না।

ভারতে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের অসুবিধা

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকরা বিশেষ দরিদ্র এবং তাহাদের সময়ের অভাব। দারিদ্র্যের জন্য তাহারা সংঘের চাঁদা ঠিকমত দিতে পারে না; এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া তাহারা সংঘের কার্যেও যোগদান করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, জাতিগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যসাধন কঠিন হইয়া পড়ে। উড়িষ্যাবাসী শ্রমিক বাঙালী শ্রমিকের সহিত মিলিতে চাহে না; বাঙালী আবার অবাঙালীকে এড়াইয়া চলে; ইত্যাদি।

চতুর্থত, মালিকশ্রেণীও শ্রমিক-সংঘের বিরোধিতা করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে শ্রমিক-সংঘের একমাত্র কার্য হইল সংগ্রামমূলক। শ্রমিক-সংঘও যে শ্রমের দক্ষতাবৃদ্ধিতে শিল্পে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে তাহা তাহারা অনুধাবন করিতে পারে না।

পঞ্চমত, তারপর আছে শ্রমিকের শিক্ষার অভাব ও অদৃষ্টবাদ। অশিক্ষার দরুন শ্রমিকদের সঠিকভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হয় না; ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

ষষ্ঠত, আমাদের দেশের শ্রমিক-সংঘগুলি প্রধানত ধর্মঘট ও আন্দোলনের সংস্থা হিসাবেই কার্য করে; সৌভ্রাত্রমূলক কার্য তাহাদের মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরিশেষে, শ্রমিক-সংঘসমূহের পরিচালনা ও নেতৃত্ব যাঁহারা করেন তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহিরের লোক।

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য ভারতে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলন প্রসারলাভ করিলেও উহা সুগঠিত হইতে পারে নাই। এই সকল ত্রুটি দূর করিবার জন্য বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমনীতির অধীনে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি: মজুরি হিসাবে যে টাকাকড়ি পাওয়া যায় তাহা আর্থিক মজুরি; ইহার বিনিময়ে যে দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারা যায় তাহা হইল প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরিই শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক এবং ইহা আর্থিক মজুরি ছাড়া অন্যান্য বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়: এই সম্বন্ধে দুইটি তত্ত্ব আছে—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব ও (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব। প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব অনুসারে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব অনুসারে মজুরি শ্রমের যোগান দ্বারা নিরূপিত হয় এবং যোগান নির্ধারিত হয় জীবনযাত্রার মান দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, মজুরি চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি: মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং নিম্নতর মাত্রা জীবনযাত্রার মান। এই দুই-এর মধ্যে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়। শ্রমিকের পক্ষে দরাদরি করে শ্রমিক-সংঘ। ইহাকে যৌথ দরাদরি বলা হয়। যৌথ দরাদরি ছাড়াও শ্রমিক-সংঘ অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে।

আপেক্ষিক মজুরি: আপেক্ষিক মজুরি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান কমবেশী হয় বলিয়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায়।

ভারতে মজুরি: ভারতে মজুরির হার অত্যন্ত নিম্ন। তবে বর্তমানে ন্যূনতম মজুরি ও ন্যায্য মজুরি ধার্যের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে শ্রমিক-সংঘ: ভারতে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের নানা অসুবিধা দেখা যায়। পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এগুলিকে দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Distinguish between Money Wages and Real Wages. Indicate the main factors which determine the Real Wages in a country.** (En. 1961)

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। যে যে বিষয় দ্বারা দেশের প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও। [৩২৫-৩২৬ পৃষ্ঠা]

2. **What determines Wages? Is it the Standard of Living or the Marginal Productivity of Labour?** (C. U. 1954, '57)

জীবনযাত্রার মান না শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন—কোনটি মজুরি নির্ধারণ করে?

[ইংগিত: যোগানের দিক দিয়া মজুরি জীবনযাত্রার মান এবং চাহিদার দিক দিয়া প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয়। (৩২৭-৩২৮ পৃষ্ঠা)]

3. **Show how Wages are determined.** **(P. U. 1962 ; H. S. (H) 1962)**

কিভাবে মজুরি নির্ধারিত হয় দেখাও। [৩২৭-৩২৮ পৃষ্ঠা]

4. **Explain why wage rates vary in different occupations within a country.** **(C. U. 1959,'61 ; H. S. (H) 1961)**

কোন দেশের ভিতর বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারে পার্থক্য হয় কেন ব্যাখ্যা কর। [৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠা]

5. **Consider the influence of Trade Unions on Wages.** **(H. S. (H) Comp. 1961)**

মজুরির উপর শ্রমিক-সংঘের কতদূর প্রভাব আছে আলোচনা করিয়া দেখাও। [৩১৮ এবং ৩২৯ পৃষ্ঠা]

6. **Describe the functions and utility of Trade Unions. What are the difficulties of the Trade Union movement in India ?**

শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলী ও উপযোগিতা বর্ণনা কর। ভারতে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনের অসুবিধা কি কি ? [৩২৯-৩৩০ এবং ৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠা]

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

সুদ কাহাকে বলে

সুদ কাহাকে বলে ? (What is Interest ?) : মূলধন কর্জ লওয়ার জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলে। সাধারণত বাৎসরিক হারে এই দামের হিসাব করা হয়। যেমন, কোন ঋণগ্রহীতা যদি ১০০ টাকা ধার লইয়া বৎসরান্তে ১০৬ টাকা ফেরত দিতে অংগীকারাবদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে সুদের বাৎসরিক হার হইল শতকরা ৬ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর আসল ছাড়াও যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাহাই সুদ।

নীট সুদ

নীট সুদ ও মোট সুদ (Net Interest and Gross Interest) : মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই নীট (Net or Pure or Economic) সুদ বলা হয়; মূলধন কর্জ করিলেই এই সুদ দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে-সুদ প্রদান করিয়া থাকে তাহার মধ্যে নীট সুদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের দাম থাকে—যেমন, আদায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে, ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার দরুন ঋণদাতা নীট সুদ ব্যতীত কিছু অতিরিক্ত আদায় করে। আবার লেনদেন সংক্রান্ত হিসাবপত্র প্রভৃতি বাবদও ঋণদাতাকে ব্যয় করিতে হয়; অনেক সময় তাহাকে ঋণ আদায়ের জন্য হাংগামা পোহাইতে হয়। ইহার দাম হিসাবেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে

অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া থাকে। অতএব ঋণগ্রহীতাকে সুদ হিসাবে যাহা দিতে হয় তাহার মধ্যে ঝুঁকি হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থও থাকে। সুতরাং উহাকে মোট বা অপরিশুদ্ধ (gross) সুদ বলা হয়। এই মোট সুদ হইতে ঝুঁকি, আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোন প্রকার ঝুঁকি বা ঝঞ্ঝাট না থাকিলে ঋণের জন্য যে-সুদ আদায় করা হয় তাহাই নীট সুদ।

মোট সুদ

এই কারণেই বিভিন্ন প্রকারের ঋণের মধ্যে সুদের পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের যে অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয় তাহার অন্যতম কারণ হইল যে এই ঋণের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা এবং আদায়ের ঝঞ্ঝাট বেশী। অপরপক্ষে সরকারকে আমরা যে-ঋণ দিয়া থাকি তাহার সুদ যে অপেক্ষাকৃত কম হয় তাহার কারণ এইরূপ ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা আদায়ের ঝঞ্ঝাট কম।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Interest Determined?): সুদ মূলধন ব্যবহারের দাম। সুতরাং জিনিস-পত্রের দামের ন্যায়ই উহা চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট মূলধনের উপযোগিতা আছে বলিয়াই মূলধনের চাহিদা এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী-শ্রেণী মূলধনের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া। ঋণ-করা মূলধন সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা আয় হয় ততটা পরিমাণ সুদই দিতে সে রাজী হইবে। মূলধনের নিয়োগের ফলে যে-আয় হয় সুদের হার তাহার অধিক হইলে সে ঋণ করিবে না। যেমন, ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদক বৎসরে ৫ টাকা আয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহার লোকসান হইবে। সুতরাং সে যখন মূলধন বাড়ায় তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে—(১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে আয় কত হইবে? এবং (২) মূলধনের সুদ কত? যেখানে মূলধন হইতে আয় ও মূলধনের সুদ সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।

মূলধনের চাহিদা

মূলধনের উৎপাদিকা-শক্তির জন্য সুদ দেওয়া হয়

চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

আমরা দেখিয়াছি যে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত ক্রমাগত একটিমাত্র উপাদান যোগ করা হইতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে থাকে।* এখন যদি অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিক মাত্রায় মূলধন

* ৬১-৬৩ এবং ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে থাকিবে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিলে ব্যবসায়িগণ সুদ বেশী দিতে রাজী থাকিবে না এবং তাহাদের ঋণের চাহিদা হ্রাস পাইবে। অতএব সুদের হার না কমাইলে লগ্নিদারেরা লগ্নি করিতে পারিবে না এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। অতএব চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা কমিবে—কারণ, যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেশী মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই মূলধন নিয়োজিত হইবে। আর সুদের হার স্বল্প হইলে মূলধনের চাহিদা অধিক হইবে—কারণ, যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কম সে-সকল ক্ষেত্রেও মূলধন নিয়োজিত হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়ী যখন উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগ করে তখন সে মূলধন হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা (expectation) আছে সেই বিচার দ্বারাই পরিচালিত হয়। লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া সে কত সুদে ঋণ করিবে তাহা ঠিক করে।

সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হয়

ব্যবসায়ী লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া ঋণগ্রহণ করে

ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার ঋণ করিয়া থাকে। ইহারাও মূলধনের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে। সাধারণ লোকে বাড়ীঘর বা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। সরকার যুদ্ধ পরিচালনার মত অনুৎপাদনশীল কার্যের জন্য এবং ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্য ঋণ করে। যুদ্ধের জন্য সরকার যে-ঋণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না—কারণ, যুদ্ধজয়ের জন্য যে-কোন সুদেই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত উৎপাদনকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যাহা হউক, চাহিদা যে-সূত্র হইতেই আসুক না কেন উহা অধিক হইলে মূলধনের সুদ বাড়িবে এবং উহা স্বল্প হইলে সুদ কম হইবে।

এই ত' গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা প্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে লগ্নি-মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং সুদের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে; আর সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না। কিছু লোক হয়ত' সুদ না থাকিলেও সঞ্চয় করে; কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য দাম হিসাবে সুদ দেওয়া না হইলে অধিকাংশ লোকই সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। ইহার কারণ, লোকে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানের ভোগকে অধিক কাম্য মনে করে। সঞ্চয় করার অর্থ হইল বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করা। অতএব এই প্রতীক্ষার (waiting) জন্য উপযুক্ত মূল্য না দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে কেন? যেমন, ১০০ টাকা ধার দিয়া যদি দশ

মূলধনের যোগান

বৎসর পরে ঐ ১০০ টাকাই মাত্র ফেরত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণত লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহিবে না। মানুষ বর্তমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যৎকে ততটা দেয় না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তি ও বর্তমান সময়প্রীতি হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। এই সুদই হইল প্রতীক্ষার বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে পরিহার করিবার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় দাম। লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয় তত অধিক বর্তমান ভোগ বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ, সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগস্বীকারের মাত্রা সঞ্চয়বৃদ্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিক মাত্রায় ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ের যোগান দিবে, আর সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমিয়া যাইবে।

বর্তমান ভোগকে স্থগিত বা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্যই সুদ দিতে হয়

দেখা গেল যে, সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে উহার চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে-হারে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার সুদের হার (Equilibrium Rate of Interest) বলে। সুদের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলিবে এবং সুদের হার কমিয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে দাঁড়াইবে। অপরদিকে সুদের হার সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে এবং সুদের হার আবার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা বাজারে সুদের হার সাম্যাবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়

নিম্নের উদাহরণটি হইতে সুদ নির্ধারণের উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজেই বুঝা যাইবে:

(হিসাব টাকায়)

সুদের হার (শতকরা)	মূলধনের চাহিদা	মূলধনের যোগান
৮	১৫,০০০	৫০,০০০
৭	১৮,০০০	৪০,০০০
৬	২২,০০০	৩০,০০০
৫	২৫,০০০	২৫,০০০
৪	৩৫,০০০	২০,০০০
৩	৫০,০০০	১৫,০০০

এই হিসাবে দেখা যায় যে বাজারে সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে ৫ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে—কারণ, ঐ সুদে মূলধনের যতটা চাহিদা

ঠিক ততটাই যোগান হয়। সুদ যদি ৬ টাকা হয় তাহা হইলে ঋণগ্রহীতারা ২২,০০০ টাকা ঋণ করিতে ইচ্ছুক থাকে, কিন্তু ঋণদাতারা ৩০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে চাহে। ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার ৫ টাকায় নামিয়া আসে। অপরদিকে সুদ যখন ৪ টাকা ঋণগ্রহীতারা ৩৫,০০০ টাকা ঋণ করিতে ব্যগ্র কিন্তু ঋণদাতারা মাত্র ২০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে রাজী থাকে। ফলে ঋণগ্রহণের জন্য ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার বাড়িয়া ৫ টাকা হয়। সুতরাং ৫ টাকা সুদের হারেই চাহিদা ও যোগান সাম্যাবস্থায় আসে।

সুদের হারে পার্থক্য (Differences in the Rate of Interest) :

যেমন, একই ধরনের পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে একই থাকে, তেমন একই ধরনের ঋণের সুদও বাজারে একই থাকার প্রবণতা দেখা যায়। তবে ঋণের শ্রেণীবিভাগ আছে এবং এইজন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদ বিভিন্ন হইতে দেখা যায়।

মেয়াদ অনুসারে সুদের পার্থক্য

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। কারণ, এ ক্ষেত্রে মহাজনের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মিটায়।

ঋণের অনিশ্চয়তার জন্য সুদের পার্থক্য

অনেক সময় ঋণে অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। দরিদ্র, অপরিচিত ও অসাধু ব্যক্তিকে ঋণদানে মহাজনরা অনিচ্ছুক হয় বা ঋণ দিতে স্বীকৃত হইলেও জামিন রাখিয়া দেয় বা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। কারণ, অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে আসল টাকা ফেরত না পাইবার আশংকা থাকে। সুতরাং ঝুঁকি বেশী হইলে মহাজনরা উচ্চ হারে সুদ দাবি করে।

আদায়ের পরিশ্রম ও খরচের পার্থক্য

অনেক সময় সুদ আদায়ের জন্য পরিশ্রম ও ব্যয় হয়। চিঠিপত্র লেখা, লোক নিয়োগ করা ইত্যাদির জন্য হাংগামা বেশী হইলে সুদ বেশী দিতে হয়। আমাদের দেশে কাবুলিওয়ালারা যে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করে তাহার অন্যতম কারণ আদায়ের অসুবিধা।

সরকারী ঋণের সুদ অল্প হওয়ার কারণ

সরকার অনেক সময় জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। স্থায়িত্ব অনুসারে এই ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা অল্প হারে সুদ দেওয়া হয়। এই অল্প সুদে ঋণগ্রহণে কেন সরকার সফল হয় তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। সরকারের নিকট হইতে মূলধন ফেরত না পাওয়ার কোন আশংকা থাকে না। সরকারের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতায় লোকের সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। উপরন্তু, এই ঋণের জন্য সুদ আদায়ের কোন হাংগামা নাই। আইনের বলে কোম্পানীগুলি, বীমা কোম্পানী ও ব্যাংকগুলি সরকারী ঋণপত্রে টাকা খাটাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং যোগান অধিক বলিয়া সরকারী ঋণের সুদের হার কম হয়।

কৃষকদের বেলায় অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহাদের ঋণের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু গ্রামে ঋণ দিবার মত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ অল্প। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে মহাজনই হইল ঋণপ্রদানের প্রধান সূত্র। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র কৃষককে ঋণ দেওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি থাকে। শস্যের ফলন ভাল হইলে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা থাকে, না হইলে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা কম হয়। অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া কৃষকেরা ধার লইবার সময় কোন জামিন বা বন্ধক দিতে পারে না। সমবায় সমিতির ঋণ, তাকাভি ঋণ বা জমিবন্ধকী ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও অতি অল্প বলিয়া মহাজনরা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে এবং কৃষকদের প্রয়োজন বেশী বলিয়া উহা দিতে বাধ্য হয়।

কৃষকদের ঋণের সুদ অধিক হওয়ার কারণ

শহরের ব্যাংকগুলি শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে যে স্বল্পমেয়াদী ধার দেয় তাহার জন্য জামিন রাখিয়া দেয়; এইজন্য ঋণের ঝুঁকি বিশেষ থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের আয় কৃষকদের আয়ের মত অতটা অনিশ্চিত নয়; সুতরাং মূলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। এই সকল কারণে শহরের ব্যাংকগুলি মহাজনদের তুলনায় অনেক কম সুদে টাকা ধার দেয়।

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের ঋণের সুদ অপেক্ষাকৃত কম

সংক্ষিপ্তসার

মোট সুদ ও নীট সুদ: মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে সুদ দেওয়া হয় তাহাকে নীট সুদ বলে। নীট সুদের উপর যদি কিছু আদায় করা হয় তবে মোট দেয় অর্থকে মোট সুদ বলা হয়।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়: সুদ নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয় ... সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদাও বাড়াকমা করে। ... ... মূলধন যোগান দেওয়া হয়। সঞ্চয়ের জন্য বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখা। ... বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখা বা অপেক্ষা করা ... অনিচ্ছা ... করার জন্যই সুদ দিতে হয়। সুদের হার ... অধিক হইবে ... বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিতে ... হইবে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সুদের হার ভারসাম্য অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়।

সুদের হারে পার্থক্য: এক ধরনের পণ্যের দাম বাজারে ... থাকে তেমনি এক ধরনের ঋণের সুদও এক হয়। কিন্তু সকল সুদ এক ধরনের নয় বলিয়া সুদের হারেও পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ। মেয়াদ অনুসারে সুদের হারে পার্থক্য অনিশ্চয়তার জন্য সুদের হারে পার্থক্য আদায়ের পরিশ্রম ও ব্যয়ের জন্য সুদের হারে পার্থক্যের উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between Gross Interest and Net Interest How is the rate of Interest determined? (H. S. (H) 1961 ; H S. (C) 1962)

মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? [৬৩৪-৬৩৮ পৃষ্ঠা]

2. Account for the variation in the rates of Interest borne by different types of loans. (H. S. (C) 1962)

বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য সুদের হারের পার্থক্যের কারণ বর্ণনা কর। [৬৩৮-৬৩৯ পৃষ্ঠা]

3. **Why does a lender demand the payment of interest on a loan? Why does he charge different rates of interest for different types of loans?**

(C. U. 1960)

ঋণদাতা ঋণের উপর সুদ দাবি করে কেন? সে বিভিন্ন ধরনের ঋণের উপর বিভিন্ন হারে সুদ দাবি করে কেন?

[৩৩৬-৩৩৭ এবং ৩৩৮-৩৩৯ পৃষ্ঠা]

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মুনাফা
(Profit)

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit): অন্যান্য উৎপাদন-উপাদানের আয় হইতে মুনাফার প্রকৃতি একটু পৃথক। প্রথমত, মুনাফা হইল পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠকের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দাম চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে। জমির মালিক কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক কত মজুরি পাইবে এবং মূলধন সরবরাহকারী কত সুদ পাইবে তাহা এই সকল ব্যক্তি ও সংগঠকের মধ্যে পূর্ব চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সংগঠকের পুরস্কার এইভাবে কোনমতে নির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত, জমি (কাঁচামাল ও খাজনা), শ্রমিক ও মূলধন সরবরাহকারীর প্রাপ্য মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাই মুনাফা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই কারণে মুনাফা একেবারে শূন্য হইতে পারে, অথবা ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। খাজনা, মজুরি বা সুদ কিন্তু কখনই ঋণাত্মক হয় না। তৃতীয়ত, খাজনা, মজুরি ও সুদের হারের সহসা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না; কিন্তু মুনাফার হারে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এক বৎসর হয়ত' মুনাফা প্রচুর হইল, পরের বৎসর প্রচুর ক্ষতি হইল—এইরূপও দেখা যায়।

মুনাফার সহিত অন্যান্য উপাদানের আয়ের পার্থক্য

মোট ও নীট মুনাফা (Gross and Net Profit): ব্যবসায়-সংগঠক প্রাপ্ত আয় হইতে খাজনা, মজুরি ও সুদ চুকাইয়া দিয়া যে অর্থ পুরস্কার বা সংগঠন পরিচালনার দাম বলিয়া দাবি করে তাহাকে মুনাফা বলে। অনেক সময় সংগঠক নিজের জমিতে উৎপাদন করে এবং নিজেই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও মূলধন নিয়োগ করে। সে-ক্ষেত্রে মজুরি বাদ দিয়া আয়ের সবটাই সে মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজের

মোট মুনাফা কাহাকে বলে

জমি ও মূলধন বলিয়া খাজনা ও সুদ পরকে দিতে হয় না। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়। কিন্তু জমি ও মূলধন নিজেরই হউক, বা পরেরই হউক মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা, মজুরি ও সুদ বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে নীট মুনাফা (Net Profit) বলা হয়। নীট মুনাফার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি থাকে :

নীট মুনাফার উৎপাদন

(ক) সংগঠক ব্যবসায়ে স্বয়ং পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে। এই ধরনের শ্রমের জন্য লোক রাখিতে হইলে তাহাকে মজুরি দিতে হইত, অথবা সংগঠক যদি অন্যত্র কাজ করিত তাহা হইলেও সে পারিশ্রমিক পাইত। সুতরাং সংগঠকের নিজের শ্রমের মজুরি হইল মুনাফার একটি উপাদান।*

(খ) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা। 'হয় রাজা নয় ফকির' হইবার সম্ভাবনা সকল ব্যবসায়ে অল্পবিস্তর আছেই। সংগঠকের যেমন লাভের আশা আছে তেমনি লোকসানের আশংকাও আছে। এই ঝুঁকিবহনের জন্য সে যে-অর্থ দাবি করে তাহাই মুনাফার প্রধান অংশ। অর্থাগমের আশা না থাকিলে কেহই ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত হইত না।

(গ) অনেক সময় একচেটিয়া বা আংশিক একচেটিয়া কারবার থাকিলে সংগঠক অধিক মুনাফার আশা করে। এই ধরনের মুনাফাকে 'একচেটিয়া কারবারের মুনাফা' বলা হয়। বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ের মধ্যে 'একচেটিয়া মুনাফা'র অংশ অল্পবিস্তর আছেই।

(ঘ) অনেক সময় হঠাৎ সুযোগ আসিলে সংগঠকরা 'বেশ মোটা' লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে অনেক জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়ায় যাহাদের নিকট ঐ জিনিস পূর্ব হইতেই মজুত করা আছে, তাহারা অচিন্তনীয় মুনাফা করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় ১ পাউণ্ড কুইনাইন্ অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই ধরনের মুনাফাকে আকস্মিক মুনাফা (windfall profit) বলা হয়।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) : স্বাভাবিক মুনাফার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সংগঠকের পক্ষে পরিচালনার পারিশ্রমিক ও ব্যবসায় বা উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কারকে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অল্পদিনের জন্য সে বেগার খাটিতে পারে, ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ঝুঁকিবহন ও পরিশ্রম বাবদ কিছু মুনাফা অর্জন করিবেই। নচেৎ, সে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে।

সংক্ষিপ্তসার

মুনাফা অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে পৃথক : ১। মুনাফা চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় না ; ২। মুনাফা ঋণাত্মক হইতে পারে ; ৩। মুনাফার হারের ভীষণ পরিবর্তন হয়।

---

* অনেক ক্ষেত্রে [illegible] বাদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করা হয়।

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা: অন্যান্য সকলকে প্রদান করিয়া সংগঠকের হস্তে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই মোট মুনাফা। ইহা হইতে সংগঠকের নিজস্ব মূলধন ও জমির দরুন প্রাপ্য বাদ দেওয়া হইলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। নীট মুনাফার উপাদানের মধ্যে ১। সংগঠকের পারিশ্রমিক, ২। ঝুঁকিবহনের পুরস্কার, ৩। একচেটিয়া কারবারের লাভ, ৪। আকস্মিক লাভ, প্রভৃতি থাকে। ইহা হইতে আবার শেষের দুইটি—অর্থাৎ, একচেটিয়া কারবারের লাভ ও আকস্মিক লাভ বাদ দেওয়া হইলে তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে।

প্রশ্নোত্তর

1. How is Profit distinguished from other Factor Incomes? Indicate the different elements of Profit.

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য কোথায়? মুনাফার উপাদানগুলি কি কি দেখাও। [৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠা]

লেখক-পরিচিতি

উইলসন (President Woodrow Wilson) : উইলসন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ঐ বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি তাঁহারই সর্তের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। রাষ্ট্রপতি উইলসন জাতিসংঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠাতেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ঐ জাতিসংঘে যোগদান করে নাই।

উইলসন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। সার্বভৌমিকতা, দলপ্রথা, জনমত, আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্থলে আন্তর্জাতিকতাই ছিল তাঁহার আদর্শ। এই আন্তর্জাতিকতার আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া তিনি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর উইলসন রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিনখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ— ১। 'An Old Master and Other Essays', ২। 'Congressional Government' এবং ৩। 'The State'.
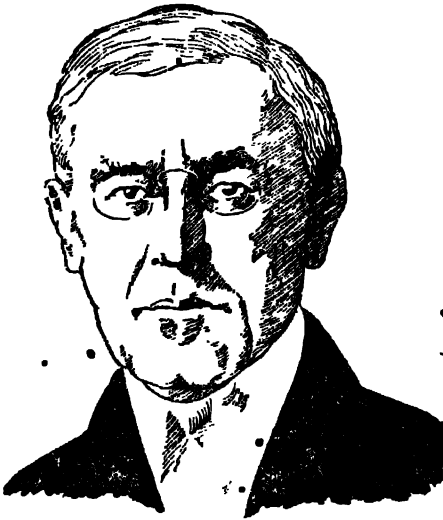
উইলসন লিংকন

এ্যাব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) : লিংকন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহবিবাদের সময় ঐ দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এই গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদের প্রশ্ন লইয়া। গৃহযুদ্ধের সময় তিনি গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া একটি স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি গণতন্ত্রকে 'জনগণের কল্যাণার্থে জনগণের শাসন' বলিয়া বর্ণনা করেন। তখন হইতে গণতান্ত্রিক সরকারের এই সংজ্ঞাই সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে।

এ্যারিষ্টটল (Aristotle) ঃ বিখ্যাত গ্রীক চিন্তাবীর এ্যারিষ্টটলকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। জীবনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২। এ্যারিষ্টটল ষ্টাগিরা (Stagira) নামক গ্রীসের একটি অখ্যাত স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ বৎসর বয়সে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে আসিয়া চিরস্মরণীয় দার্শনিক প্লেটোর (Plato) ছাত্র হন। পরে কিছুদিন ম্যাসিডনবীর আলেক-জেণ্ডারের গৃহশিক্ষকতা করেন।

এ্যারিষ্টটল

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া যুক্তিবিজ্ঞান (Logic), অর্থবিদ্যা, ইতিহাস, নীতি-শাস্ত্র, দর্শন, চারুকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এ্যারিষ্টটলের অবদান রহিয়াছে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Politics)। তৎকালীন গ্রীক পটভূমিকায় রচিত হইলেও ইহাতে যথেষ্ট আধুনিকতার ছাপ আছে।

গার্ণার (Prof. Wilfred Garner) ঃ গার্ণার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনই (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রথমে 'Introduction to Political Science' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ইহাকে বৃহদাকারে পরিবর্তিত করিয়া নাম দেন 'Political Science and Government'।

রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় গার্ণারের বিশেষ কিছু দান নাই; তিনি পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা হিসাবেই পরিচিত।

মিল

জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ঃ জন ষ্টুয়ার্ট মিল উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ চিন্তাবীর। জীবনকাল ১৮০৬-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। পিতা জেমস মিলও একজন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক।

রাষ্ট্রনীতি ছাড়া অর্থবিদ্যা, যুক্তি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতেও মিলের দান রহিয়াছে। এদিক দিয়া মিল এ্যারিষ্ট-টলের সহিত তুলনীয়। পাণ্ডিত্যেও মিলকে এ্যারিষ্টটলের সমকক্ষ মনে করা হয়।

মিলের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক রচনা 'On Liberty'-র প্রকাশের সময় হইল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। এক বৎসর পরেই (১৮৬১) প্রকাশিত হয় 'Considerations on Representative Government'।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell): বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও চিন্তাবীর। জন্ম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসেল পরিবারের সন্তান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধ্যাপক। যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া শান্তিবাদ প্রচারের জন্য রাসেল পদচ্যুত হন। পদচ্যুতির পর তিনি সমগ্র বিশ্বে তাঁহার মতবাদ ও চিন্তাধারা প্রচারের আদর্শ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করিতে থাকেন। ফলে বিশ্বই হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়, এবং রাসেল পরিচিত হন মানব-বন্ধুরূপে। বর্তমানে ৯১ বৎসর বয়স্ক এই মানব-বন্ধু আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতেছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বার্ট্রাণ্ড- রাসেলের রচনার মধ্যে 'A History of Western Philosophy', 'Principles of Social Reconstruction', 'Authority and the Individual', 'Impact of Science on Society' ইত্যাদিই সমধিক প্রসিদ্ধ। এ-পর্যন্ত তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ হইল 'Has Man a Future?' এই গ্রন্থে তিনি বিশ্ববাসীকে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের বিরোধিতায় সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার উপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

ব্রাইস (Lord James Bryce): ইংরাজ লেখক লর্ড ব্রাইস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক ভ্রমণ করেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে অধিক বিখ্যাত 'Modern Democracies' (Vols. I & II) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনৈতিক দল, রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা ও রীতিনীতি লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থ হইল 'Studies in History and Jurisprudence', 'American Commonwealth' এবং 'South America, *Observations and Impressions*'.

ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের জার্মান দার্শনিক। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও জীবদেহের প্রকৃতি একই।

মণ্টেস্কু (Baron de Montesquieu) ঃ মণ্টেস্কু রুশোর কিছু পূর্ববর্তী ফরাসী দার্শনিক। জীবনকাল ১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। শৈশব হইতেই তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। তারপর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'Espirit des Lois' (Spirit of Laws) গ্রন্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদ প্রচার করেন।

ম্যাট্‌সিনি
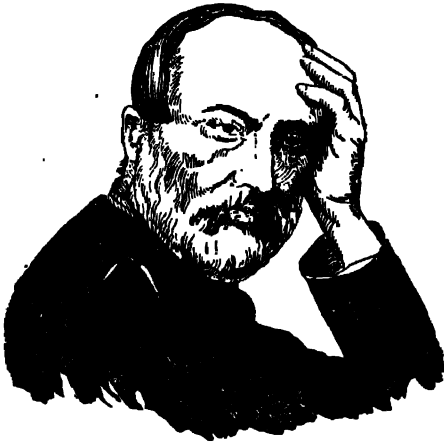
ম্যা ট্‌ সি নি (Mazzini) ঃ উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর নেতা। ইতালীর জনগণকে জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ইতালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রভুত্ব ও বিদেশী নৃপতিদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য 'নব্য ইতালী' নামে গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। ১৮৪৮ ব্দ রোমে সাধারণতন্ত্রী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে নির্বাসিত হন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Manifesto of Young Italy' নামক গ্রন্থে ম্যাট্‌সিনি ইতালীয়গণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঃ রাষ্ট্রনীতি চিন্তাতে যে রবীন্দ্রনাথের দান আছে তাহা অনেকেরই জানা নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'Nationalism' গ্রন্থ রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যের (Political Literature) একখানি মূল্যবান সম্পদ। ইহা কলিকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.-এর পাঠ্য। রাষ্ট্র-নীতির উপর অন্যান্য লেখাও রবীন্দ্রনাথের আছে।

রবীন্দ্রনাথ

রুশো (Jean Jacques Rousseau) ঃ রুশোকে ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু (spiritual father) আখ্যা দেওয়া হয়। জীবনকাল ১৭১২-১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।

রুশোর জীবন বিপ্লবীর জীবন। ১৬ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে ভ্রাম্যমাণ ও নির্বাসিতের জীবনযাপন করিতে হয়। তাঁহার অনুকরণীয় গ্রন্থ 'Contract Social' (Social Contract) ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধারণের সার্বভৌমিকতা (popular sovereignty) সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্ব এবং রুশোর সমসাময়িক চিন্তাবীর ভোলটেয়ারের (Voltaire) ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে রচনা ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

রুশো

লক্ (John Locke) ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিকগণের মধ্যে লক্ হবসের পরবর্তী। জীবনকাল ১৬৩২-১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

লক্ ইংলণ্ডে উদারনৈতিক দলের (Whig Party) প্রতিষ্ঠার সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ এবং হবস্ কর্তৃক প্রচারিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব উভয়েরই বিরোধিতা করেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রক্তহীন বা গৌরবজনক বিপ্লব (Glorious Revolution) সংঘটিত হইলে ইহার সমর্থনে লক্ তাঁহার গ্রন্থদ্বয় 'Two Treatises on Civil Government' রচনা করেন (১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহাতে তিনি প্রচার করেন যে সামাজিক চুক্তি দ্বারা আদিম মনুষ্য-সম্প্রদায় রাজার হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করে নাই। সুতরাং রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং রাজার দায়িত্ব রহিয়াছে প্রজাপালন করিবার। রাজা তাঁহার দায়িত্ব পালন না করিলে প্রজারা আইনসংগতভাবেই বিদ্রোহ করিতে পারে।

লক

রাজক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট তত্ত্বই রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় লকের অবদান।

ল্যাস্কি (Harold Joseph Laski) : ল্যাস্কি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) গত হইয়াছেন।

ল্যাস্কির রচিত অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'Grammar of Politics', 'Problem of Sovereignty', 'Authority in the Modern State', 'Democracy in Crisis' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলিতে ল্যাস্কি ব্যক্তি-স্বাধীনতার এবং সার্বভৌমিকতার বিকেন্দ্রিকরণের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

লেনিন (V. I. Lenin) : রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা ও সমাজতান্ত্রিক সোবিয়েত রাষ্ট্রের স্রষ্টা। জীবনকাল ১৮৭৯-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথমে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত রুশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী শ্রমিকদলের (Russian Social Democratic Labour Party) অন্যতম নেতা ছিলেন। এই দল কার্ল মার্কসের (Karl Marx) মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। পরে দলটি
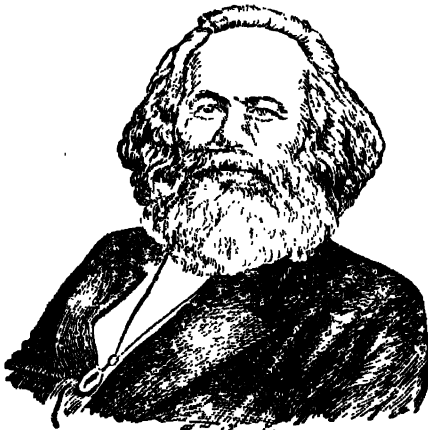
কার্ল মার্কস্ লেনিন

'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক' এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে লেনিন বলশেভিক দলের নেতা হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর বলশেভিক দল কমিউনিস্ট দল নামে পরিচিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লব লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং ফলে সোবিয়েত সরকার প্রবর্তিত হয়। লেনিনের দূরদর্শিতার ফলেই বিপ্লবের পর বিশৃংখলার মধ্য

হইতেই এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। তাঁহার রচনার মধ্যে অন্যতম হইল 'State and Revolution'। এই পুস্তকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মার্কসীয় মতবাদের ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী : মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নূতন রূপ ও নূতন পথ গ্রহণ করিলে কয়েকজন জননেতা ইহা হইতে বিচ্যুত হইয়া মধ্যপন্থী (Moderate) আখ্যা লাভ করেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইঁহাদের অন্যতম। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী জননেতৃত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি যে কমলা-বক্তৃতা (Kamala Lecture) প্রদান করেন তাহা উচ্চস্তরের রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্য (political literature) হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

হবস্ (Thomas Hobbes) : হবস্ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক। জীবনকাল ১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ।

হবস্ কিছুদিন দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজতন্ত্রের সমর্থক হিসাবে তিনি দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যচ্যুতি ও ক্রমওয়েলের অধীনে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মোটেই সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'লেভায়াথানে'* (Leviathan) সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার প্রজাদের নাই।

এইভাবে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতিবাদে হবস্ যে সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক হইতে তাহা বিশেষ মূল্যবান।

* লেভায়াথান কল্পিত এক বিরাট সামুদ্রিক জীব, তিমি মাছ অপেক্ষাও বড়।

অ্যালফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) : কেম্ব্রিজের প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ। আধুনিক অর্থবিদ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত এই অর্থবিদ্যাবিদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে 'Principles of Economic'ই অধিক পরিচিত। অর্থবিদ্যার আলোচনায় তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হইল চাহিদা ও যোগান রেখা এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার বিশ্লেষণ। আধুনিক অর্থবিদ্যার আলোচনায় এই বিশ্লেষণ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করিয়া মূল্যতত্ত্বের আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
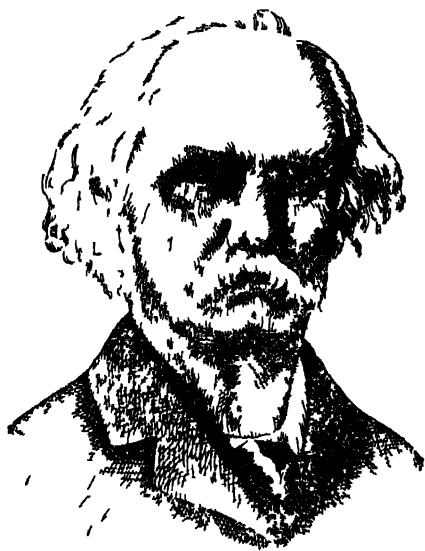
মার্শাল

এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) : ব্রিটেনে বিশদ ও সুশৃংখলভাবে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু করেন এ্যাডাম স্মিথ। জীবনকাল ১৭২৩-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'Wealth of Nations' প্রকাশিত হয়। স্মিথ শ্রমবিভাগ, শ্রমের সহিত দামের সম্পর্ক, মূলধন, প্রতিযোগিতা, করনীতি, বহির্বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনই স্বাভাবিকভাবেই সুশৃংখল দেখা যায়। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার চিন্তাধারা অর্থবিদ্যাবিদগণকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত পথ ধরিয়াই ম্যালথাস, রিকার্ডো, মিল প্রভৃতি 'ক্লাসিক্যাল' লেখকগণ নিজ নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং অর্থবিদ্যার আলোচনাকে অগ্রসর করেন।

ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) : ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থবিদ্যাবিদ। এ্যাডাম স্মিথের মতই খ্যাতিসম্পন্ন লেখক। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাংক-নোটের মূল্যহ্রাস সম্পর্কে রচনা প্রকাশ করেন। তাঁহার লেখা তুমুল তর্ক-বিতর্কের সূচনা করে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক 'The Principles of Political Economy' প্রকাশিত হয়। খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও ধনবণ্টন, মুদ্রানীতি, মূল্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখার মূল সূত্র ধরিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John

Stuart Mill) এবং কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) নিজেদের মতবাদ গড়িয়া তুলেন।

ম্যালথাস (T. R. Malthus) : ইংরাজ ধর্মযাজক ম্যালথাস জনসংখ্যা-নীতির ব্যাখ্যাকার হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'Essay on the Principle of Population' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার জীবদ্দশায় উহার আরও চারিটি সংস্করণ হয়। এই পুস্তকে তিনি দেখান যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খাদ্যবৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক ; সুতরাং মানুষ স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করিলে মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে বাধ্য। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে 'The Principles of Political Economy'-র কথা উল্লেখ করিতে হয়। বর্তমান যুগের প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ কেইন্‌সের (Keynes) মতবাদের অনেকগুলিরই সন্ধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

রাইফিজেন (Friedrich Wilhelm Raiffeisen) : জীবনকাল ১৮১৮-১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্মেনীতে সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তক। তাঁহার প্রেরণা ও পরিচালনায় জার্মেনীর তেয়ারবুশ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রথম গ্রামীণ সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। পরে এই সমবায় প্রথা সমগ্র জার্মেনীতে, এবং জার্মেনীর ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে।

রাইফিজেন

কয়েকটি ব্যাখ্যা

১। **এ্যাটর্নী-জেনারেল**ঃ ভারতের শাসন-ব্যবস্থার ৩২ পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুসারে রাষ্ট্রপতি এ্যাটর্নী-জেনারেলকে নিযুক্ত করেন। এই অংশ মুদ্রিত হইবার পর ভারত সরকার এ্যাটর্নী জেনারেলের স্বতন্ত্র পদের বিলোপসাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে আইন মন্ত্রীই (Law Minister) পদটি অধিকার করিবেন। এ্যাটর্নী-জেনারেলের কার্য হইল আইন মন্ত্রি-দপ্তরকে পরামর্শ দেওয়া। ফলে এখন হইতে এই পরামর্শ স্বয়ং আইন মন্ত্রীই দিবেন। তবে অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সংবিধানে এ্যাটর্নী-জেনারেলের স্বতন্ত্র পদের ব্যবস্থা আছে বলিয়া সংবিধানের সংশোধন ব্যতীত ঐ কার্যভার আইন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা আইনসংগত হইবে না। সুতরাং মনে হয় যে এই উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বেই সংবিধানের আর একদফা (১৬শ) সংশোধন পাস করা হইবে। ১৫শ সংশোধন দ্বারা যে হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ যথাস্থানে (৭২ পৃষ্ঠা) করা হইয়াছে।

২। **ক্যালোরি-মূল্য**ঃ সকলের পক্ষে দৈনিক একই পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। বয়স, কায়িক পরিশ্রম, জলবায়ু ইত্যাদির তারতম্যের দরুন প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণেরও কমবেশী হয়। গৃহীত খাদ্য হইতে শরীরে কি পরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরই প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ নির্ভর করে। খাদ্য হইতে উদ্ভূত উত্তাপকেই 'ক্যালোরি'* বলা হয়। অতএব, গৃহীত খাদ্য যথেষ্ট কিনা, তাহার হিসাব ক্যালোরিতেই করা হয়।

৩। **মেট্রিক ওজন**ঃ বর্তমানে মেট্রিক পদ্ধতিতেই ওজন ও পরিমাপ করা হইতেছে বলিয়া সকল স্থানে মেট্রিক হিসাবই দেওয়া হইয়াছে। ফলে টনের পরিবর্তে 'মেট্রিক টন' ব্যবহার করা হইয়াছে। এক মেট্রিক টন=২০০০ পাউণ্ড।

৪। **ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা**ঃ সকল প্রকারের শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, (১) বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industries), (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industries) এবং (৩) কুটির শিল্প (Cottage Industries)।

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা

কিছুদিন পূর্বে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N.) নিযুক্ত এক কমিশন** কুটির শিল্পের

* এক কিলোগ্রাম জলের উষ্ণতাকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক তাহার পরিমাণই 'এক' ক্যালোরি।

** Economic Commission for Asia and Far East বা সংক্ষেপে ECAFE

এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে: আংশিক বা পূর্ণ বৃত্তি হিসাবে যে-শিল্পকে কারিগর সম্পূর্ণভাবে বা প্রধানত পরিবারের অন্যান্য সকলের সহযোগিতায় পরিচালনা করে তাহাকেই কুটির শিল্প বলা হয়। ১৯৪৯-৫০ সালের ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশন এই সংজ্ঞা অনুমোদন করে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে ঐ ফিসক্যাল কমিশন বলে যে, এরূপ শিল্প প্রধানত ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যেই পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে শিল্পপতি বা কর্মকর্তা (entrepreneurs) মজুর নিয়োগ করিয়া ছোট কারখানায় উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। সংক্ষেপে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা এইভাবে করা যায়: কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া নিজের গৃহে চিরাচরিত পন্থায় উৎপাদনকার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ, কারিগর নিজস্ব চেষ্টা ও কৌশলের উপর নির্ভরশীল; সে অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্য লয়। উপরন্তু, এই শিল্প কারিগরের আসল পেশা নাও হইতে পারে। কৃষিকার্য বা অন্য কোন প্রধান বৃত্তির সহিত পার্শ্বজীবিকা হিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে। অপরদিকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদনকার্য কারিগরের গৃহে পরিচালিত হয় না; ক্ষুদ্রায়তন কারখানায় শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদনকার্য চলে। বর্তমানে 'ক্ষুদ্রায়তন' বলিতে ৫ লক্ষ টাকা অবধি বিনিয়োগকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (Small-scale Industries Board) প্রদত্ত সাম্প্রতিক সংজ্ঞা অনুসারে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শক্তিচালিত এবং সাধারণত নগরাঞ্চল বা সহরতলীতে অবস্থিত হয়। এ-সংজ্ঞা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গ্রামাঞ্চলেও বেশ কিছু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ময়দা ও চাউলের কলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুত, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, কুটির শিল্প কিরূপ আকার ধারণ করিলে তাহাকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা হইবে সে-সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বৈশিষ্ট্য

কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

শুদ্ধি

পৌরবিজ্ঞানের ৮২ পৃষ্ঠা—তলা হইতে ৪র্থ লাইন—আছে 'কোন বিভাগের মধ্যে নিজস্ব—হইবে "কোন বিভাগের 'পক্ষে' নিজস্ব"।

পৌরবিজ্ঞানের ১০৮ পৃষ্ঠা—উপর হইতে ১২শ ও ১৩শ লাইন—আছে 'আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যসমূহের'—হইবে "আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠা এবং 'রাষ্ট্র'সমূহের"।

পরিভাষা

অ

অগণতান্ত্রিক—undemocratic
অতিদীর্ঘকালীন বাজার—secular market
অত্যল্পকালীন বাজার—very short-period market
অত্যুন্নত—highly developed
অদৃশ্য রপ্তানি ও আমদানি—invisible export and import
অধিকার-পৃচ্ছা—*quo u ai ranto*
অনগ্রসর অঞ্চল—backward area
অনন্য—exclusive
অন্তর্নিয়োগ শিক্ষা—training-on-job
অনিবদ্ধ মূলধন—floating capital, non-specific capital
অনিশ্চিত ব্যয়-তহবিল—contingency fund
অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—favourable bal ınce of trade
অনুকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত—favourable balance of payments
অনুচ্ছেদ—articles
অনুমোদনসিদ্ধ (নাগরিক)—naturalized (citizen)
অনুসন্ধানকারী দল—study group
অনুৎপাদনশীল—unproductive
অনুৎপাদনশীল ঋণ—unproductive debt
অন্তঃশুল্ক—excise duty
অপরিশুদ্ধ—gross
অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা—unplanned economy
অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—inconvertible paper currency
অপ্রচুর—scarce
অপ্রাচুর্য—scarcity
অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা—imperfect competition
অপূর্ণাংগ যুক্তরাষ্ট্র—quasi-federal state
অবস্তুগত—non-material
অবাধ বাণিজ্য—free trade
অবাধলভ্য—free
অভাব—wants
অভাবের সংগতি—coincidence of wants
অভিজাততন্ত্র—aristocracy
অভিজাতশ্রেণী—patricians
অভাব হইতে মুক্তি—freedom from want
অভিভাবক পরিষদ—Trusteeship Council (U. N.)
অরাজকতা—anarchy
অর্থ কমিশন—Finance Commission
অর্থদপ্তর—finance department
অর্থনৈতিক—economic
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—Economic and Social Council (U. N.)
অর্থনৈতিক খাজনা—economic rent
অর্থবিদ্যা—economics
অর্থ ব্যবস্থা—economic system
অর্থনৈতিক বিপ্লব—economic revolution
অর্থনৈতিক সংগঠন—economic organisation
অর্থনৈতিক সমস্যা—economic problem

অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা—economic liberty
অর্থসাহায্য—bounty, grants-in-aid, subsidy
অর্ধ-নিয়োগ—underemployment
অর্ধোন্নত (স্বল্পোন্নত) অঞ্চল—underdeveloped area or region
অর্ধোন্নত (স্বল্পোন্নত) দেশ—underdeveloped country
অল্পকালীন বাজার—short-period market
অসাধু প্রতিযোগিতা—unfair competition
অসীম দায়—unlimited liability
অসীম বিহিত মুদ্রা—unlimited legal tender money
অস্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থা—temporary equilibrium position
অস্থায়ী ভারসাম্যের দাম—temporary equilibrium price
অহস্তান্তরযোগ্য—non-transferable
অংগ—organ, unit
অংগরাজ্য—constituent unit
অংশীদার—partner
অংশীদারী—partnership

আ

আইন—law
আইনাভিজ্ঞ—jurist
আইনগত অধিকার—legal rights
আইনগত ধারণা—legal idea
আইন-প্রণয়ন—legislation, law-making
আইনসভা—legislature
আইনসংগত স্বাধীনতা—legal liberty
আইনের অনুশাসন—rule of law
আকর—ore
আকস্মিক মুনাফা—windfall profit
আকাংক্ষা—desiredness
আঞ্চলিক—territorial, regional
আঞ্চলিক পরিষদ—territorial council, zonal council
আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ—territorial division of labour
আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী—territorial army
আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য—regional autonomy
আত্যন্তিক চাষ—intensive cultivation
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—right of self-determination
আন্তঃরাজ্য পরিষদ—Inter-State Council
আন্তর্জাতিক—international
আন্তর্জাতিকতা—internationalism
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—international organisation
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান—International Trade Organisation (ITO)
আন্তর্জাতিক বিচারালয়—International Court of Justice
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল—International Monetary Fund (IMF)
আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ—International Labour Organisation (ILO)
আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ—United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
আনুগত্য—allegiance
আপিল এলাকা—appellate jurisdiction

আপেক্ষিক—relative
আপেক্ষিক দক্ষতা—comparative advantage
আপেক্ষিক ব্যয—comparative cost
আপেক্ষিক মজুরি—relative wages
আপেক্ষিক মল্য—relative value
আপোষ—conciliation
আবগারী শুল্ক—excise duty
আবাদী শিল্প—plantation industry
আভ্যন্তরীণ—internal
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—domestic trade, internal trade
আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা—internal sovereignty
আমদানি—import
আলোচনা—discussion, commentaries
আর্থিক আয—money income
আর্থিক নীতি—economic policy
আর্থিক মজুরি—money wages
আর্থিক মলধন—money capital
আশাবাদী—optimist
আসল টাকাকড়ি—actual money
আয়—income
আয়কর—income tax

উ

উচ্চতর—senior
উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি—consumers' surplus
উন্নয়নমূলক কার্য—development services
উন্নয়ন ব্লক—development block
উন্নয়নের গতি—pace of development
উন্নয়নমূলক ব্যয়—development expenditure
উপঅঞ্চল—sub-area
উপজাতি—tribe
উপদল—faction
উপাদান—factor
উপদেষ্টা কমিটি—advisory committee
উপপরিষদপাল—Deputy Speaker
উপবিধি—bye-law
উপযোগ—utility
উপযোগের তহবিল—store of utility
উপযোগের স্রোত—flow of utility
উপরাষ্ট্রপতি—Vice-President
উপরিস্থ কর—super tax
উষ্ণমণ্ডলীয—tropical
উৎকর্ষ—efficiency
উৎপন্নের বিধি—law of returns
উৎপাদক—producer
উৎপাদকের উদ্বৃত্ত—producer's surplus
উৎপাদিকাশক্তি—productivity
উৎপাদন—production
উৎপাদনের উপাদান—factors of production
উৎপাদনের উপাদানের আয়—factor income
উৎপাদন-ব্যয—cost of production
উৎপাদন-শুল্ক—excise duty
উৎপাদনের লক্ষ্য—target of production
উৎপাদনশীল—productive
উৎপাদনশীল ঋণ—productive debt
উৎপাদনশীলতার নীতি—canon of productivity
উৎপ্রেষণ—*certiorari*
উৎস—sources

ঋ

ঋণ—loan, credit, debt
ঋণজনিত ব্যয়—debt services

ঋণদান সমিতি—credit society
ঋণ-নিয়ন্ত্রণ—credit control
ঋণপত্র—credit instruments
ঋণবরাদ্দ-নীতি—rationing of credit
ঋণ-ব্যবস্থা (গ্রামীণ)—credit system (rural)
ঋণ-মূলধন—loan capital
ঋতুগত বেকারত্ব—seasonal unemployment

এ

এক-উদ্দেশ্যসাধক সমিতি—single-purpose society
একক—unit
এককেন্দ্রিক—unitary
একজাতীয় রাষ্ট্র—mononational State
একচেটিয়া কারবার (বিভেদমূলক)—monopoly (discriminating)
একচেটিয়া কারবারী—monopolist
একচেটিয়া প্রতিযোগিতা—monopolistic competition
একদেশতা—localisation
একধাতুমান—monometallic standard
একধাতু রৌপ্যমান—monometallic silver standard
একনায়ক—dictator
একনায়কতন্ত্র—dictatorship
একনায়কতন্ত্রী—dictatorial
একপরিষদসম্পন্ন—unicameral
একবার ব্যবহার্য দ্রব্য—single-use goods
এক-মালিক—single owner
এলাকা—jurisdiction

ঐ

ঐতিহাসিক মতবাদ—Historical Theory
ঐশ্বরিক-উৎপত্তিবাদ—Divine Origin Theory

ঔ

ঔপনিবেশিক—colonial

ক

কথাবার্তা চালানো—negotiation
কর—tax
কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব—non-tax revenue
করপ্রদানের ক্ষমতা—taxable capacity
কর-রাজস্ব—tax-revenue
কর্মগত বণ্টন—functional distribution
কর্মপ্রচেষ্টা—efforts
কর্মবিভাগ—division of labour
কর্মসূচী—programme
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি—Law of Increasing Returns
ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি—Law of Increasing Cost
ক্রমবিকাশ—evolution
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় বিধি—Law of Diminishing Cost
ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয় বিধি—Law of Decreasing Cost
ক্রয়শক্তি—purchasing power
কাগজী মুদ্রা—paper money
কাগজী মুদ্রামান—paper money standard
কাঁচামাল—raw materials
কাঠামো—structure
কাম্য—optimum
কাম্যতা—desiredness
কাম্য অনুপাত—optimum proportion

কাম্য উৎপাদন—optimum production
কাম্য জনসংখ্যা—optimum population
কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান—optimum firm
কারবার—firm
কারিগরি—technical
কার্যকরী—operative
কার্যকাল—tenure
কার্য পরিদর্শক—overseer
ক্রান্তীয়—tropical
ক্লিয়ারিং হাউস ব্যবস্থা—clearing house system
ক্রিয়াশীল—active
কুটির শিল্প—cottage industry
কৃষি-আয়কর—agricultural income tax
কেনাবেচা—transaction
কেন্দ্রীয় কৃত্যক—All India Services
কেন্দ্রীয় সংগঠন—central organisation

খ

খসড়া—draft
খাজনা—rent
খাজনাতত্ত্ব—theory of rent
খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ—food-rationing
খাদ্য সরবরাহ—food supply
খাদ্য সমস্যা—food problem
খাদ্যাহরণ জীবন—food gathering life
খাদ্যোৎপাদন জীবন—food-producing life
খুচরা দাম—retail price
খোলাবাজারে কারবার—open market operations

গ

গণ-উদ্যোগ—initiative
গণতন্ত্র—democracy
গণতান্ত্রিক—democratic
গণভোট—referendum
গড় উৎপাদন-ব্যয়—average cost of production
গড়পড়তা—average (*per capita*)
গতিশীল—mobile
গতিশীলতার নীতি—principle of progression
গাণিতিক প্রগতি—arithmetical progression
গুণগত—qualitative

ঘ

ঘাটতি—deficit
ঘাটতি অঞ্চল—deficit area
ঘাটতি ব্যয়—deficit financing

চ

চক্রীদল—clique, coterie
চতুর্পর্যায়ী পরিকল্পনা—point-four programme
চরম—absolute
চলতি আমানত—demand deposit
চলতি মূলধন—circulating capital
চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন-উদ্বৃত্ত—balance of payments on current account
চাহিদা—demand
চাহিদা-রেখা—demand curve
চাহিদা-সূচী—demand schedule
চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা-income-elasticity of demand
চাহিদা-দাম—demand price
চাহিদার সূত্র—law of demand

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—elasticity of demand
চুংগি—octroi
চুক্তি অনুযায়ী খাজনা—contract rent
চেক—cheque
চেতনাসম্পন্ন—enlightened

ছ

ছদ্ম বেকারত্ব—disguised unemployment

জ

জনগোষ্ঠী—clan, party
জনপ্রিয় পরিষদ—popular chamber
জনমত—public opinion
জনপালন কৃত্যক—public services
জনাধিক্য—overpopulation
জন্মসূত্রে—natural born
জন্মস্থান নীতি—*jus loci, jus soli*
জনস্বাস্থ্য—public health
জনসংখ্যা—population
জমা আমানত—savings deposit
জমার অনুপাত—reserve ratio
জমির (জোতের) সংহতিসাধন—consolidation of holdings
জমিবন্ধকী ব্যাংক—land mortgage bank
জলবায়ু—climate
জরুরী আইন—ordinance
জাতি—nation, race
জাতিগত—racial
জাতিগত বৈশিষ্ট্য—racial qualities
জাতীয় আয়—national income
জাতীয় উন্নয়ন—national development
জাতীয় উৎপাদন—national product
জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান—National Defence Academy
জাতীয় ব্যয়—national outlay
জাতীয় মূলধন—national capital
জাতীয় রাষ্ট্র—Nation State
জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী—National Cadet Corps (N C C)
জাতীয় সমাজ—national society
জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—National Extension Service (N. E S)
জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা—national self-sufficiency
জাতীয় স্বাধীনতা—national liberty
জাতীয়করণ—nationalisation
জাতীয়তাবাদ—nationalism
জ্যামিতিক প্রগতি—geometric progression
জীববিজ্ঞানী—biologist
জীবন সংগ্রাম—struggle for existence
জীবনযাত্রার মান—standard of living
জীবনযাত্রার স্তর—level of living
জুয়া—gambling
জোত—holding
জোতের অসম্বদ্ধতা—fragmentation of holdings

ট

টাকাকড়ি—money
টাকাকড়ির কার্য—functions of money
টাকাকড়ির মূল্য—value of money

ড

ডিবেঞ্চার—debenture

ত

তত্ত্ব—theory
তত্ত্বগত—theoretical
তপশীলভুক্ত জনগোষ্ঠী—scheduled tribes

তপশীলভুক্ত জাতি—scheduled castes
তপশীলভুক্ত (তপশীলী) ব্যাংক—.scheduled bank
তপশীল-বহির্ভূত ব্যাংক—non-scheduled bank
তমসুক—bonds
ত্যাগের সমতা—equality of sacrifice
তেজী (অবস্থা)—boom
তেজী বাজার—boom market

দ

দক্ষতা—skill
দল—party, clan
দলীয় সরকার—party government
দলীয় মনোবৃত্তি—party spirit
দ্রব্য—goods
দ্রব্য-বিনিময়—barter
দাম—price
দায়—liability
দায়রা জজ—sessions judge
দ্বি-দলীয় প্রথা—bi-party system
দ্বি-ধাতুমান—bi-metallic
দ্বি-পরিষদ সম্পন্ন—bi-cameral
দ্বি-বিক্রেতা প্রতিযোগিতা—duopoly
দায়িত্বশীল (পার্লামেন্টীয়)—responsible (parliamentary)
দীর্ঘকালীন বাজার—long-period market
দূত—consul, ambassador
দূতাবাস—consulate, embassy
দৃশ্য-আমদানি—visible import
দৃশ্য-রপ্তানি—visible export
দেনাপাওনার মান—standard of deferred payment
দেশীয় ব্যাংক—indigenous bank
দৈনন্দিন—ordinary

ধ

ধন—wealth
ধনতান্ত্রিক—capitalistic
ধনতান্ত্রিক রূপ—capitalistic form
ধনবৈষম্য—inequality of wealth
ধর্মঘট—strike
ধর্মীয় রাষ্ট্র—theocratic State
ধ্বংসাত্মক (নাশকতামূলক) কার্য—sabotage
ধাতব মুদ্রা—metallic money
ধাতব মুদ্রামান—metallic standard

ন

নগর-রাষ্ট্র—city-State
নগরোন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান—improvement trust
নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা—river valley project
নাগরিক—citizen
নাগরিক জীবন—civic life
নাগরিকতা—citizenship
নামসর্বস্ব—nominal
নায়ক—leader
ন্যায্য মজুরি—fair wage
ন্যায়—justice
ন্যায়বিচার—equity
ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি—natural law
নিদর্শক মুদ্রা—token coin
নিবদ্ধ মূলধন—sunk capital, specific capital
নিবারক.নিরোধ—preventive detention
নিম্নতর—junior
নিম্নতর আদালত—subordinate court
নিরাপত্তা—security
নিরাপত্তা পরিষদ—Security Council

নির্দেশ—writ
নির্দেশমূলক নীতি—Directive Principles
নির্দিষ্ট ভূখণ্ড—territory
নির্বাচন—choice, election
নির্বাচন কমিশন—Election Commission
নির্বাচকমণ্ডলী—electorate
নির্বাহী বাস্তুকার—executive engineer
নির্লিপ্ততা—indolence
নিশ্চয়তার নীতি—canon of certainty
নিষ্ক্রিয় অংশীদার—sleeping partner
নিয়ন্ত্রণ—check, control
নিয়মতান্ত্রিক শাসক—constitutional head
নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—parliamentary government
নিয়োগ-সংস্থা—employment exchange
নিঁখুত—absolute, pure
নীট—net, pure
নীতি—canon, principle
ন্যূনতম জীবনধারণ—subsistence level
ন্যূনতম জীবনধারণের মান—minimum subsistence standard
ন্যূনতম মজুরি—minimum wage
নৈতিক অধিকার—moral right
নৈতিক প্রণোদান—moral suasion
নৌবাহিনী—navy
নৌবাহিনীর প্রধান (অধ্যক্ষ)—Chief of the Naval Staff

প

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—Five Year Plan
পণ্য—commodity, merchandise
পণ্যোৎপাদন—commodity production
পদচ্যুতি—recall
পরমাদেশ—*mandamus*
পরামর্শদান এলাকা—advisory jurisdiction
পরিকল্পনা—project, planning
পরিকল্পনা অঞ্চল—project area
পরিকল্পনা কমিশন—Planning Commission
পরিকল্পনা কাঠামো—plan-frame
পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা—planned economy
পরিচালক—director
পরিচালন—operation
পরিচালিত মুদ্রা—managed money
পরিচালনা—management
পরিচালকমণ্ডলী—board of directors
পরিতৃপ্তি—satisfaction
পরিধি—extent
পরিবর্ত-দ্রব্য—substitute
পরিবর্তনশীলতার নীতি—canon of elasticity
পরিবর্তনীয়—convertible
পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা—convertible paper money
পরিবেশ—environment, atmosphere
পরিবহণ ও সংসরণ—transport and communication
পরিমাণগত—quantitative
পরিশুদ্ধ—pure
পরিষদ—council
পরিষদপাল—Speaker
পরোক্ষ গণতন্ত্র—indirect democracy

পশুপালন—animal husbandry
পাইকারী দাম—wholesale price
পালটি শস্য উৎপাদন—rotation of crops
পার্লামেণ্ট—Parliament
পিতৃতান্ত্রিক—patriarchal
পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ—Patriarchal Theory
পুঁজিপতি—capitalist
পুঁজিবাদ—capitalism
পুনরুৎপাদন-ব্যয়—cost of reproduction
পুনর্বাট্টা—rediscount
পুরঃশুল্ক—octroi
পুষ্টিকারিতা—nutritional
পূর্ণাংগ বাজার—perfect market
পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা—perfect competition
পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়—predetermined income
পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়—predetermined expenditure
পৃথকিকরণ—separation
পৃথকীকৃত—differentiated
পৌনঃপুনিক মূলধন—recurring circulating capital
পৌর—urban
পৌর-কর্তব্য—civic duties
পৌর-চিকিৎসক—civil surgeon
পৌরবিজ্ঞান—Civics
পৌরসংঘ—municipality
প্রকৃত আয়—real income
প্রকৃত মজুরি—real wage
প্রক্রিয়া—process
প্রজা—subject
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র—direct democracy
প্রতিকূল—unfavourable

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—representative democracy
প্রতিনিধিমূলক মুদ্রা—representative money
প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা—representative government
প্রতিরক্ষা—defence
প্রতিরক্ষা দপ্তর—Defence Department
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—Defence Minister
প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ—defensive type of protection
প্রতিরোধ—prohibition
প্রতিরোধকারী উৎপাদন-শুল্ক—prohibitive excise duties
প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ—preventive check
প্রতিশ্রুতি পত্র—promissory note
প্রতিযোগিতা—competition
প্রতীক্ষা—waiting
প্রথা—custom
প্রথাগত আইন—customary law
প্রধান কর্মকর্তা—chief executive
প্রধান কর্মসচিব—Secretary-General
প্রধান ধর্মাধিকরণ—Supreme Court
প্রপন্নাধিকার—court of wards
প্রমোদ কর—entertainment tax
প্রস্তাবনা—Preamble
প্রাকৃতিক অবস্থা—State of Nature
প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য—natural resources
প্রাকৃতিক পরিবেশ—natural environment
প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ—positive check
প্রাকৃতিক সম্পদ—natural resources
প্রাথমিক লাভ—immediate gain
প্রান্তিক—marginal

প্রান্তিক আয়—marginal profit
প্রান্তিক উপযোগ—marginal utility
প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—marginal cost of production
প্রান্তিক জমি—marginal land
প্রান্তিক মুনাফা—marginal profit
প্রাপ্তবয়স্ক—adult
প্রামাণিক মুদ্রা—standard coin

ফ

ফৌজদারী আদালত—criminal court

ব

বণ্টন—distribution
বন্দী-প্রত্যক্ষকরণ—*habeas corpus*
বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান—port trust
বরাদ্দ—quota
বরাদ্দ-নীতি—rationing
বর্ণভেদ প্রথা—caste system
বহু-উদ্দেশ্যমূলক—multi purpose
বহুজাতীয় রাষ্ট্র—multi-national State
বহুদলীয় ব্যবস্থা—multi-party system
বলপ্রয়োগ মতবাদ—Theory of Force
বস্তুগত—material
বাজার—market
বাজার-দাম—market price
বাজার বসার জায়গা—market place
বাট্টা—discount
বাণিজ্য—commerce
বাণিজ্য-শুল্ক—customs
বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত—balance of trade
বাণিজ্যিক—commercial
বাণিজ্যিক পদ্ধতি—commercial system
বাণিজ্যিক ব্যাংক—commercial bank
বাণিজ্যিক সংগঠন—trade organisation
বাধ্যতামূলক সঞ্চয়—forced savings
বাস্তব মূলধন—concrete capital, real capital
বাহ্যিক—external
বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা—external sovereignty
বিকল্প—alternate
বিকৃত রাষ্ট্র—perverted State
বিচার বিভাগ—judiciary
বিক্রয়যোগ্য—marketable
বিক্রয়কর—sales tax
বিচারমূলক সংরক্ষণ—discriminating protection
বিচারের রায়—judicial decisions
বিদেশীয়—alien
বিধান পরিষদ—legislative council
বিধানসভা—legislative assembly
বিধি—law
বিনিময়—exchange
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ—exchange control
বিনিময় ব্যাংক—exchange bank
বিনিময়-মূল্য—value-in-exchange
বিনিময়ের মাধ্যম—medium of exchange
বিনিয়োগ—investment
বিনিয়োগ অভ্যাস—investment habit
বিনিয়োগকারী—investor
বিবর্তন—evolution
বিবর্তনবাদ—Evolutionary Theory
বিভিন্ন জাতীয়—heterogeneous
বিবেচনা-সাপেক্ষ খসড়া—tentative draft

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার—discriminating monopoly
বিমান বাহিনী—air force
বিলম্বিত—deferred
বিলম্বিত শোধ—deferred payment
বিলাস দ্রব্য—luxuries
বিশ্বব্যাংক—World Bank
বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান—World Health Organisation (WHO)
বিশেষজ্ঞ কর্মী—specialised expert
বিশেষিকরণ—specialisation
বিশেষীকৃত—specialised
বিশেষীকৃত স্থায়ী মূলধন—specialised fixed capital, specialised fixed equipment
বিধিসম্মত মুদ্রা—legal tender money
বৃত্তি—stipend
বৃহদায়তন শিল্প—large scale industry
বেকারত্ব—unemployment
বেকার-সমস্যা—unemployment problem
বেসরকারী উদ্যোগ—private sector
বেসামরিক শাসনপরিচালনা—civil administration
বৈচিত্র্য আনয়ন—diversification
বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক—foreign exchange bank
বৈদেশিক মুদ্রা—foreign exchange
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি—private property
ব্যক্তিগত বণ্টন—personal distribution
ব্যক্তিগত মূলধন—private capital
ব্যক্তিগত মূল্য পৃথকিকরণ—personal discrimination
ব্যক্তিগত সঞ্চয়—personal savings
ব্যক্তিগত সম্পদ—individually owned wealth
ব্যক্তিগত স্বার্থ—private interest
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—individualism
ব্যবহার-মূল্য—value in use
ব্যবসায়—business
ব্যয়—cost, expenditure
ব্যয়কর—expenditure tax
ব্যয়সংক্ষেপ—economies
ব্যয়সংক্ষেপের নীতি—canon of economy
ব্যাখ্যাকর্তা—interpreter
ব্যাপক—comprehensive, extensive
ব্যাপক চাষ—extensive cultivation
ব্যাপক চাহিদা—wide demand
ব্যাংক-ব্যবস্থা—banking system
ব্যাংকের আমানত—bank deposit
ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি—bank money

ভ

ভারসাম্য—equilibrium
ভারসাম্য-দাম—equilibrium price
ভারী শিল্প—heavy industry
ভ্রাতৃভাব—fraternity
ভ্রাম্যমাণ—nomadic
ভিত্তি বৎসর—base year
ভূমিদাস—serf
ভূমি-রাজস্ব—land revenue
ভূমি সংস্কার—land reforms
ভোক্তা—consumer
ভোগ—consumption
ভোগ্যদ্রব্য—consumers' goods, consumption goods
ভোগ্য (পণ্য) দ্রব্যক্রেতা—consumer
ভোক্তার উদ্বৃত্ত—consumers' surplus
ভোটাধিকার—franchise, suffrage

মজুরি—wages
মজুরিতত্ত্ব—theory of wages
মতবাদ—theory
মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী—middleman
মন্দাজনিত বেকারত্ব—cyclical unemployment
মন্দাবস্থা—depression
মন্ত্রি-পরিষদ—Council of Ministers
মন্ত্রিসভা—Cabinet
মহাধর্মাধিকরণ—high court
মাথাপিছু—*per capita*
মাথাপিছু আয়—*per capita* income
মাতৃতান্ত্রিক—matriarchal
মান—standard
মানসিক—subjective
মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয়—friendly aliens
মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা—mixed economy
মুদ্রা—coin, currency
মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাংকন—currency and coinage
মুদ্রামান—monetary standard
মুদ্রাস্ফীতি—inflation
মুনাফাতত্ত্ব—theory of profit
মূলধন—capital
মূলধন খাতে ব্যয়—expenditure on capital account
মূলধন-গঠন—capital formation
মূলধন-দ্রব্য—producers' goods, production goods, capital goods
মূলধনবৃদ্ধি—accumulation of capital
মূলধন-লাভ—capital gains
মূলধন-লাভকর—capital gains tax
মূলধনপ্রদানকারী অংশীদার—share-holders
মূলধনের হিসাবের খাতে—on capital account
মূল শিল্প—key industry, basic industry
মূল্য—value
মূল্যতত্ত্ব—theory of value
মূল্যস্তর—price level
মূল্যস্থিতিকরণ—price stabilisation
মূল্যের পরিমাপ—measure of value
মূল্যের শ্রমতত্ত্ব—Labour Theory of Value
মেয়াদী আমানত—time deposit
মোট—gross
মোট আয়—gross income
মোট উপযোগ—total utility
মোট জাতীয় উৎপাদন—gross national product
মোট মুনাফা—gross profit
মোট সুদ—gross interest
মৌলিক অধিকার—fundamental rights

য

যন্ত্রপাতি—machinery
যুক্তরাষ্ট্রীয়—federal
যুগ্ম তালিকা—concurrent list
যুদ্ধনায়ক—war-lord
যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী শিল্প—strategic industry
যোগান—supply
যোগান-দাম—supply price
যোগান-রেখা—supply curve
যোগান-সূচী—supply schedule
যোগানের সূত্র—law of supply
যৌথ দরাদরি—collective bargaining
যৌথ দায়িত্ব—joint responsibility
যৌথ পরিবার—joint family

যৌথ পুঁজি ব্যাংক—joint stock bank
যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ—Syndicalism
যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান—joint stock company

র

রক্ষণশীল—conservative
রক্ষাকবচ—safeguards
রক্তের সম্পর্ক—kinship
রক্তের সম্পর্ক নীতি—*jus sanguinis*
রপ্তানি—export
রাজতন্ত্র—monarchy
রাজনৈতিক দল—political party
রাজস্ব খাতে ব্যয়—expenditure on revenue account
রাজস্ব দপ্তর—treasury
রাজ্যকৃত্যক—State Services
রাজ্য-তালিকা - State List
রাজ্যপাল—Governor
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন—State Reorganisation Commission
রাজ্যসভা—Council of States
রাজ্যসংঘ—Union of States
রাষ্ট্র—State
রাষ্ট্রকৃত্যক—public services
রাষ্ট্রদ্রোহিতা—sedition
রাষ্ট্রমন্ত্রী—Minister of State
রাষ্ট্রপতি—President
রাষ্ট্রপতি-শাসিত—presidential
রাষ্ট্র-পরিচালনা—State-management
রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—political rights
রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—political consciousness
রাষ্ট্রনৈতিক দল—political party
রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন—political organisation
রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা—political liberty
রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কমিশন—Public Service Commission
রাষ্ট্রহীন—Stateless
রাষ্ট্রীয় ধর্ম—State religion
রাষ্ট্রীয় মালিকানাকরণ—nationalisation
রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ—State socialism
রাষ্ট্রের ইচ্ছা—will of the State
রীতি—convention
রূপগত উপযোগ—form utility
রোপণ শিল্প—plantation industry

ল

লক্ষ্য—target
লিখিত মূল্য—face value
লেখ—writ
লেনদেন—transaction
লেনদেন-উদ্বৃত্ত—balance of payments
লোকসভা—House of the People

শ

শক্তি—power
শক্তিজোট—power bloc
শান্তিশৃংখলা—peace and security
শাসক—administrator
শাসন—administration
শাসন-ব্যবস্থা—government, administration
শাসন বিভাগ—executive
শাসনতান্ত্রিক সুবিধা—administrative expediency
শিল্প—industry
শিল্প-প্রতিষ্ঠান—firm

শিল্প ব্যাংক—industrial bank
শিল্পগত ভিত্তি—industrial base
শিক্ষানবীশ—apprentice
শিক্ষানবীশী—apprenticeship
শোষণ—exploitation
শ্রম—labour
শ্রমবিভাগ—division of labour
শ্রমিক সমবায়—confederation of labour
শ্রমিক-সংঘ—trade union, guild

স

সক্রিয়—active
সঞ্চয়—savings
সঞ্চয়মূলক—cumulative
সঞ্চয়ের ইচ্ছা—will to save
সঞ্চয়ের ক্ষমতা—power to save
সঞ্চয়ের ভাণ্ডার—store of value
সতর্কতা—vigilance
সদর কার্যালয়—headquarters
সভাপতি—chairman
সভা সমিতি—platform
সমজাতীয়—homogeneous
সমবায়—cooperation (co operation)
সমবায়িক—cooperative (co operative)
সমাজ—society
সমাজ-কল্যাণকর—social welfare
সমাজজীবন—social life
সমাজবিজ্ঞানী—sociologist
সমাজতন্ত্রবাদ—socialism
সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা—Socialist Pattern of Society
সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত—socialistic bias
সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা—Community Development Projects
সমতার নীতি—canon of equality
সম্পত্তি—asset
সম্পদ—wealth
সম্পদকর—wealth tax
সমষ্টিগত সম্পদ—collectively owned capital
সময়গত উপযোগ—time utility
সমহারে উৎপন্নের বিধি—Law of Constant Returns
সমানুপাতিক কর—proportional tax
সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব—proportional representation
সম্ভাবনা—potentiality
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—United Nations
সম্মিলিত সরকার—coalition government
সরকার—government
সরকারী আয়—public income
সরকারী আয় ব্যয়—public finance
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র—public sector
সরকারী ঋণ—public debt
সরকারী ব্যয়—public expenditure
সরল সূচক সংখ্যা—simple index numbers
সরলতার নীতি—canon of simplicity
সর্বজনীন (প্রাপ্তবয়স্কের) ভোটাধিকার—universal (adult) suffrage
সর্বহারা—proletariat
সর্বহারার বিপ্লব—proletarian revolution
সর্বাধিককরণ—maximisation
সর্বাগ্রগণ্য অংশ—preference share
সর্বাধিনায়কতা—supreme command
সসীম দায়—limited liability
সহজে চেনার যোগ্যতা—cognisability
সহায়ক শিক্ষার্থীবাহিনী—Auxiliary Cadet Corps

সংখ্যাগরিষ্ঠতা—majority
সংগ্রামমূলক কার্য—militant function
সংঘজীবন—organised life
সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ—guild socialism
সংঘর্ষ—friction
সংঘাতজনিত বেকারত্ব—frictional unemployment
সংবিধান—constitution
সংরক্ষণ—protection, maintenance
সংরক্ষণ নীতি—fiscal policy
সংরক্ষণমূলক খাদ্য—protective food
সংরক্ষণমূলক শুল্ক—protective duty
সংসদ—Parliament
সংসরণ-ব্যবস্থা—communication system
সংহতি—consolidation
স্বজাতীয়—national
স্বরাষ্ট্র দপ্তর—Home Department
স্বর্ণ দাবিপত্র—gold certificate
স্বর্ণপিণ্ডমান—gold bullion standard
স্বর্ণবিনিময়মান—gold exchange standard
স্বর্ণমুদ্রামান—gold currency standard, gold circulation standard
স্বর্ণমূল্য—gold value
স্বর্ণসমতামান—gold parity standard
স্বল্পবিক্রেতা প্রতিযোগিতা—oligopoly
স্বয়ংনিযুক্ত—self-employed
স্বয়ংসম্পূর্ণতা—self-sufficiency
সাধারণ অংশ—ordinary share
সাধারণ দানকর—general gift tax
[illegible]ফা—normal profit

সাধারণ বিভাগ—General Assembly (U N)
সাধারণতন্ত্র—republic
সাধারণতান্ত্রিক—republican
সামগ্রিক নিরাপত্তা—collective security
সামগ্রিক মূলধন—collective capital
সামগ্রিক সম্পত্তি—collective wealth
সামন্ততন্ত্র—feudalism
সামন্ত যুগ—feudal age
সামাজিক অধিকার—civil rights
সামাজিক চুক্তি মতবাদ—Social Contract Theory
সামাজিক নিরাপত্তা—social security
সামাজিক মূলধন—social capital
সামাজিক স্বাধীনতা—social liberty
সামাজিক সংগঠন—social organisation
সাম্য—equality
সাম্যবাদ—communism
সাম্যবাদী—communist
সাম্যবাদী সমাজ—communistic society
সাম্যাবস্থার সুদের হার—equilibrium rate of interest
সার্বভৌম—sovereign
সার্বভৌম ক্ষমতা—sovereignty
সার্বভৌমিকতা—sovereignty
সালিশী বিচার—arbitration
সাংস্কৃতিক—cultural
সাংস্কৃতিক সংগঠন—cultural organisation
স্থানগত উপযোগ—place utility
স্থানগত পৃথকীকরণ—local discrimination

স্থানান্তর গমন—migration
স্থানান্তর প্রেরণের সুবিধা—portability
স্থানান্তরে অর্থপ্রেরণের সুবিধা—remittance facilities
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা—local self-government
স্থায়িত্ব—durability
স্থায়ী—durable
স্থায়ী বসবাস—domicile
স্থায়ী মূলধন—fixed capital
স্থিতিস্থাপক—elastic
স্নাতকোত্তর—post-graduate
স্বাতন্ত্র্যনীতি—principle of independence (autonomy)
স্বাদেশিকতা—patriotism
স্বাধীন—free
স্বাধীনতা—freedom, liberty
স্বাভাবিক উপযোগ—elementary utility, natural utility
স্বাভাবিক দাম—normal price
স্বল্পোন্নত (অঞ্চল, দেশ প্রভৃতি)—underdeveloped (area, country, etc.)
স্বাস্থ্যাধিকারক—health officer
স্বায়ত্তশাসন—self-government
সুনাগরিকতা—good citizenship
সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক—hindrances to good citizenship
সুনাম—goodwill
সুবিধা—benefit
সুবিধার নীতি—canon of convenience
সুসংবদ্ধ—organised
সুষম উন্নয়ন—balanced development
সুষম খাদ্য—balanced diet
সুষম শিল্প-ব্যবস্থা—balanced industrial system
সূক্ষ্মতা—precision
সূত্র—law
সেচ—irrigation
সেনাবাহিনী—army
সেনানিবাস সংঘ—cantonment board
সেবাগত উপযোগ—service utility
সেবামূলক কার্য—services
স্বেচ্ছামূলক—voluntary
সৈন্যবাহিনী—army
স্বৈরাচার—despotism
স্বৈরাচারী—despot
সৌভ্রাত্রমূলক কার্য—fraternal functions

হ

হস্তান্তর-পাওনা—transfer payment
হস্তান্তরযোগ্য—transferable
হিসাব-নিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি—money of account
হুণ্ডি—bill of exchange

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের প্রশ্নপত্র

HUMANITIES GROUP

1960

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any* three *questions*)

1. Define a State. Is West Bengal a State according to your definition ? Explain your answer.

2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects ?

3. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a government ?

4. Define a citizen. What are the hindrances to good citizenship ?

5. What is meant by Liberty ? How is it related to Law ?

Or, Distinguish between unitary and federal forms of government.

Group B (*Answer any* three *questions*)

6. "India is a sovereign Democratic Republic."--Explain what it means.

7. Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected ?

8. What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ?

9. State the composition and functions of the Supreme Court of India.

10. What are the fundamental rights of the Indian citizen under the Constitution of India ?

11. Describe the constitution and functions of District Boards in India.

ECONOMICS : First Paper (*Answer any* six *questions*)

1. Explain how price is determined in a market under perfect competition.

2. Discuss the functions and utility of Trade Unions. What are the principal weaknesses of trade union movement in India ?

3. What is meant by 'co-operation' ? Describe the different types of co-operative societies which prevail in India.

4. What is capital? What measures would you adopt to increase the accumulation of capital in India?

5. Give a brief account of the aims and objectives of India's Five Year Plans.

6. What is inflation? How does inflation affect businessmen and wage-earners?

7. Comment on the advantages and limitations of production by joint-stock companies.

8. Discuss the functions of a Central Bank.

9. What are the principal features of an underdeveloped economy? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.

10. Indicate the importance of the village and small-scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries?

11. Define a tax. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes.

1960 (COMPARTMENTAL)

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any* three *questions*)

1. Explain and criticise the Social Contract Theory about the origin of the State.

2. Distinguish between Parliament and Presidential forms of Government. Is the Government of India Presidential or Parliamentary?

3. State and explain the Socialist theory about the functions of Government.

4. Define a Party. What are the merits and demerits of a Party System of Government?

5. What is meant by Public Opinion? How is Public Opinion formed in a country?

Group B (*Answer any* three *questions*)

6. What are Directive Principles of State Policy as stated in the Indian Constitution? What is their significance?

7. State and explain the important characteristics of the Federation of India?

8. How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive?

9. Discuss the position and powers of the Governor of a State in Indian Union.

10. State the relation between the Centre and the States of the Indian Union on legislative and executive matters.

ECONOMICS : First Paper (*Answer any* six *questions*)

1. Distinguish between (*a*) wealth and capital, (*b*) value and price and (*c*) money wages and real wages.

2. What are the causes leading to the localisation of industries in particular areas ? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.

3. Explain the nature of services performed by the entrepreneur in modern business organisation.

4. What are market prices ? Why is demand more influential than supply in fixing market prices ?

5. Estimate the place of small-scale and cottage industries in the economy of India. How would you propose to plan the future development of such industries ?

6. What are the functions of Banking ? Carefully explain their importance in modern business.

7. Distinguish between a direct and an indirect tax. Give examples of both from the Indian tax system.

8. What are the main causes which influence the accumulation of capital in a country ? How far are those causes present in India today ?

9. What are the chief defects of Indian industrial labour and what, in your opinion, are the remedies for them ?

10. How will a period of rising prices affect the following groups in the population :—

(*a*) Farmers ; (*b*) Wage-earners ; and (*c*) Teachers.

1961

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any* three *questions*)

1. Explain the characteristics of the State and distinguish it from other associations.

2. Distinguish between Direct and Indirect Democracy. What are [illegible] of a Democratic form of Government ?

3. Explain the limits to the theory of Separation of Powers. [illegible] examples.

4. Define a citizen. What are the qualities of a good citizen ?
5. "Rights and Duties go together."—Explain.

Group B (*Answer any* three *questions*)

6. te at least four of the Fundamental Rights of an Indian citizen. How are these Fundamental Rights protected in the Indian Constitution ?

7. What are the characteristic features of the Federation of India ?

8. Describe the organisation of the Judiciary in India.

9. What are the functions of Municipalities in India ? What are their principal sources of revenue ?

10. Describe the position and powers of the President of the Indian Union.

ECONOMICS : First Paper (*Answer any* six *questions*)

1. Distinguish between market value and normal value. Show how market value is determined.

2. What is money ? Describe the functions of money.

3. Describe the part which co-operation can play in the development of Indian agriculture.

4. Discuss the problem of India's population and food supply.

5. Explain why wage rates vary in different occupations within a country.

6. Discuss the advantages and disadvantages of foreign trade.

7. Explain how interest is determined.

8. What is a bank ? What are its services to society for which you consider it useful ?

9. What is meant by 'economic development' ? State the principal requirements for development of an underdeveloped country like India.

10. What is a tax ? How should the burden of taxes be distributed among the people ?

1961 (COMPARTMENTAL)

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any* three *questions*)

1. Describe the essential characteristics of the State. How would you distinguish a State from other associations ?

2. Discuss the merits and defects of democracy.

3. Distinguish between Unitary and Federal government. Give examples.

4. Explain what is meant by a bicameral form of legislature. Do you favour such a form of legislature? If so, why?

5. Define the term 'Right' of a citizen. Enumerate the principal civil and political rights of a citizen.

Group B (*Answer any* three *questions*)

6. What is meant by the term 'preamble' to a constitution? Briefly describe and explain the preamble to the Constitution of India.

7. Explain the term 'Franchise'? What is Adult Franchise? Do you justify it in the case of India?

8. Discuss the distribution of legislative powers between the Centre and the States in the Constitution of India.

9. Discuss the relation between the two houses of the Union Parliament.

10. State the main heads of revenue and expenditures of the State Governments under the present constitution of India.

ECONOMICS : First Paper (*Answer any* six *questions*)

1. What is meant by 'elasticity of demand'? Explain why the demand for luxuries is usually elastic, while the demand for necessaries is inelastic.

2. Explain and discuss the different forms of business organisation.

3. Define 'land' and show how its productivity can be increased. Illustrate your answer by a reference to Indian conditions.

4. Describe the advantages of money.

5. How are creditors and debtors affected by changes in the general price level?

6. Consider the influence of Trade Unions on wages.

7. Examine the connection between rent and price.

8. Define 'capital' and point out how it helps production.

9. How is monopoly price determined?

10. Describe the aims and objects of India's Five Year Plans.

1962

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any* three *questions*)

1. Define State. Explain its characteristics. and distinguish it from Government.
2. What is meant by Socialism ? Give your arguments for and against it.
3. Discuss the case for and against the Right of self-determination as a principle of organisation of states.
4. Explain what is meant by a Federal Government. What are the merits and defects of such a form of Government ?
5. What is meant by Liberty ? Point out the relation of Liberty to Law.

Group B (*Answer any* three *questions*)

6. Explain the main features of the present Constitution of India.
7. What is meant by Directive Principles of State policy as adopted in the Constitution of India ? Illustrate your answer.
8. Describe the organisation and powers of the Union legislature in India.
9. Describe the administrative relation between the Federal and the State Governments in Indian Constitution.
10. Briefly describe the organisation of the judicial system in India.

ECONOMICS : First Paper (*Answer any* six *questions*)

1. What do you mean by an undeveloped economy ? What are the main structural features of such an economy ? Illustrate your answer by reference to Indian conditions.
2. How far does value depend upon cost of production ?
3. Define 'economic rent'. Indicate the effect of the pressure of population on rent.
4. What is ment by the term 'value of money' ? How is the value of money related to the quantity of money ?
5. What are the different purposes of public expenditure ? Explain your answer with special reference to Indian conditions.
6. State the functions of a Central Bank.
7. Write short notes on any *two* of the following :—
   (*a*) Balance of Trade ; (*b*) Mixed Economy ; (*c*) National Income.
8. What is a direct tax ? Give a brief account of some of the important taxes levied in this country.
9. Show how wages are determined.
10. State the principles of co-operation. What are the different types of co-operative societies to be found in India ?

1962 (COMPARTMENTAL)

CIVICS : Second Paper

Group A (*Answer any* three *questions*)

1. Explain the Social Contract Theory about the origin of the State.
2. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Explain the merits and demerits of each.
3. Define the term 'Nation' and distinguish it from 'State'. Is India a nation ?
4. State the principal aims and objects of the United Nations. Give a brief outline of its organisation.
5. What are Public Services ? What are their essential characteristics and functions ?

Group B (*Answer any* three *questions*)

6. The preamble to the Indian Constitution states—'India is a sovereign, democratic republic.' Explain,
7. Describe the scheme of distribution of powers between the Federal and the State governments in the Indian Constitution.
8. Explain the aims of the Community Development Projects in India.
9. Describe the organisation and functions of the Supreme Court in India.
10. Give an estimate of the powers and position of the Governor in a state in India.

ECONOMICS : First Paper (*Answer any* six *questions*)

1. What is Capital ? What are the factors upon which the accumulation of capital depends ?
2. What is meant by monopoly ? Show how price is determined under conditions of monopoly.
3. Examine the connection between population and food supply.
4. What are the aims and objects of India's Five Year Plans ?
5. What is meant by land in Economics ? In what respects does it differ from other factors of production ?
6. Describe the principal advantages of foreign trade.
7. Describe the functions of a bank. What are the advantages of a good banking system ?
8. Write a short note on the economic functions of a modern government.
9. Explain how interest is determined.
10. Write short notes on any *two* of the following :—

    (*a*) Index Numbers ; (*b*) Inflation ; (*c*) Co-operation.

অধ্যক্ষ **অরুণকুমার সেন** প্রণীত

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থবিদ্যা পরিচয় (৮ম সংস্করণ)

পরিশিষ্ট স্লিপ

[**DUE SLIP নহে**]

"The subject is to be treated with special reference to **Indian conditions.**" *(Vide Syllabus)*

গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু ভারতীয় জীবনের (Indian conditions) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়ায় ইহা বিশেষ পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ভারতীয় সংবিধান, ভারতের বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন অবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এখন (১৯৬৩ সালের জানুয়ারী) তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিবার জন্য এই পরিকল্পনার কিছু পুনর্বিন্যাস করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিভাবে পুনর্বিন্যাস করা হইবে সে সম্বন্ধে বর্তমানে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু ১৯৬৩ বা ১৯৬৪ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন এই পুস্তকের ক্রেতা ছাত্রছাত্রীগণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবে তখন তাহাদিগকে ঐ পুনর্বিন্যস্ত পরিকল্পনা এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকিতে হইবে। সংগে সংগে ভারতীয় সংবিধান ও শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন ঘটিবে সেগুলি সম্পর্কেও সচেতন থাকিতে হইবে।

এই কারণে সময়ের সহিত বিষয়বস্তুর সংগতি রাখিবার জন্য—অর্থাৎ, বিষয়বস্তুকে current রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে) একটি করিয়া পরিশিষ্ট বাহির করা হইতেছে। উহাতে বিষয়বস্তুর সকল পরিবর্তনই সন্নিবিষ্ট করিয়া ছাত্রছাত্রীগণকে পুনরায় নূতন সংস্করণের গ্রন্থ কিনিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

যে পরিশিষ্ট বাহির হইবে তাহা এই স্লিপের পরিবর্তে **বিনামূল্যে** দেওয়া হইবে।

পুনরায় বলিতে চাই যে ইহা Due Slip নহে।

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নাম ....

বিদ্যালয় ....

ঠিকানা ....

....

....

[৮ম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৬৩]